বংশ-পরিচয়

ঊনবিংশ-খণ্ড

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার-সঙ্কলিত

বৈশাখ, ১৩৪৫

সূচীপত্র

কলিকাতা—বাগবাজারের সহৃদয় ভূম্যধিকারী

একনিষ্ঠ সাহিত্যিক

সকল সদনুষ্ঠানে অগ্রণী, সদালাপী, সদানন্দ,

শ্রদ্ধেয় সুহৃদ্‌বর

শ্রীযুক্ত বিজয়গোপাল গঙ্গোপাধ্যায়

মহাশয়ের করকমলে

বংশ-পরিচয়—১৯শ খণ্ড

উৎসর্গীকৃত হইল।

বংশ-পরিচয়

ওড়াকান্দীর ঠাকুর বংশ।

"নীচ হয়ে করিব যে নীচের উদ্ধার।
অতি নিম্নে না নামিলে কিসে অবতার॥
কৃষ্ণ প্রেম সুনির্ম্মল উচ্চেতে না রবে।
নিম্নখাদে থাকে বারি দেখ মনে ভেবে॥"

শ্রীশ্রীহরি লীলামৃত।

মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্য দেবের প্রেমবন্যায় যখন নদীয়া প্লাবিত হইতেছিল এবং নবদ্বীপের সমৃদ্ধি সমগ্র ভারতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছিল; তখন বিহার প্রদেশ হইতে এক বাৎস্য গোত্রীয় মৈথিলী ব্রাহ্মণ সস্ত্রীক তথায় আগমন করিয়া মহাপ্রভুর ধর্ম্মে দীক্ষিত হন এবং স্থায়ীভাবে তথায় বসতি করেন। এই বংশের রামদাস নামক এক পরম সাধু বৈষ্ণব ভারতের বহু তীর্থ পর্য্যটন করিয়া সস্ত্রীক পূর্ব্ববঙ্গের চন্দ্রনাথ তীর্থ দর্শন করিতে আসেন। সে স্থান হইতে ফিরিবার পথে বর্ত্তমান যশোহর জিলার নবগঙ্গা তীরস্থ লক্ষ্মীপাশা গ্রামে আসিয়া উপনীত হন। এই স্থানটী বড়ই মনোরম ও স্বাস্থ্যকর ছিল। এখানে তাঁহাদের অনেক শিষ্য জুটিয়া গেল। তাহাদের মধ্যে নমঃশূদ্র জাতীয় শিষ্যই অধিক। তাহাদের একান্ত ইচ্ছায়, আগ্রহে এবং ভক্তিতে সাধু রামদাস লক্ষ্মীপাশা গ্রামেই বাস করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে লোকে ব্রাহ্মণকে "ঠাকুর" বলিয়া সম্বোধন করিত। রাম

দাসের শিষ্যেরা তাঁহাকে "প্রভু ঠাকুর" বলিতেন। ইহা হইতেই তিনি ঠাকুর আখ্যা প্রাপ্ত হন এবং তদবধি তাঁহার বংশধরগণ "ঠাকুর" বলিয়া অভিহিত হইয়া আসিতেছেন।

কিছু দিন গত হইলে প্রভুর একটী পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। তাহার নাম চন্দ্রমোহন ঠাকুর। পিতা-মাতার ক্রোড়ে শিশু স্নেহে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। কিন্তু বিবাহের উপযুক্ত বয়স হইলে প্রভু রামদাস এক মহাসমস্যায় পতিত হইলেন। কারণ তিনি মৈথিলী ব্রাহ্মণ ছিলেন; এজন্য বাংলাদেশের ব্রাহ্মণ সমাজের সহিত তাঁহার কোন সংশ্রব ছিল না। এতদ্ব্যতীত বহুদিন যাবৎ নমঃশূদ্র শিষ্যগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত থাকায় বঙ্গ দেশীয় ব্রাহ্মণগণও তাঁহাকে আর ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করিতে সম্মত হইলেন না। রামদাস পরম বৈষ্ণব ছিলেন। প্রকৃত পক্ষে বৈষ্ণবের কোন জাতি নাই। তিনি স্বীয় জাতাভিমানে জলাঞ্জলি দিয়া একমাত্র পুত্র চন্দ্র মোহনকে এক নমঃশূদ্র কন্যার সহিত বিবাহ দেন। এই কন্যার গর্ভে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তাঁহার নাম শুকদেব ঠাকুর, তিনি লক্ষ্মীপাশার উত্তরে জয়পুর গ্রামে যাইয়া বসতি করেন। তাহার পুত্র কালিদাস ঠাকুর মধুমতী নদীর পূর্ব্ব তীরে পাথরঘাটা গ্রামে আসিয়া বাস করেন। তিনি অতিশয় কৃষ্ণভক্ত ছিলেন এবং সর্ব্বদা সাধুসঙ্গে কৃষ্ণগুণ কীর্ত্তন করিয়া ও বৈষ্ণব ভোজন করাইয়া কালাতিপাত করিতেন।

মুকুন্দরাম ঠাকুর

কালিদাসের তিন পুত্র—রবিদাস, নিধিরাম ও শ্রীজীব, মধ্যম পুত্র নিধি রামের দুই পুত্র মুকুন্দরাম ও কার্ত্তিক। নিধিরাম ফরিদপুর জিলার বর্ত্তমান গোপালগঞ্জ মহকুমার অধীন সাফলীডাঙ্গায় আসিয়া বাস করেন এবং নিজ বুদ্ধিবলে ও পরিশ্রমগুণে অতি অল্পকাল মধ্যেই বহু ভূসম্পত্তির অধিকারী হন। তাঁহাব জ্যেষ্ঠ পুত্র মুকুন্দরাম বাল্যকাল

হইতেই নানা কার্য্যে স্বীয় বুদ্ধিমত্তার ও বিচক্ষণতার পরিচয় দেন এবং পিতৃ সম্পত্তি অনেক পরিমাণে বর্দ্ধিত করেন। তিনি লক্ষ্মীপুর গ্রাম নিবাসী রাজবল্লভ দাশের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। দাশ মহাশয় অতিশয় প্রতিপত্তিশালী লোক ছিলেন। মুকুন্দ রাম ঠাকুরের পাঁচ পুত্র—যশোবন্ত, সনাতন, প্রাণকৃষ্ণ, রামমোহন ও রমকৃষ্ণ। ইহাঁরা সকলেই অত্যন্ত কৃষ্ণভক্ত ছিলেন। ইহাঁদের পুত্র পৌত্রেরা অনেকে সংসারে থাকিয়া গৃহকার্য্য করিতেছেন। অনেকে কৃষ্ণ প্রেমে উদাসীন হইয়া গৃহত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনবাসী হইয়াছেন।

যশোবন্ত ঠাকুর

মুকুন্দ রাম ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র যশোবন্ত ঠাকুর ১১৮৮ বঙ্গাব্দে সাফলী-ডাঙ্গায় জন্মগ্রহণ করেন। বংশানুগত সংস্কার প্রভাবে তিনি অতিশয় ভগবদ্ভক্ত ছিলেন। বৈষ্ণব ধর্ম্মে তাঁহার প্রগাঢ় নিষ্ঠা ছিল। দূরদেশ হইতে বৈষ্ণবগণ সতত তাঁহার আলয়ে অতিথিরূপে উপস্থিত হইতেন। তিনি তাহাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া আনন্দের সহিত ভোজন করাইতেন। তিনি বৈষ্ণব শাস্ত্রানুমোদিত সমস্ত ভগবৎ সেবা, উৎসব ও অনুষ্ঠান করিতেন। তাঁহাব ধনৈশ্বর্য্য ছিল। সম্পত্তির আয় হইতে সাধু বৈষ্ণব সেবায় প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়াও তাঁহার প্রতিবৎসর বহু অর্থ সঞ্চিত থাকিত।

পরম ধার্ম্মিক এবং ত্যাগী হইলেও যশোবন্ত গৃহকার্য্য উপেক্ষা করিতেন না। তিনি পিতাব সম্পত্তি অনেক পরিমাণে বর্দ্ধিত করেন এবং সেই সময়ে ফরিদপুরের এই অঞ্চলের মধ্যে অত্যন্ত প্রতিপত্তিশালী এবং সম্মানী লোক বলিয়া পরিগণিত হন। তিনি মধুমতী নদীর পূর্ব্বতীরস্থ তারাইল গ্রাম নিবাসী রাম প্রসাদ চৌধুরীর কন্যা অন্নপূর্ণা দেবীকে বিবাহ করেন। এই রমণী অশেষ গুণসম্পন্না এবং কৃষ্ণভক্তি পরায়ণা ছিলেন। তাঁহার

গর্ভে পাঁচ পুত্র—কৃষ্ণদাস, হরিদাস, বৈষ্ণবদাস, গৌরীদাস ও স্বরূপদাস এবং দুই কন্যা—জাহ্নবী ও মালিনী জন্ম গ্রহণ করেন।

জ্যেষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণদাস ঠাকুরের জন্মের ৯ বৎসরের মধ্যে যশোবন্ত ঠাকুরের আর কোন পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করে নাই। সে কারণ অন্নপূর্ণা দেবী বড়ই দুঃখিতা এবং বিমর্ষহৃদয়া হইয়া পড়েন। গৃহে কোন সাধু বৈষ্ণব আসিলেই দেবী তাহার নিকট মনের দুঃখ জানাইতেন এবং সতত ভগবচ্চরণে আর একটী পুত্র লাভের জন্য প্রার্থনা করিতেন। রামকান্ত গোস্বামী নামে এক বৈষ্ণব সাধু মুখডোবা গ্রামে বাস করিতেন। তিনি শ্রীশ্রীবাসুদেব জীউর অর্চ্চনা করিতেন এবং যশোবন্তের গৃহে বৈষ্ণব মহোৎসব উপলক্ষে প্রায়ই আগমন করিতেন। তিনি বাক্‌সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। একদিন যশোবন্তের গৃহে যখন রামকান্ত বাসুদেব জীউর পূজায় রত ছিলেন, তখন অন্নপূর্ণা দেবী তাঁহার সমীপে নিজের মনোবাঞ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। রামকান্ত যশোবন্ত ও অন্নপূর্ণার কৃষ্ণভক্তি দেখিয়া এতই আনন্দিত হইয়াছিলেন যে তিনি দেবীর প্রার্থনা শ্রবণমাত্র হৃষ্টমনে বাসুদেব জীউকে তাঁহার ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া বলিলেন, "এই বাসুদেব স্বয়ং তোমার উদরে জন্মগ্রহণ করিবেন।" এদিকে যশোবন্ত এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়া দেবীকে তাহা বলিলেন। তারকচন্দ্র সরকার কবিরসরাজ কৃত শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত গ্রন্থে উহা এইরূপ বর্ণিত আছে।

"যশোবন্ত বলে প্রিয়ে শুনহ বচন"।
যে রূপ আমার মনে জাগে সর্ব্বক্ষণ॥
নবীন মেঘের বর্ণ বনমালা গলে।
ভৃগুপদ চিহ্ন দেখা যায় বক্ষঃস্থলে॥
পীতাম্বর ধর কোকনদ পদাম্বুজে।
শঙ্খ চক্র গদাপদ্ম শোভে চতুর্ভুজে॥

এইরূপ আভা মম হৃদয়ে পশিয়া।
সে যে তব কোলে বৈসে দ্বিভুজ হইয়া॥"

দেবী গর্ভবতী হইলেন এবং যথাসময়ে তাঁহার একটী পুত্র-সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। ইহার নাম শ্রীশ্রীহরি ঠাকুর। অন্নপূর্ণা পুত্রের মুখ দর্শন করিয়া পরমাহ্লাদিতা হইলেন। রমাগণ হুলুধ্বনি করিল এবং সমবেত বৈষ্ণব সাধুগণ আনন্দে হরি সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। মুহুর্মুহুঃ শঙ্খ নিনাদে চতুর্দ্দিক মুখরিত হইল। হরিধ্বনিতে আকাশ যেন বিদীর্ণ হইয়া গেল।

কৃষ্ণদাস ঠাকুর

শ্রীশ্রীহরি ঠাকুরের জন্ম গ্রহণের পর যশোবন্তের আর তিনটী পুত্র ও দুইটী কন্যা জন্মগ্রহণ করে। তাহাদের নাম পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে। পুত্রগণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে যশোবন্ত ঠাকুর লীলা সম্বরণ করেন। তখন জ্যেষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণদাস সংসারের কর্ত্তা হইলেন এবং তাঁহার উপর পৈতৃক ভূসম্পত্তি রক্ষার ভার ন্যস্ত হইল। কুমার নদের তীরে অবস্থিত জগন্নাথদি গ্রামের সূর্য্যমণি মজুমদাব ও পার্ব্বতী চরণ মজুমদার তৎকালে সাফলাডাঙ্গার জমিদার ছিলেন। জমিদারেব কর্ম্মচাবী সদর কর পরিশোধ করিবার জন্য কৃষ্ণদাস ঠাকুরের নিকট হইতে সাতশত টাকা ঋণ করেন। ঐ টাকা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিশোধ না করায় কৃষ্ণদাস তাহার নিকট উহার জন্য পুনঃ পুনঃ তাগাদা করেন। এই প্রসঙ্গে উভয়ের মধ্যে বচসা হওয়ায় মনোমালিন্য উপস্থিত হয়। অতঃপর একদা জমিদার কর্ম্মচারী নৌকাযোগে খাজনা আদায় করিতে আসিলে পূর্ব্বের টাকা পরিশোধ না করায় আক্রোশে কৃষ্ণদাস তাহার নৌকা লোকজন দ্বারা ভূমির উপর টানিয়া তুলেন। কর্ম্মচারী বিশেষ অবমানিত হইয়া জমিদার ভ্রাতৃদ্বয়ের নিকট যাইয়া আমূল বৃত্তান্ত বলেন। তাহারা কৃষ্ণদাসের

অনিষ্ট করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণদাস সম্পত্তিশালী প্রজা ছিলেন। তখন ইজারদারগণ প্রধান প্রজাকে জামিন রাখিয়া গ্রামের ইজারা লইত। কৃষ্ণদাস মেনাজদিয়া গ্রামের জামিন ছিলেন। ঐ গ্রামের খাজনা বাকী পড়ায় মালিক কর্ত্তৃক বাকী করের জন্য ১৪ হাজার টাকার ডিক্রী হয়। ইহার ফলে কৃষ্ণদাস দেন্দার সাব্যস্ত হন। কিছুদিন পরে ঐ ডিক্রী জারি দিয়া কৃষ্ণদাসের অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করা হয়। এই প্রকার বিপন্ন হইয়া কৃষ্ণদাস কনিষ্ঠ চারি ভ্রাতাসহ সাফলীডাঙ্গা ত্যাগ করিয়া উত্তর পূর্ব্বে অবস্থিত ওড়াকান্দী গ্রামে মাতুলের জ্ঞাতি ভজরাম চৌধুরী ও রামচাঁদ চৌধুরীর বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। পরে ঠাকুর ভ্রাতৃগণ ওড়াকান্দীর পূর্ব্বপাড়ায় বিশ্বনাথ রায়ের বাটীতে যাইয়া বসতি করেন। এই বাটীই বর্ত্তমান ওড়াকান্দীর ঠাকুর বাটী। বিশ্বনাথ পবম বৈষ্ণব ছিলেন; কিন্তু অপুত্রক হওয়ায় সংসার ত্যাগী হইয়া বৃন্দাবন চলিয়া যান।

ওড়াকান্দী তেলীহাটী আমিরাবাদ পরগণার অধীন। ঐ সময়ে যশোহর-নড়াইলের জমিদার রামরতন রায় ইহার মালিক ছিলেন। অদ্যাবধি নড়াইলের জমিদারগণ ইহার মালিক আছেন।

কিছুকাল পরে ঠাকুর ভ্রাতৃগণ পৃথক্ ভাবে বাস করিতে লাগিলেন। ওড়াকান্দীর বাটীতে স্থান সংকুলান না হওয়ায় বৈষ্ণবদাস ও স্বরূপদাস ঠাকুর বর্ত্তমান মাদারীপুর বিলরূট ক্যানালের পূর্ব্বতীরস্থ সাহাপুর পরগণার অধীন পদ্মবিলা গ্রামে যাইয়া বসতি করেন। অদ্যাবধি তাঁহাদের বংশধরগণ ধন সম্পত্তিতে প্রতাপান্বিত হইয়া তথায় বাস করিতেছেন। বর্ত্তমানে ওড়াকান্দীতে কৃষ্ণদাস, হরিদাস এবং গৌরীদাসের বংশধরগণ বাস করিতেছেন। সম্প্রতি গৌরীদাসের দুই পৌত্র নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ ও ব্রজকিশোব ঠাকুর সানপুকুরিয়া নামক গ্রামে যাইয়া বাস করিতেছেন।

শ্রীশ্রীহরি ঠাকুর

যশোবন্ত ঠাকুরের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীশ্রীহরি ঠাকুর বাংলা ১২১৮ সালে ফাল্গুনী মধুকৃষ্ণা ত্রয়োদশীতে মহাবারুণী দিবসে ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে সাফলীডাঙ্গায় জন্মগ্রহণ করেন। পঞ্চম বর্ষের সময় তাঁহাকে গ্রাম্য পাঠশালায় বিদ্যা-শিক্ষার্থ প্রেরণ করা হয়। সে কালে পাঠশালার বিদ্যা সমাপ্ত করিয়া শাস্ত্রাদি গ্রন্থ পাঠ করিতে পারিলেই বিদ্যাশিক্ষা শেষ হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইত। প্রাতঃকালে পাঠশালা বসিত। বিকালে ছাত্রেরা মাঠে গাভী চরাইত। সাফলীডাঙ্গার প্রতিগৃহস্থের বহুদুগ্ধবতী গাভী ছিল। হরি ঠাকুর অন্যান্য রাখাল বালকের ন্যায় মাঠে গরু চরাইতেন। তিনি বাল্যকালে বড়ই চঞ্চল প্রকৃতির ছিলেন। তিনি পিতামাতার কথায় বড় একটা কর্ণপাত করিতেন না। নিজের যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতেন। তাঁহার দৌরাত্ম্যে পল্লীবাসী সকলেই বিরক্ত হইয়া উঠিত। কিন্তু তাঁহার মানুষকে মুগ্ধ করিবার অসাধারণ শক্তি ছিল। কাহারও কোন অনিষ্ট করিলেও সে ঠাকুরকে দেখিবামাত্র তাহা ভুলিয়া যাইত। তিনি অত্যন্ত দুঃসাহসী ছিলেন। গর্ত্ত হইতে বিষধর সর্প বাহির করিয়া তাহা লইয়া খেলিতেন এবং পদ্মপুরাণ, মনসা-ভাষাণ ও বেহুলার করুণ কাহিনী গাইতেন। নাটু এবং বিশ্বনাথ নামে দুই রাখাল বালক সতত তাঁহার সহিত থাকিত। ইহারা উত্তরকালে হরিঠাকুরের পরম ভক্ত হইয়াছিল। যশোবন্ত ঠাকুর ও অন্নপূর্ণা দেবী কখন কখন শ্রীহরি ঠাকুরকে ভগবান বলিয়া জ্ঞান করিতেন। অতি বাল্যকাল হইতেই তাঁহার রাখালদিগের সহিত ক্রীড়ার মধ্যে নানা কার্য্য তাঁহার অলৌকিকত্ব প্রকাশ করিত। বস্তুতঃ তাঁহার রাখালিয়া খেলার মধ্যেই অনেকে তাঁহার ঈশ্বরত্ব অনুভব করিত। লীলামৃত গ্রন্থে ঠাকুরের বাল্যলীলা সম্বন্ধে এই প্রকার উল্লেখ আছে :—

"মহাপ্রভু বাল্যকালে রাখিতেন গরু।
ধরিয়া গোপাল বেশ বাঞ্ছাকল্পতরু॥

আবা ধ্বনি দিয়া করে ধরিতেন তাল।
আনন্দে করিত নৃত্য গোধনের পাল ॥
গোপনীয় ভাব যেন ছিল বৃন্দাবনে।
করিত তেমনি মেলা রাখালের সনে ॥
ব্রজেতে যেমন ভাব ছিল ভঙ্গী বাঁকা।
সেই ভাবে দাঁড়াতেন যষ্ঠি দিয়া ঠেকা ॥
ভাব দেখে রাখালেরা জিজ্ঞাসিত নাম।
বলিতেন নাম কৃষ্ণ দুর্ব্বাদল শ্যাম ॥
মুখ ডোবা ছিনু বাসুদেব মূর্ত্তি ধরে।
যশোবন্ত সুত হৈনু রামকান্ত বরে ॥"

শ্রীশ্রীহরি ঠাকুরের পিতা যশোবন্ত ঠাকুরের গৃহে প্রায়ই বৈষ্ণব ভোজন হইত এবং তদুপলক্ষে হরি সংকীর্ত্তন হইত। কীর্ত্তন শেষে ভগবদ্ভক্ত যশোবন্ত তাঁহার সকল পুত্রকে সেই সংকীর্ত্তনের ধূলিতে গড়াগড়ি দিতে বলিতেন। অন্যান্য পুত্রেরা কোন আপত্তি না করিয়া তাহা করিত; কিন্তু হরি ঠাকুরকে প্রহাব করিলেও তিনি গড়াগড়ি দিতেন না। পিতার একান্ত পীড়াপীড়িতে তিনি তাঁহাকে সাময়িকভাবে সন্তুষ্ট করিবার জন্য বাটীর অন্যত্র যাইয়া সর্ব্বাঙ্গে ইঁদুরের মাটী মাখিয়া আসিতেন এবং বলিতেন "বাবা আমি গডাগড়ি দিয়াছি।" তিনি বৈষ্ণব সাধুদিগের দ্বারা কোন দিনই বিশেষ আকৃষ্ট হইতেন না এবং তাহাদের ধর্ম্মোপদেশও বড় একটা মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিতেন না। তিনি বেদ বিধির অনেক কিছু মানিতেন না এবং ধর্ম্ম বিষয়ে কাহারও অধিনায়কত্ব স্বীকার করিতেন না। ধর্ম্ম সম্বন্ধে তিনি যাহা ভাল বুঝিতেন তাহাই করিতেন। একারণ কেহ কেহ তাঁহার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং তাঁহাকে নাস্তিক বলিয়া সন্দেহ করিতেন। পক্ষান্তরে অনেকেই তাঁহার নব নব ভাবরাশি

দর্শন করিয়া পুলকিত হইতেন এবং তাঁহাকে ভগবানের অবতার জ্ঞান করিয়া ভক্তিরসে আপ্লুত হইতেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর ওড়াকান্দীর উত্তরে অবস্থিত জিকাবাড়ী গ্রামের লোচন চন্দ্র সমাজপতির একমাত্র কন্যা শান্তি দেবীকে বিবাহ করেন। সমাজ-পতি মহাশয় ধনবান ছিলেন। তাঁহার কোন পুত্রসন্তান না থাকায় খুব সমারোহে কন্যার বিবাহ দেন। তিনি জামাতাকে নিজ পুত্রের ন্যায় জ্ঞান করিতেন। শান্তি দেবী অসামান্য রূপবতী ও গুণবতী ছিলেন। উত্তরকালে যখন হরি ঠাকুর গৃহে থাকিয়াও বিষয় কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া-ছিলেন তখন এই রমণী স্বীয় বুদ্ধি এবং বিচক্ষণতা বলে সংসারের যাবতীয় কার্য্য নিজেই পরিচালনা করিতেন।

পিতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণদাস সংসারের কর্ত্তা হইলেন এবং বিষয় সম্পত্তি সংক্রান্ত সকল কার্য্য তাহারই উপর ন্যস্ত হইল। হরিঠাকুর কনিষ্ঠ সহোদরসহ নিজ বাটীতে একটী দোকান স্থাপন করিলেন এবং জয়নগরের বাজার হইতে গৃহস্থের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি আমদানী করিয়া বিক্রয় করিতে লাগিলেন। ইহাতে অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে বহু অর্থের সমাগম হইল। তিনি ঐ অর্থদ্বারা পরিবারের সকলকে সাহায্য করিতেন। ইহাতে দিন দিন সংসারের শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। কৃষ্ণদাস সাংসারিক কার্য্যের প্রতি ভ্রাতৃগণের এতাদৃশ মনোযোগ দেখিয়া আনন্দিত হইলেন। বৈষ্ণব ও অতিথিসেবা যথারীতি হইতে লাগিল। গৃহে পূর্ণশান্তি বিরাজ করিতে লাগিল। এই প্রকারে কিছুদিন অতীত হইলে হরি ঠাকুরের মনে হঠাৎ একটা পরিবর্ত্তন আসিল। তাঁহার পরিবারে কেহ কৃষিকার্য্য করিতেন না। তাঁহাদের সকল জমি প্রতিবৎসর বর্গা দেওয়া হইত। বর্গাদারগণ উহা হইতে ফসল উৎপন্ন করিয়া তাহার অংশ ঠাকুর ভ্রাতাদের প্রদান করিত। সকল অবস্থাপন্ন গৃহস্থের মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত ছিল। হরি ঠাকুরের মনে হইল তিনি নিজহস্তে

একবার চাষ করিবেন। বাটীর সন্নিকটে একখণ্ড জমিতে তেমন বেশী ধান্য উৎপন্ন হইত না। তিনি ঐ জমি চাষ করিতে মনস্থ করিলেন। তাঁহার সঙ্গী বিশ্বনাথের সহিত জমিতে পরিশ্রম করিয়া সে বৎসর প্রচুর ফসল উৎপাদন করিলেন। সকলে তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইল; অবস্থাপন্ন হইলেও তিনি কৃষিকার্য্যকে কখনও হেয় মনে করিতেন না। তিনি কৃষকদিগের পরম বন্ধু ছিলেন। তিনি বলিতেন, গৃহস্থের কৃষি এবং বাণিজ্য উভয়ই অর্থোপার্জ্জনের প্রশস্ত পথ। তিনি নিজেই উহা করিয়া অনেক আত্মাভিমানী ধনী গৃহস্থকে শিক্ষা দিয়াছিলেন।

ইহার কয়েক বৎসর পরে জমিদারের অত্যাচারে ঠাকুর ভ্রাতৃগণ যখন সাফলীডাঙ্গার বাটী ত্যাগ কবিয়া ওড়াকান্দী আগমন কবেন, তখন হরি ঠাকুরের একটী পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তাহার নাম শ্রীগুরুচবণ ঠাকুর। এই সময়ে একটী অনাথিনী নারী শ্রীশ্রীহরি ঠাকুরকে ধর্ম্ম পিতা বলিয়া ঠাকুরবাটীতে অবস্থান করে। শান্তিদেবী শিশু পুত্রের লালন পালনে বিশেষ ব্যস্ত থাকায় এই স্ত্রীলোকটী গৃহেব সকল কার্য্য করিত। একারণ সকলেই তাহাকে ভালবাসিত এবং বিশ্বাস করিত। একদা স্ত্রীলোকটী সুযোগ পাইয়া গৃহ হইতে সমুদয় টাকাকড়ি চুরি করিয়া পলায়ন করিল। তাহাতে হরি ঠাকুর একেবারে কপর্দ্দক হীন হইয়া পড়িলেন। শিশুপুত্র ক্রোড়ে শান্তিদেবী মহা বিপদে পতিতা হইলেন। শ্রীহরি ঠাকুর এই ঘটনার পর হইতে গৃহ কার্য্যে আর মনোনিবেশ করিলেন না। স্বামীকে এতদূর উদাসীন দেখিয়া শান্তিদেবী কেবল রোদন করিতেন। তাহাতে শ্রীশ্রীহরি বলিতেন, "আমি আর গৃহকার্য্য করিব না; ভগবান পুত্র দিয়াছেন, তিনিই তাহা পালন করিবেন।", এই সময় হইতে তিনি সর্ব্ববিষয়ে ঔদাস্য দেখাইতে লাগিলেন। গৃহে তাঁহার মন একমুহূর্ত্তও তিষ্ঠিত না। তিনি রাত্রিকালে একাকী নির্জ্জন প্রান্তর মধ্যে থাকিতেন। কখন কখন তাঁহাকে বৃক্ষতলে একাকী

সমাধিপ্রাপ্ত অবস্থায় দেখা যাইত। এইরূপে কিছুদিন অতীত হইল। একদিন তিনি একাকী জয়নগর অভিমুখে যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে এক দিব্য মহাপুরুষের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। উভয়ে এক বটবৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া দীর্ঘকাল কথোপকথন করিলেন। শ্রীশ্রীহরির আর জয়নগর যাওয়া হইল না। তিনি উদাসীন মনে ওড়াকান্দী অভিমুখে ফিরিলেন। আসিতে আসিতে রজনী হইল। এমন সময় আড়ুয়াকান্দী গ্রামে শূন্যপ্রান্তরে বকুল-বৃক্ষতলে এক জ্যোতির্ম্ময় শঙ্খ চক্র গদাপদ্ম হস্ত পুরুষ দেখিয়া ভাবে বিভোর হইয়া পড়িলেন। পরদিবস অতি প্রত্যুষে গ্রামের লোকে তাঁহাকে প্রান্তর মধ্যে একাকী দেখিয়া বাটীতে লইয়া আসিলেন। তখন হইতে ক্রমশঃ প্রতি কার্য্যে তাঁহার ঈশ্বরত্ব প্রকাশ পাইতে লাগিল।

পূর্ব্বোক্ত রামচাঁদ চৌধুরীর সহিত হরিঠাকুরের বাল্যকাল হইতেই অত্যন্ত সৌহার্দ্দ্য ছিল। একদা তিনি এবং ঠাকুর এক প্রান্তরে ভ্রমণে বাহির হন। সম্মুখে ঠাকুর এবং পশ্চাতে রামচাঁদ যাইতেছিলেন। এমন সময় রামচাঁদ দেখিলেন ঠাকুর যেখানে পা ফেলিতেছেন, সেখানেই একটী করিয়া পদ্ম ফুটিয়া উঠিতেছে। রামচাঁদ বিস্মিত হইলেন। তিনি বুঝিলেন শ্রীশ্রীহরি মানুষ নহেন। তিনি পূর্ণ ভগবান্। পল্লীবাসী জনসাধারণের ইহা জানিতে আর বাকী রহিল না। তাহারা সকলেই শ্রীশ্রীহরি ঠাকুরের ঈশ্বরত্ব হৃদয়ঙ্গম করিল। যে সকল লোক ঠাকুর দর্শন করিতে আসিত তাহারা প্রচুর আহার্য্য, মিষ্টান্ন, নানাবিধ ফল, বস্ত্র, ও অন্যান্য দ্রব্য সঙ্গে আনিত। ঠাকুর বাটীতে আর কিছুরই অভাব রহিল না। স্ত্রীলোকেরা আসিয়া কেহ রন্ধন করিত, কেহ তরকারি কুটিত, কেহ বা গৃহের আবর্জ্জনা পরিষ্কার করিত। ভক্তগণ ঠাকুর বাটীতে আহারাদি করিয়া অহর্নিশ কেবল হরি সংকীর্ত্তনে মাতিয়া থাকিত।

অতি প্রত্যুষে ঠাকুর দর্শন ভক্তগণ অতি সৌভাগ্যের মনে করিত।

সেজন্য রজনী প্রভাত না হইতেই বহু ভক্ত ঠাকুর বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইত। অনেকে বহু টাকা কড়ি ও জিনিষ পত্র আনিয়া ঠাকুরের পদপ্রান্তে রাখিত। তিনি নিজ হস্তে তাহা কখনও স্পর্শ করিতেন না। ভক্তেরা উহা লইয়া যাইয়া শান্তি দেবীর হস্তে প্রদান করিত। ক্রমশঃ ঠাকুরের ঈশ্বরত্বের কথা চতুর্দ্দিকে বিস্তারিত হইল। অবকাশ পাইলেই ভক্তগণ কীর্ত্তন করিতে করিতে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইত এবং ঠাকুরেব মাহাত্ম্য প্রচার করিত। ঠাকুর মধ্যে মধ্যে ভক্তদিগের গৃহে যাইতেন। তাহারা ভক্তির সহিত নানা ভাগে রন্ধন করিয়া পরম প্রীতির সহিত ঠাকুরকে ভোজন করাইত। ঠাকুর যেখানেই যাইতেন সেখানে বহুলোকের সমাগম হইত। অনেকে ভক্ত না হইলেও ঠাকুরের মুখের বাক্যে রোগ আরোগ্য হয় শুনিয়া তাঁহার নিকট আসিত এবং রোগ আরোগ্য হইয়া গেলে ঠাকুরের ভক্ত হইত। কারণ তাহারা বহু বৈদ্য কবিরাজের চিকিৎসায় হতাশ হইয়া ঠাকুরের বাক্যেই আরোগ্যলাভ করিত। শ্রীশ্রীহরি ঠাকুরের রোগের ব্যবস্থা সম্বন্ধে কবিরসরাজ তারকচন্দ্র তাহার শ্রীশ্রীহরি লীলামৃত গ্রন্থে যাহা লিখিয়াছেন তাহাই নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

“লোকে আসে প্রভুস্থানে হ’য়ে রোগযুক্ত।
সংকীর্ত্তনে গড়িদিলে রোগ হয় মুক্ত॥

রোগ জানাইয়া সব বলিত কাতরে।
রোগমুক্ত হ’ত প্রভু দিলে আজ্ঞা করে॥

প্রভু বলিতেন যদি রোগ মুক্তি চাও।
যে রোগের বৃদ্ধি যাতে তাই গিয়ে খাও॥

তিন সন্ধ্যা ধুলি মাখ তুলসীর তলা।
জ্বর হ’লে পথ্য দেন তেঁতুলের গোলা॥

বেদনা অজীর্ণ বমি কিম্বা অম্লপিত্তে।
তেতুল গুলিয়া খায় পিত্তলের পাত্রে॥

মহারোগে অঙ্গে মাখে গোময় গোমূত্র।
কেহবা আরোগ্য পায় প্রভু আজ্ঞা মাত্র॥

রোগ জানাইয়া যায় মানসা করিয়ে।
মানসিক টাকা দেয় রোগ মুক্ত হ'য়ে॥

মানসা করিত লোকে যার যেই শক্তি।
একান্ত মনেতে যার সেই রূপ ভক্তি॥"

একদা শ্রীশ্রীহরি ঠাকুর ভক্তগণ পরিবৃত হইয়া বসিয়া আছেন। এমন সময় রামধন নামে এক জন্মান্ধ বালক তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইল। রামধনের নিবাস গোপালগঞ্জের সন্নিকট বেতগ্রামে ছিল। সে ঠাকুরের রোগ আরোগ্য করিবার অসাধারণ শক্তির কথা শ্রবণ করিয়া ওড়াকান্দী আগমন করে। রামধন ও তাঁহার পিতামাতার ভক্তি এবং বিশ্বাস দেখিয়া শ্রীশ্রীহরির অন্তরে দয়া হইল। তিনি তাঁহার পদ্মহস্ত খানি রামধনের মস্তকে স্থাপন করিলেন, ইহাতে রামধন তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি লাভ কবিল। ভক্তগণ এতাদৃশ ঘটনা দেখিয়া বিস্মিত হইল। রামধন আর গৃহে ফিরিল না। সে ঠাকুর বাটীতে থাকিয়া দুগ্ধবতী গাভীসকল চরাইয়া বেড়াইত এবং গৃহের যাবতীয় কার্য্য করিত। শ্রীহরির নিত্যধাম গমনের পর রামধন উদাসীন হইয়া দেশে দেশে পর্য্যটন করিত এবং ঠাকুরের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিত।

শ্রীহরি ঠাকুর ওড়াকান্দীর দক্ষিণে রাউৎখানার গ্রামে তদীয় ভক্ত মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাসের বাটীতে প্রায়ই গমন করিতেন। এক দিবস ঠাকুর ঐ বাটীতে বহু ভক্তসহ বসিয়া আছেন। ভক্তেরা কেহ তাঁহাকে নানাপ্রকার পুষ্প দ্বারা সাজাইতেছে, কেহ পাখা দিয়া ব্যজন করিতেছে, কেহ বা

ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া ভূমিতে গড়াগড়ি দিতেছে। এমন সময় একদল কৃষক লাঙ্গল স্কন্ধে করিয়া জমিতে চাষ করিতে যাইতেছিল। উহাদিগের সহিত হীরামোহন নামে একজন অতি সরল প্রকৃতির লোক ছিল। শ্রীহরি ঠাকুরকে দেখিবামাত্র সে চমকিয়া উঠিল। তিনিও তাহার দিকে একটু তাকাইলেন। হীরামোহন অচৈতন্য প্রায় হইয়া শ্রীহরির ঠাকুরের অঙ্গে রামরূপ দর্শন করিল। এই সম্বন্ধে লীলামৃত গ্রন্থে এই প্রকার বর্ণনা আছে ঃ—

* * * *

"হীরামন দেখিল সাক্ষাৎ সেই রাম।
শিরে জটা বাকলটা সুন্দর সুঠাম॥

এক হীরামন দেখে রাম দয়াময়।
সেরূপেব আভা মাত্র দেখে মৃত্যুঞ্জয়॥

বাম পার্শ্বে কুক্ষিমধ্যে দেখে ধনুর্গুণ।
কটীতে বাকল শিরে জটা কক্ষে তুণ॥

বনবাসে সেই বেশে যান ঋষ্যমুখে।
তেম্নি অপরূপ রূপ হীরামন দেখে॥"

সেই সময় হইতেই হীরামোহন গৃহকার্য্য একেবারে ত্যাগ করিয়া উদাসীন হইল এবং দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইত। বর্ষাকালে রাউৎখামার প্রভৃতি গ্রাম অঞ্চল বন্যার জলে প্লাবিত হইয়া যাইত। তাহাতে এক বাটী হইতে অন্য বাটীতে গমন করা নৌকা ব্যতীত অসম্ভব হইত। হীরামোহনের যখন শ্রীহরি দর্শন করিবার আকাঙ্খা হইত তখন সে আর নৌকার অপেক্ষা করিত না। মনের আবেগে জলের উপর দিয়া হাটিয়া ওড়াকান্দী আসিত এবং শ্রীহরি দর্শন করিয়া যাইত। গৃহ-কার্য্য ত্যাগ করিয়া এই প্রকার উদাসীন হওয়ায় হীরামোহনের জ্ঞাতিগণ

তাহাকে পরিত্যাগ করে। কিছুদিন পরে তাহার ভীষণ জ্বর হইল এবং তাহাতে তাহার মৃত্যু ঘটিল। জ্ঞাতিগণ তাহার মৃতদেহ ওড়াকান্দী ঠাকুর বাটীতে ফেলিয়া চলিয়া গেল। শ্রীহরি উহা দেখিয়া বড়ই দুঃখিত হইলেন। তিনি সকলকে বিদায় দিলেন এবং এক বৃক্ষের তলায় হীরামোহনের মৃতদেহ লইয়া রজনী কাটাইলেন। শেষ রজনীতে তাহার প্রাণ সঞ্চার হইল। লীলামৃত গ্রন্থে এই প্রকার বর্ণিত আছে :—

"প্রভু বলে যাহা হ'ক সবে যাহ ঘরে।
আমি দেখি চেষ্টা ক'রে ঈশ্বর কি করে॥

সবে গেল প্রভু মাত্র রহিল একেলা।
মরা হীরামনে লয়ে সেই বৃক্ষতলা॥

যামিনীর শেষ যামে সঞ্চারিল প্রাণ।
নীরোগ শরীর হ'ল পূর্ণ শক্তিমান॥

উঠিয়া চরণ ধরি বলে ওহে নাথ।
এ অধমে কৃপা করি কর আত্মসাৎ॥"

হীরামোহনের জীবনী অদ্ভুত ঘটনাবলীতে পরিপূর্ণ। তাহা এই প্রকার স্থানে সন্নিবেশ করা অসম্ভব। শ্রীহরির আদেশে হীরামোহন দেশ ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে চলিয়া গিয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, হীরা-মোহন অদ্যাবধি জীবিত আছে।

একদিন প্রাতঃকালে শ্রীহরি ঠাকুর বাটীর পুষ্করিণীর পাড়ে এক বৃক্ষতলে বসিয়া আছেন। অনেক ভক্ত তথায় সমবেত হইয়াছে। এমন সময় পাইকডাঙ্গা নিবাসী স্বরূপ চন্দ্র রায় মহারোগে আক্রান্ত হইয়া ঠাকুরের সমীপে আসিলেন। রায় মহাশয় অত্যন্ত প্রতিপত্তিশালী লোক ছিলেন এবং দেশে তাঁহার খুব প্রভুত্ব ছিল। তিনি বড়ই অহঙ্কারী ছিলেন এবং প্রজার উপর খুব অত্যাচার করিতেন। ঠাকুর তাহাকে

দেখিবামাত্র বলিলেন, "আপনি দেশের রাজা, আপনি আমার বাটী আসিয়াছেন। আমি কি দিয়া আপনার অভ্যর্থনা করিব ?" ঠাকুরের বাক্যে তাঁহার অহঙ্কার চিরদিনের জন্য চূর্ণ হইয়া গেল। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার চরণতলে পতিত হইলেন। ঠাকুর দেখিলেন বাস্তবিক তাঁহার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তখনই তাঁহার মহাব্যাধি আরোগ্য হইয়া গেল। তিনি প্রেমাশ্রুতে ভাসিয়া বাটী গমন করিলেন। অতঃপর অন্য এক দিবস স্বরূপ রায় মহাশয় ঠাকুরকে নিজ বাটীতে লইয়া যাইবার জন্য তাঁহার নিকট নিবেদন জানাইলেন। তাহাতে ঠাকুর বলিলেন, "তুমি বাটীতে এক পতিতাকে আশ্রয় দিয়া তাহার সহিত পাপাসক্ত রহিয়াছ। তুমি যদি উহাকে মাতা বলিয়া সম্বোধন করিতে পার, তবে আমি তোমার বাটী যাইব।" স্বরূপ রায় ভীত এবং বিস্মিত হইয়া মনে কবিলেন, ঠাকুর এই প্রকার অতি গূহ্য বিষয় কি করিয়া জানিলেন। তিনি আর কোন কথা না বলিয়া ঐ পতিতাকে মাতা বলিয়া সম্বোধন করিতে স্বীকৃত হইলেন! ঠাকুর অগণিত ভক্ত সমভিব্যাহারে পাইকডাঙ্গা রায় মহাশয়ের বাটী চলিলেন। সেখানে মহানন্দের রোল পড়িয়া গেল। ভক্তেরা সংকীর্ত্তনে মাতিয়া গেল। অতঃপর ভোজনান্তে ভক্তদিগের সভার মধ্যে ঠাকুর সমীপে সেই পতিতা নারীকে আনয়ন করা হইল। ঠাকুর বলিলেন, স্বরূপ তুমি এখন তোমার বাক্য প্রতিপালন কর। এই নারীকে মাতা বলিয়া সম্বোধন কর। স্বরূপ রায় তাহাই করিলেন। মা, মা, বলিয়া তাহার পদে পড়িলেন। সেই দণ্ড হইতেই সেই নারীর প্রতি তাঁহার ঘৃণিত আসক্তি একেবারে চলিয়া গেল। তাঁহার নূতন জীবন আরম্ভ হইল।

সেই পতিতা নারী অসামান্য রূপলাবণ্য সম্পন্না যুবতী ছিল। রূপের জন্য তাহার যথেষ্ট অহঙ্কার ছিল। ঠাকুর বলিলেন, "তুমি শ্বেতকুষ্ঠগ্রস্তা, তোমার আবার রূপের গৌরব কি ? তোমার স্তনের নিম্নে ও উরুদেশে

শ্বেতকুষ্ঠ রহিয়াছে।” ঠাকুরের বাক্যে তাহার সকল অভিমান ভাঙ্গিয়া গেল। তখন নিকটে এক দণ্ডায়মানা নারী তাহাকে অন্যত্র লইয়া যাইয়া বস্ত্র উন্মোচন করিয়া দেখিল, বাস্তবিক সে শ্বেতকুষ্ঠগ্রস্তা। বাটীর কেহ পূর্ব্বে ইহা জানিত না। ভক্তগণ মহাবিস্ময় মানিল। সেই পতিতা রমণী তখন ঠাকুরের চরণ ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। ঠাকুরের কৃপা হইল এবং সে কুষ্ঠ হইতে পরিত্রাণ পাইল। এই রমণী হরিভক্তি-পরায়ণা হইয়া যতকাল জীবিতা ছিল ততকাল শ্রীহরি ঠাকুরের ভক্তদিগেব সেবা শুশ্রূষা করিয়া দিন কাটাইত। এই প্রকাবে ঠাকুরের পদধূলি লাভ করিয়া কত অহঙ্কারীর যে দর্প চূর্ণ হইয়াছে, কত পাষণ্ডের প্রাণে যে ভাবের বন্যা খেলিয়াছে, কত মহারোগীর যে রোগ আরোগ্য হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

শ্রীহরি ঠাকুর তাঁহার ভক্তের আলয়ে গমন করিলে তথায় হরি সংকীর্ত্তন হইত। কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেই ঠাকুরের প্রেমে উন্মত্ত-প্রায় হইয়া সংকীর্ত্তনে যোগদান করিত। তাহারা ভেদাভেদ জ্ঞানশূন্য হইয়া সকলেই মনে করিত ঠাকুর তাহাদের একমাত্র ভগবান, আর তাহারা সকলে তাঁহার ভক্ত। স্ত্রীপুরুষের এই প্রকার মিলন দেখিয়া অনেকে তাহাদিগকে বড়ই ঘৃণা করিতে লাগিল এবং তাহাদের বিরুদ্ধে এক তুমুল আন্দোলন আরম্ভ করিল। একদিবস ঠাকুর তদীয় ভক্ত পদ্মবিলানিবাসী দশরথ বিশ্বাসের বাটী গমন করিলেন। ভক্তগণ স্ত্রীপুরুষ সকলে সংকীর্ত্তনে মত্ত হইল। এদিকে গ্রামের বিরুদ্ধ পক্ষেব লোক দলবদ্ধ হইয়া জমিদারের কাছারীতে নায়েব মহাশয়ের নিকট ভক্তগণের কথা জানাইল। নায়েব দশরথের বাটী আসিয়া স্ত্রীপুরুষের ঐ প্রকার প্রমত্ত অবস্থা দেখিয়া তাহাকে ডাকাইলেন। নায়েব পায়ের জুতা খুলিয়া নিজহস্তে দশরথের পৃষ্ঠে সজোরে প্রহার করিলেন এবং কুড়ি টাকা জরিমানা করিলেন। দশরথ ঐ টাকা আনিয়া নায়েবের

হস্তে দিলেন। নায়েব উহা পাইয়া হৃষ্টচিত্তে প্রস্থান করিলেন। শ্রীহরি ঠাকুর ভক্তের এই প্রকার দুর্দ্দশা ও অপমান দেখিয়া ব্যথিত হইলেন। কীর্ত্তনান্তে সকলে ভোজন শেষ করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল। ঠাকুর খট্বার উপর শয়ন করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। কুলবধূগণ এমন সময় দেখিলেন ঠাকুরের পৃষ্ঠে রক্ত জমিয়া থাক্ থাক্ দাগ হইয়া রহিয়াছে। উহা দেখিয়া তাহারা উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল। বাটীর সকলে ছুটিয়া আসিল এবং জিজ্ঞাসা করিল কি হইয়াছে? ঠাকুর উঠিয়া বসিলেন। কোন কথা বলিলেন না। কেবল বলিলেন, "দশরথ কোথায়?" সকলে ঠাকুরের পৃষ্ঠে ঐ প্রকার দাগ দেখিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল এবং বুঝিতে পারিল, ভক্ত দশরথকে প্রহার করায় ঠাকুরের পৃষ্ঠে ঐ প্রকার দাগ হইযাছে, প্রকৃত ভক্ত এবং ভগবান এক! পরে এই নায়েবের গলিত কুষ্ঠ হইয়াছিল এবং তাহার বংশ নির্ম্মূল হইযা গিয়াছে।

ইহার কিছুদিন পরে কতকগুলি দুষ্টলোক ঠাকুরের ভক্তদিগের বিরুদ্ধে অভিযোগ লইয়া জোসাসুর গ্রামের নীলকুঠির ডিক্‌সন সাহেবের নিকট উপস্থিত হইল। সাহেব তাহাদের অভিযোগ শ্রবণ করিয়া শ্রীশ্রীহরি ঠাকুরকে তাহার ভক্তগণ সহ কুঠিতে উপস্থিত হইতে সংবাদ দিলেন। এই সময়ে নীলকুঠি সাহেবদের জনসাধারণের উপর খুব প্রভুত্ব ছিল এবং ছোট ছোট মোকদ্দমা কি দেওয়ানী কি ফৌজদারী তাহারাই বিচার করিত এবং সাধারণের উহা মানিয়া লইতে হইত। শ্রীহরি ঠাকুর প্রায় ৩০০ ভক্ত লইয়া জোসাসুর অভিমুখে চলিলেন। ভক্তগণ প্রমত্তের ন্যায় দীর্ঘপথ কীর্ত্তন করিতে করিতে নৃত্য করিয়া চলিল। ডিক্‌সন্ সাহেব পূর্ব্বে এই প্রকার কীর্ত্তন কখনও শ্রবণ করেন নাই বা দেখেন নাই। উহা দেখিয়া তিনি ভাবাবেশে আবিষ্ট হইলেন এবং তাঁহার মাতাকে উহা দেখিবার জন্য ডাকিয়া আনিলেন। ডিক্‌সন-মাতা কীর্ত্তন মধ্যে ঠাকুরকে দেখিয়া পাগলিনীর ন্যায় হইলেন এবং মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া ঠাকুরের পদচুম্বন

করিলেন। তিনি শ্রীশ্রীহরি ঠাকুরের অঙ্গে খ্রীষ্ট যীশুকে দর্শন করিলেন। এই সম্বন্ধে লীলামৃত গ্রন্থে এই প্রকার উল্লেখ আছে :—

"সাহেবের মাতা দেখে হ'য়ে অনিমিষ।
সাহেবে বলে তুমি দেখ দেখ ডিক্‌স॥
হিন্দু বলে শ্রীহরি যবনে বলে আল্লা।
দরবেশ ফকিরে যাবে বলে হেলাল্লা॥
বৌদ্ধ যারে বুদ্ধ করে খ্রীষ্ট বলে যীশু।
এই তিনি নবরূপে উদ্ধারিতে বসু॥"

ওড়াকান্দীব পশ্চিমে তিলছাডা গ্রামেব একটী বিধবা রমণী জলোদরী রোগে আক্রান্তা হইয়া শ্রীহরি ঠাকুরেব নিকটে আগমন করে। ঠাকুরের কৃপায় তাহার ব্যাধি দূবীভূত হইয়া যায়। অতঃপর রথযাত্রার সময় ঠাকুর তাহাকে পুবীধামে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেব দর্শন করিবার জন্য তথায় গমন কবিতে আদেশ দেন। স্ত্রীলোকটীর ঠাকুরের প্রতি এতই বিশ্বাস হইয়াছিল যে, সে কোন মতেই পুরী যাইয়া জগন্নাথ দর্শন করিতে স্বীকৃত হইল না। কারণ সে ঠাকুরকে সাক্ষাৎ ভগবান জ্ঞান করিত। অনেক বলিবার পর স্ত্রীলোকটী স্বীকৃত হইল। সে দেখিল ঠাকুরের বাক্য প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য। অতঃপর পুবী যাইয়া রথোপরি শ্রীশ্রীহরি ঠাকুরের মূর্ত্তি দেখিয়া বিস্ময়ে বাহ্যজ্ঞান শূন্যা হইল। লীলামৃত গ্রন্থে এই সম্বন্ধে এই প্রকার বর্ণিত আছে :—

"সে নারী শ্রীক্ষেত্র গেল জগন্নাথে আর্ত্তি।
রথের উপরে দেখে হরিচাঁদ মূর্ত্তি॥
নারী বলে কেন আমি আসি এত দূর।
ওড়াকান্দী আছে যদি দয়াল ঠাকুর॥

ইহার কয়েকদিন পরেই শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রেষ্ঠ পাণ্ডার প্রতি এক

স্বপ্নাদেশ হয়। শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেব বলিলেন, আমি ওড়াকান্দী অবস্থান করিতেছি। তথায় শ্রীশ্রীহরি ঠাকুরের নিকট ভাণ্ডে করিয়া প্রসাদ লইয়া যাও। লীলামৃত গ্রন্থে এই সম্বন্ধে যাহা বর্ণিত আছে তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"শিবনাথ ভবনাথ দুই পাণ্ডা দিয়ে।
পায়সান্ন ওড়াকান্দী দেহ পাঠাইয়ে॥
ফরিদপুর জিলা তেলীহাটী পরগণে।
মুকুন্দপুর থানা তাহার দক্ষিণে॥
তাহার মধ্যেতে আছে ওড়াকান্দী গ্রাম।
সাধু যশোবন্ত সুত হরিদাস নাম॥
ঝট পট কর কার্য্য আর কিবা চাও।
শীঘ্র এই ভাণ্ড সেই শ্রীধামে পাঠাও॥
সেই আমি আমি সেই নহে ভেদভিন্ন।
সেই দেহে মোর সেবা হইবে এ অন্ন॥"

শ্রীশ্রীহরি ঠাকুরের জীবন লীলা অতি মধুর এবং অলৌকিক ঘটনা পরিপূর্ণ। তাহার সমুদায় এই প্রকার পুস্তকে যথাযথভাবে সন্নিবেশ করা একেবারেই অসম্ভব। তদীয় ভক্ত প্রেমিকপ্রবর কবিরসরাজ ৺তারক চন্দ্র সরকার প্রণীত "শ্রীশ্রীহরি লীলামৃত" গ্রন্থে এবং তদীয় পৌত্র সুকবি ৺সুধন্য কুমার ঠাকুর কৃত "শ্রীশ্রীহরি চরিতামৃত" গ্রন্থে তাঁহার জীবনলীলা অতি মধুরভাবে বর্ণিত আছে। আশা করা যায় অনু-সন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেই উহা পাঠ করিয়া ঠাকুরের জীবনলীলা অবগত হইবেন। অধুনা পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে আমাদের দেশে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে আশ্চর্য্য ঘটনাবলীর সত্যতায় বিশ্বাস স্থাপন করিবার অক্ষমতা দৃষ্ট হয়। ইহাদের প্রতি বক্তব্য এই যে, এই আশ্চর্য্য বিচিত্রতা-পূর্ণ জগতের—বিশেষতঃ ধর্ম্ম জগতের ঘটনাবলী মানুষের চক্ষুতে সমস্তই

আশ্চর্য্যপূর্ণ। ধর্ম্মজগতের ইতিহাসে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই অতীব অলৌকিক ঘটনার বিবরণ দৃষ্ট হয়। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু চৈতন্যদেবের জীবনের সমস্তই আশ্চর্য্য ঘটনাপূর্ণ। এমন কি পাশ্চাত্য জগতের ধর্ম্মগুরু যীশু খ্রীষ্টের জন্ম, জীবনী ও কার্য্যকলাপ সমস্তই অলৌকিক। কিন্তু তাই বলিয়া এই সমস্তের সত্যতায় কেহই সন্দিহান হন না। আর একথাও অতীব সত্য যে মানুষের শক্তি ও জ্ঞান অতি ক্ষুদ্র। সেই জ্ঞানকে জাগতিক ঘটনা সমূহের সত্যাসত্যের একটা বিচার বলিয়া মানিয়া লওয়া যাইতে পারে না। বরং এই সমস্ত নূতন নূতন ঘটনা মানুষের জ্ঞান ও শক্তিকে উত্তরোত্তর পরিবর্ত্তিত করিতেছে এবং ভবিষ্যতে আরও করিবে।

শ্রীশ্রীহরি ঠাকুরের নামে, প্রেমে ও কীর্ত্তনে তাঁহার ভক্তেরা অনুক্ষণ মাতোয়ারা থাকিত বলিয়া লোকে তাহাদিগকে "মতুয়া" আখ্যা দিয়াছিল। অদ্যাবধি এই ভক্ত সম্প্রদায়কে "মতুয়া সম্প্রদায়", বলা হয় এবং এই নামেই ইহারা সর্ব্বত্র পরিচিত। আহারে, বিহারে, সুখে, দুঃখে, শয়নে, স্বপনে, কীর্ত্তনে নর্ত্তনে, শ্রান্তি ক্লান্তিতে, আরামে বিরামে, হা হুতাসে জীবনের শেষ নিশ্বাসে পূর্ব্ববঙ্গে যে হরিচাঁদের নাম জীবগণের জিহ্বাগ্রে উচ্চারিত হইতেছে, সেই ভাবরাজ্যের সোণার মানুষ, ভক্তের ন'দের গোরা, ভক্তের কিশোরী প্রাণবল্লভ শ্রীশ্রীহরি ঠাকুরের লীলাস্থল শ্রীশ্রীধাম ওড়াকান্দীতে ত্রিতাপে তাপিত লক্ষ লক্ষ নরনারী প্রাণের জ্বালা জুড়াইবার জন্য প্রতি বৎসর চৈত্রমাসে ৺বারুণী স্নান উপলক্ষে সমবেত হইয়া প্রেমানন্দে মধুর হরিনাম কীর্ত্তন করে। সে দৃশ্য অতি মনোরম, অতি চিত্তাকর্ষক! ঐ সময়ে ৩।৪ দিন ধরিয়া শ্রীশ্রীহরি ঠাকুরের লীলাস্থলে হরিনামের যে প্রবল তরঙ্গ উত্থিত হয়, তাহাতে লক্ষ লক্ষ জীবকে হাবুডুবু খাইতে দেখিলে প্রাণে এক অভিনব ভাবের উদয় হয়। খোল, করতাল, শিঙ্গা, শঙ্খ, জয়ঢাকের বাদ্য সংযোগে হরিনামের ধ্বনিতে যে অব্যক্ত ওঁকার

নাদের সমুত্থান হয়, তাহা যাহার প্রাণ স্পর্শ করিয়াছে কেবল মাত্র সে জানে সে পরশন কত মধুর, কত আরামের, কত আনন্দের। প্রায় ৫০ বৎসর হইল শ্রীশ্রীহরি ঠাকুর মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন ; কিন্তু তিনি যে অনন্ত ভাববন্যা প্রবাহিত করিয়া গিয়াছেন তাহা প্রাণ হইতে প্রাণান্তরে, গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে, দেশ হইতে দেশান্তরে ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া পড়িতেছে। সে মহাপুরুষের পায়ের ধুলি পাইয়া অবিশ্বাসীর ভগবানে বিশ্বাস বাড়িয়াছে, অভিমানীর দর্প চূর্ণ হইয়াছে, পাষণ্ডের প্রাণে ভাবের স্রোত বহিয়াছে, প্রেমশূন্যের প্রাণে প্রেমের উৎস খুলিয়াছে, তাঁহার আবির্ভাবে এদেশ ধন্য হইয়াছে। খুলনা, বরিশাল, ফরিদপুব, যশোহর, নোয়াখালি, মৈমনসিংহ, ঢাকা, মালদহ, ত্রিপুরা প্রভৃতি জেলার জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে শ্রীশ্রীহরি ঠাকুরের লক্ষ লক্ষ ভক্ত তদীয় পীঠস্থানে সমাসীন তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীশ্রীগুরুচাঁদের চরণ সকাশে উপস্থিত হইয়া অদ্যাবধি প্রাণের জ্বালা জুড়াইতেছে। এতদ্দেশে এমন মহাপুরুষেব জন্মে সকলেই গৌরবান্বিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীহরি ঠাকুবের এক একজন ভক্ত চরিত্র লিপিবদ্ধ করিলে ক্রিয়া-গুণ দ্বারা ভগবানের অবতার বলিয়া অনুভব করিতে হয়। তদীয় ভক্ত-গণের মধ্যে গোস্বামী গোলক, স্বামী মহানন্দ, গোস্বামী শ্রীলোচন, পাগল হীরামোহন, পাগল ব্রজনাথ, নাটু, বিশ্বনাথ, দাশরথী, মৃত্যুঞ্জয় ও তারক তাঁহার নাম ও প্রেম পূর্ব্ববঙ্গের প্রতি দ্বারে দ্বারে যাইয়া বিলাইয়া-ছেন। প্রচারক ভক্ত হিসাবে ৺তাবক চন্দ্র সরকার মহাশয়ের নাম এই প্রসঙ্গে উত্থাপন না করিলে ঠাকুর বংশের ইতিহাস অসমাপ্ত থাকিয়া যায়। যশোহর জিলার জয়পুর গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম কাশীনাথ। তিনি অতি বাল্যকালে ওড়াকান্দী আসিয়া ঠাকুরের প্রেমে ও ভক্তিতে আপ্লুত হন। তিনি সুকবি ছিলেন এবং বাংলার বহু-স্থানে কবি গান করিতেন। ঐ গানের ভিতর দিয়া তিনি শ্রীশ্রীহরি

ঠাকুরের জীবনলীলা এমন সুন্দরভাবে বর্ণনা করিতেন যে লোকে ঠাকুরের প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া পারিত না। তাঁহার রচিত শ্রীশ্রীহরি লীলামৃত ও শ্রীশ্রীমহাসংকীর্ত্তন গ্রন্থ অদ্যাবধি ঠাকুরের ভক্তগণ অতি যত্ন ও ভক্তি সহকারে পাঠ করিয়া থাকে। লীলামৃতে ঠাকুরের জীবনী ও লীলা লিখিত আছে এবং মহাসংকীর্ত্তনে ঠাকুর সম্বন্ধে ভক্তিরসপূর্ণ বহু গীতি রচিত হইয়াছে। বস্তুতঃ তারকচন্দ্রের জন্যই ঠাকুরের ধর্ম্মমত বাংলার এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে ব্যাপকভাবে দ্রুত বিস্তার লাভ করিয়াছে।

শ্রীশ্রীহরি ঠাকুরকে তাঁহাব ভক্তগণ ভগবানের অবতার জ্ঞান করেন। যদি পতিতের উদ্ধার করিবার জন্যই ভগবান মর্ত্তে আগমন করিয়া থাকেন, তবে শ্রীশ্রীহবি ঠাকুব ভগবানের পূর্ণ অবতার তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। এই সময়ে বাংলাব নমঃশূদ্র জাতির তথা সমগ্র অনুন্নত জাতি সমূহের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইহারা অতিশয় ঘৃণিত সামাজিক এবং ধর্ম্মজীবন যাপন করিত। একারণ তথা কথিত উচ্চবর্ণের হিন্দুগণ কর্ত্তৃক ইহারা নিপীড়িত এবং উপেক্ষিত হইয়া আসিতেছিল। অস্পৃশ্যতা দোষ এতদূব প্রবল ছিল যে অনুন্নত হিন্দুরা আত্মমর্য্যাদা জ্ঞানশূন্য হইয়া উচ্চবর্ণের হিন্দুদিগের সম্মুখে নিজেদের কুক্কুর হইতেও অধম মনে করিত। ইহাদিগের মধ্যে বিদ্যার চর্চ্চা একেবারেই ছিল না। দরিদ্রতা পূর্ণমাত্রায় বিরাজ করিত। বৈষ্ণব ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম হইলেও এবং শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব জাতিভেদ প্রথা এবং অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে ঘোর সংগ্রাম চালাইয়া হরিনামে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকলের মধ্যে সাম্যবাদ প্রচার করিলেও তাঁহার অন্তর্ধানের পরে বৈষ্ণব ভক্তগণের মধ্যে জাতিভেদ প্রথা আবার জাগরিত হইল। অস্পৃশ্যতা নূতন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া হিন্দুসমাজ আক্রমণ করিল। ফলে চৈতন্যদেবের ধর্ম্ম জনসাধারণের ধর্ম্ম (mass religion) হইলেও অনুন্নত সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ বৈষ্ণবধর্ম্মাধিকারে বঞ্চিত হইয়া "বাউল" নামক একপ্রকার অতিশয় নিকৃষ্ট ধর্ম্ম অনুসরণ

করিতে লাগিল। ইহারা পবিত্র গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নানাপ্রকার জঘন্য আচরণে ও অনুষ্ঠানে অনুক্ষণ মত্ত থাকিত এবং ইহাকে তাহারা অতি বিশুদ্ধ প্রেমধর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা করিত। তাহাদের নৈতিক চরিত্রের অধোগতির আর সীমা রহিল না, বাউল ধর্ম্ম যেন মুখ ব্যাদান করিয়া বাংলার সমগ্র অনুন্নত সমাজকে গ্রাস করিতেছিল। ইহার উপর তথাকথিত উচ্চবর্ণের হিন্দুরা অস্পৃশ্য অনুন্নত জাতির উপর এতদূর অত্যাচার এবং নিষ্পীড়ন করিত যে তাহারা নিজেদের হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে পারিত না। ইহার ফলে তাহারা দলে দলে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতে লাগিল। হিন্দু ধর্ম্মে যেন ভাঙ্গন লাগিল। সোণার বাংলা যেন হিন্দু-শূন্য হইয়া যাইতে বসিল। এই শঙ্কটাপন্ন অবস্থা হইতে হিন্দুধর্ম্মকে রক্ষা করিবার জন্য অবতারের প্রয়োজন হইল।

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মনং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুস্কৃতাম্।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

সাধুদিগের পরিত্রাণ, দুস্কৃতের বিনাশ সাধন এবং ধর্ম্ম স্থাপনের জন্য ভগবান যুগে যুগে অবতীর্ণ হন। নিপীড়িত এবং অস্পৃশ্য জাতির উদ্ধারের জন্য তাহাদিগকে নির্য্যাতন হইতে পরিত্রাণ করিবার জন্য এবং তাহা-দিগের মধ্যে নবজীবন সঞ্চার করিবার জন্য শ্রীশ্রীহরি ঠাকুর ওড়াকান্দীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। পতিত, নিপীড়িত ও উপেক্ষিতদের উদ্ধার এবং কল্যাণের জন্যই ভগবান মর্ত্ত্যে আগমন করেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবতারের উদ্দেশ্যও ছিল পতিত উদ্ধার করা; কিন্তু হিন্দু ধর্ম্মের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে ঐ উদ্দেশ্য তাহাদের দ্বারা সম্যকরূপে সাধিত হইতে পারে নাই। রামায়ণে আমরা দেখিতে পাই রামচন্দ্র পতিত চণ্ডালকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। তাহা দ্বারা তাঁহার স্বীয়

অভিপ্রায় সিদ্ধ হইয়াছিল সন্দেহ নাই; কিন্তু সেই আলিঙ্গনে চণ্ডাল জাতির উদ্ধার সাধিত হয় নাই। রামচন্দ্র ক্ষত্রিয় ছিলেন; তাঁহার সময়ে ক্ষাত্রশক্তি ভারতে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। দ্বাপরে আমরা নন্দদুলাল শ্রীকৃষ্ণকে বৈশ্য গোপ-কুলে আবির্ভূত হইতে দেখিতে পাই। তাঁহাব সময়ের ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে দেখা যায় বৈশ্য সম্প্রদায়ের উন্নতি তাঁহার সময়ে বিলক্ষণ সাধিত হইয়াছিল। তারপর কলিতে দয়াল ঠাকুর শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব হইল। তিনি ব্রাহ্মণের পুত্র হইয়াও আচণ্ডাল সকলকে আলিঙ্গন করিয়া হরিনাম ও প্রেম বিলাইলেন। তাঁহার লীলাতে মনে হইল বাংলার বক্ষ হইতে জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা চিরতরে বিলুপ্ত হইল। কিন্তু তাঁহার লীলা সংবরণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ভক্তগণ স্ব স্ব জাতিভুক্ত হইয়া গেলেন। পতিত শূদ্র পতিতের স্থানেই রহিয়া গেল। তাহার উদ্ধার হইল না। তখন ভগবান ভাবিলেন তাঁহার উদ্দেশ্য কোন মতেই সিদ্ধ হইল না। তিনি এক উপায় উদ্ভাবন করিলেন, তাহা এই—"পতিত উদ্ধার কবিতে হয় পতিতের আলয়ে জন্মগ্রহণ করিয়া।" তাই ভগবান ওড়াকান্দী অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার আগমনে বাংলার অনুন্নত জাতি বহু যুগ যুগান্তরের নির্য্যাতনের পর গৌরব করিবার অমূল্য রতন লাভ করিল। তাহারা ধন্য হইল ও পরিত্রাণ পাইল।

শাস্ত্রে অবতারের নানা লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে মনে হয় একটা লক্ষণ খুবই প্রবল। তাহা এই যে প্রত্যেক অবতার ধরাধামে আসিয়া এক ভাবের স্রোত—এক আনন্দের মহাবন্যা প্রবাহিত করিয়া যান। সেই স্রোতের গতি অনন্তকাল চলিতে থাকে; কখনও তাঁহার নিবৃত্তি হয় না। তাই কোন যুগে শ্রীকৃষ্ণ চলিয়া গিয়াছেন, তবুও তাঁহার ভক্তগণ আনন্দে আত্মহারা হইয়া সেই বৃন্দাবন অভিমুখে ধাবিত হইতেছে। প্রায় পাঁচশত বৎসরেরও অধিক হইয়া গিয়াছে শ্রীশ্রীচৈতন্য দেবের

অন্তর্ধান হইয়াছে, তথাপি তাঁহার ভক্তগণ প্রাণের আবেগে আনন্দাশ্রুতে ভাসিয়া নবদ্বীপে যাইতেছে। বহুকাল অতীত হইল শ্রীশ্রীহরি ঠাকুর তাঁহার লীলা সম্বরণ করিয়াছেন, অদ্যাবধি তাঁহার লক্ষ লক্ষ ভক্ত প্রাণের জ্বালা জুড়াইবার জন্য তাঁহার লীলা ক্ষেত্র শ্রীশ্রীধাম ওড়াকান্দীতে ছুটিয়া আসিতেছে। অবতার সকলেই আত্ম পরিচয় দিয়াছেন, শ্রীশ্রীহরি ঠাকুরও তাঁহার ভক্তগণ সমক্ষে আত্মপরিচয় দিয়া পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন, "আমিই সেই ক্ষীরোদের হরি।"

শ্রীশ্রীহরি ঠাকুরের দৃষ্টি সর্ব্বাগ্রে অনুন্নত জাতির ধর্ম্ম সংস্কারের দিকে আকৃষ্ট হইল। তিনি দেখিলেন, নমঃশূদ্র ও অন্যান্য অনুন্নত জাতি বাউল ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ঘোর তামসিকভাবে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। এই তামসিক ভাব হইতে ইহাদের হঠাৎ সাত্ত্বিকভাবে উন্নীত করা একেবারেই অসম্ভব। ইহাদিগের সম্মুখে নানা প্রলোভন রহিয়াছে। উহা অতিক্রম করা তাহাদের পক্ষে অতীব ক্লেশকর। তিনি অনুভব করিলেন, মানুষের রাজসিক ভাব হইতে সাত্ত্বিকভাবে উন্নীত হওয়া অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য। তাই ঠাকুর সর্ব্বাগ্রে অনুন্নতদের রাজসিকভাবে উন্নীত করিবার জন্য আদর্শ গার্হস্থ্যধর্ম্ম শিক্ষা দিতে লাগিলেন। মনুষ্যের হাজারকরা একজন মাত্র সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিবার উপযুক্ত হয়, আর বাকী ৯৯৯ জনই গৃহী থাকিয়া যায়। অতএব গৃহস্থের জীবনই সাধারণের জীবন এবং গৃহস্থাশ্রমই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রম। গৃহে থাকিয়াও কি প্রকারে সন্ন্যাসী হওয়া যায়, তাঁহার জীবনে তিনি তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। বাউল ধর্ম্ম ও তৎসংশ্লিষ্ট ঘোর তামসিক আচরণ ও ব্যভিচারমূলক কার্য্যের উচ্ছেদকল্পে তিনি গৃহস্থমাত্রকেই শিক্ষা দিয়াছিলেন যে "এক স্ত্রী যাহার তিনি ব্রহ্মচারী।" তিনি এক হরিনাম কীর্ত্তনকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মানুষ্ঠান বিবেচনা করিতেন এবং মানুষকে তাহাই শিক্ষা দিতেন। তাঁহার চেষ্টায় লোকে তামসিক বাউল ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া তাঁহার ধর্ম্মমতে দীক্ষিত হইতে লাগিল

এবং আদর্শ গার্হস্থ্য জীবন যাপন করিয়া নৈতিক চরিত্রের উন্নতি সাধন করিতে প্রয়াসী হইল।

অনুন্নত জাতিসমূহ যে প্রকার তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর জাতিদ্বারা নিপীড়িত হইতেছিল এবং অস্পৃশ্যতা দোষ হিন্দু সমাজকে যেরূপভাবে গ্রাস করিতেছিল, তাহাতে আত্মমর্য্যাদাজ্ঞানশূন্য জাতি সকল ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়া বাংলার হিন্দুর জনসংখ্যাশক্তি দিন দিন হ্রাস করিতেছিল। ঠাকুর দেখিলেন অনুন্নতদিগের মধ্যে আর্থিক এবং শিক্ষার উন্নতির দ্বার উৎঘাটিত না হইলে তাহাদের আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান লাভ হইবে না। আর যতদিন না তাহারা ইহা লাভ করিতে পারিবে ততদিন উহারা ঐ প্রকার ভাবে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতে থাকিবে। তিনি তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার মানসে নানাস্থানে পাঠশালা স্থাপন করিয়া তাহাদিগের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের ব্যবস্থা করিলেন। পূর্ব্বে কৃষকেরা মাত্র কৃষিকার্য্যকে ধনোপার্জ্জনের একমাত্র অবলম্বন মনে করিত। ঠাকুরের চেষ্টায় তাহারা কৃষির সহিত নানাপ্রকার ব্যবসায় বাণিজ্য করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে লাগিল। এইরূপে অতি অল্প সময়ের মধ্যে অনুন্নত জাতির সামাজিক, পারিবারিক এবং ধর্ম্ম জীবনের সমূহ উন্নতিসাধন হইল। তাহারা স্বধর্ম্মের গৌরব অনুভব করিল এবং ধর্ম্মান্তর গ্রহণ ত্যাগ করিল। এইরূপে শ্রীশ্রীহরি ঠাকুর বাংলার হিন্দুসমাজকে রক্ষা করিলেন। এজন্য বাংলার হিন্দু চিরকাল তাঁহার নিকট ঋণী থাকিবে।

গৃহে থাকিলেও শ্রীশ্রীহরি ঠাকুর সর্ব্বত্যাগী ছিলেন। তিনি সকল ধর্ম্মানুষ্ঠানের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্য ব্রতানুষ্ঠান এবং হরিনাম কীর্ত্তনকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করিতেন। তিনি প্রায়ই বলিতেন—মানুষ অসীম অনন্ত বিশ্বের অংশ। এই বিশ্ব ও তাহার স্রষ্টাকে জানিবার শক্তি মনুষ্য মাত্রের মধ্যেই আছে। সেই শক্তি একমাত্র ব্রহ্মচর্য্য ও হরিনাম কীর্ত্তন দ্বারা জাগ্রত করা যায়। যাগ যজ্ঞ ক্রিয়া-কাণ্ড সমূহ ধর্ম্মের বাহ্য আড়ম্বর মাত্র।

হরিনামে চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং ব্রহ্মচর্য্যে মানুষের সুপ্ত শক্তি জাগরিত হয়! তাঁহার ধর্ম্মমত ও শিক্ষার ফলে আজ বাংলার অনুন্নত জাতির মধ্যে নব জাগরণ আসিয়াছে। পূর্ব্বের মত আর তাহাদের অবস্থা নাই। সে দুঃখের দিন গিয়াছে। অনুন্নতেরা বুঝিতে পারিয়াছে একমাত্র শিক্ষা, নৈতিক চরিত্রের উন্নতি এবং আর্থিক উন্নতিই মানুষকে চতুর্ব্বর্গ ফল প্রদান করিতে পারে। বাংলার এই বিশাল অনুন্নত জাতির দেশময় আন্দোলনের পশ্চাতে শ্রীশ্রীহরি ঠাকুরের আশীর্ব্বাদ রহিয়াছে। তাঁহার নিকটে বাংলার অনুন্নত সমাজ বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ থাকিবে।

বাংলা ১১৮৪ শকে ২৩শে ফাল্গুন শ্রীশ্রীহরি ঠাকুর ৬৬ বৎসর বয়ঃক্রম-কালে মানবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার ভক্তেরা তাঁহার দেহ ঘৃত সংযোগে চন্দনকাষ্ঠ দ্বারা ভস্মীভূত করেন। সেই চিতা ভস্ম বাটীতে আনিয়া মাটীর নীচে পুতিয়া রাখা হয়। সে স্থানে একটী মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। বহু নরনারী তথায় আগমন করিয়া মাটীতে গড়াগড়ি দিয়া সর্ব্বাঙ্গে ধূলি মাখে এবং তাপিত দেহ শীতল করে।

শ্রীশ্রীহরি ঠাকুরের দুই পুত্র—শ্রীগুরুচরণ ঠাকর ও ৺উমাচরণ ঠাকুর এবং তিন কন্যা—রোহিণী, সরমা, ও রাধারাণী। জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে তিনি তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র গুরুচরণ ঠাকুরকে তাঁহার ধর্ম্মমত এবং সংস্কার কার্য্য পরিচালন করিতে আদেশ করিয়া গিয়াছিলেন। তিনি সেই আদেশ পালন করিতে জীবন উৎসর্গ করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে গুরুচরণ ঠাকুর মহাশয় তাঁহার পিতার পীঠস্থানে সমাসীন "ঠাকুর"। ভক্তেরা তাহাকে "গুরুচাঁদ ঠাকুর" বলে। তিনি এই নামেও সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। শ্রীশ্রীহরি ঠাকুরের অন্তিমকালে ভক্তেরা কাঁদিয়া আকুল হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তাহারা তাহার পরে কাহার পদচ্ছায়ায় দাঁড়াইবে। তিনি তাহাদের অভয় বাণী দিয়া বলিয়া গেলেন :—

"আমি নাহি ছেড়ে যাব জানিও বিশেষ।
গুরুচাঁদ দেহে এই করিনু প্রবেশ॥
গুরুচাঁদে ভকতি করিস্ মোর মত।
যাহা চা'বি তাহা পা'বি মনোনীত যত॥

শ্রীগুরুচরণ ঠাকুর

শ্রীশ্রীহরি ঠাকুরের অসমাপ্ত লীলাপূর্ণকারী তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীশ্রীগুরুচরণ ঠাকুব ১২৫৪ বঙ্গাব্দে ওড়াকান্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্ম সময়ে তাঁহার পিতার সাংসারিক অবস্থা তেমন সচ্ছল ছিল না। মাতা শান্তি দেবী তাঁহাকে বহুকষ্টে বাল্যে লালন পালন করিয়াছিলেন। একটু বড় হইলে পিতা তাঁহাকে বিদ্যাশিক্ষার্থ পদ্মবিলা গ্রামে দশরথ বিশ্বাসের বাটীতে প্রেরণ করেন। তিনি সেখানে থাকিয়া ঐ গ্রামের পাঠশালায় কিছুদিন পাঠাভ্যাস করেন। পরে মোল্লাকান্দী, সাধুহাটী, দেবাসুর প্রভৃতি স্থানে থাকিয়াও তিনি বিদ্যাশিক্ষা করেন। তিনি কিছুদিন আড়কান্দী সর্দ্দারপাড়ার মোক্তবে পাশী ভাষা শিক্ষা করেন। তৎকালে বাংলা পাঠশালায় শুভঙ্করী ও শিশুবোধ পড়ান হইত। চাণক্যশ্লোক পদ্যানুবাদসহ মুখস্থ করিতে হইত। চিঠি এবং খতিয়ান লেখা শেষ হইলে পাঠশালার অধ্যয়ন এক প্রকার শেষ হইত। পৌরাণিক বাংলা পুথি হাতে লিখিয়া পাঠ করিতে হইত। তিনি অনেক শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করিয়া উহাতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। পাঠ সমাপ্তে তিনি কিছুদিন বাটীতে রহিলেন এবং মধ্যে মধ্যে পিতার সহিত ভক্তের গৃহে বেড়াইতে যাইতেন। ভক্তগণ তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিত।

যখন তাঁহার বয়স অনুমান কুড়ি বৎসর তখন তাঁহার মনে অর্থোপার্জ্জনের ইচ্ছা বলবতী হইল। তাঁহার সমবয়স্ক বন্ধু গিরিশচন্দ্র কীর্ত্তনীয়া ও নীলকান্ত চৌধুরীর সহিত পরামর্শ করিয়া জলপথে নৌকায়

চালানি ব্যবসায় করিতে মনস্থ করিলেন। এই সময়ে দেশের এই অঞ্চলে রেল বা ষ্টীমার কিছুই ছিল না। বন্যার জলে ছয়মাস কাল দেশ প্লাবিত থাকায় নৌকাই একস্থান হইতে স্থানান্তরে গমনাগমনের একমাত্র অবলম্বন ছিল। ব্যবসায়িগণ ব্যবসায়ের সুবিধার জন্য বড় বড় নৌকা প্রস্তুত করিত এবং উহাতে এই অঞ্চলজাত ধান্য, কলাই, পাট, রাই, সরিষা প্রভৃতি বোঝাই করিয়া কলিকাতা ও অন্যান্য বড বন্দবে চালান দিত এবং বিক্রয়-লব্ধ অর্থ দ্বারা বস্ত্র, তৈল, লবণ ও অন্যান্য দ্রব্য আনিয়া হাট বাজারে দোকানে বিক্রয় করিত। ইহাতে অনেকে বিশেষ লাভবান হইত। ঠাকুর মহাশয় ব্যবসায়ের জন্য অনেকগুলি বড় বড় নৌকা প্রস্তুত কবিলেন এবং স্থানীয় কয়েকটী বাণিজ্য কেন্দ্রে দোকান স্থাপন করিয়া কলিকাতা হইতে জিনিষ পত্রের আমদানী করিতে লাগিলেন। ইহাতে তিনি অত্যল্পকাল মধ্যে মহাধনবান হইয়া পড়িলেন। পরে তিনি বিস্তৃত ভূসম্পত্তি ক্রয় এবং ক্রমশঃ তেজারতি ও মহাজনী ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে তিনি যজ্ঞেশ্বর বিশ্বাস ও রামতনু বিশ্বাস নামে দুইজন বিচক্ষণ কর্ম্মচারী নিয়োগ করেন। ইহাবা পূর্ব্বে কোন জমিদাবী সেরেস্তায় কার্য্য করিতেন এবং ইহাদের জমিদারী সংক্রান্ত কার্য্য পরিচালন কবিবার অশেষ বুদ্ধি ছিল। ইহাদের পরামর্শ অনুযায়ী কার্য্য করিয়া ঠাকুর মহাশয় তাঁহার ভূসম্পত্তি ও ব্যবসায় বহু পবিমাণে বর্দ্ধিত করেন।

ঠাকুব মহাশয় ওড়াকান্দীর উত্তর পশ্চিমস্থ সাতবাড়িয়া গ্রামনিবাসী রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের জ্যেষ্ঠা কন্যা সত্যভামা দেবীকে বিবাহ করেন। বর এবং কন্যা উভয় পক্ষ হইতে খুব আড়ম্বরের সহিত বিবাহ সম্পন্ন হয়। এই কন্যার গর্ভে ঠাকুর মহাশয়ের চাবিপুত্র—শশীভূষণ, সুধন্যকুমার উপেন্দ্র নাথ ও সুরেন্দ্রনাথ এবং একটী কন্যা করুণাময়ীর জন্ম হয়।

এই সময়ে দেশে বিদ্যাশিক্ষার জন্য লোকের মনে তেমন কোন উৎসাহ ছিল না। তাহারা বিদ্যাশিক্ষার উপকারিতা কিছুই বুঝিত না।

কেহ কেহ মাত্র শাস্ত্রাদি গ্রন্থ পাঠ করিবার অভিলাষে যৎকিঞ্চিৎ লেখা পড়া শিক্ষা করিত। যাহারা জমিদারী সেরেস্তায় কাজ করিত তাহারা তৎকালে উচ্চশিক্ষিত বলিয়া পরিগণিত হইত এবং দেশের জনসাধারণের নিকট বিশেষ সম্মান পাইত। ঠাকুর মহাশয় তদীয় পুত্রগণের শিক্ষার জন্য নিজ গ্রাম ওড়াকান্দীতে দাশ মহাশয়দের পাড়ায় একটী পাঠশালা স্থাপন করিলেন; কিন্তু ঐ পাঠশালার উপর তাহাদের ঔদাস্য থাকায় তাহা চৌধুরী মহাশয়দের বাটীতে পরে স্থাপিত হয়। কিন্তু ঐ পাঠশালা মধ্যবাংলা স্কুলে পরিণত হওয়ায় ঐ বাটীতে স্থান সংকুলান হয় না এবং উহা বর্ত্তমান ওড়াকান্দীর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় যে স্থানে প্রতিষ্ঠিত সেই স্থানে স্থানান্তরিত করা হয়। এই সময়ে ঘৃতকান্দি গ্রামনিবাসী, কলিকাতার নিমতলার সুপ্রসিদ্ধ ধনাঢ্য ব্যবসায়ী গিরিশ চন্দ্র বসু মহাশয় দেশের নানাবিধ জনহিতকর কার্য্যে বহু অর্থ দান কবিতেছিলেন। একদা তিনি কলিকাতা হইতে ঘৃতকান্দি নিজবাটীতে আগমন করিলে গুরুচরণ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট জিজ্ঞাসা কবিলেন, "কি কি কার্য্য করিলে এই দেশবাসীর উপকার সাধিত হইতে পারে এবং তাহার নাম ও প্রতিপত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।" তাহাতে ঠাকুব মহাশয় পরামর্শ দেন যে এই অঞ্চলে একটী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় ও একটী দাতব্য চিকিৎসালয়ের বিশেব অভাব। যদি এইরূপ একটী বিদ্যালয় ও একটী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করা যায়, তবে দেশস্থ লোকের সমুহ উপকার হইবে এবং অত্র দেশে তাঁহার কীর্ত্তি অমর হইয়া থাকিবে। ইহার পরে দেশের বিদ্যোৎসাহী লোকে একত্র মিলিত হইয়া একটী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য বসু মহাশয়কে অনুরোধ করেন। ইহার ফলে ওড়াকান্দীর মধ্যবাংলা বিদ্যালয়টী তুলিয়া ওড়াকান্দী এবং ঘৃতকান্দীর মধ্যস্থলে স্থাপিত হয় এবং উহাকে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে পরিণত করিবার চেষ্টা চলিতে থাকে। এদিকে

ওড়াকান্দীর নমঃশূদ্রগণের সহিত ঘৃতকান্দীর কায়স্থগণের নানা প্রকার মনোমালিন্যের সূত্রপাত হয়। ইতোমধ্যে ওড়াকান্দীর নিকটস্থ ফুকুরা গ্রামের ব্রাহ্মণ সমাজ ঐ গ্রামে একটী ইংরেজী উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য বসু মহাশয়কে বিশেষভাবে অনুরোধ করিতে লাগিল। তিনি উহাদের অনুরোধে বিদ্যালয়টী ঘৃতকান্দী হইতে ফুকুরা গ্রামে স্থানান্তরিত করিয়া উহা উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে পরিণত করিলেন। ওড়াকান্দীর নমঃশূদ্রগণ অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়া গুরুচরণ ঠাকুরের নিজ বাটীতে একটী মধ্যইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করিল। ঠাকুর মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শশিভূষণ ঠাকুর উহার প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন।

বিদ্যালযটী অনেক প্রকার আর্থিক দুর্দ্দশার মধ্য দিয়া চলিতে থাকে। এই সময় অষ্ট্রেলিয়ার এডিলেড সহরবাসী খ্রীষ্ট মিশনারী ডাক্তার সি, এস, মিড্ বি, এ, এম, বি সাহেব মহোদয় খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচারকল্পে ফরিদপুর বাস করিতেছিলেন। স্বজাতিবৎসল কতিপয় নমঃশূদ্র ভদ্রলোক তাঁহার নিকট যাইয়া জাতীয় অভাব অভিযোগ এবং তাহা দূরীকরণের জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। তিনি অতিশয় সদাশয় প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি তাহাদেব নিকট নমঃশূদ্র জাতির এতাদৃশ দুরবস্থার কথা শ্রবণ করিয়া বড়ই ব্যথিত হইলেন এবং সেই বৎসরই বর্ষাকালে বড় একটী গ্রীণ বোটে ওড়াকান্দী এবং তাহার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে নমঃশূদ্র-দিগের অবস্থা পরিদর্শন করিতে আগমন করেন। গুরুচরণ ঠাকুর মহাশয় তাঁহাকে অত্যন্ত সম্ভ্রমেব সহিত নিজবাটীতে অভ্যর্থনা করিয়া আনেন। নমঃশূদ্রজাতির উন্নতি সম্বন্ধে তাঁহার সহিত অনেক আলোচনা হইল। নমঃশূদ্র জাতির মধ্যে একটী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের অভাবে শিক্ষা-ব্যাপারে এজাতির পশ্চাৎপদতা সম্যক্‌রূপে ঠাকুর মহাশয় তাঁহাকে বুঝাইয়া দেন। ডাঃ মিড্ ওড়াকান্দী এবং এতদঞ্চলের লোক দেখিয়া এতদূর প্রীত হইয়াছিলেন যে, তিনি তথায় একটী খ্রীষ্ট মিশন স্থাপনের অভিলাষ

করিলেন এবং তাহা ঠাকুর মহাশয়কে জানাইলেন। ঠাকুর মহাশয় উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় ও মিশন স্থাপনের জন্য জমি প্রদান করিলেন। ডাঃ মিড্ ক্রমশঃ মিশনবাটী, স্কুল ও তৎসহ একটী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিলেন। এতদিনে এদেশবাসী নমঃশূদ্রগণের এতদ্সম্বন্ধীয় অভাব দূরীভূত হইল। এই হাইস্কুলের নাম "ওড়াকান্দী হাইস্কুল" হইল। পরে উহা ডাঃ মিডের স্মৃতি রক্ষার জন্য "মিড্ হাই স্কুল" রাখা হইয়াছে। উহা স্থাপনের জন্য ঠাকুর মহাশয় জমি এবং নগদ অর্থে ১০০০৲ হাজার টাকার উপর দান করিয়াছেন। তিনি অদ্যাবধি এই স্কুলের জীবন সদস্য (life-member) আছেন। নমঃশূদ্র জাতির মধ্যে ইহাই সর্ব্ব প্রথম প্রধান শিক্ষার কেন্দ্র এবং স্বজাতির শিক্ষার জন্য ঠাকুর মহাশয়ের এই দানই ইহার ভিত্তিস্বরূপ। এই বিদ্যালয় হইতে নমঃশূদ্র জাতির যে কত কল্যাণ সাধিত হইয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

গুরুচরণ ঠাকুর মহাশয়ের সহিত ডাঃ মিডের এক অতি নিকট সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। ডাঃ মিডের সহধর্ম্মিণী ঠাকুর মহাশয়কে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন এবং তাঁহাকে ধর্ম্মপিতা বলিযাছিলেন। তিনিও মিসেস্ মিড্কে নিজ কন্যার ন্যায় দেখিতেন। ডাঃ মিডের দুই কন্যা কুমারী ডরথি এবং কুমারী মারজরী ঠাকুর মহাশয়কে দাদামহাশয় বলিয়া সম্বোধন করিতেন। অনেক সময় মিসেস্ মিড্ ঠাকুর মহাশয়কে নিজ কুঠিতে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করাইতেন। তিনি গোঁড়া নৈষ্ঠিক হিন্দু হইলেও বিজাতীয় ধর্ম্মকন্যার প্রদত্ত আহার্য্য গ্রহণে কখনও সঙ্কোচ বোধ করিতেন না। অষ্ট্রেলিয়া হইতে যখন সংবাদ আসিল যে মিসেস্ মিড আর ইহ-জগতে নাই, তখন তিনি একটী শোকসভা আহ্বান করিয়াছিলেন এবং প্রকাশ্য সভায় মিসেস্ মিডের গুণকীর্ত্তন করিতে করিতে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। ডাঃ মিড্ও ঠাকুর মহাশয়কে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসে যখন তিনি চিরতরে ভারতবর্ষ

ত্যাগ করিয়া স্বদেশ অষ্ট্রেলিয়ায় চলিয়া যান, তখন তিনি কৃতজ্ঞতা জানাইয়া ঠাকুর মহাশয়কে যে প্রশংসাপত্র দিয়াছিলেন. নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল।

From Dr. Mead. Orakandi, East Bengal.

Being about to leave India for good I am glad to leave on record my gratitude to Babu Gurucharan Thakur of Orakandi for all that he has done for me. I came to live at Orakandi as being the most influencial centre of Namasudra life in this district. Gurucharan Babu is a leader of outstanding ability and of wide-spread influence. In the various activities of my missionary life he has made possible many things that without his backing could not have been carried through. With a liberality of thought, a courage and a foresightedness uncommon among men of the older orthodox school he has sought the uplift of the great Namasudra caste. They owe a great deal to him. So do I.

(Sd) C. S. Mead

Dec. 1921.

এই পত্র হইতে বুঝিতে পারা যায় ঠাকুর মহাশয় নমঃশূদ্র জাতির উদ্ধারকল্পে কত পরিশ্রম করিয়াছেন এবং এজাতি তাঁহার নিকট কি পরিমাণে ঋণী।

এই সময় হইতে নমঃশূদ্র জাতির সহিত খ্রীষ্ট মিশনারীগণের অত্যন্ত সৌহার্দ্দ্য স্থাপিত হয় এবং ঠাকুর মহাশয়ের বাটীতে অনেক মিশনারী

সাহেব যাতায়াত করিতে থাকেন। নমঃশূদ্র জাতির উন্নতিকল্পে তাহাদের সহিত নানা বিষয়ের আলোচনা হইতে লাগিল। ঠাকুর মহাশয়ের চেষ্টায় এবং দেশবাসীর অত্যন্ত আগ্রহে দেশের স্থানে স্থানে বড় বড় সভার আয়োজন হইতে লাগিল। দেশে উন্নতির এক নবযুগ আসিল। নমঃশূদ্রমাত্রেই শিক্ষার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। বালিকাদের শিক্ষার জন্য ওড়াকান্দীতে একটী উচ্চ প্রাইমারী বিদ্যালয় স্থাপিত হইল এবং গ্রামের ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের বহু বালিকা বিদ্যাশিক্ষা করিতে লাগিল। এই প্রকারে শিক্ষা নারীসমাজের মধ্যেও প্রচলিত হইল।

ইংরেজী ১৯০৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ওড়াকান্দী হইতে নমঃশূদ্র জাতির উন্নতিকল্পে "নমঃশূদ্র-সুহৃদ" নামক যে মাসিক পত্রিকা বাহির হয়, গুরুচরণ ঠাকুর মহাশয় তাহার স্বত্বাধিকারী ছিলেন। পরলোকগত আদিত্য কুমার চৌধুরী মহাশয় তাহার সম্পাদক ও ঠাকুর মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র স্বর্গীয় সুরেন্দ্র নাথ ঠাকুব তাহার কর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন। এই পত্রিকা তখন নমঃশূদ্র জাতির মধ্যে শিক্ষা, ব্যবসায়, বাণিজ্য, কৃষি, শিল্প, রাজনীতি ও সমাজনীতি বিষয়ক প্রথম মাসিক পত্রিকা। ইহা জাতির অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছে। বলা বাহুল্য যে এই পত্রিকা ডাঃ মিডের পরামর্শ অনুসারে বাহির করা হইয়াছিল।

ওড়াকান্দী মিশন স্থাপন করিয়া ডাঃ মিড্ ঠাকুর মহাশয়কে তাঁহার প্রতি কার্য্যে বিশেষ সহায়করূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঠাকুব মহাশয়ও জাতির উন্নতির জন্য নানা কার্য্যে ডাঃ মিডের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। নমঃশূদ্র জাতি আর্থিক দুরবস্থার নিমিত্ত এবং শিক্ষায় বিশেষ অগ্রসর না হওয়ায় তখনও গবর্ণমেণ্টের পরিচিত হইতে পারে নাই। তখন যদিও উচ্চ শিক্ষিতের সংখ্যা জাতির মধ্যে একেবারে কম ছিল না, তথাপি তাহারা গবর্ণমেণ্টের কোন চাকুরী প্রাপ্ত হইত না

এবং গবর্ণমেণ্ট. ও নমঃশূদ্রজাতি রাজভক্ত কিনা তাহার সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন। ১৯০৭ সালে ঠাকুর মহাশয় ডাঃ মিডের সহিত পরামর্শ করিয়া তৎকালীন পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের ছোটলাট ল্যান্সলট হেয়ার বাহাদুরকে অভিনন্দন দেওয়া স্থির করেন। ডাঃ মিড্ ঐ অভিনন্দনপত্রে নমঃশূদ্র জাতির অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে যে যে বিষয় সন্নিবেশ করা প্রয়োজন তাহা ঠাকুর মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া নিজ হস্তে লিখিয়া দিয়াছিলেন। ফরিদপুরে যথাসময়ে ছোটলাট বাহাদুরকে অভিনন্দন দেওয়া হইল। ইহাই অনুন্নত জাতির মধ্য হইতে গবর্ণমেণ্টকে সর্ব্বপ্রথম অভিনন্দন পত্র। ইহার পরে বাংলার নমঃশূদ্র ও অন্যান্য অনুন্নত জাতিসমূহের রাজনৈতিক অধিকারের দাবী ও গবর্ণমেণ্টের চাকুরি পাইবার উপযুক্ততা গবর্ণমেণ্ট স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। বাংলাব অনুন্নত সম্প্রদায় আজ যে রাজনৈতিক অন্দোলনে এতদূর অগ্রসর হইয়াছে এবং দিন দিন হইতেছে তাহার মূলে এই অভিনন্দন পত্র।

ইং ১৯০১ সালের এবং তৎপূর্ব্ব সেন্সাস্ রিপোর্ট সমূহে নমঃশূদ্র-দিগকে অযথা “চণ্ডাল” আখ্যা দিয়া লেখা হইত। ঠাকুর মহাশয় ইহাতে বড়ই মর্ম্মাহত হইয়া উহার প্রতিকারকল্পে ডাঃ মিডের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। অতঃপর ঠাকুর মহাশয় এই ঘৃণিত আখ্যা দূর করিবার জন্য তদানীন্তন সেন্সাস্ কমিশনার গেট সাহেবের নিকট এক দরখাস্ত করিলেন। এদিকে ডাঃ মিড্ নমঃশূদ্র জাতি সম্বন্ধে উক্ত গেট সাহেবের নিকট যে রিপোর্ট পাঠাইয়াছিলেন তাহার মর্ম্ম এই :—“আমি ফরিদপুব, ঢাকা, বরিশাল, পাবনা, মৈমনসিংহ, যশোহর প্রভৃতি জিলার নমঃশূদ্রগণের মধ্যে ভ্রমণ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে এই জাতি কখনও চণ্ডাল জাতি নহে। তথা-কথিত উচ্চবর্ণের হিন্দুগণ হিংসার বশবর্ত্তী হইয়া ইহাদের এই ঘৃণিত

আখ্যা দিয়াছে এবং উহা সেন্সাসে স্থান পাইয়াছে। 'শিক্ষার অভাবে এই জাতি ইহার বিরুদ্ধে এযাবৎ কোন আন্দোলন করিতে পারে নাই। ইহাদের শ্রাদ্ধাদি কর্ম্ম এবং সমাজ বিষয়ক রীতিনীতি অনেকাংশে ব্রাহ্মণের রীতিনীতির ন্যায়; কিন্তু নানা কারণে ইহারা হিন্দুর সামাজিক অধিকারে বঞ্চিত হইয়া বর্ত্তমান শোচনীয় সামাজিক অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। ইহাদের চণ্ডাল আখ্যা অত্যন্ত গর্হিত এবং উহা সংশোধন করিয়া ১৯১১ সালের সেন্সাস্ রিপোর্টে কেবল "নমঃশূদ্র" বলিয়া উল্লেখ করা উচিত।" ঠাকুর মহাশয়ের দরখাস্ত এবং ডাঃ মিডের এই বিবৃতি হইতেই নমঃশূদ্রগণের চণ্ডাল আখ্যা বিদূরিত হইয়াছে। এখন সেন্সাস রিপোর্টে ইহাদিগকে কেবল নমঃশূদ্র বলিয়া লেখা হয়। ঠাকুর মহাশয়ের এই কার্য্যের জন্য বহু সভায় নমঃশূদ্রগণ তাঁহার প্রতি তাহাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়াছিল।

ঠিক এই সময় গবর্ণমেণ্ট নমঃশূদ্র জাতিকে 'তথাকথিত উচ্চবর্ণের হিন্দুগণের প্ররোচনায় অতি নিকৃষ্ট জাতি বলিয়া মনে করিত এবং জেলে ইহাদের দ্বারা অতিশয় নিকৃষ্ট কার্য্য করাইত। ইহা দূর করিবার জন্য নমঃশূদ্রদিগের মধ্যে স্থানে স্থানে সভাসমিতি হইতে লাগিল। অতঃপর ঠাকুর মহাশয় কতিপয় স্বজাতি ভদ্রলোকসহ ফরিদপুরের ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট এই কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া এক দরখাস্ত করেন। তাহার ফলে জেলে বা অন্য কোন স্থানে গবর্ণমেণ্ট নমঃশূদ্রদিগের দ্বারা আর কোন নিকৃষ্ট কার্য্য করাইত না। গবর্ণমেণ্ট সার্কুলার জারি করিয়া বাংলার প্রত্যেক জেল হইতে ইহা অপসারিত করিয়াছেন। এজন্যও নমঃশূদ্রগণ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট তাহাদের কৃতজ্ঞতা জানাইয়াছে।

পূর্ব্ব এবং পশ্চিম বঙ্গ যখন সংযুক্ত হইল তখন লর্ড কারমাইকেল বাংলার প্রথম গবর্ণর হইয়া আসেন। যখন ১৯১২ সালের আগষ্ট মাসে তাঁহার ফরিদপুর পরিদর্শন করিবার দিন ধার্য্য হইল, তখন ঠাকুর মহাশয়

ডাঃ মিডের সহিত পরামর্শ করিয়া নমঃশূদ্র জাতির পক্ষ হইতে গবর্ণর বাহাদুর সমীপে একটি ডেপুটেশন প্রেরণ করা স্থির করিলেন। এই সম্পর্কে যাবতীয় আয়োজন করিয়া ঠাকুর মহাশয়, ডাঃ মিড্ও কতিপয় নমঃশূদ্র ভদ্রলোক সহ ফরিদপুর যাত্রা করিলেন। ডাঃ মিড্ এই ডেপুটেসানের মুখপাত্র হইলেন। তিনি ঠাকুর মহাশয়ের স্বজাতির উন্নতিকল্পে নানাবিধ চেষ্টা এবং উৎসাহ সম্বন্ধে গবর্ণর বাহাদুরকে অনেক কথা বলিলেন। তাহাতে লর্ড কারমাইকেল ঠাকুর মহাশয়কে বাংলার সমগ্র "নমঃশূদ্র জাতির নেতা" আখ্যা প্রদান করেন এবং যথোচিত সম্মান করেন।

ইং ১৯১২ সালে পরলোকগত সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের ভারত আগমনে দিল্লীর দরবার উপলক্ষে দেশের বিশ্বস্ত, সম্ভ্রান্ত রাজভক্ত প্রজাদিগকে গবর্ণমেণ্ট হইতে রাজভক্তির নিদর্শন স্বরূপ একটী কবিয়া "দরবার মেডাল" প্রদান করা হয়। নমঃশূদ্রজাতিব নেতা হিসাবে ঠাকুর মহাশয়কে গবর্ণমেণ্ট এই সম্মানে বিশেষ সম্মানিত করেন। পূর্ব্বে নমঃশূদ্র সমাজ হইতে আর কোন ব্যক্তি এইরূপ সম্মানে সম্মানিত হইতে পারে নাই।

এই সময়ে ওড়াকান্দীর নিকটবর্ত্তী গোপালপুব নামক স্থানে দাঙ্গা হাঙ্গামার ফলে লুঠতরাজ হয়। একারণ গবর্ণমেণ্ট এই অঞ্চলে পিউনিটিভ পুলিশ স্থাপনের জন্য প্রয়াসী হন। ঠাকুর মহাশয় ঢাকার তদানীন্তন কমিশনার মিঃ ন্যাথানের নিকট এই লুঠতরাজের যাবতীয় বিবরণ সহ এই মর্ম্মে এক দরখাস্ত করেন যে, উহার জন্য স্থানীয় নমঃশূদ্রগণ কোন প্রকারে দায়ী নহে। ইহাতে মিঃ ন্যাথান তদন্ত করিবার মানসে ওড়াকান্দী ঠাকুর বাটীতে আগমন করেন। ঠাকুর মহাশয় নমঃশূদ্র জাতির হইয়া তাঁহার মস্তকে ধান্য এবং দূর্ব্বা প্রদান করিয়া অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। কমিশনার বাহাদুর এই অভ্যর্থনায় প্রীত হইয়া বলিয়াছিলেন, জীবনে তিনি পূর্ব্বে কোন ব্যক্তি দ্বারা এতদূর সম্মানিত হন নাই। তাঁহার তদন্তে নমঃশূদ্র-

দিগের বিরুদ্ধে সকল অভিযোগই অসত্য প্রমাণিত হইল। পিউনিটিভ্ পুলিশ স্থাপনের আর কোন চেষ্টা হইল না। মিঃ ন্যাথান্ যতদিন ঢাকায় ছিলেন, ততদিন নমঃশূদ্র জাতি সম্বন্ধে সকল বিষয়ে ঠাকুর মহাশয়ের পরামর্শ ব্যতীত কিছুই করিতেন না।

ইং ১৯০৫ সালে যখন বঙ্গ বিভাগ হইল, তখন স্বদেশী আন্দোলন পূর্ণমাত্রায় চলিতে লাগিল। বৃটীশ পণ্য দ্রব্যসকল বর্জ্জিত হইতে লাগিল। দেশে সর্ব্বত্র সভা সমিতিতে বঙ্গ বিচ্ছেদের বিরুদ্ধে ঘোর আন্দোলন দেশময় ছড়াইয়া পড়িল। এই সময়ে পরলোকগত স্যার সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই আন্দোলনের অন্যতম নেতা ছিলেন। তিনি গুরুচরণ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট এই আন্দোলনে নমঃশূদ্র জাতির যোগদান কবা কর্ত্তব্য এই মর্ম্মে এক দীর্ঘ পত্র লিখিয়াছিলেন। ঠাকুর মহাশয় তাহার উত্তরে লিখিলেন, "নমঃশূদ্র জাতি অত্যন্ত দরিদ্র জাতি। ইহারা কখনও বিলাসিতা জানে না। এক স্থুলভ বিলাতী বস্ত্র ব্যতীত ইহারা কোন বিদেশী দ্রব্যই ব্যবহার করে না। তথাকথিত উচ্চবর্ণের বিলাসী লোকেরাই বিলাতী দ্রব্য ব্যবহার করিয়া থাকে। অতএব এই আন্দোলন সর্ব্বতোভাবে তাহাদের মধ্যেই প্রচলিত হওয়া আবশ্যক। নমঃশূদ্র জাতি এতকাল রাজনৈতিক অধিকারে বঞ্চিত হইয়া তাহাদের নিজ বাসভূমিতে নিপীড়িত ও নির্য্যাতিত অবস্থায় বাস করিতেছে। তাহাদের এই অধিকার লাভের চেষ্টা ব্যর্থ করিবার মানসে বহুলোক তাহাদের বিরুদ্ধে পূর্ব্ব হইতেই লাগিয়া আছে। সর্ব্ব প্রথমে তথাকথিত উচ্চবর্ণের হিন্দুদিগের মধ্যে অনুন্নত জাতি সমূহের প্রতি ভ্রাতৃভাব আনয়ন করা দরকার। তাহা না হইলে কোন দিনই বাংলার অনুন্নত সমাজ উচ্চবর্ণের হিন্দুদিগের সহিত মিলিত হইয়া কোন প্রকার স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করিতে সমর্থ হইবে না।" এই পত্র পাইয়া সুরেন্দ্র নাথ একবার ওড়াকান্দী আসিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু

নানা কার্য্যে জড়িত থাকায় তিনি তাহা পারিয়া উঠেন নাই। সেজন্য তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন।

ইং ১৯২০ সালে কলিকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে যখন দেশে নন-কো-অপারেশন আন্দোলন প্রবর্ত্তিত হইল, তখন ওড়াকান্দীতে ঠাকুর মহাশয়ের উদ্যোগে এক বিরাট সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় নমঃশূদ্র জাতি এই আন্দোলনে যোগদান করিবে না স্থির করিয়া এক প্রস্তাব গ্রহণ করে। ইহার কিছুদিন পরে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল প্রভৃতি কংগ্রেস নেতৃগণ নন্-কো-অপারেশনের মূলনীতি এবং উহা জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকলের গ্রহণ করা উচিত এই মর্ম্মে অনেক পত্রাদি ঠাকুর মহাশয়ের নিকট লিখিয়াছিলেন। তিনি তাহার উত্তরে বলিয়াছিলেন—"রাজনৈতিক অধিকারে বঞ্চিত থাকিয়া নমঃশূদ্রগণ গবর্ণমেণ্টের সহিত কোন প্রকার সহযোগ করিতে পারে নাই। এমন অবস্থায় ইহাদিগকে গবর্ণমেণ্টের সহিত অসহযোগ করিতে বলা ও না বলা উভয়ই সমান। দেশের নেতৃগণ এই প্রকার আন্দোলনে তাহাদের শক্তি সম্পূর্ণ নিয়োগ না করিয়া অনুন্নত সমাজের উদ্ধার সাধনে চেষ্টা করিলে অধিকতর অল্প সময়ে স্বরাজ লাভের সম্ভাবনা হইত।" ফলতঃ মহাত্মা গান্ধি এই সত্য পরে উপলব্ধি করিয়া অনুন্নতদের উন্নতিকল্পে প্রয়াসী হইয়াছিলেন।

১৯২৫ সালে যখন বঙ্গের অস্থায়ী গবর্ণর স্যার জন কার গোপালগঞ্জ মহকুমা পরিদর্শন করিতে আগমন করেন, তখন অসহযোগ আন্দোলন পূর্ণমাত্রায় চলিতেছিল। অসহযোগীগণ গবর্ণর বাহাদুরের আগমনের দিন হরতাল ও তাহার অভ্যর্থনা বর্জ্জন করিবে বলিয়া সর্ব্বত্র ঘোষণা করিয়াদিল। সেই সময় শ্রীযুত কালীপদ মৈত্র গোপালগঞ্জের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তিনি দেখিলেন গবর্ণর বাহাদুরকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য

লোকের কোন সমারোহ হইবে না। তিনি ওড়াকান্দী ঠাকুর মহাশয়ের নিকট এক পত্র লিখিলেন। তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

Gopalgunge
The 17th July 1925

Dear Sir.

I have not heard from you as yet. Who is going to read the address? Please reply immediately. Please let me know also how many thousands of people you are bringing with you. The success of the reception will rest entirely with your efforts.

Yours Sincerely
(Sd.) K. Maitra
Subdivisional Magistrate.

এই পত্র পাইয়া গুরুচরণ ঠাকুর মহাশয় দশ সহস্রেরও অধিক লোক লইয়া গোপালগঞ্জ উপস্থিত হন এবং গবর্ণর বাহাদুরকে বিপুলভাবে সংবর্দ্ধনা করেন। এদিকে গোপালগঞ্জ বাজার হরতালের জন্য বন্ধ হইয়া গেল। নিকটস্থ হরিদাসপুরের বাজার হইতে আবশ্যক চাউল ডাল আমদানী হওয়ায় উপস্থিত লোকদিগের আহারের কোন কষ্ট হইল না। কালিপদ বাবু ঠাকুর মহাশয়ের এই সহায়তার জন্য তাঁহার নিকট বড়ই কৃতজ্ঞ ছিলেন।

ঠাকুর মহাশয় তেজস্বী, নির্ভীক, সমাজ এবং ধর্ম্ম সংস্কারক। তিনি তাঁহার পিতার প্রবর্ত্তিত সংস্কার কার্য্য চালাইতে জীবনে একদিনও অবসর গ্রহণ করেন নাই। শ্রীশ্রীহরি ঠাকুর বলিয়াছিলেন যে, বাংলার অনুন্নত জাতি সমূহ ঘোর তামসিকতায় আচ্ছন্ন এবং সর্ব্বাগ্রে তাহাদিগকে রাজসিক-

ভাবে উন্নীত করিতে না পারিলে তাঁহারা কখনও সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন হইতে পারিবে না। ঠাকুর মহাশয় এই বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া প্রথমে নমঃশূদ্র জাতিকে আত্মমর্য্যাদা শিক্ষা দিতে লাগিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি জাতির মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য রাশি রাশি অর্থ দান করিয়াছেন। বহু নমঃশূদ্রকে তিনি কৃষির সহিত নানাবিধ ব্যবসায় বাণিজ্য শিক্ষা দেন। পূর্ব্বে নমঃশূদ্রগণ গ্রাম ছাড়িয়া সহরে যাইতে ভীত হইত। তিনি উহাদিগকে সহরে যাইয়া অর্থোপার্জ্জনের পথ প্রদর্শন করেন। ইহার ফলে বহু নমঃশূদ্র ব্যবসায় ক্ষেত্রে প্রবেশ কবিয়া নানা প্রকারে ধনোপার্জ্জন করিতেছে। এজন্য অনেক নমঃশূদ্র আজকাল বেশ ধনবান হইতেছে এবং শিক্ষায় অগ্রসর হইতেছে।

পূর্ব্বে নমঃশূদ্র জাতিব মধ্যে শ্রাদ্ধ উপলক্ষে খুব বড রকমের খরচ হইত। ইহার ফলে অত্যল্পকাল মধ্যে তাহারা নিঃস্ব হইয়া যাইত। ঠাকুর মহাশয় দেখিলেন এই প্রকার প্রথা জাতির মধ্য হইতে দূব না করিতে পারিলে এজাতি কখনও অর্থের সদ্ব্যয় বুঝিতে পারিবে না এবং বিদ্যাশিক্ষায় মনোনিবেশ করিতে পারিবে না। তিনি বহু ক্লেশ স্বীকার করিয়া এই প্রথা দূর কবিতে সমর্থ হইয়াছেন। তিনি লোকদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছেন যে মৃতব্যক্তির আত্মার কল্যাণের জন্য অর্থ ঐ প্রকারে ব্যয় না কবিয়া জীবিত সন্তান সন্ততির শিক্ষার জন্য সুবন্দোবস্ত করিলে মানুষের অধিকতর কল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে। তিনি ঐ অর্থদ্বারা বহুস্থানে বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া জাতির অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন।

নমঃশূদ্র জাতি নানা প্রকার শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল ; একারণ জাতির মধ্যে কোন একতা ছিল না এবং সর্ব্বপ্রকার মহৎ কার্য্যে ইহাদের সমবেত চেষ্টার অভাব দৃষ্ট হইত। ঠাকুর মহাশয়ের চেষ্টায় ইহা অনেক পরিমাণে বিদূরীত হইয়াছে এবং তাঁহার নিজের অক্লান্ত চেষ্টায় বিভিন্ন শ্রেণীর নমঃশূদ্রদিগের মধ্যে পংক্তি ভোজন ও বিবাহাদি সামাজিক কার্য্য প্রচলিত

হইয়াছে। জমিদারের কর্ম্মচারিগণ হিংসার বশবর্ত্তী হইয়া নমঃশূদ্র প্রজাদিগের নামের সহিত অত্যন্ত কুৎসিত পদবি সংযুক্ত করিয়া দিত। ঠাকুর মহাশয় ইহার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন এবং স্বয়ং বহু নমঃশূদ্র পরিবারকে উচ্চ পদবি দ্বারা ভূষিত করেন। তিনি নমঃশূদ্র জাতির ব্রাহ্মণের শিক্ষার জন্য বহু চেষ্টা করেন এবং তাঁহার নিজ ব্যয়ে বহু নমঃশূদ্র জাতির ব্রাহ্মণ টোলে পড়িয়া নানা প্রকার সংস্কৃত উপাধি লাভ করিয়াছে। নমঃশূদ্রগণ অধিকারী নামক এক শ্রেণীব লোকের নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিত। এই অধিকারী গুরু হইতে সমাজে অনেক ব্যাভিচাব মূলক কার্য্য ধর্ম্মের নামে চলিত ; এই প্রথা দিন দিন সমাজকে কলুষিত করিতেছিল। ঠাকুর মহাশয় ইহা দমনকল্পে নিজহস্তে জুতা মারিয়া অনেক অধিকারী গুরুকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিয়াছেন। একমাত্র তাঁহার জন্যই এদেশ হইতে অধিকারী গুরুগিরি ব্যবসায় তিরোহিত হইয়াছে। এই সঙ্গে ভেকধাবী বহু বৈষ্ণব বৈষ্ণবী এই অঞ্চল ছাড়িয়া দূরদেশে প্রস্থান করিয়াছে। শ্রীশ্রীহরিঠাকুরের কথা ছিল বাউল ধর্ম্মের একেবারে উচ্ছেদ সাধন করিতে হইবে। ঠাকুর মহাশয় তাহা অক্ষবে অক্ষরে পালন কবিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে আর বাউল ধর্ম্ম নমঃশূদ্র জাতির মধ্যে নাই। সকল বাউল ধর্ম্মী এখন শ্রীশ্রীহরি ঠাকুরের ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া মধুর হরিনাম কীর্ত্তন করে।

গুরুচবণ ঠাকুর মহাশয় তাঁহার পিতাব ধর্ম্ম ও মত ব্যাপকভাবে প্রচার করিয়াছেন এবং তাঁহার ভক্ত সংখ্যা বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং দিন দিন এখনও পাইতেছে। তাঁহার প্রধান শিষ্য পরলোকগত দেবী চরণ মণ্ডল দক্ষিণ খুলনা এবং বরিশাল যাইয়া ঠাকুরের ধর্ম্ম প্রচার করেন এবং বহু নমঃশূদ্র ও ব্রাত্যক্ষত্রিয় ও বারুজীবি তাহা গ্রহণ করে। দক্ষিণ খুলনা অঞ্চলের গোপাল চন্দ্র সাধু হালদার ঠাকুরের পরম ভক্ত হিসাবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি এবং বরিশাল জিলার বিপিন চন্দ্র

গোস্বামী ঠাকুরের ধর্ম্ম বহু দূরদেশে প্রচার করিয়াছেন। রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী নামক বরিশালবাসী এক ব্রাহ্মণ ওড়াকান্দী আসিয়া ঠাকুরের নামে ও প্রেমে উন্মত্ত হন। তিনি উত্তরে মৈমনসিংহ, কাছাড়, কুচবিহার রংপুর, দিনাজপুর এবং পূর্ব্বে ত্রিপুরা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম এবং আগরতলায় যাইয়া ঠাকুরের নাম ও ধর্ম্ম প্রচার করেন এবং সহস্র সহস্র লোককে এই ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। তিলছাড়া গ্রামনিবাসী দেবীচরণ বিশ্বাস বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জিলায় প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। তালতলাবাসী বিচরণ বিশ্বাস অনেক খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে হরিনাম প্রচার করিয়া তাহাদিগকে ঠাকুরের ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছেন। যশোহরের কালিয়ানিবাসী রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ৺পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য যশোহর ও নদীয়া জেলায় ঠাকুরের নাম প্রচার করিয়াছেন। খাসিয়ালী নিবাসী ৺নবীন চন্দ্র বসু তাঁহার স্বজাতি কায়স্থগণের মধ্যে ঠাকুরের মাহাত্ম্য প্রচার করেন। খুলনার তেরখাদা নিবাসী মুসলমান তিনকড়ি হরিসাধক মুসলমানদিগের মধ্যে হরি নাম প্রচার করিয়াছেন।

প্রতি বৎসর চৈত্রমাসে মধুকৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথিতে মহাবারুণী স্নান দিবসে ওড়াকান্দী শ্রীশ্রীহরি ঠাকুরের জন্মোৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই সময়ে বাংলার বহু দূরবর্ত্তী স্থান হইতে তাঁহার লক্ষ লক্ষ ভক্ত তথায় সমবেত হইয়া অহর্নিশ হরি সংকীর্ত্তন করিয়া থাকে। এই উপলক্ষে একটী মেলা হয় এবং বহু লোকের সমাগম হইয়া থাকে। স্বেচ্ছাসেবকগণ মেলার এবং উৎসবের শৃঙ্খলা রক্ষা করে।

ঠাকুর মহাশয় তাঁহার পিতার স্মৃতি রক্ষার্থ নিজ বাটীতে একটী হরি-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন। প্রত্যহ সকালে এবং সন্ধ্যায় উহাতে শ্রীশ্রীহরি ঠাকুরের অর্চ্চনা হয় এবং রাত্রিতে হরি সংকীর্ত্তন হইয়া থাকে। বাংলা ১৩৩৯ সালে আশ্বিন মাসে লক্ষ লক্ষ ভক্তদিগকে একতাসূত্রে বন্ধন

করিবার অভিলাষে ঠাকুর মহাশয় "শ্রীশ্রীহরি গুরুচাঁদ মিশন" নামে একটী মিশন স্থাপন করেন। এই মিশন বাংলার অনুন্নত জাতি সমূহের অশেষ উপকার সাধন করিতেছে। কয়েক স্থানে ইহার শাখা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে ইহা ভক্তগণের চাঁদার দ্বারাই পবিচালিত হইতেছে। এই মিশন হইতে একটী মধ্য ইংরেজী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। উহা ঠাকুর মহাশয়ের মাতা শান্তি দেবী এবং সহধর্ম্মিণী সত্যভামা দেবীর নামানুসারে "দেবী শান্তি সত্যভামা মধ্য ইংরেজী বালিকা শিক্ষালয়" নাম রাখা হইয়াছে। উহাতে বর্ত্তমানে প্রায় দেড়শত ছাত্রী পাঠাভ্যাস কবিতেছে। উচ্চবর্ণের হিন্দুগণ অনুন্নত জাতিকে অস্পৃশ্য মনে করিয়া তাহাদের প্রতিষ্ঠিত দেব মন্দিরে তাহাদিগকে প্রবেশ করিতে দেয় না। এইজন্য এই মিশন হইতে অনুন্নতদের নিজস্ব মন্দির স্থাপনের ব্যবস্থা করা হইতেছে এবং কয়েক স্থানে কয়েকটী মন্দিরও স্থাপিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীহরি ঠাকুরের নাম ও ধর্ম্ম প্রচারার্থ এই মিশন হইতে ওড়াকান্দী হাইস্কুলে ১০০০৲ টাকা দান করা হইয়াছে। ঐ টাকার সুদ হইতে প্রতি বৎসর প্রতি শ্রেণীতে একটী করিয়া বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যে সকল ছাত্র কবিরসরাজ তারক চন্দ্র প্রণীত "শ্রীশ্রীহবি লীলামৃত গ্রন্থের" পরীক্ষায় প্রতিযোগীতা করিয়া প্রতি শ্রেণীতে প্রথম হইতে পারিবে. তাহারাই ঐ বৃত্তি লাভ করিবে।

বিগত ১৩৪১ সালের মাঘ মাসে মহাত্মা গান্ধি যখন হরিজন উন্নয়নকল্পে বাংলায় আগমন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন তখন তাঁহার ভ্রমণ তালিকায় ওড়াকান্দী ভুক্ত হইয়াছিল। কিছুদিন পূর্ব্বে মহাত্মার সেক্রেটারী প্যারী-লালজি ওড়াকান্দী ভ্রমণ করিতে আসিয়া শ্রীশ্রীহরি গুরু চাঁদ মিশন পরিদর্শন করিয়া গিয়াছেন এবং উহার উদ্দেশ্য ও কার্য্যাবলী দেখিয়া উহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধি পুনরায় বাংলা দেশে আগমন করিলে অবশ্য একবার ওড়াকান্দী পরিদর্শন করিতে আসিবেন এইরূপ স্থির হইয়াছে।

গুরুচরণ ঠাকুর মহাশয় মহাধনবান হইলেও সংসারে একেবারে নির্লিপ্ত। তিনি অতি সাধরণভাবে জীবন যাপন করেন। সাহায্য-প্রার্থী হইয়া কেহ তাঁহার দ্বারে উপনীত হইলে তিনি জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে তাহাকে সাহায্য করিয়া থাকেন। সাংসারিক জীবনে ভগবান তাঁহাকে বিশেষ সুখী করেন নাই। জীবদ্দশায়ই তাহার চারিপুত্রের, একটী কন্যাব এবং এক মাত্র ভ্রাতা উমাচরণ ঠাকুরের মৃত্যু হয়। তিনি অতিশয় ধৈর্য্যের সহিত এই সকল শোক সংবরণ করিয়াছেন। গত কয়েক বৎসর তিনি বার্দ্ধক্যহেতু দৃষ্টিশক্তি হারাইয়াছেন। তাঁহার প্রিয়ভক্ত নেপাল চন্দ্র, নবকুমার, দীনবন্ধু ও শ্রীনাথ অনুক্ষণ তাঁহার সেবায় রত থাকেন। সাধারণ লোকে হয়ত শুনিলে বিশ্বাস করিবে না যে ঠাকুর মহাশয় খুব অল্প নিদ্রা যাইয়া থাকেন। তাঁহার মতে নিদ্রা খুব কম করিলে সুস্থ ও দীর্ঘ জীবন লাভ হয়। তিনি তাঁহার পিতার ন্যায় সর্ব্ব ধর্ম্মানুষ্ঠানের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্য ব্রতানুষ্ঠানই শ্রেষ্ঠ মনে করেন। তিনি বাক্‌সিদ্ধ পুরুষ। প্রত্যহ বহুরোগগ্রস্ত লোক ঠাকুর বাটীতে আসিয়া তাঁহার বাক্য লাভ করিয়া রোগ মুক্ত হইতেছে। হিন্দুর যাবতীয় ধর্ম্মানুষ্ঠান ও পূজা পার্ব্বণ তাঁহার গৃহে মহাসমারোহে সম্পন্ন হয় এবং প্রতি উৎসবে ঠাকুর বাটীতে বহু ভক্ত ও লোকের সমাগম হইয়া থাকে। গত ১৩৩৯ সালের মাঘ মাসে তাঁহাব সহধর্ম্মিণী সাধ্বী সতী সত্যভামা দেবী স্বর্গারোহণ করেন। বর্ত্তমানে তিনি প্রায় সর্ব্বদাই ভক্তগণ পরিবৃত হইয়া কাল কাটাইতেছেন।

ঠাকুর বাটীর সংলগ্ন স্থানে একটী বৃহৎ পুষ্করিণী খনন করা হইয়াছে। বহু ভক্ত ঐ জলাশয়ের পবিত্র সলিলে স্নান করিয়া তাহাদের অনেক মনষ্কাম পূর্ণ করিতেছে বলিয়া উহার নাম "কামনা সাগর" হইয়াছে। উহার নিকটেই আর একটী দীঘি খনন করা হইয়াছে। বারুণী স্নান দিবসে ভক্তগণ উহার জলে অবগাহন করিয়া থাকে। প্রতি গঙ্গা

স্নানের সময় বহু যাত্রী সমবেত হইয়া এই দুই জলাশয়ে স্নান করিয়া ত্রিতাপে তাপিত দেহ শীতল করে। শেষোক্ত জলাশয়টী ঠাকুর মহাশয়ের মাতৃদেবীর নামে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে বলিয়া উহাকে "শান্তি সাগর" কহে।

স্বর্গীয় শশিভূষণ ঠাকুর

গুরুচরণ ঠাকুর মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শশিভূষণ ঠাকুর বাংলা ১২৭৫ সালে ভাদ্রমাসে ওড়াকান্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে তাঁহার স্বাস্থ্য বিশেষ ভাল ছিল না এবং তিনি বড়ই নিরীহ প্রকৃতির বালক ছিলেন। গ্রাম্য পাঠশালায় অধ্যয়ন শেষ করিয়া তিনি যশোহর জিলার অন্তর্গত জয়পুর নামক গ্রামে থাকিয়া লোহাগড়া স্কুলে পাঠাভ্যাস করেন। তিনি বাল্যকাল হইতেই লেখাপড়ায় অত্যন্ত অনুরাগ প্রদর্শন করেন এবং খুব মেধাবী ছাত্র বলিয়া শিক্ষকদিগের অত্যন্ত প্রিয় পাত্র হইয়াছিলেন।

তিনি কলিকাতার বিডন উদ্যানের পশ্চিম পার্শ্বস্থ চিৎপুর রোড়ের সুপ্রসিদ্ধ চাঁদসীর ডাক্তার শ্রীযুত প্রসন্ন কুমার দাশ ধম্বন্তরী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা অনঙ্গ মোহিনী দেবীকে বিবাহ করেন। তখন তাঁহাব বয়স মাত্র ১৭ বৎসর। বিবাহের পর তিনি কলিকাতার কটন স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উর্ত্তীর্ণ হন। পরে কিছুদিন ঢাকায় থাকিয়া জগন্নাথ কলেজে অধ্যয়ন করেন। এই সময়ে তাহার তৃতীয় ভ্রাতা উপেন্দ্র নাথের মৃত্যু হওয়ায় তিনি ঢাকা ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় মেট্রোপলিটান কলেজে কিছুদিন অধ্যয়ন করেন। পরে তিনি জেনারেল এসেমব্লী ইনষ্টিটিউসনে ভর্ত্তি হইয়াছিলেন। কলেজের অধ্যক্ষ মরিসন সাহেব তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন।

সাংসারিক অনেক দুর্ঘটনায় ও শারীরিক অসুস্থতার জন্য তিনি আর বেশী দিন কলিকাতায় থাকিয়া কলেজে অধ্যয়ন করিতে পারেন নাই।

তিনি নিজগ্রামে আসিয়া মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। তিনিই সর্ব্ব প্রথমে ফরিদপুরের এই দক্ষিণ অঞ্চল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি এই দেশের নমঃশূদ্রদিগকে প্রথম ইংরেজী শিক্ষা দেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার ভূতপূর্ব্ব সদস্য, লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবহারাজীব শ্রীযুত ভীষ্মদেব দাশ মহাশয় তাঁহারই নিকট হইতে প্রথম ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করেন. কয়েক বৎসর পরে তিনি পুনরায় কলিকাতা যাইয়া কটন স্কুলে শিক্ষকতার কার্য্য করেন। এই সময়ে হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি পরলোকগত সারদা চরণ মিত্রের সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় হয়। তিনি শশিভূষণ ঠাকুর মহাশয়কে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। সাধারণ-ব্রাহ্ম সমাজের ৺পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ও ৺নগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁহার অত্যন্ত নিকট বন্ধু ছিলেন। সমাজ সংস্কার বিষয়ে তিনি ইঁহাদের নিকট হইতে উৎসাহ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সহিত মিশিয়া তিনি ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করিতেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি তিনি এতদূর অনুরাগী হইয়াছিলেন যে, ঐ সময়ে তিনি ঐ ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবেন বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। তিনি বেদান্ত-দর্শনে বিশেষ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন এবং বাঙ্গালা ও ইংরাজী ভাষায় প্রবন্ধাদি লিখিতেন। তিনি থিওসফিকেল্ সোসাইটীতে যোগদান করিয়াছিলেন এবং বন্ধুদের সহিত পরলোকতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিতে বড় ভালবাসিতেন।

অতঃপর নানা কারণে তাঁহাকে কলিকাতা ছাড়িয়া নিজ গ্রামে আসিতে হয়। এই সময়ে নমঃশূদ্র জাতি কোন গবর্ণমেণ্টের চাকুরী পাইত না। ডাঃ মিডের সহায়তায় পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের তদানীন্তন ছোটলাটকে যে অভিনন্দন প্রদত্ত হয়, তাহারই ফলে তিনি নমঃশূদ্র জাতির মধ্য হইতে সর্ব্ব প্রথম সবরেজিষ্ট্রারী চাকুরী প্রাপ্ত হন।

ইংরেজী ১৯০৫ সালে যখন স্বদেশী আন্দোলন ঘোরতররূপে দেশব্যাপী ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল, তখন ফরিদপুর নিবাসী, ভূতপূর্ব্ব কংগ্রেস সভাপতি ৺অম্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয় ওড়াকান্দীর দক্ষিণে ঘৃতকান্দি আসিয়া এক বিবাট জনসভা করেন। তাহার ফলে নমঃশূদ্রগণ পতাকা হস্তে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি করিতে করিতে ওড়াকান্দী ঠাকুর বাটীতে আগমন করে। তখন তথায় এক বিরাট জনসভার অধিবেশন হয়। উহার আলোচ্য বিষয় ছিল নমঃশূদ্র জাতির স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করা কর্ত্তব্য কি না। অনেক নমঃশূদ্র নেতা এই আন্দোলনে যোগদান করা কর্ত্তব্য বলিয়া দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন ; কিন্তু তখন একমাত্র শশিভূষণ ঠাকুর মহাশয়ের মনে জাগরিত হইল যে ঐ আন্দোলনের সহিত নমঃশূদ্র জাতির কোন প্রকার সংস্রব রাখা কর্ত্তব্য নহে। তাহার কারণ নমঃশূদ্র জাতি শিক্ষায় এবং আর্থিক উন্নতিতে এতদূর পশ্চাৎপদ ছিল যে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা তাহাদিগকে অত্যন্ত ঘৃণাব চক্ষে দেখিত। এই প্রকার ঘৃণিত জাতি তাঁহাদিগেব সহিত সহযোগিতা করিয়া এই আন্দোলনে যোগদান করিতে পারে না, তাহা বুঝাইয়া তিনি এক বক্তৃতা করেন এবং সকল নমঃশূদ্র তাঁহাদের পূর্ব্বসিদ্ধান্ত ত্যাগ কবিতে বাধ্য হয়। এই সময় হইতেই নমঃশূদ্রগণ সর্ব্ব প্রকার স্বদেশী আন্দোলন হইতে নিজেদের দূরে রাখিয়াছে এবং ১৯২০ সালের অসহযোগ আন্দোলনেও এই জাতি যোগদান করে নাই। ইহার ফলে নমঃশূদ্রগণ রাজনৈতিক অধিকার ক্রমশঃ লাভ করিয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান যুগে অনুন্নত হিন্দুগণ যে বুঝিতে পারিয়াছে যে তাহাদেব জন্য ব্যবস্থাপক সভায় পৃথক্ নির্ব্বাচন আবশ্যক তাহাও শশিভূষণ ঠাকুর মহাশয়ের স্বদেশী আন্দোলনের বিরুদ্ধতার ফল।

ইংরেজী ১৯০৭ সালে সবরেজিষ্ট্রারের পদ লাভ করিয়া তিনি মাত্র ১০ বৎসর কাল চাকুরী করিতে পারিয়াছিলেন। ঐ সময়ে তিনি ফরিদপুর গোয়ালন্দ, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, বরিশাল জিলার তজুমদ্দিন

থানা এবং ফরিদপুরের কাশিয়ানী ও গোপালগঞ্জ নামক স্থানে কার্য্য করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট পদে নিযুক্ত হন। অতঃপর ১৯১৮ সালে খুলনা জিলার রামপাল নামক স্থানে বদলি হইয়া তিনি তথায় পীড়িত হইয়া পড়েন এবং অবকাশ লইয়া বাটীতে আসিয়া এক বৎসর ভুগিয়া ঐ বৎসরই ডিসেম্বর মাসে ৫১ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ইহলোক ত্যাগ করেন।

সমাজ সংস্কার কার্য্যে শশিভূষণ ঠাকুব মহাশয় তাঁহার পিতাকে অনেক সহায়তা করিয়াছিলেন। তিনি স্বজাতিবৎসল ছিলেন। তাঁহার বিনয় এবং অমায়িকতা অদ্যাপি তাঁহাব বন্ধুগণ ভুলিতে পারেন নাই। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে দেশের সকলে গভীর শোক প্রকাশ করিয়াছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি দুই পুত্র—প্রমথ রঞ্জন ও মন্মথ রঞ্জন এবং ছয় কন্যা সুশীলা, প্রমীলা, ক্ষীরোদা, প্রমদা, সুখদা ও সন্তোষিণীকে রাখিয়া যান। প্রথমা কন্যা সুশীলা বালার পাটগাতীর ধনী মণ্ডল পরিবারের ৺ রাজেন্দ্র নাথ মণ্ডলের সহিত বিবাহ হয়। গোপিনাথপুরের স্বনামধন্য পূর্ণচন্দ্র মল্লিক মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুত রাধিকা প্রসন্ন মল্লিক দ্বিতীয়া কন্যা প্রমীলা বালাকে বিবাহ করেন। বড়বাড়িয়া গ্রাম নিবাসী ধনাঢ্য ব্যবসয়ী ৺ রামচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুত যতীন্দ্র নাথ বিশ্বাস তৃতীয়া কন্যা ক্ষীরোদা বালার পাণিগ্রহণ করেন। থালিয়া নিবাসী শ্রীযুত ক্ষীরোদমোহন বলের সহিত চতুর্থা কন্যা প্রমদা বালার বিবাহ হয়। পাবনা নিবাসী পুলিশ সব-ইন্সপেক্টর ৺ভুবন মোহন সরকার পঞ্চমা কন্যা সুখদা বালাকে বিবাহ করেন। দত্তডাঙ্গা নিবাসী ধনাঢ্য শ্রীযুক্ত ভবানীশঙ্কর গাইন সর্ব্ব কনিষ্ঠা সন্তোষিণীকে বিবাহ কবেন।

শ্রীপ্রমথরঞ্জন ঠাকুর।

শশিভূষণ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রমথরঞ্জন ঠাকুর বাংলা ১৩০৯ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে ৩১শে তারিখে ওড়াকান্দী জন্মগ্রহণ করেন। তিনি

বাল্যকালে গ্রাম্য বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস করেন; কিন্তু লেখা পড়ায় তাঁহার তাদৃশ মনোযোগ ছিল না। বিদ্যালয়ে না যাইয়া তিনি রাখালদের সহিত মাঠে গরু চরাইতে ভালবাসিতেন। বিদ্যাশিক্ষার প্রতি তাঁহার এই প্রকার অমনোযোগ দেখিয়া তাঁহার পিতা তাঁহাকে তাঁহার কার্য্যস্থল কাশিয়ানী লইয়া যান এবং তথায় স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেন। পরে তাঁহার পিতার সহিত গোপালগঞ্জ যাইযা তথাকার মিশন স্কুলে ৭বৎসর অধ্যয়ন করেন। পিতা রামপাল নামক স্থানে বদলি হইলে তিনি একবৎসর কলিকাতার স্কটিশ চার্চ্চ কলেজিয়েট স্কুলে পাঠাভ্যাস করেন। ১৯১৮ সালে তাঁহার পিতার মৃত্যুব পর তিনি নিজ গ্রামেব হাইস্কুলে পড়িয়া ১৯২০ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। তিনি কলিকাতা সেণ্ট পলস্ কলেজ হইতে ১৯২২ সালে প্রথম বিভাগে আই এ, ও ১৯২৪ সালে বি, এ, পাশ কবেন। অতঃপব ১৯২৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয হইতে এম্, এ, পাশ করিয়া সেই বৎসরই সেপ্টেম্বর মাসে ব্যারিষ্টারী পড়িতে ইংলণ্ড যাত্রা করেন। (তিনি লিন্-কন্স ঈনের) (Lincoln's Inn) মেম্বর হইয়া ১৯২৯ সালের ১২ই জুন ব্যারিষ্টার হন। তিনিই নমঃশূদ্র জাতির মধ্যে সর্ব্বপ্রথম ব্যারিষ্টার এবং ঐ জাতির মধ্য হইতে তিনি, তাঁহার খুল্লতাত ভ্রাতা ভগবতী প্রসন্ন ঠাকুর এবং অমূল্য কৃষ্ণ দাশ সর্ব্বাগ্রে উচ্চ শিক্ষার্থ বিলাত যাত্রা করেন। শ্রীযুত ঠাকুর ইংলণ্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, জার্ম্মানি, সুইজারল্যাণ্ড, ইতালী, অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, জেকোশ্লোভাকিয়া, গ্রীস, তুর্কী, সিরিয়া, প্যালেষ্টাইন, ও মিশর দেশ ভ্রমণ করিয়া ঐ সকল দেশের রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করেন এবং ঐসকল বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করেন। পঠদ্দশায় তাঁহার ন্যায় খুব অল্প লোকই এইরূপ বিস্তৃত ভ্রমণ করিয়াছেন।

১৯৩০ সালের ১০ই নভেম্বর তিনি ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং

কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করেন। বিলাত হইতে আগমনের পর বহুস্থানে লোকে তাঁহাকে অভিনন্দিত করেন এবং অনেক স্থানে জনসভায় তিনি সভাপতিরূপে আহূত হন। ১৯৩২ সালের আগষ্ট মাসে যখন সম্রাটের প্রধান মন্ত্রী মিঃ রামজে ম্যাকৃডোনাল্ডের সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা প্রকাশিত হয় এবং উহাতে বাংলার অনুন্নত জাতির জন্য ব্যবস্থাপক সভায় মাত্র ১০টী আসন সংরক্ষিত হয়, তখন শ্রীযুত ঠাকুর তাহার বিরুদ্ধে ঘোর আন্দোলন করেন। এই সম্পর্কে হাওড়া নিখিল বঙ্গ অনুন্নত জাতি সমূহের যে সম্মেলন হইয়াছিল, তিনি তাহার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ঐ সময়ে তিনি অন্যান্য অনুন্নত সমাজ নেতাদের সহিত মিলিত হইয়া নিখিল বঙ্গ অনুন্নত জাতি সঙ্ঘ (All Bengal Depressed Classes Federation) স্থাপন করেন। পরলোকগত রায় বাহাদুর রেবতীমোহন সরকার উহার সভাপতি এবং শ্রীযুত ঠাকুর উহার সহঃ সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

১৯৩২ সালের শেষভাগে মহাত্মা গান্ধি ভারতীয় অনুন্নতদের ব্যবস্থাপক সভায় পৃথক নির্ব্বাচনের প্রতিবাদ করিয়া অনশন ব্রত অবলম্বন করিলে বর্ণহিন্দু নেতাদিগের এবং অনুন্নত সমাজনেতা ডাঃ আম্বেদকরের মধ্যে পুণায় এক চুক্তি হয়। তাহাতে বাংলার অনুন্নত জাতি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় ৩০টী আসন পাইবে স্থির হয়। এই পুণা চুক্তির বিরুদ্ধে বাংলার কতিপয় বর্ণহিন্দু দেশময় ঘোরতর আন্দোলনের সৃষ্টি করিলে শ্রীযুত ঠাকুর ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া ষ্টেটস্‌ম্যান এবং অমৃতবাজার পত্রিকায় অনেক বিবৃতি প্রদান করেন। খুলনা জিলার লক্ষ্মীখালি নামক স্থানে ইহার প্রতিবাদকল্পে এক বিরাট জনসভা আহূত হয়। শ্রীযুত ঠাকুর ইহার সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। উহাতে পুণাচুক্তি সমর্থন করিয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯৩৩ সালের জুলাই

মাসে তিনি ফরিদপুর অনুন্নত জাতির সম্মেলনে সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। ঐ সম্মেলনেও পুণাচুক্তি সমর্থিত হয়। পরে ঐ মাসের শেষভাগে বাংলার গবর্ণর স্যার জন এণ্ডারসন্ যখন ফরিদপুর গমন করেন, তখন শ্রীযুত ঠাকুরের নেতৃত্বে তাঁহার নিকট ডেপুটেসন্ পাঠান হয়। ১৯৩৪ সালে জানুয়ারী মাসে তিনি কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট হাউসে পুনরায় স্যার জন এণ্ডারসনের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং বাংলার অনুন্নত সমাজের রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কে বহুবিষয় তাঁহার সহিত আলোচনা করেন।

শ্রীযুত ঠাকুর বরিশাল জিলার অন্তর্গত স্বরূপকাঠি নিবাসী স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র সাধক মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুত অশ্বিনীকুমার সাধক মহাশয়ের তৃতীয়া কন্যা রূপগুণ সম্পন্না শ্রীমতী অরুণিমা দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। এই বিবাহ ১৩৪১ সালের ৬ই আশ্বিন বিনা আড়ম্বরে সম্পন্ন হয়।

১৯৩৫ সালের অক্টোবর মাসে নাসিক অনুন্নত সম্মেলনে ডাঃ আম্বেদকর বর্ণহিন্দুদিগের উৎপীড়নে ধর্ম্মান্তর গ্রহণের সংকল্প করিলে শ্রীযুত ঠাকুর সংবাদপত্র সমূহে যে বিবৃতি দিয়াছিলেন তাহা হইতে সমাজ সংস্কার বিষয়ে তাঁহার তেজস্বিতা এবং নির্ভীকতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি নিখিলবঙ্গ নমঃশূদ্র সমিতির সভাপতি এবং তাঁহার পিতামহ প্রতিষ্ঠিত "শ্রীশ্রীহরিগুরুচাঁদমিশনের" প্রেসিডেণ্ট। তিনি সুবক্তা এবং বাংলার অনুন্নত সমাজের অন্যতম নেতা। তিনি বংশের ভবিষ্যত "ঠাকুর"। (Heir-apperent to the "Thakur gadhi.") *

* এই বংশের উপকরণসমূহ সরবরাহ করিয়া শ্রীযুতপ্রমথ রঞ্জন ঠাকুর মহাশয় আমাদিগকে উপকৃত করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম।

শ্রীমন্মথরঞ্জন ঠাকুর

শশিভূষণ ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র মন্মথরঞ্জন ঠাকুর বাংলা ১৩১২ সালের ২১শে কার্ত্তিক জন্মগ্রহণ করেন। ওড়াকান্দীর স্কুল হইতে তিনি ১৯২৩ সালে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি কলিকাতার সিটী কলেজ হইতে ১৯২৫ সালে আই, এস, সি, ও স্কটীশ চার্চ্চ কলেজ হইতে ১৯২৭ সালে বি, এ, এবং বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ১৯৩০ সালে বি, এল, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। স্কুল কলেজে পাঠ্যাবস্থায় তিনি খুব ভাল ফুটবল খেলোয়াড় ছিলেন। ১৯২৯ সালে ঢাকা নগরীতে যে জনসঙ্ঘের বিরাট সভা হইয়াছিল তিনি তাহাতে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। তিনি অসবর্ণ বিবাহেব পক্ষপাতী। তাঁহার অভিমত এই যে যতদিন ভারতে হিন্দু সমাজে ব্যাপকভাবে অসবর্ণ বিবাহ প্রথা প্রচলিত না হইবে ততদিন সমাজে অস্পৃশ্যতা দোষ থাকিবেই। তিনি ১৯৩২ সালে কলিকাতার শ্যামবাজারের কায়স্থ বংশীয় ৺কালীচরণ সেন মহাশয়েব জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুত কৃষ্ণলাল সেন মহাশয়েব প্রথমা কন্যা শ্রীমতী রেণুকা দেবীর পাণি গ্রহণ করেন। নমঃশূদ্র সমাজে মন্মথরঞ্জন ঠাকুরই সর্ব্ব প্রথম অসবর্ণ বিবাহ করেন। বরিশালে কিছুদিন ওকালতি করিয়া তিনি এখন খুলনা জজ কোর্টের উদীয়মান ব্যবহারাজীব। আইন শাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি। তাঁহার প্রথম পুত্র প্রবীররঞ্জন অল্পবয়সেই কালগ্রাসে পতিত হয়। কনিষ্ঠ শ্রীমান্ মানস রঞ্জন বর্ত্তমানে মাতৃক্রোড়ে স্নেহে বর্দ্ধিত হইতেছে।

স্বর্গীয় সুধন্য কুমার ঠাকুর

গুরুচরণ ঠাকুরের দ্বিতীয় পুত্র সুধন্যকুমার ঠাকুর বাংলা ১২৭৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ওড়াকন্দীর বাংলা স্কুল হইতে ছাত্রবৃত্তি পাশ করিয়া কলিকাতার কটন স্কুলে কিছুদিন অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

তিনি ফরিদপুব জিলার পাটগাতী গ্রামের সম্ভ্রান্ত ধনী· মণ্ডল বংশের দ্বারকা নাথ·মণ্ডল মহাশয়ের কন্যা সরলা দেবীকে বিবাহ করেন। তিনি অল্প বয়স হইতেই সাংসারিক কার্য্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহার পিতাকে অনেক সহায়তা করেন। দরিদ্র কৃষকদিগকে সাহায্য করিবার মানসে তিনি নিজ গ্রামে "গ্রাম্য মহাজনী সভা" নামক একটী ব্যাঙ্ক স্থাপন করেন। তিনি তাঁহার পিতামহ শ্রীশ্রীহরি ঠাকুরেব নৈষ্ঠিক ভক্ত ছিলেন এবং তাহার লীলা বিষয়ক "শ্রীশ্রীহরি চরিতামৃত", "শ্রীশ্রীহরি সংকীর্ত্তন", "পূর্ব্ব স্মৃতি," "সদ্বাক্য সংগ্রহ" প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তিনি সুগায়ক ছিলেন এবং সঙ্গীত শাস্ত্রের চর্চ্চা করিতেন। যৌবনে তিনি তাঁহার অসীম শারীবিক শক্তির জন্য সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি অত্যন্ত বিনয়ী ছিলেন এবং ছোট বড় কেহই তাঁহাকে দেখিলে অগ্রে নমস্কার করিতে পারিত না। বাংলা ১৩৩৪ সালে তাঁহার সহধর্ম্মিনী সরলা দেবীর মৃত্যু হয়। উহার ঠিক ৬মাস পরে ১৩৩৫ সালে আষাঢ় মাসে রথ যাত্রা দিবসে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁহার দুই পুত্র— ভগবতী প্রসন্ন ও শ্রীপতি প্রসন্ন এবং একমাত্র কন্যা নলিনী দেবী। মুন্‌সেফ্ শ্রীযুত অতুল বিহারী মল্লিক এম্, এ, বি, এল, নলিনী দেবীকে বিবাহ করেন। তিনি বর্ত্তমানে চট্টগ্রামের মুন্‌সেফ্।

শ্রীভগবতীপ্রসন্ন ঠাকুর

সুধন্যকুমার ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র ভগবতীপ্রসন্ন ঠাকুর বাংলা ১৩০৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ওড়াকান্দী হাই স্কুল হইতে ১৯১৫ সালে প্রবেশিকা, কলিকাতার সেণ্ট পল্‌স্ কলেজ হইতে ১৯১৭ এবং ১৯২০ সালে যথাক্রমে আই, এ, এবং বি, এ, পরীক্ষায় এবং বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ১৯২২ সালে এম্, এ, পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হন। তিনি নিখিল বঙ্গ নমঃশূদ্র ছাত্র সমিতির সম্পাদক ছিলেন এবং দুর্ভিক্ষের জন্য ওড়াকান্দী

এবং তন্নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহে প্রপীড়িতদিগের সাহায্যার্থে যে রিলিফ্ সোসাইটী স্থাপিত হইয়াছিল তিনি তাঁহার প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। ১৯২৪ সালে লর্ড লিটন গোপালগঞ্জ আগমন করিলে স্থানীয় নমঃশূদ্র সমিতি হইতে যে অভিনন্দন তাঁহাকে প্রদান করা হইয়াছিল, তিনি তাঁহার মুখপাত্র ছিলেন। তিনি ১৯২৬ সালে ব্যারিষ্টারী অধ্যয়ন করিতে বিলাত যাত্রা করেন। তথায় থাকিতেই তাঁহার পিতামাতা উভয়ের মৃত্যু হয়। তিনি নানা প্রকার মনোদুঃখে আর স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। তিনি লণ্ডনে চাকুরী করিয়া জীবিকার্জ্জন করিতেছেন। তিনি অবিবাহিত।

শ্রীশ্রীপতি প্রসন্ন ঠাকুর

সুধন্য কুমার ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীপতি প্রসন্ন ঠাকুর বাংলা ১৩০৬ সালে মাঘ মাসে জন্মগ্রহণ করেন। গ্রাম্য স্কুলে পাঠ সমাপ্ত করিয়া তিনি কলিকাতার ব্রাহ্ম বালক বিদ্যালয় হইতে ১৯২৩ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কিছুদিন স্কটীশ চার্চ্চ কলেজে অধ্যয়ন করিয়া তিনি কাকুড়গাছি ন্যাশন্যাল মেডিকেল ইনষ্টিটিউসনে ডাক্তারী পড়েন। এই সময়ে তাঁহার পিতামাতার মৃত্যু হওয়ায় তিনি অধ্যয়ন ত্যাগ করিয়া সংসার কার্য্যে প্রবেশ করেন। তিনি নিজগ্রামে থাকিয়া দেশ ও দশের হিতকর কয়েকটী অনুষ্ঠানে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। তিনি বলুগ্রাম তেঁতুলিয়া খাল সংস্কার সমিতির প্রেসিডেণ্ট থাকিয়া ফরিদপুর জিলার দক্ষিণ অঞ্চলের জলে ডোবা বিল জমির জল নিকাশের ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং কচুরীপানা ধ্বংস করিতে দেশবাসীকে প্রভূত সহায়তা করিয়াছেন।

বাংলা ১৩৩৬ সালে তিনি নিজগ্রামবাসী শ্রীযুত যোগেশ চন্দ্র বিশ্বাসের কন্যা মঞ্জুলিকা দেবীকে বিবাহ করেন। এই বিবাহে তাঁহার বর্ত্তমানে দুইটী সন্তান শ্রীমান্ অংশুপতি ও শ্রীমান্ মিহির কুমার।

শ্রীপতি প্রসন্ন ঠাকুর ওড়াকান্দী বারুণী স্নান সমিতির সভাপতি এবং শ্রীশ্রীহরি গুরুচাঁদ মিশনের জেনারেল সেক্রেটারী। তিনি কিছুকালের জন্য ওড়াকান্দী স্কুলের সম্পাদক পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ঐ সময়ে স্কুলেব হিসাব নিকাশ সম্বন্ধে অনেক গোলমাল ছিল। তিনি তাহা দূর করেন এবং ঐ সময় হইতে স্কুলেব আর্থিক উন্নতি হইতে থাকে। তিনি ঘৃতকান্দির গিরিশ দাতব্য চিকিৎসালয়ের অন্যতম সভ্য এবং সম্প্রতি লোকাল বোর্ডের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তিনি শ্রীশ্রীহরি গুরুচাঁদ মিশন পরিচালিত দেবী শান্তি সত্যভামা বালিকা শিক্ষালয়ের প্রতিষ্ঠাতা এবং বর্ত্তমানে উহাব সম্পাদক। স্ত্রীশিক্ষায় তাঁহার অত্যন্ত উৎসাহ। তাঁহার চেষ্টায় সম্প্রতি নারীজাতির কল্যাণার্থ একটী সম্মেলনের অধিবেশন হয়। তাহারই উদ্যমে পরলোকগত সম্রাটের রজত জুবিলী উপলক্ষে ওড়াকান্দী গ্রামবাসী মহোৎসবের আয়োজন করিয়াছিল। ওড়াকান্দীতে যখন মহাত্মা গান্ধি আসিবেন বলিয়া স্থির হয় তখন তাঁহার চেষ্টায় গ্রামে অনেক রাস্তা নির্ম্মিত হয়। মহাত্মার আগমন উপলক্ষে যে অভ্যর্থনা সমিতিব কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হয়, তিনি তাহার সভাপতি ছিলেন। তিনি বড় সংসারের কার্য্য পরিচালনে রত থাকিলেও সর্ব্বদা পরিহিত ব্রতে ব্রতী। দরিদ্র দেশবাসীর কিসে মঙ্গল সাধিত হয় সর্ব্বদা তিনি তাহা চিন্তা করিয়া থাকেন। গোপালগঞ্জের প্রত্যেক মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট প্রতি-জন হিতকর কার্য্যে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করেন।

স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ ও স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর

গুরুচরণ ঠাকুরের তৃতীয় পুত্র উপেন্দ্র নাথ ঠাকুর ঢাকায় পাঠদ্দশায় ইহলোক ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ১৬ বৎসর হইয়াছিল। তিনি অত্যন্ত রূপবান ও সুগায়ক ছিলেন। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে তাঁহার পিতামাতা শোকে অত্যন্ত অধীর হইয়াছিলেন।

সর্ব্বকনিষ্ঠ সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা ১২৯৫ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ওড়াকান্দী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় হইতে ১৯১২ সালে সর্ব্ব প্রথমে ম্যাট্রিকুলেসন্ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। তিনি প্রথমে নড়াইলের উকীল শ্রীযুক্ত শ্যামলাল বিশ্বাসের ভগ্নী মনোরমা দেবীকে বিবাহ করেন। অল্পকাল মধ্যে পত্নী বিয়োগ হওয়ায় তিনি ইংরেজী ১৯১৩ সালে পরাণপুর নিবাসী ৬রসিক লাল বিশ্বাসের দ্বিতীয়া কন্যা সুবালা দেবীকে বিবাহ করেন। বিবাহের মাত্র ২১ দিন পরে সুরেন্দ্র নাথের মৃত্যু হয়। কনিষ্ঠ পুত্রের এতাদৃশ শোচনীয় মৃত্যুতে তাঁহার বৃদ্ধ পিতামাতা অত্যন্ত শোকাকুল হইয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ অত্যন্ত প্রিয়দর্শন ও অমায়িক লোক ছিলেন। তিনি "নমঃশূদ্র সুহৃদ" পত্রিকার কর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন এবং ঐ অল্প বয়সেই সুলেখক হইয়াছিলেন। তাঁহাব চেষ্টায় অত্যল্প কালমধ্যে ঐ পত্রিকা জনসাধারণের দ্বারা সমাদৃত হইয়াছিল।

গুরুচরণ ঠাকুরের* একমাত্র কন্যা করুণাময়ীকে চাঁদসীর সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার অভয়া চরণ দাশ বিবাহ করিয়াছিলেন। বিবাহের অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার কোন সন্তানাদি হয় নাই। তিনি স্বামীকে এতদ্রূব ভক্তি কবিতেন যে, প্রত্যহ প্রাতঃকালে তাঁহার চবণ ধৌত জল পান না করিয়া কোন কার্য্য করিতেন না।

স্বর্গীয় উমাচরণ ঠাকুর

শ্রীশ্রীহরি ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র উমাচরণ ঠাকুর বাংলা ১২৬৫ সালে ওড়াকান্দী জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাংলা লেখা পড়া খুব ভাল জানিতেন এবং হিন্দু শাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। তিনি তান্ত্রিক মতে নানাপ্রকার অলৌকিক কার্য্য করিতে পারিতেন। তিনি একজন বিখ্যাত হট্‌যোগী ছিলেন এবং শারীরিক শক্তি ও সামর্থ্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি রাজসিকভাবে জীবন যাপন করিতে

ভালবাসিতেন এবং ভাল অশ্বারোহী ছিলেন। তিনি তাঁহার পিতার মৃত্যুর কিছুকাল পরে জ্যেষ্ঠভ্রাতার সহিত পিতৃসম্পত্তি সমভাগ করিয়া গোপালপুর নামক স্থানে যাইয়া বসতি করেন। তিনি নিশ্চিন্তপুরের প্রসিদ্ধ মজুমদার বংশে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র আদিত্যকুমার ও যতীন্দ্র-নাথ ও এক কন্যা সরোজিনী। যতীন্দ্র নাথ পঠদ্দশাতেই কালগ্রাসে পতিত হন। পাঠিকেলবাড়ী নিবাসী শ্রীযুত নিবারণ চন্দ্র বিশ্বাস সরোজিনীকে বিবাহ করেন। ১৩৩৬ সালে উমাচরণ ঠাকুব মহাশয় মানবলীলা সংবরণ কবেন।

শ্রীআদিত্যকুমার ঠাকুর

তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র আদিত্য কুমার ঠাকুর ১২৮১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা মেডিকেল স্কুল হইতে ডাক্তারী পাশ করিয়া নড়াগাতী এবং তারাইল নামক স্থানে কৃতিত্বেব সহিত ডাক্তারী ব্যবসায় কবেন। তাবাইলে তাঁহাব খুব বড দোকান ছিল। তিনি কলিকাতা হইতে অনেক দ্রব্য আনিয়া আমদানী করিতেন এবং উহা বিক্রয় করিয়া বিশেষ লাভবান হইয়াছিলেন। তিনি পরে সাংসারিক কার্য্যে মনোনিবেশ করেন। তিনি ওড়াকান্দী ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি ছিলেন। ঐ সময়ে তিনি গ্রামে অনেক রাস্তা ঘাট করাইয়া জনসাধারণের প্রভূত উপকার সাধন করেন। তিনি এজন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে প্রথম শ্রেণীর প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হন। তিনি কিছুকাল ওড়াকান্দী স্কুলের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন এবং স্কুলের মঙ্গলের জন্য বহু পরিশ্রম করেন। পল্লীর উন্নতির জন্যও তিনি সর্ব্বদা চেষ্টা করেন। তিনি রাউৎখামার নিবাসী ৺দীননাথ বিশ্বাসেব একমাত্র কন্যা গায়ত্রি দেবীকে বিবাহ করেন। তাঁহার এক পুত্র অতুল চন্দ্র ঠাকুর ও তিন কন্যা—বিদ্যুৎলতা, প্রীতিলতা ও আশালতা।

শ্রীঅতুল চন্দ্র ঠাকুর

অতুল চন্দ্র ঠাকুর ১৩১০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি বাল্যকাল হইতেই চিত্রবিদ্যায় বিশেষ অনুরাগ প্রদর্শন করেন। তাঁহার চেষ্টায় বহু পুরাতন চিত্র হইতে শ্রীশ্রীহরি ঠাকুরের চিত্র অঙ্কিত হইয়া জনসমাজে প্রচারিত হইয়াছে। তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সী মেডিকেল স্কুল হইতে কৃতিত্বের সহিত পাশ করিয়া বর্ত্তমানে ভারাইল নামক স্থানে ডাক্তারী করিতেছেন। তিনি গোবরাগ্রাম নিবাসী শ্রীযুত মহেন্দ্র নাথ পোদ্দার মহাশয়ের একমাত্র কন্যা বিমলা দেবীকে বিবাহ করেন। তাঁহার শিশু পুত্র শ্রীমান্ শান্তি কুমার মাতৃক্রোড়ে লালিত পালিত হইতেছে।

স্বর্গীয় নগেন্দ্র নাথ ঠাকুর

কৃষ্ণদাস ঠাকুরের দুই পুত্র—রামচন্দ্র ও লক্ষণ চন্দ্র। রাম চন্দ্র ঠাকুর নিষ্পুত্রক ছিলেন। লক্ষণ চন্দ্র ঠাকুরের চারি পুত্র—নগেন্দ্র নাথ, চারু চন্দ্র, মহেন্দ্র নাথ ও নরেন্দ্র নাথ। জ্যেষ্ঠ নগেন্দ্র নাথ বাংলা ১৩০৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবেই তিনি মাতৃ-পিতৃহীন হন। একারণ বাল্যকালে তাঁহার জীবন অতি দুঃখে ও অভাবের মধ্য দিয়া অতিবাহিত হইয়াছিল। গুরুচরণ ঠাকুর মহাশয় তাঁহাকে অত্যন্ত মেধাবী দেখিয়া অনেক আর্থিক সাহায্য করিতেন। তিনি ১৯১৪ সালে ওড়াকান্দীর স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হন। তিনি কলিকাতার চাঁদসীর ডাক্তার শ্রীযুত প্রসন্ন কুমার দাশ ধন্বন্তরী মহাশয়ের বাটী থাকিয়া স্কটীশ চার্চ্চ কলেজে অধ্যয়ন করিতেন এবং ১৯১৬ সালে ঐ কলেজ হইতে আই, এ পাশ করেন। কলেজের প্রফেসর আর্কুহার্ট সাহেব তাঁহাকে বড়ই ভাল-বাসিতেন। অর্থাভাবে তিনি আর উচ্চ শিক্ষার জন্য কলিকাতায় থাকিতে না পারিয়া এক বৎসরের জন্য রাহুথড় নামক স্থানে মধ্য ইংরেজী

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। পরে পুনঃ কলিকাতায় গমন করিয়া তিনি পূর্ব্বোক্ত কলেজে চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন; কিন্তু সাংসারিক নানাপ্রকার অভাবে তাঁহাকে চিরতরে অধ্যয়ন ত্যাগ করিতে হয়। তিনি সাতপাড় নামক স্থানে মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। এই সময় হইতে তিনি দেশ ও জনহিতকর কার্য্যে ব্রতী হন। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার চেষ্টায় সাতপাড় গ্রামে একটা পোষ্টাফিস ও একটা ষ্টীমার ষ্টেশন স্থাপিত হয়। ইহার কিছু কাল পরে তিনি ২৪ পরগণার বশিরহাট মহকুমার অন্তর্গত সফিরাবাদ নামক স্থানে একটা স্কুলে শিক্ষক নিযুক্ত হন এবং ঐ অঞ্চলে নমঃশূদ্র জাতিব মধ্যে ব্যাপকভাবে শিক্ষা বিস্তাব করেন।

এই সময়ে পূর্ব্বোক্ত রাহুথড় গ্রামের কতিপয় ব্যক্তি তাঁহাকে ঐ গ্রামে একটা মঠ ও আশ্রম স্থাপন করিতে অনুরোধ করেন। তিনি সফিরাবাদ ছাড়িয়া রাহুথড় আসিলেন এবং সকলের সমবেত চেষ্টায় ঐ স্থানে একটা মঠ ও আশ্রম স্থাপন করিলেন। ঐ মঠের সন্নিহিত স্থানে তিনি জেলা বোর্ডের সাহায্যে একটা প্রকাণ্ড দিঘি খনন এবং রোগীদিগকে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করিবার জন্য একটা দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। বাংলা ১৩৩৪ সালে ১৮ই বৈশাখ রাহুথড় মঠে যে বঙ্গীয় জন শক্তি মহাসভার অধিবেশন হইয়াছিল, নগেন্দ্র নাথ তাহার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ঐ সভায় আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। নড়াইলের জমিদার শ্রীযুত ধীরেন্দ্র নাথ রায়, মাদারীপুরের উকীল শ্রীযুত সুরেন্দ্র নাথ বিশ্বাস এবং কুমিল্লা অভয়াশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ সুরেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন। নগেন্দ্র নাথ ১৩৩৫ সালে বলুগ্রাম তেঁতুলিয়া খাল সংস্কার সমিতি স্থাপন করেন; উহাতে

এই দেশবাসী বহু কৃষকের উপকার সাধিত হইতেছে এবং কচুরী পানার ধ্বংস হইতেছে।

ইং ১৯২৫ সালে ফরিদপুরে যখন প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের অধিবেশন হয়, তখন নগেন্দ্র নাথ উহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। ঐ সম্মেলনে মহাত্মা গান্ধি এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন আসিয়াছিলেন। নগেন্দ্র নাথ ফরিদপুরের নমঃশূদ্র জনসাধারণের পক্ষ হইতে মহাত্মা গান্ধি এবং দেশবন্ধুকে তাহাদের অবস্থা বুঝাইয়া দেন। ১৯২৬ সালে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে কলিকাতায় যে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়, নগেন্দ্র নাথ তাহাতে বাংলার নমঃশূদ্র জাতির প্রাধান্য দেখাইবাব জন্য বহু নমঃশূদ্র লাঠিয়াল লইয়া গিয়াছিলেন। তাহারা লাঠি খেলা দেখাইয়া নেতৃমণ্ডলীব নিকট হইতে অশেষ প্রশংসা পাইয়াছিল। শ্রীযুক্তা সবোজিনী নাইডু, বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ, মতিলাল নেহেরু, জহবলাল নেহেরু প্রভৃতি দেশনায়কগণের সহিত, তাঁহার বিশেষ পরিচয় ছিল। দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহন সেন গুপ্ত তাঁহার পবম বন্ধু ছিলেন।

১৯২৯ সালে হঠাৎ টাইফয়েড জ্বরে আক্রান্ত হইয়া তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৩২ বৎসব হইয়াছিল। তনি চির কুমার ছিলেন। দেশহিত ব্রতে তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহার এই আকস্মিক মৃত্যুতে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকলেই দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি সুবক্তা ও সুলেখক ছিলেন। সর্ব্বোপরি তাঁহার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও দেবোপম চরিত্র গুণে তিনি বাংলার সর্ব্বত্র সমাদৃত হইয়াছিলেন। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে ওড়াকন্দীর ঠাকুর বংশ একটী অমূল্য রত্ন হারাইয়াছে।

শ্রীমহেন্দ্র নাথ ঠাকুর।

নগেন্দ্র নাথের তৃতীয় ভ্রাতা মহেন্দ্র নাথ বাংলা ১৩০৯ সালের ৫ই অগ্রহায়ণ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ওড়াকান্দী স্কুল হইতে ম্যাট্রীকুলেশন

পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়া কুমিল্লার অভয়াশ্রমে ডাঃ সুরেশ চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের নিকট চারি বৎসর কাল ডাক্তারী শিক্ষা করেন। ঐ আশ্রমের স্থাপিত চিকিৎসালয়ে ও হাসপাতালে তিনি বহু রোগীর সেবা করেন। ভ্রাতা নগেন্দ্র নাথের মৃত্যুর পর তিনি রাহুথড় আসিয়া তথাকার মঠের এবং আশ্রমের কার্য্য পরিচালন কবিতে অভিলাষ কবিয়াছিলেন; কিন্তু কর্ম্মীদিগের মধ্যে তেমন উৎসাহ না দেখায় তিনি পুনঃ কুমিল্লা গমন করেন।

১৯৩০ সালে লবন আইন অমান্য করিতে বাংলাব যে প্রথম সৈনিক দল সৃষ্ট হয়, মহেন্দ্র নাথ তাহাব অন্যতম বীর সৈনিক ছিলেন। ঐ বৎসব বাকুড়া স্বেচ্ছাসেবক শিবিরে তিনি অধিনায়কত্ব কবিয়া তথা হইতে পাত্রসায়ের নামক স্থানে চৌকীদারী ট্যাক্স বন্ধ করিতে গমন করিয়াছিলেন। এই বিষয়ে তাঁহার অসীম সাহস ও নির্ভিকতা দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইয়াছিলেন। ইহার পর "গান্ধি-আরউইন চুক্তির" ফলে তিনি কুমিল্লা প্র্যাতাবর্ত্তন করিয়া অভয়াশ্রমের জেনারেল ম্যানেজার নিযুক্ত হন। পুনঃ ১৩৩২ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করিয়া তিনি ৬মাসের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। বন্দী অবস্থায় তিনি দমদম জেলে ছিলেন। ঐ সময়ে তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হওয়ায় তিনি চিরতরে রাজনৈতিক আন্দোলন ত্যাগ করিয়া নিজবাটী ওড়াকান্দী চলিয়া যান এবং তথায় শ্রীশ্রীহরি গুরু চাঁদ মিশনের ম্যানেজার নিযুক্ত হন। বর্ত্তমানে তিনি দেবী শান্তি সত্যভামা বালিকা শিক্ষালয়ে শিক্ষকতা কার্য্য করিতেছেন। তিনি উদ্যোগ করিয়া বাংলায় গান্ধি সফর তালিকায় "ওড়াকান্দীকে" ভুক্ত করিয়াছিলেন। অন্যান্য কার্য্যের মধ্যে তিনি পল্লীসংগঠন ও স্ত্রীজাতির মধ্যে শিক্ষাবিস্তার কার্য্যে বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।

মহেন্দ্র নাথ তাঁহার ভ্রাতা নগেন্দ্র নাথের ন্যায় চিরকুমার এবং দেশহিতব্রতে ব্রতী। তাঁহার ন্যায় অতি সরল ত্যাগী কর্ম্মী সমগ্র বাংলা দেশে অতি বিরল। বাল্যকাল হইতে নানাপ্রকার আর্থিক অভাবের মধ্যে জীবন অতিবাহিত কবিলেও চবিত্রের উন্নতি করিতে এবং প্রকৃত মনুষ্যত্ব বিকাশে তিনি সর্ব্বদা প্রয়াসী ডাক্তার সুরেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়েব নিকট তাঁহার অশেষ প্রশংসা শুনিতে পাওয়া যায়। মহেন্দ্র নাথ ঠাকুর বংশের উজ্জ্বল নক্ষত্র।

বংশ-লতা

রামদাস (মৈথিলী ব্রাহ্মণ)
চন্দ্রমোহন (নমঃশূদ্রের কন্যা বিবাহে নমঃশূদ্র)
শুকদেব
কালিদাস
রবিদাস
নিধিরাম
শ্রীজীব
মুকুন্দরাম
কার্ত্তিক
যশোবন্ত
সনাতন
প্রাণকৃষ্ণ
রামমোহন
রামকৃষ্ণ
১) কৃষ্ণদাস
(২) হরিদাস
(৩) বৈষ্ণবদাস
(৪) গৌরীদাস
(৫) স্বরূপদাস
গুরুচরণ
উমাচরণ
শশি
সুবন্ত
উপেন্দ্র
সুরেন্দ্র
আদিত্য
যতীন্দ্র
অতুল
প্রমথ
মন্মথ
ভগবতী
শ্রীপতি
শান্তি
প্রবীর
মানস
অংশু
মিহির
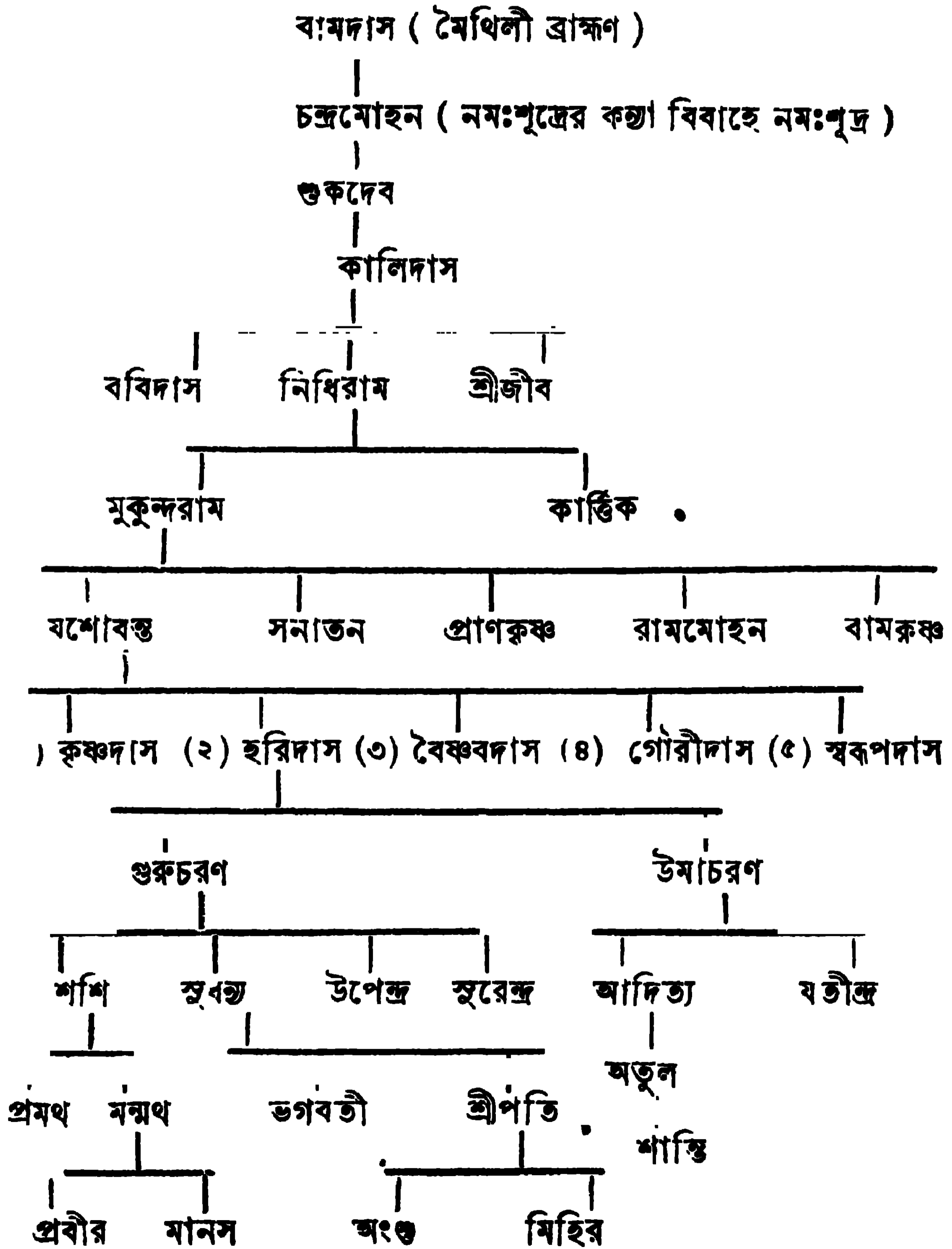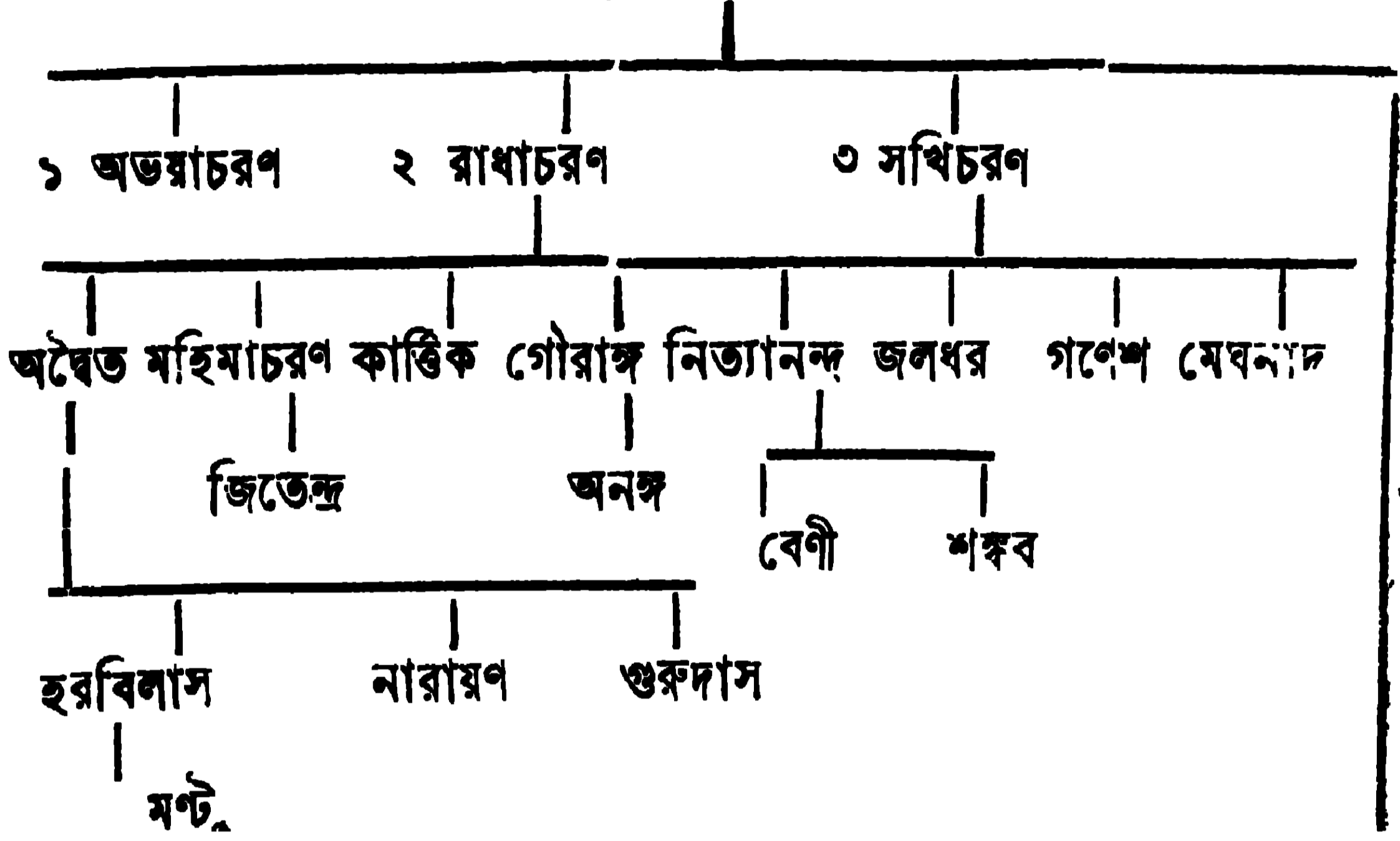
(৩) বৈষ্ণবদাস ঠাকুর
১ অভয়াচরণ
২ রাধাচরণ
৩ সখিচরণ
অদ্বৈত
মহিমাচরণ
কার্ত্তিক
গৌরাঙ্গ
নিত্যানন্দ
জলধর
গণেশ
মেঘনাদ
জিতেন্দ্র
অনঙ্গ
বেণী
শঙ্কর
হরবিলাস
নারায়ণ
গুরুদাস
মণ্টু
৪ গোপীচরণ
৫ গঙ্গাধর
৬ শ্যামাচরণ
যোগেন্দ্র
কুঞ্জ
নরেন্দ্র
হরিদাস
হরেন্দ্র
কালিদাস
অতুল
জয়দেব
দেবেন্দ্র
পুলিন
জটাধর
শুকলাল
সমরেন্দ্র
অমরেন্দ্র
অমল
বিমল
নিত্য
অরবিন্দ
শরদিন্দু

(৫) স্বরূপদাস ঠাকুর

১ যজ্ঞেশ্বর
২ সিদ্ধেশ্বর
৩ চন্দ্রকান্ত
দেবনাথ
জটাবিলাস
রসিক
রাজেন্দ্র
রমেন্দ্র
রেবতী
রমণী
ধনপতি
যাদব
হৃদয়
বিজয়
কমল
ফণী
কুমুদ
পবিত্র
সন্তোষ
মোহনলাল
হীরালাল
মাখনলাল
চুণীলাল
বাসুদেব
৪ গোপাল
৫ শ্রীনাথ
৬ গিরিধর
মনোহর
তারক
গদাধর
ভাগ্যধর
মৃণাল
সতীশ
প্রাণনাথ
রমানাথ
কানু
ননী
দীনেশ
মণীন্দ্র
হিতেন্দ্র
অমৃত
কুলপদ
কালিপদ
কালী
পরমানন্দ
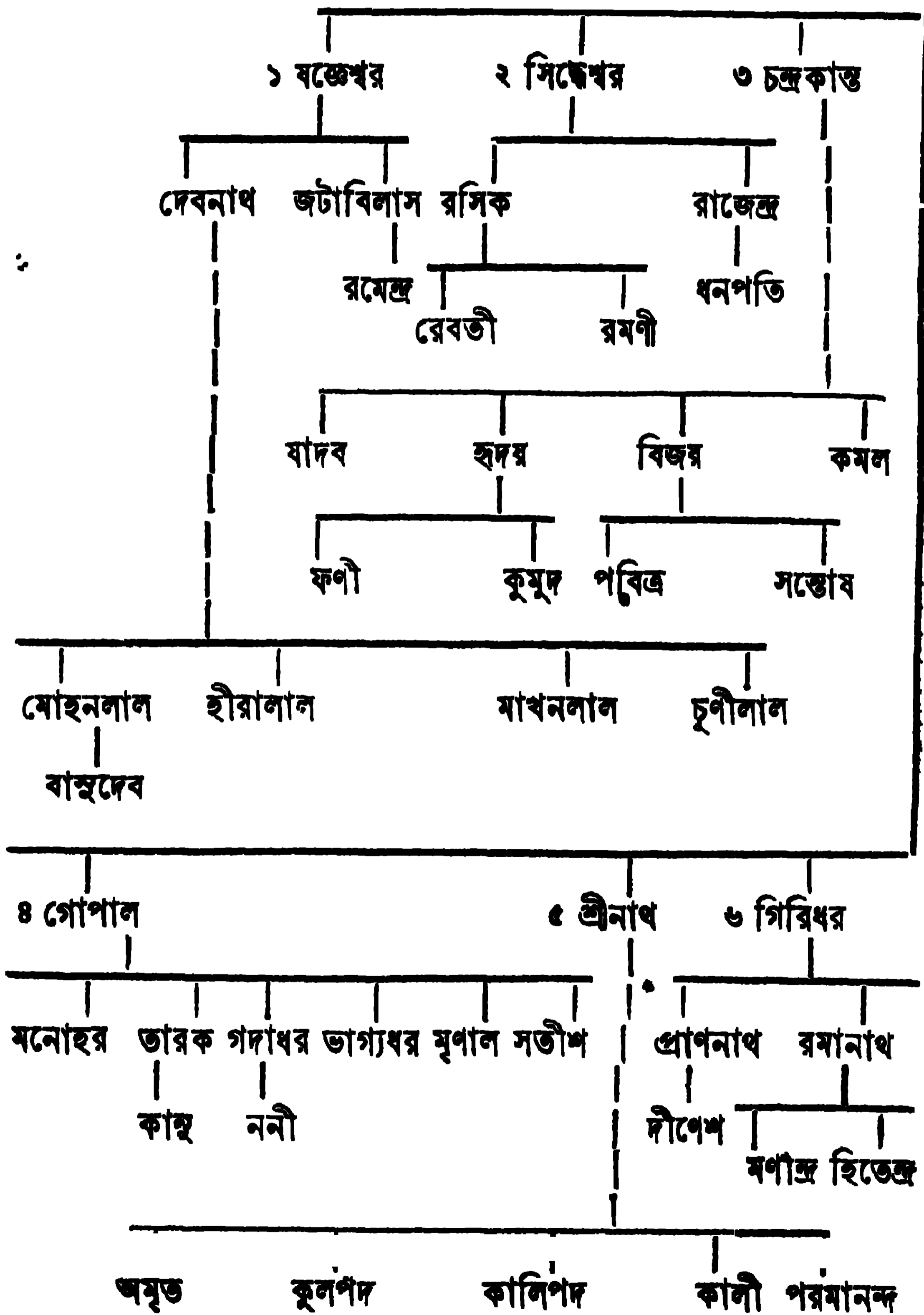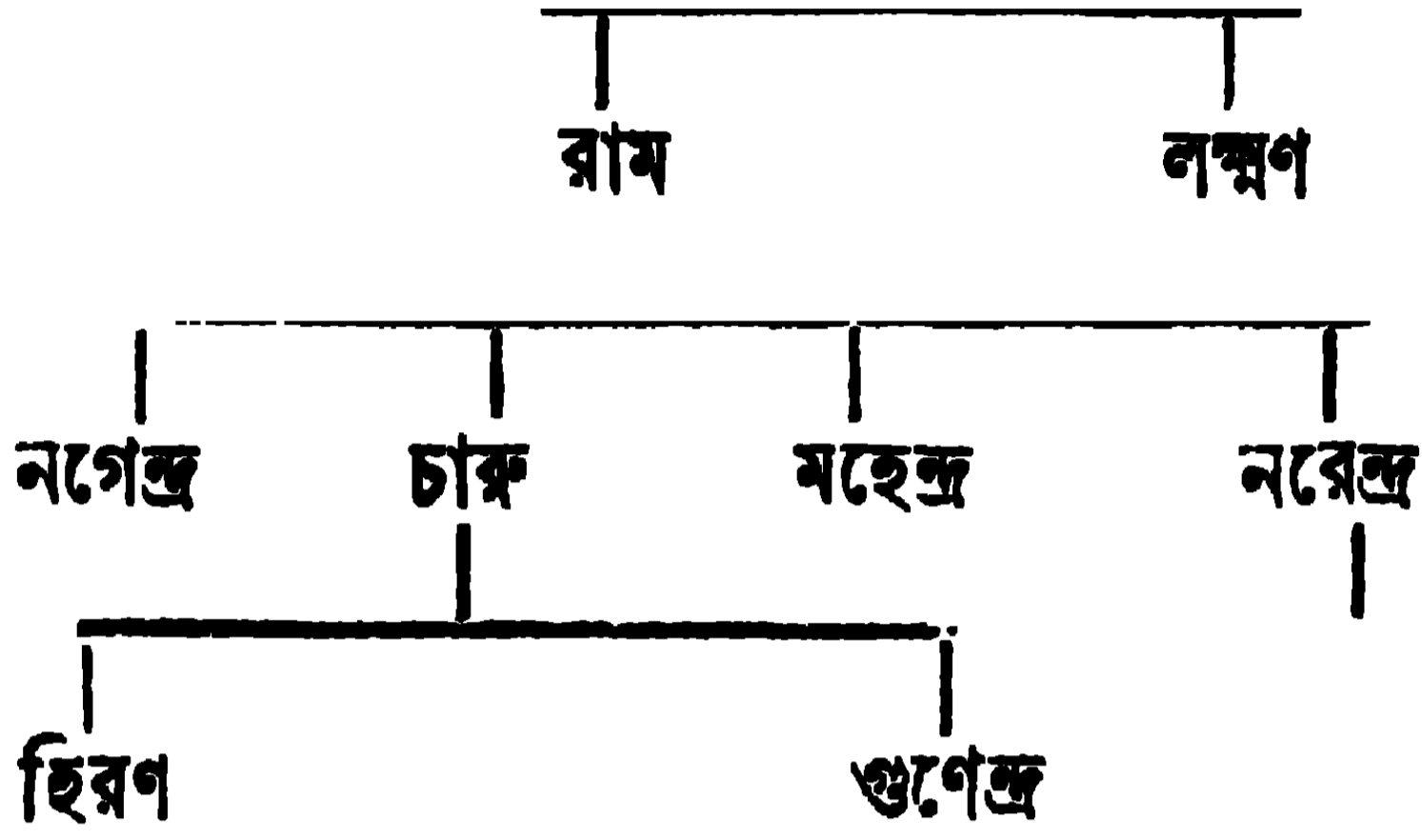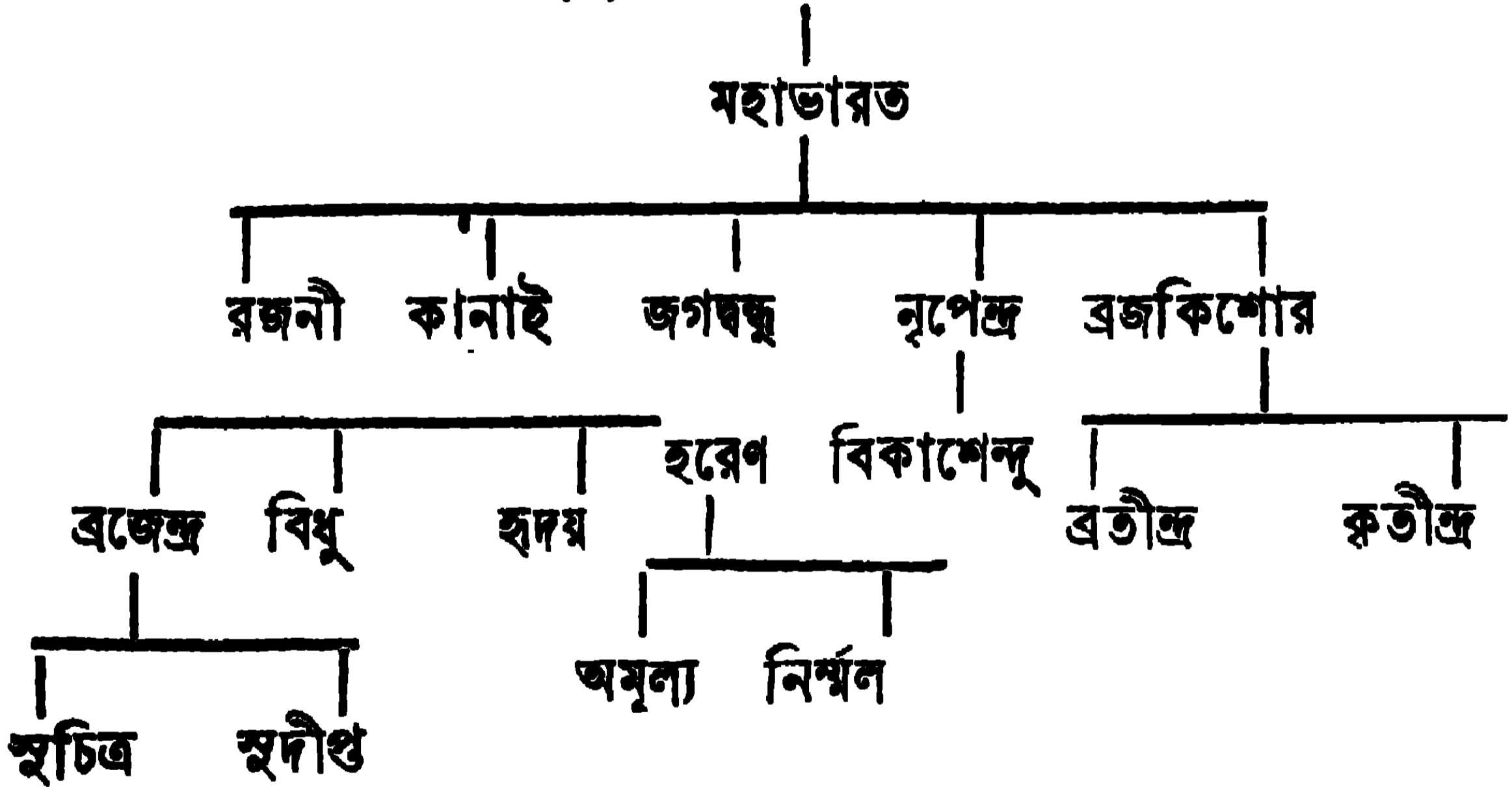
বিশেষ দ্রষ্টব্য :—মাত্র ওড়াকান্দী ও পদ্মবিলায় যাঁহারা বাস করিতেছেন, তাঁহাদের "লতা" প্রদত্ত হইল। ইহা ছাড়া ঘৃতকান্দি, রামদিয়া, সাফলীডাঙ্গা, কানাচ্চর, বলনারায়ণ প্রভৃতি স্থানে ঠাকুর বংশধরগণ প্রবল প্রতাপের সহিত বাস করিতেছেন।

স্বর্গীয় রায় বাহাদুর কৃপানাথ দত্ত

স্বর্গীয় রায় বাহাদুর কৃপানাথ দত্ত

কৃপানাথ বাবু কলিকাতার হাটখোলা দত্ত বংশের উজ্জ্বলতম রত্ন ছিলেন। হাটখোলা দত্ত বংশ বাঙ্গালার অতি প্রাচীন ও বনিয়াদি বংশ। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা পুরুষো ত্তম দত্তকে—বাঙ্গালার রাজা আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে বঙ্গে আনয়ন করেন। পুরুষোত্তমের বংশধর গোবিন্দ শরণ—"গোবিন্দপুর" গ্রাম প্রতিষ্ঠা করেন। এই গ্রামখানি হুগলী নদের তীরে নিষ্করভাবে মোগল সম্রাট্ কর্ত্তৃক তাঁহাকে প্রদান করা হয়। এই গোবিন্দপুব গ্রামখানিকে গোবিন্দ শরণের বংশধর রাম চন্দ্র দত্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে দুর্গ নির্ম্মাণের জন্য দান করেন। রাম চন্দ্র দত্ত মহাশয় উক্ত কোম্পানীর বেনিয়ান ছিলেন। গোবিন্দপুরের বিনিময়ে তিনি কোম্পানীর নিকট হইতে হাটখোলা প্রাপ্ত হন।

রামচন্দ্রের পুত্র মাণিকরামও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বেনিয়ান ছিলেন। তাঁহার পুত্র মদনমোহন দত্ত কলিকাতা, কাশী ও অন্যান্য স্থানে অনেক মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং গয়ার প্রেতশিলা পাহাড়ে উঠিবার সোপান নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি রাম-দুলাল সরকারকে লক্ষ টাকা দান করিয়া তাঁহার ভাগ্য পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছিলেন। কলিকাতার বিখ্যাত ছাতু বাবু ও লাটু বাবু রামদুলালের বংশধর ছিলেন।

মদনমোহনের পুত্র জগতরাম ভ্যান্সি টার্টের দেওয়ান ছিলেন এবং তাঁহার সহিত মেদিনীপুর, কটক ও বেহারের জরীপ কার্য্যে সমভিব্যাহারী হইয়াছিলেন। মদনমোহন ঐ সমস্ত স্থানে বহু মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া-ছিলেন।

জগতরাম তিন পুত্র রাখিয়া যান। তাঁহাদের নাম—(১) হরসুন্দর (২) প্রাণ নাথ ও (৩) গিরীন্দ্র কুমার।

কৃপানাথ বাবু এই প্রাণনাথেরই জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। কৃপানাথ বাঙ্গালা—"বসন্তক" নামক হাস্য রসাত্মক ব্যঙ্গ পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ছিলেন।

প্রাণনাথ কালকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর কার্য্যে বিশেষভাবে যোগদান করিতেন এবং ছোট লাট স্যার রিচার্ড টেম্পলের শাসনকালে হাইকোর্টের বিচারপতিগণের হাত হইতে নির্ব্বাচিত সদস্যদের হাতে যাহাতে মিউনিসিপ্যালিটী আইসে, তজ্জন্য দেশব্যাপী যে প্রবল আন্দোলন হইয়াছিল, তিনি তাহাতে অগ্রণী ছিলেন। প্রাণনাথ মিউনিসিপ্যালিটীর প্রথম নির্ব্বাচিত সদস্যদের অন্যতম ছিলেন। প্রাণনাথেরই অদম্য চেষ্টার ফলে কাশীপুব চীৎপুর স্বতন্ত্র মিউনিসিপ্যালিটীতে পরিণত হইয়াছিল।

গত শতাব্দীর শেষভাগে প্রাণনাথ হাটখোলার নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীটের পৈতৃক বাটী হইতে কলিকাতার উত্তরাংশ টালায় নূতন বসত বাটী নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করিতে থাকেন।

রায় কৃপানাথ দত্ত বাহাদুর ১৮১৬ খ্রীঃাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী স্কুলের তিনি ছাত্র ছিলেন? কিন্তু স্বাস্থ্য ভঙ্গতাহেতু তিনি স্কুল পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। অতঃপর তিনি বাহিরের ছাত্র হিসাবে (Ex-student) প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন করিতে থাকেন, কিন্তু তিনি কখনও কোন পরীক্ষায় উপস্থিত হন নাই। বাড়ীতে পড়িয়া তিনি ইংরাজী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কাশীপুরে সব্‌রেজিষ্ট্রাররূপে নিযুক্ত হন। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি শিয়ালদহে স্থানান্তরিত হয়েন।

ইহার কয়েক বৎসর পরে এখন কলিকাতার যৌথ সব্‌রেজেষ্টারী

অফিস বড়বাজারে খোলা হয়, তখন তিনি উহার সব্‌রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত হ'ন।

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মালদহের জেলা সাব্‌রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত হন এবং কিছুদিন পরে সিউড়ীতে বদলী হন। ১৯১০ সালে তিনি ইনসিওরেন্স কোম্পানী ও জয়েণ্ট ষ্টক্ কোম্পানীর রেজিষ্ট্রার হন এবং তখন তাঁহার বেতন মাসিক ৪০০৲ চারিশত টাকা হয়। ১৯১৫ সালে তিনি রেজিষ্ট্রেশন অফিস সমূহের ইন্‌স্পেক্টর নিযুক্ত হন; কিন্তু অনবরত পর্য্যটনের ফলে তাঁহার স্বাস্থ্যহানি হওয়ায় তিনি উক্ত পদ পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় রেজিষ্ট্রার হন।

১৯১৪ সালে ইণ্ডিয়ান কোম্পানীর একৃট পাশ হওয়ার ফলে জয়েণ্ট ষ্টক্ কোম্পানীর পদ পৃথক হইয়া যায় এবং ইউরোপীয় ও চার্টার্ড একাউণ্ট্যাণ্ট্ সমূহকে ৮০০৲—১২০০৲ টাকা বেতনে ঐ সমস্ত পদে নিযুক্ত করা হইতে থাকে।

১৯১৮ সালে তিনি জয়েণ্ট ষ্টক্ কোম্পানীর রেজিষ্ট্রাররূপে মিঃ ষ্ট্রেথার হেল্‌সের বিদায়কালে অস্থায়ীভাবে কার্য্য করেন।

রায় কৃপানাথ দত্ত বাহাদুর ১৯২০ সালের ডিসেম্বর মাসে সরকারী চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁহার চাকুরীর কার্য্যকাল চারিবার বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল। ১৯২৫ সালের ২৫শে জানুয়ারী রবিবার তিনি তাঁহার টালার বাড়ীতে হঠাৎ হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া রুদ্ধ হওয়ায় ৬৪ বৎসর বয়সে মারা যান। কাশীপুর চীৎপুর মিউনিসিপ্যালিটীর সহিত তাঁহার সম্বন্ধ ৩৬ বৎসরের উপর ছিল। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সর্ব্বপ্রথমে উক্ত মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনার ও ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে উহার চেয়ারম্যান হন। যতদিন পর্য্যন্ত কাশীপুর চীৎপুর মিউনিসিপ্যালিটী কলিকাতা কর্পোরেশনের সহিত একত্রীভূত না হইয়াছিল, ততদিন তিনি উহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি একত্রীকরণ কমিটির (Amalgamation

Committee) সদস্য ছিলেন। ইহা ছাড়া তিনি আয়ব্যয় কমিটিরও (Budget & Establishment committee) সদস্য ছিলেন। তাঁহার উপদেশের দ্বারা কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটী বিশেষ উপকৃত হইয়াছিল। তিনি যে সময়ে উক্ত কাশীপুর চীৎপুর মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনার হন, তখন উহার আয় মাত্র কয়েক সহস্র ছিল, কিন্তু তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রমগুণে উহার আয় অচিরাৎ ৫ লক্ষ টাকা হয় এবং উক্ত মিউনিসিপ্যালিটীতে পরিণত হয়। তাঁহার এই প্রকার কর্ম্মদক্ষতায় পরিতুষ্ট হইয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে "রায় বাহাদুর" উপাধি প্রদান করেন। তাঁহাকে ৫ বার সম্মানসূচক সার্টিফিকেট দেওয়া হইয়াছিল। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে, ১৯০৩খ্রীঃ অব্দে, ১৯০৮, ১৯১১ ও ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে। দেশে দুর্ভিক্ষ ও প্লেগ নিবারণের চেষ্টা ও আদমসুমারীর রিপোর্ট গণনায় কৃতীত্ব দেখানর জন্য তাঁহাকে এইরূপ সম্মানসূচক সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে কয়েকটি কমিটির সদস্য মনোনীত করিয়া কিভাবে কলিকাতার জনবহুল বসতি দূর ও সহরতলীর উন্নতি সাধন করা যাইতে পারে, তৎসম্বন্ধে তাঁহার সুপরামর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি যে সমস্ত কমিটির সদস্য ছিলেন, তন্মধ্যে কয়েকটির নাম এস্থলে করা যাইতেছে—(১) Riparian water supply committee (২) Lands and building sub committee (৩) Public works conference (৪) Committee for considering the fire brigade Act and of the excise licensing board.

তিনি কাশীপুর চীৎপুর মিউনিসিপ্যালিটীর সংস্রবে কলিকাতা ইম্‌প্রুভ্‌মেণ্ট ট্রাষ্টের যুগ্ম সদস্য ছিলেন। তিনি কলিকাতা মেডিকেল কলেজ ইন্‌স্পেক্‌সন কমিটির সদস্য, কলিকাতা ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেসনের পরামর্শ কমিটি, India league and Albert temple

of science and school of arts এর অবৈতনিক সদস্য ছিলেন। কলিকাতা অনাথাশ্রম, শোভাবাজার বেনাভোলেণ্ট সোসাইটি, শ্যাম-বাজার দরিদ্র ভাণ্ডার, ন্যাশনাল লিবারেল লীগ ও মহারাজা কাশিমবাজার পলিটেক্‌নিক্যাল স্কুলের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সদস্য ছিলেন। তিনি সিঁথি গোপেশ্বর দত্ত স্মৃতি বিদ্যালয়েরও প্রেসিডেণ্ট ছিলেন এবং নর্থ সুবার্ব্বণ স্কুলের ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট ছিলেন।

তিনি অতি ধনী ও সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সাধারণতঃ ঐ প্রকার বংশের সন্তানগণ বিলাসিতা ও আমোদ প্রমোদেই কালাতিপাত করেন, কিন্তু রায় বাহাদুর উহার ব্যতিক্রম করিয়াছিলেন। আলস্য, নিদ্রা, গল্প গুজব, বৃথা আমোদ প্রমোদ কাহাকে বলে তাহা তিনি জানিতেন না। তিনি কর্ত্তব্য সাধনকেই "ধর্ম্ম" বলিয়া জানিতেন। কর্ম্মই তাঁহার জীবনের লক্ষ্য ছিল এবং তিনি একজন একনিষ্ঠ কর্ম্ম-যোগী ছিলেন। শ্রীমদ্‌ভাগবতগীতায় কর্ম্মযোগের যে সমস্ত লক্ষণ উল্লেখ করা হইয়াছে, তিনি আপনার জীবনে সেই সমস্ত আদর্শ পালন করি-তেন। তাঁহার বাক্য ও কার্য্য সমস্তের ভিতর হিন্দুর সমস্ত আদর্শ ও ধারা অক্ষুন্ন ছিল। যে কোন কাজ তাঁহার হস্তে ন্যস্ত হৌক না কেন তিনি তাহা অত্যাশ্চর্য্যরূপে সমাধা করিতেন। তাঁহার নিজের অফিসের কঠোর কর্ত্তব্য পালনের পর নানাপ্রতিষ্ঠানের জন্য অবৈতনিকভাবে তিনি যে ভাবে আন্তরিকতার সহিত কার্য্য করিতেন, তাহা দ্বারাই সূচিত হয় যে তিনি "কর্ম্মকে" কিরূপ উচ্চস্থান দিতেন। নানাপ্রতিষ্ঠানে তিনি অবৈতনিকভাবে বেতনভোগী কর্ম্মচারীর ন্যায় যে প্রকার কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, তাহা দ্বারা দেশ যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছে।

তাঁহার শারীরিক অবস্থা তত সবল ছিল না, তথাচ দেশের কাজ তিনি এত ভালবাসিতেন যে, নিজের শরীরের দিকে আদৌ দৃক্‌পাত করিতেন না।

তাঁহার অদম্য ইচ্ছাশক্তি ছিল এবং মানবের সেবাই যে ধর্ম্ম এই দৃঢ় বিশ্বাস তাঁহার ছিল, এই বিশ্বাসের বলে তিনি জীবনে এত জনহিতকর কার্য্য করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি গ্র্যাজুয়েট কিংবা আণ্ডার গ্র্যাজুয়েটও ছিলেন না, কিন্তু তথাচ তিনি অতি উত্তমরূপে ইংরাজী বলিতে পারিতেন এবং অনেক সময় মিউনিসিপ্যাল কৌন্সিল চেম্বারে উপস্থিত (Extempore) বক্তৃতা করিতেন। তাঁহার গঠনমূলক শক্তি অসাধারণ ছিল। তিনি জনহিতকর কার্য্যের জন্য তাঁহার মনপ্রাণ সমস্ত নিয়োগ করিয়াছিলেন।

সরকারী কর্ম্মচারী হিসাবেও তিনি অতিশয় কর্ত্তব্যপরায়ণ ও উদ্যমশীল কর্ম্মচারী ছিলেন। যে কোন সরকারী, বে-সরকারী কর্ম্মচারী তাঁহার সংস্পর্শে আসিতেন, সেই-ই তাঁহার সৌজন্য, শিষ্টাচার, সহিষ্ণুতা ও ব্যক্তিত্বে মোহিত হইতেন। প্রত্যেকেরই সহিত তিনি শিষ্ট ব্যবহার করিতেন। পারিবারিক জীবনেও তিনি অতিশয় সদাশয় ও স্নেহ মমতাময় ছিলেন। তিনি অতি সাধু প্রকৃতির ছিলেন। তাঁহার সময়ে এমন কোন জনহিতকর প্রতিষ্ঠান ছিল না, যেখানে তাঁহার দীর্ঘকায়, শান্ত সৌম্য মূর্ত্তি দেখা যাইত না।

চাকুরী করিবার সময় তিনি প্রতিদিন প্রাতঃকালে মিউনিসিপ্যাল অফিসে উপস্থিত হইয়া কার্য্য করিতেন, সরকারী চাকুরী হইতে অবসর লইবার পর তিনি প্রত্যেকদিন অপরাহ্ণে এবং সন্ধ্যাকালে উক্ত অফিসে গভীরভাবে কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন। তাঁহার অধঃস্তন কর্ম্মচারীগণের সমস্ত কর্ত্তব্যকর্ম্ম তিনি নিজে স্বচক্ষে পর্য্যবেক্ষণ করিতেন, তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল মিউনিসিপ্যালিটির কার্য্যসমূহ কিরূপ চলিতেছে তাহা ব্যক্তিগতভাবে দেখা। এমন কি যখন তিনি বয়োবৃদ্ধ তখনও তিনি ঐরূপ করিতেন। তাঁহার এইরূপ ত্যাগ স্বীকার ও শ্রম আদর্শস্থানীয় ছিল।

রায় বাহাদুর কৃপান দত্ত মৃত্যু-শয্যায়

যখন তিনি সিউড়ী বীরভূমে ১৯০৫—৭ সাল অবধি জেলা সাব্‌-রেজিষ্ট্রার ছিলেন, তখন তত্রত্য শিল্প ও কৃষি প্রদর্শনীর যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার কর্ত্তব্যপরায়ণতা এত আন্তরিক ছিল যে তিনি রাত্রি-কালীন আহার্য্য আহারের জন্য বাসায় যাইবার অবকাশ পাইতেন না. তথায় আনাইয়া খাইতেন।

বৃদ্ধ বয়সে তিনি অনেক সামাজিক প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিলেও কখনও তথায় কোন খাদ্য পানীয় গ্রহণ করিতেন না। এইজন্য তিনি আমরণ স্বাস্থ্য অক্ষুন্ন রাখিতে পারিয়াছিলেন।

তাঁহার সহিত সরকারী উচ্চপদস্থ অনেক কর্ম্মচারীর সাক্ষাৎ হইত। হাইকোর্টের অনেক বিচারপতি, এমন কি প্রধান বিচারপতিকে পর্য্যন্ত রেজেষ্ট্রারী কার্য্যের জন্য তাঁহার নিকট আসিতে হইত।

এক সময়ে বিচারপতি মিঃ চিটি একখানি দলিল রেজেষ্ট্রারী করিবার জন্য তাঁহার এজলাসে আসিয়া দেখেন যে, কৃপানাথ বাবু এজলাসে নাই। তখন মিঃ চিটি সবরেজিষ্ট্রারের ঘরে তাহা রেজেষ্ট্রী করিতে যান। সাবরেজেষ্ট্রার মহাশয় বিচারপতি মিঃ চিটিকে দেখিয়া একেবারে হতভম্ব ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়েন এবং মিঃ চিটির কথার কোন জবাব দিতে পারেন না। মিঃ চিটি সাবরেজিষ্ট্রারের মৌনাবলম্বন দর্শনে বলিলেন "আপনি কি ইংরাজী জানেন না?" ঠিক সেই সময়ে রায় বাহাদুর কৃপানাথ সাব্‌রেজিষ্ট্রারের ঘরে আসিয়া মিঃ চিটিকে নিজের এজলাসে লইয়া গেলেন। সাব্‌রেজিষ্ট্রার সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন।

আর একবার মিঃ চিটি ১১টার কিছু পূর্ব্বে রায় বাহাদুরের এজলাসে আসিয়া পাইচারী করিতে লাগিলেন। রায় বাহাদুর এজলাসে আসিলে হাসিতে হাসিতে মিঃ চিটি তাঁহার ঘড়ি বাহির করিয়া বলিলেন, "আপনি তিন মিনিট বিলম্বে আসিয়াছেন।" এই বলিয়া মিঃ চিটি তাঁহার কাজ সারিয়া চলিয়া গেলেন।

একদিন ছয়জন "নাইট" উপাধিধারী ব্যক্তি তাঁহার এজলাসে দলিল ফেরত লইবার ও রেজেষ্টী করিবার জন্য সমবেত হইয়াছিলেন। রায় বাহাদুরের এতদূর কার্য্যতৎপরতা ছিল যে তিনি তাঁহাদিগের কার্য্য একে একে সমাধা করিয়া দিলেন। তাঁহারা রায় বাহাদুরের কার্য্যে ও ব্যবহারে প্রীত হইয়া চলিয়া গেলেন।

তিনি এতদূর জনপ্রিয় ছিলেন যে, তিনি অবসর গ্রহণ করিলে তাঁহার অফিসের সমস্ত কর্ম্মচারীগণ চাঁদা করিয়া তাঁহার একখানি তৈল চিত্র এজলাসে রাখিয়া তাঁহাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

১৯২৫ সালের জানুয়ারী মাসে রায় বাহাদুর মৃত্যুমুখে পতিত হন। কলিকাতা কর্পোরেশন ও অন্যান্য সভাসমিতিতে তাঁহার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করিয়া তাঁহার জনসেবার ভূয়সী প্রশংসা করা হইয়াছিল। উত্তর কলিকাতার যাবতীয় প্রতিষ্ঠানে তাঁহার মৃত্যুর অব্যবাহিত পরে শোকসভার অধিবেশন হইয়াছিল।

রায় বাহাদুর মৃত্যুকালে তিনটী পুত্র ও কয়েকটি কন্যা রাখিয়া যান। তিনি পটলডাঙ্গার বিখ্যাত বসু মল্লিক পরিবারের ৺চারুচন্দ্র বসু মল্লিকের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

যুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ দত্ত, এম-এস-সি, বি-এল

শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ দত্ত এম্, এস্, সি, বি, এল্।

ত্রৈলোক্য বাবু রায় বাহাদুর কৃপানথ দত্তের মধ্যম পুত্র। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই নভেম্বর তিনি পটলডাঙ্গায় তাঁহার মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা ও বুদ্ধি। ১৯১১ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে তিনি পদার্থ বিজ্ঞানে অনার্স লইয়া বি, এস্ সি পাশ করেন। ঐ বৎসরে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "উড্রো বৃত্তি" লাভ করেন। প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে উক্ত বিষয়ে তিনি ১৯১৩ সালে এম্ এস্ সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯১৪ সালে তিনি বি এল্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯১৫ সালে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল শ্রেণীভুক্ত হইয়া বেহারের ছাপরায় ওকালতী করিতে যান।

তিনি ছাপরার দেশবিখ্যাত এডভোকেট, বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মিত্রের একমাত্র কন্যাকে বিবাহ করেন।

পাটনা হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হইলে ত্রৈলোক্যবাবু পাটনা হাইকোর্টের এড্ভোকেট শ্রেণীভুক্ত হন এবং ১৯১৫ সাল হইতে ছাপরায় তিনি ওকালতী করিতেছেন। তিনি অনেক জনহিতকর কার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট। কিছুকাল তিনি ছাপরা মিউনিসিপ্যালিটির নির্ব্বাচিত কমিশনার ছিলেন। তিনি ছাপরা কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের অনারারি ও ডেপুটী চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল ছাপরা উকিল সমিতির কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি একজন মস্তবড় ব্যবসায়ী। বাঙ্গালা ও বেহারে তিনি অনেক ব্যবসার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তাঁহার কার্য্যদক্ষতা ও কর্ম্মতৎপরতা নানাদিকে বিস্তৃত। তিনি ভারতের অন্যতম বৃহৎ চিনির কারখানার Managing ডিরেক্টর। ঐ কারখানাটি বেহারের শীতলপুরে অবস্থিত। উহার নাম Sitalpore Sugar Works Ltd. ছাপরার বিখ্যাত সিনেমা "লক্ষ্মী টকিজেরও" তিনি ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

কলিকাতার Orient illustrated news Ltd. নামক সাপ্তাহিক পত্রেরও তিনি ডিরেক্টর। ঐ পত্রিকাখানি আজকালকার যুগের বিশেষ জনপ্রিয় পত্রিকা। কলিকাতার Oriental chemical works Ltd. এর ও তিনি একজন ডিরেক্টর। ব্যক্তিগতভাবে তিনি সজ্জন, মিষ্ট-ভাষী। দ্বাদশ বর্ষকাল তিনি ছাপরার বাঙ্গালী বালিকা বিদ্যালয়ের অনারারি সেক্রেটারী ছিলেন। বর্ত্তমানে তিনি "সারান একাডেমী" নামক প্রাচীনতম উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের সহাকারী সম্পাদক। তিনি জনসেবা কার্য্যেও পরাঙ্মুখ নন। তাঁহার স্বদেশ ও স্বজাতি প্রীতির ফলে বহু বেকার লোক কর্ম্ম পাইয়াছে এবং বহু পরিবার অনশনে আসন্ন মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছে। তিনি বেহারী বালিকা বিদ্যালয়ের (কন্যা বিদ্যালয়) ছাত্রীগণকে মোটর বাস দ্বারা সাহায্য করিয়াছিলেন।

ত্রৈলোক্য বাবু বাঙ্গালার বাহিরে থাকিয়া যেভাবে জনহিতকর কার্য্য করিয়া নিজের পিতৃদেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেছেন, তাহাতে মনে হয় যে সমস্ত বঙ্গসন্তান বাঙ্গালার বাহিরে থাকিয়া বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন, তিনি তাঁহাদের শূন্য আসন পূর্ণ করিতে পারিবেন। দেশের এই দুর্দ্দিনে তিনি নানাবিধ শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করিয়া যেভাবে বেকার যুবকগণের অন্ন সংস্থান করিতেছেন, তাহা দেশবাসী কখনই ভুলিতে পারিবে না।

ত্রৈলোক্য বাবু অতি সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান। হাটখোলার দত্ত বংশের বদান্যতা বাঙ্গালাদেশে কাহার অবিদিত আছে? এই বংশের সন্তান হইয়া তিনি জনসেবায় আত্মনিয়োগ করিবেন ইহা ত স্বাভাবিক। বিদেশে থাকিলেও ত্রৈলোক্য বাবু আপন জন্মভূমি বঙ্গদেশকে বিস্মৃত হন নাই, ইহা তাঁহার দেশাত্মবুদ্ধির প্রকৃষ্ট পরিচয়। আমরা ভগবচ্চরণে প্রার্থনা করি ত্রৈলোক্য বাবু নিরাময় ও দীর্ঘজীবি হইয়া সর্ব্বতোভাবে দেশমাতৃকার সেবা করুন এবং বিদেশে বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করুন।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মিত্র

ছাপরার প্রসিদ্ধ উকিল

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মিত্র

বঙ্গের বাহিরে যে সমস্ত বাঙ্গালী আপনাদের প্রতিভা, মনীষা ও কর্ম্মদক্ষতায় বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন, ছাপরার স্বনামধন্য উকিল শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মিত্র মহাশয় তাঁহাদের অন্যতম। ইঁহাদের আদি নিবাস জেলা ২৪ পরগণার অধীন বরিশা বেহালা। প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বে ইঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা বরিশা হইতে কলিকাতার শ্যামবাজার ষ্ট্রীটে ৬০নং বাটীতে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। তাঁহাদের সেই পৈতৃক বাটী বর্ত্তমানে ইম্‌প্রুভমেণ্টট্রাষ্ট ক্রয় করিয়াছেন। ইহার পূর্ব্ব পুরুষদের ঘৃত এবং সোরার কারবার ছিল। ইঁহার পিতামহ ৺পীতাম্বর মিত্র মহাশয় সর্ব্বপ্রথম বেহারে যান এবং চাম্পারণে চাকুরী করিতে থাকেন। ইঁহার পিতা ৺যদুনাথ মিত্র মহাশয় কলিকাতা হাইকোর্টে কিছুদিন ওকালতী করিয়া পরে মুনসেফ হন; কিন্তু স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ায় চাকুরী পরিত্যাগপূর্ব্বক ছাপরায় আসিয়া ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ওকালতী করিতে থাকেন। অল্প দিনের মধ্যেই তিনি ওকালতীতে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হন। তিনি ৭০ বৎসর বয়সে কালগ্রাসে পতিত হন। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি ছাপরা উকিল সমিতির সহকারী সভাপতি (Vice-president) ছিলেন। ইঁহার পিতামহ এবং পিতামহী ৺সৌদামিনী দীর্ঘায়ুঃ ছিলেন। ইঁহার মাতা শ্রীমতী কামিনী দাসী এখনও জীবিতা। ইঁহারা এখন কলিকাতা ২৫নং নন্দরাম সেনের ষ্ট্রীটে পৈতৃক বাটীতে বাস করিতেছেন।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে হেমচন্দ্র মিত্র মহাশয় কলিকাতায় জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহারা চারি সহোদর (১) মাননীয় বিচারপতি দ্বারকা

নাথ মিত্র (২) দ্বারভঙ্গের শ্রেষ্ঠ ব্যবহারাজীব শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মিত্র ও (৩) পাটনা হাইকোর্টের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উকিল শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠ নাথ মিত্র।

হেম বাবু ছাপরা জেলা স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রেসিডেন্সী কলেজ ও জেনারেল এসেম্ব্লী ইন্‌ষ্টিটিউসনে অধ্যয়ন করিয়া মেট্রোপলিটান ইন্‌ষ্টিটিউসন্ হইতে বি এল পাশ করিয়া ১৮৯৬ সালে ছাপরা কোর্টে ওকালতী আরম্ভ করেন। সরকারী উকিল মৌলভী আবদাস সাবাদ মারা গেলে ইঁহাকে সরকারী উকিল পদে প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করা হইয়াছিল, কিন্তু হেম বাবু উহা প্রত্যাখ্যান করেন। হেম বাবু শুধু ছাপরায় নয়, বেহারের সমস্ত জেলায় বড় বড় মোকদ্দমা পরিচালনে আহূত হইয়া থাকেন—এমনকি যুক্তপ্রদেশে পর্য্যন্ত তাঁহাকে ওকালতী করিতে যাইতে হয়।

১৯১৮ সালে সাহাবাদে বকরীদ উপলক্ষে হিন্দু মুসলমানে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাঁধিলে তাঁহাকে গবর্ণমেণ্ট উহার বিচার কমিটির অন্যতম সদস্য মনোনীত করেন।

দাঙ্গাকারীদের বিচারে তিনি তখন যথেষ্ট স্বাধীনতার পরিচয় দিয়াছিলেন। পাটনায় হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হইলে যে দশজনকে বার কৌন্সিলের সদস্য নির্ব্বাচিত করা হইয়াছিল, তিনি সেই দশজনের একজন ছিলেন।

কিছুকালের জন্য তিনি জেলা বোর্ডেরও সদস্য ছিলেন।

বর্ত্তমানে হেম বাবু ছাপরা উকিল সমিতির সভাপতি; ইহা ছাড়া তিনি নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠান সমূহেরও সভাপতি—যথা (১) সারণ পিঁজরাপোল, (২) ছাপরা হিন্দু সভা (৩) ছাপরা কালীবাড়ী সমিতি (৪) বাঙ্গালী বালিকা বিদ্যালয়।

ইনি শীতলপুর চিনির কারখানার ডিরেক্টর বোর্ডের সভাপতি।

স্বর্গীয় যদু নাথ মিত্র

ইঁহার সতী, সাধ্বী, সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী সাবিত্রী দাসী ২৪ পরগণা ইছাপুর নিবাসী ৺ডাক্তার পূর্ণ চন্দ্র ঘোষের কন্যা। ইঁহার একমাত্র কন্যার সহিত কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব রেজিষ্ট্রার রায় বাহাদুর কৃপানাথ দত্তের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য নাথ দত্তের সহিত বিবাহ হইয়াছে।

হেমবাবু আপন বিদ্যা, বুদ্ধি, প্রতিভা, মনীষা, সত্যবাদিতা, দয়া, ধর্ম্ম, সরলতা, উদারতা ও দেশ হিতৈষিতা গুণে ছাপরাবাসীর হৃদয়ে কিরূপ উচ্চাসন লাভ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার জয়ন্তী উপলক্ষে শ্রীযুত জিতেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এস্ সি বি এল্ মহাশয় যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহার প্রতি অক্ষরে অক্ষরে দেদীপ্যমান। আমরা এস্থলে জিতেন্দ্র বাবু কর্ত্তৃক লিখিত ও পঠিত সেই প্রশস্তি পত্র ও "ছাপরাবাসীবার্ত্তা" নামক সংবাদপত্রের অভিমত উদ্ধৃত করিলাম, তাহা পাঠে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন হেম বাবু কিভাবে প্রবাসে বাঙ্গালীর মুখ সমুজ্জ্বল করিতেছেন।

হেম-প্রশস্তি।

(শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এস্ সি, বি এল,
কর্ত্তৃক হেম জয়ন্তী উপলক্ষে লিখিত)

১। সংসারে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় এক এক জন মানব জন্মগ্রহণ করেন সাধারণ পারিপার্শ্বিকের মধ্যেই, বর্দ্ধিত হন সাধারণ ভাবেই। তাঁহাদের বাল্য, কৈশোর ও যৌবন অতিবাহিত হইয়া যায়, একান্ত বৈচিত্র্যহীনতার মধ্য দিয়াই। কিন্তু অকস্মাৎ একদিন পরিণত যৌবনের পরিপূর্ণতায়, তাঁহাদের দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় নিত্য নৈমিত্তিক ব্যবহারে, অন্তরের এমন একটী পরিচয় সুস্পষ্ট হইয়া উঠে, যে ক্রমশঃ সকলের দৃষ্টি তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধায় আনমিত হইতে থাকে। তখন তাঁহাদের চতুষ্পার্শ্বে সম্মিলিত হইতে থাকে এক জনের পর এক-জন, আপন আপন দুঃখ কষ্ট দায়িত্বের অংশীদার করিয়া লয় তাঁহাদের, পরস্পরের মধ্যে গড়িয়া উঠে একটী মৈত্রী ও প্রীতির বন্ধন, সৃষ্ট হয় একটী বৃহৎ পরিবার :

২। ঠিক এমনটীই দেখা যায় ছাপরার প্রবাসী বাঙ্গালী সমাজ। এখানকার অবিসম্বাদী নেতা বাবু হেম চন্দ্র মিত্র যাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা জানাইতে আজ আমরা এখানে সমবেত। ছাপরার প্রবাসী বাঙ্গালী একদিন অগোচরে তাঁহার মাথায় পরাইয়া দিয়াছে শ্রদ্ধা ও প্রীতির রাজ-মুকুট, হস্তে দিয়াছে বিচার ও অনুশাসনের রাজদণ্ড। এ সিংহাসন বংশ পরম্পরায় উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত নয়, এ তাঁহার আপনার চরিত্র বলে অর্জ্জিত ও ছাপরার প্রত্যেক বাঙ্গালীর অন্তরের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত।

৩। হেম বাবু সাধারণ প্রবাসী বাঙ্গালীর মত, চাকুরিজীবি সদা

বদ্‌লি ভীত এক ভ্রাম্যমাণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাঁহার পিতা ৺যদুনাথ মিত্র এখানকার একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল ছিলেন। প্রায় পঁয়ষট্টি বৎসর পূর্ব্বে ১৮৭০ খৃঃ এক স্মরণীয় প্রভাতে তিনি স্বাস্থ্যের জন্য কলিকাতা ত্যাগ করিয়া ছাপরায় পদার্পণ করেন এবং অল্পকাল মধ্যেই সুপ্রসিদ্ধ হইয়া উঠেন।

৪। যদুনাথ বাবু দীর্ঘকায়, তেজস্বী ও অত্যন্ত নির্ভীক ব্যক্তি ছিলেন। মস্তকে উজ্জ্বল টাক, নয়নে গাম্ভীর্য্য ও সংকল্পের অবিচলিত ভ্রুকুটী, অধরে আত্মমর্য্যাদার সদা চেতনা বোধ, দৃঢ়তা ও কঠোরতার প্রতিমূর্ত্তি ; এই ব্যক্তিকে দেখিলে সকলেরই মনে শ্রদ্ধার উদয় হইত।

হেম বাবু কিন্তু পিতার এই উগ্রতার দিক দিয়াও যান নাই। তাঁহার জীবন তাহার মাতার স্বভাবে ও আদর্শে গঠিত! হেম বাবুর মাতা শান্তি ও করুণার যেন প্রতিমূর্ত্তি। হেম বাবুর এই যে মূর্ত্তি—সদাই,-শান্ত সদাই সংযত, বাক্যে ব্যবহারে সদাই স্নিগ্ধতা জড়িত, এ মূর্ত্তি তাঁহার মাতার প্রতিমূর্ত্তি মাত্র।

যদুনাথ বাবু ১৮৭০ সাল হইতে ১৯০৯ সাল পর্য্যন্ত দীর্ঘ ৩৯ বৎসর ছাপরায় ওকালতি করিয়াছিলেন। এই দীর্ঘ সময়ে ছাপরাকে তিনি আপনার জন্মভূমি এবং ছাপরার সকল প্রবাসী বাঙ্গালী পরিবারকে আপনার আত্মীয়ের মত করিয়া লইয়াছিলেন। এই প্রীতি ও সখ্যতার আবহাওয়ার মধ্যেই হেম বাবুর জন্ম ও শিক্ষা দীক্ষা। তাই আজ যাহাতে আত্মকলহের দ্বারা প্রবাসী বাঙ্গালী সমাজ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া না যায়, সেই দিকে হেম বাবুর এত প্রখর দৃষ্টি ও এরূপ অক্লান্ত চেষ্টা।

ছাপরা জিলা স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া হেম বাবু কলিকাতায় General Assemblyতে F. A. পড়েন এবং ১৮৯৫ খৃঃ বি এল পাশ করিয়া পিতার জীবদ্দশাতেই আইন ব্যবসায়ে যোগদান করেন। ব্যবসায়ে পিতার সুযশঃ প্রতিষ্ঠিত, হেম বাবুকে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিতে

হইল না, পিতার সহিত ধীরে ধীরে তিনিও আইনের রণক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন এবং দেখিতে দেখিতে বড় বড় যোদ্ধাদের সম্মুখীন হইতে থাকিলেন। হেম বাবুর আশ্চর্য্য মিষ্ট কণ্ঠস্বর, আশ্চর্য্য অনুনয়ের ভাষা, আশ্চর্য্য বাক্য বিন্যাসের চতুরতা দেখিতে দেখিতে তিনি ব্যবসায়ে প্রিয় হইতে প্রিয়তর হইতে লাগিলেন।

শাস্ত্রে আছে "বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে"। হেমবাবুর বিদ্যার সুরভি ছাপরার ক্ষুদ্রপ্রাঙ্গন অতিক্রম করিয়া দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িল। সুদূর বেনারস, এলাহাবাদ হইতে পাটনা আরা পর্য্যন্ত সর্ব্বস্থান হইতেই তাঁহার আহ্বান আসিতে লাগিল! বীণাপাণি তাঁহার শ্বেত পদ্মদলের অনেকগুলি পাপড়িই এই সাধকের শিরে বর্ষণ করিয়াছিলেন। অচিরেই তাঁহার সহিত লক্ষ্মীর পদ্মহস্তের স্বর্ণবৃষ্টি মিলিত হইল, দেখিতে দেখিতে হেমচন্দ্রের রত্নাগার মণি মাণিক্য খচিত হইয়া উঠিতে লাগিল। তাঁহার পরের ইতিহাস অত্যন্ত সরল। ১৮৯৬ সাল হইতে আজ ১৯৩৬ সাল পর্য্যন্ত এই দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর ধরিয়া হেমচন্দ্র দিনের পর দিন আদালতের পর আদালতে অসাধারণ বাগ্মিতার পরিচয় দিয়া ছাপরার ও সেই সঙ্গে বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করিয়া ফিরিতে লাগিলেন।

হেমবাবু একজন বিচক্ষণ ব্যবহারাজীব। আইন সংগ্রামে তিনি অসম্ভবকে সম্ভব করিতে পারেন। তীক্ষ্ণ প্রশ্নোত্তরের জালে তিনি অপরাধীর অপরাধের সকল চেষ্টা নিমিষে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া উড়াইয়া দিতে পারেন। জুরির প্রতি তাঁহার অভিভাষণ শুনিলে মনে হয়, অপরাধীর দিক হইতে ইহার চেয়ে প্রাণস্পর্শী আবেদন আর হইতে পারে না। কিন্তু আজিকার এই সম্মান সভা তাঁহার সূক্ষ্ম আইন জ্ঞান বা শ্রেষ্ঠ বক্তৃতা শক্তির জন্য নহে। তিনি একজন উৎকৃষ্ট আইন ব্যবসায়ী, কিন্তু সেজন্য তিনি অপরাধীর প্রিয় হইতে পারেন, যে মনে করে যদি কেহ তাহাকে বাঁচাইতে পারে ত সে হেমবাবু। সেজন্য তিনি West-

word সাহেবের প্রিয় হইতে পারেন, যাহাকে তিনি এক মোকর্দ্দমায় তিনদিন ধরিয়া, এমন জেরা করিয়াছিলেন যে সাহেব পরে বলিয়াছিলেন যে আমি নিজে যদি কখন কোন মোকর্দ্দমায় পড়ি ত হেমবাবুকে আমাব উকিল রাখিব। সেজন্য তিনি অর্থ লাভ করিতে পারেন, যশ লাভ করিতে পারেন, কিন্তু সেজন্য কি তিনি জনসাধারণের প্রীতিলাভ করিতে পারেন ?

মানবের ইতিহাসে দেখা যায় দেশে দেশে যুগে যুগে কত শ্রেষ্ঠ মনীষী কত অসামান্য আইন জ্ঞান, কত আসামান্য বাগ্মিতা শক্তি লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, আজ তাঁহাদের স্মৃতিটুকু মাত্রও অবশিষ্ট নাই। হয়ত তাঁহাদের সঞ্চিত ধন সম্পত্তি আজ বংশ পরম্পরায় পুত্র কলত্রগণও ভোগ করিতেছেন, অথবা একদিন যে পথ দিয়া আসিয়াছিল, আর এক দিন সেই পথ দিয়া তাহা বাহির হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা আপন আপন জীবনে আত্মসুখ ছাড়া আর এমন কোন পরিচয়ই রাখিয়া যান নাই ভাবীকালে যাহা তাঁহাদের স্মরণীয় করিয়া রাখিতে পারে। হেমবাবু যদি এইরূপ আত্মসুখ সর্ব্বস্ব হইতেন, তাহা হইলে আজিকার এই জয়ন্তী সভার আয়োজন হইত না।

আমাদের দেশ ত্যাগ ও মনুষ্যত্বের উপাসক। এই দেশে একদিন এক রাজপুত্র জীর্ণ কন্থা পরিধান করিয়া রাজত্ব বৈভবে পদাঘাত করিয়া এক নিশীথ রাত্রে একাকী সত্যের সন্ধানে বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন তাই আজ তিনি ভগবান্ বুদ্ধ নামে বিশ্বের পূজনীয়। এই ত্যাগের মন্ত্র এ দেশের প্রতি ধূলি কণায়, এ জাতির প্রতি রক্তশিরায়। তাইত এই বিচিত্র দেশের ত্যাগাভিমানী অধিবাসী আজ সর্ব্বতোভাবে দীনহীন হইয়াও ত্যাগ বিহীন জীবনের সম্মুখে কখনও মস্তক অবনত করে না। হেমবাবুর জীবনে এই ত্যাগের প্রভাব অনির্ব্বচনীয়। পরণে অতি সাধারণ বেশ, ব্যবহারে বিনয় ও নম্রতার যেন প্রতিচ্ছবি। তাঁহাকে

দেখিলে সত্যই মনে হয় যেন ফলভারে বৃক্ষটি অবনত। যশ অর্থ খ্যাতি সম্পদ ইত্যাদি অহঙ্কার ও ঔদ্ধত্যের সকল সরঞ্জাম উপস্থিত থাকিতেও কেহ তাঁহার দৃষ্টিতে গর্ব্বের চিহ্ন, অধরে তাচ্ছিল্যের রেখা, অথবা বাক্যালাপে আত্মপ্রচারের কোনও প্রকার চেষ্টা কখনও দেখে নাই। এ শক্তি যে কত বড় তাহার তুলনা হয় না। এই অভ্রভেদী শক্তির সম্মুখে মাথা আপনিই নত হইয়া আসে। প্রকাণ্ড বাষ্পীয় শকট যখন দিগ্বিদিক কম্পিত করিয়া প্লটফরমে আসিয়া আপনার গতি সংযত করিতে থাকে, তখন এই শক্তির দানটার অসাধারণ সংযম শক্তিতে মন যেমন বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া যায় তেমনিই অসীম বিত্তশালী হেম বাবুর ত্যাগ ও সংযমের শান্ত মূর্ত্তি দেখিয়া মন শ্রদ্ধায় আপ্লুত হইয়া যায়।

আমাদের জৈব প্রকৃতিতে যাহা কিছু নিম্নস্তরের ঘৃণা অহঙ্কার ক্রোধ দর্প এ সকলকে আপনার দাস করিয়া রাখিয়া এই যে মানবটি স্নিগ্ধোজ্জ্বল মূর্ত্তিতে আমাদের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছেন, ইঁহার মধ্যে আমরা ভারতীয় সাধনার সেই রূপটিই দেখিতে পাই, চিরকালের সেই শাশ্বত বাণী শুনিতে পাই, যা অনন্তকাল ধরিয়া সংঘোষিত করিতেছে "মা কুরু ধনজন যৌবন গর্ব্বং হরতি নিমেষাৎকালঃ সর্ব্বং"। ইহারি মধ্যে দেখিতে পাই রাষ্ট্রপতি শিবাজীকে যাঁহার রাজ সিংহাসনের মাথায় একদিন উড়িয়াছে ত্যাগ ও সেবার প্রতিমূর্ত্তি গৈরিক পতাকা। তাই আজ এই ক্রোধশূন্য, বিলাস শূন্য, অহঙ্কার শূন্য মানবটি আমাদের এত প্রিয়।

হেমবাবু শুধু মাত্র শ্রদ্ধার আসন অধিকার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তাঁহার কর্ম্মজীবন বহুদূর বিস্তৃত। দেশবাসী তাঁহাকে শুধু শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া সর্ব্বসাধারণের সুখদুঃখজড়িত সংশয় হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া পূজার বেদীতে বসাইয়া দিয়া বাহির হইতে অর্গলবদ্ধ করিয়া দেন নাই। তিনি কর্ম্মমুখর জীবন পথে আরো সকলের মত একজন সাধনার পথিক। সামাজিক আদান প্রদানে উৎসবে, ব্যসনে, রোগশয্যা হইতে

নিমন্ত্রণ সভা পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র সমভাবে পরিদৃশ্যমান। যে ব্যক্তির নিজের জীবনে এরূপ সর্ব্ববিষয়ে অসাধারণ তীক্ষ্ণদৃষ্টি, যে ব্যক্তি অপরাধীর দিক হইতে এরূপ শ্রেষ্ঠ আবেদনকারী তাহারি হাতে অপরাধের বিচারভার সমর্পণ করাই সব চেয়ে যুক্তিসঙ্গত। তাই আজ দেশবাসী তাঁর হাতে দিয়াছে বিচার ও শাসনের ন্যায় দণ্ড এবং তাঁহার সুবিচারে সকলের এমনই বিশ্বাস যে, সকলে মনে করে ইঁহাকে বিনা বাক্যব্যয়ে নির্ব্বিচারে মানিয়া লওয়াই সব চেয়ে বেশী সুখকর এবং সামাজিক শৃঙ্খলা স্থাপনে সবচেয়ে মঙ্গলপ্রদ।

কিন্তু হেমবাবু কি শুধু আপনার জ্ঞান ও বিচার যুক্তির দ্বারাই সকলের হৃদয় অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছেন? শুদ্ধ জ্ঞান বা শুদ্ধ বিচার বুদ্ধি এবং শুদ্ধ কর্ত্তব্য স্পৃহা কখনও প্রাণের ক্ষেত্রকে জাগাইয়া তুলিতে পারে না। একমাত্র প্রাণই শুধু প্রাণকে স্পর্শ করিতে পারে। তাই এক মহাপ্রাণের মহাপ্রয়াণে কবি গাহিয়াছিলেন "এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ, মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।" দেহের অবসান হইতে পারে, কিন্তু প্রাণের মৃত্যু নাই, এই প্রকার ক্ষণজন্মা মহাপুরুষগণই দেশে দেশে প্রাণকে জাগরিত করিতে পারেন, প্রাণের স্পন্দনকে সঞ্জীবিত করিতে পারেন।

হেমবাবুর সব চেয়ে বড় শক্তি—এই প্রাণের শক্তি। তাঁহার হৃদয়ে আছে সর্ব্বসাধারণের জন্য অসীম ভালবাসা—সকলের প্রতি সীমাহীন প্রীতি। তাঁহার এই ভালবাসাই সকলের হৃদয় অধিকার করিয়াছে। সকলেই জানে তাহার দুঃখের কষ্টের অভাবের অভিযোগের এমন ধৈর্য্যবান সমদুঃখী শ্রোতা বুঝি আর নাই। সকলেই জানে অতি তুচ্ছ অতি ক্ষুদ্র সামান্য অভিযোগটি ও হেমবাবু শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করিবেন ও প্রতিবিধানের চেষ্টা করিবেন। সর্ব্ব সাধারণের এমন দরদীবন্ধু বুঝি আর নাই। তাই আজ তিনি ছাপরার মুকুটহীন সম্রাট্। বাহু

প্রেমের বাঁশী বাজিয়ে আজ সকলকে এমন করে মুগ্ধ করেছে যে সকলে বলছে—আমাদের আর নিজের কোন অস্তিত্ব নেই, আমাদের সকলের অস্তিত্ব তোমার মধ্যে। তুমি আমাদের আনন্দের পথে মঙ্গলের পথে লইয়া চল, আমরা নির্ব্বিচারে তোমাকে অনুসরণ করিয়া কৃতার্থ হই।

এমন মানব সংসারে প্রতিনিয়ত জন্মায় না। যখন জন্মে তখন চতুর্দ্দিক আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া যায়। সেই আলোকের প্রভায় প্রত্যেকে আপনাকে আবিষ্কার করে। মহত্বের প্রেরণা, ত্যাগের প্রেরণা হৃদয়ে জাগরিত হয়। তখন আমাদের মধ্যে জাগিয়া উঠে সেই আদিম মানব, যে বৃহতের সম্মুখে চিরকাল মস্তক অবনত করিয়া আসিয়াছে। যে মুহূর্ত্তে আমরা অনুভব করিলাম আমাদের মধ্যে এমন একজন মহাপুরুষ রহিয়াছেন, যাহার সম্মানে আমরাই সম্মানিত, সেই মুহূর্ত্তেই আমাদেব মধ্যে জাগিয়া উঠিল সেই পুজারী মন, পুজার নৈবেদ্য লইয়া প্রস্তুত হইয়া উঠিল সেই উপাসক মন। প্রতিদিনের বিলম্ব অসহনীয় হইয়া উঠিল যেন একটা কর্ত্তব্য অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইতেছে। তাই আজ আমাদের এই দীনহীন অনুষ্ঠানের তুচ্ছ চেষ্টা। তাই আজ আমরা এই মহাপ্রাণের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিতেছি—"হে সত্যসন্ধানী হে মহামানব, তুমি আমাদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া আমাদের ধন্য করিয়াছ তোমার আদর্শ আমাদের ভবিষ্যতের যাত্রাপথকে চিরকাল আলোকিত করুক। তুমিত আমাদের পুজার অপেক্ষা রাখ নাই তুমি আজীবনব্যাপী সাধনা দ্বারা আপনার দুর্ব্বলতাকে নিষ্পেষিত করিয়াছ, আপনার যা কিছু শ্রেষ্ঠ, যা কিছু মহৎ তাহাই প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছে। তোমার এই সাধনার ইতিহাস আমাদের আবহমানকাল পর্য্যন্ত অনুপ্রাণিত করিতে থাকুক, তোমাকে বলিবার আমাদের আর কিই বা আছে। শুধু ৺ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা করি তিনি যেন তোমাকে আমাদের মধ্যে আরো কিছুকাল রাখেন। তুমি না থাকিলে আমাদের

মধ্যে যে কি এক বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হইবে তার ভীষণ রূপ আমরা কল্পনাতে পর্য্যন্ত আনিতে পারি না। তুমি ধন্য, তোমার প্রভাবে আজ আমরাও ধন্য। তোমার জন্ম গ্রহণে দেশ পবিত্র, জাতি শক্তিমান, তোমার জন্মগ্রহণে কুলং পবিত্রং, জননী কৃতার্থা। তোমাকে আমরা আজ এই জয়ন্তী উপলক্ষে অভিবাদন করি।

লেখকের পরিচয়—ইঁহার আদি নিবাস ২৪ পরগণার ব্যারাকপুরে (যাহা পূর্ব্বে চাণক নামে খ্যাত ছিল) ইঁহারা অত্যন্ত প্রাচীন জমিদার বংশ। পুরাতন দলিলাদিতে, মুসলমান আমলের পাঞ্জা ইত্যাদিতে কুমার নামে অভিহিত। ইঁহারা অত্যন্ত প্রতাপশালী ছিলেন এবং কথিত আছে, ইঁহাদের নামে নাকি বাঘে গরুতে এক ঘাটেই জল খাইত। ইঁহার পিতামহ হরিহর মুখোপাধ্যায় প্রথম বাসভূমি ত্যাগ করিয়া বি এল্ পাশ করিয়া বাঁকুড়ায় ওকালতী আরম্ভ করেন এবং পরে সরকারী উকিল হন। ইনি বহুকাল মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ছিলেন এবং বাঁকুড়া জেলায় ইঁহারই প্রথম ত্রিতল অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইঁহার পিতা ৺চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিহারে সবজজ ছিলেন এবং অবসর গ্রহণ করিয়া পুরীতে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থিতি করিয়াছিলেন। ইঁহার মাতুল বাবু প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য বিহারে ডিষ্ট্রীক্টজজ্ ছিলেন। অধুনা অবসর গ্রহণ করিয়া কলিকাতায় লেক্‌রোডে সুরম্য ভবন নির্ম্মাণ করিয়া পুত্র ডাঃ ভবানীচরণ ভট্টাচার্য্য (পি, এচ, ডি লণ্ডন) এর সহিত অবস্থিতি করিতেছেন। ইঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ডাঃ ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় ছাপরার হেল্‌থ অফিসার। ইনি নিজে ওকালতী করেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই Asst. public prosecutor হইয়াছেন। ইনি লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে এম্, এস্, সিতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, কিন্তু দাসত্ব করিবেন না প্রতিজ্ঞা ছিল বলিয়া চাকরী গ্রহণ বা চাকরীর চেষ্টা করেন নাই। ইনি একজন সুলেখক, বাগ্মী ও সুঅভিনেতা এবং

ব্যবহারে অত্যন্ত সৌজন্যপরায়ণ। ইনি আধুনিক যুগের শিক্ষা ও কৃষ্টির একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

ছাপরা কালীবাড়ী

বাংলার বাহিরে বাঙ্গালী যেখানে আপনার নাম উজ্জ্বল করিয়াছে, আপনার যশ ও কীর্ত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, বাহিরের ঝড় ও ঝঞ্ঝার শত আবর্ত্তনের মধ্যে এখনও আপনার বিজয় পতাকা অম্লান রাখিয়াছে, বিহারের এই সুদূর প্রান্তে, ছাপরা তাহাদের অন্যতম। এখানকার সমস্ত বাঙ্গালী একই পরিবারের মত বিদেশবাস করিতেছেন। তাঁহাদের উৎসব, আনন্দ, পূজা পার্ব্বণের যে সুপ্রতিষ্ঠিত ক্ষেত্র তাঁহারা এই দীর্ঘকাল ধরিয়া রচনা করিয়াছেন তাহা ছাপরা কালীবাড়ী নামে খ্যাত। এখাণে, বালিকা বিদ্যালয়, পুস্তাকাগার, পূজার বেদী সকলই সুবিন্যস্তভাবে রক্ষিত, প্রতিবৎসর অত্যন্ত সমারোহে ৺দুর্গাপূজা ও ৺কালীপূজা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ৺দুর্গাপূজার তিনদিন এখানে অরন্ধন ব্রত পালিত হয়। এই কয়দিন এখানে সকলে স্ত্রী পুরুষ বালক বালিকা নির্ব্বিশেষে প্রসাদ গ্রহণ করিয়া থাকেন।

এই কালীবাড়ীর গৌরবে ওখানকার সকল বাঙ্গালীই গর্ব্ব অনুভব করে। এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা টুনটুন বাবু ও তাহার সভাপতি হেমচন্দ্র বাবু।

স্বর্গীয় মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ

ভগবান চন্দ্রের কন্যা জগত্তারিণী দেবীর সহিত কথক ধরণীধর শিরোমণির বিবাহ হয়। ধরণীধর কথকতা করিয়া অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি দোল দুর্গোৎসব ইত্যাদি বার মাসে তের পার্ব্বণ, আমোদ প্রমোদ ও দানে তাহার অধিকাংশ ব্যয় করিয়া অতি অল্পই সঞ্চয় করিয়া যান। তিনি ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ৬২ বৎসর বয়সে অন্তঃসত্বা অবস্থায় তাঁহার পত্নী জগত্তারিণী ও ১টী শিশুপুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। জগত্তারিণী স্বামীর মৃত্যুর পাঁচ মাস পরে ১টী কন্যা প্রসব করেন ও স্বামীর সঞ্চিত অর্থ এই কন্যার বিবাহে ও পুত্রের বিদ্যাশিক্ষায় ব্যয় করেন।

মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায় :—কথক ধরণীধর শিরোমণির উল্লিখিত শিশুপুত্রই মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ২৪ শে এপ্রিল খাঁটুরাগ্রামে (সন ১২৮২ সালের ১৯শে বৈশাখ) জন্মগ্রহণ করেন। ইনি দশবৎসর বয়সে পিতৃহীন হইয়া মাতার তত্বাবধানে বাড়ীতে পণ্ডিত ৺ভুবনমোহন বিদ্যালঙ্কার মহাশয়কে গৃহশিক্ষক রাখিয়া তাঁহার নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করেন। তিনি কিছুদিন খাঁটুরা মধ্য ইংরাজী ও গোবরডাঙ্গা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। কিন্তু সংস্কৃতে অনুরাগের আধিক্যবশতঃ ইনি চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে স্বগ্রাম ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসেন। সেখানে তাঁহার পিতৃব্য শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের বাটিতে তাঁহার তত্বাবধানে থাকিয়া ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলে পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন এবং এই স্কুল হইতে এণ্ট্রেন্স্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। আইএ এবং বিএ তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে পাশ করেন এবং এম এ পরীক্ষায় সংস্কৃত কলেজের ছাত্ররূপে উত্তীর্ণ হন।

অল্প বয়স হইতে দর্শন শাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মে। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য যতটুকু প্রয়োজন পাঠ্যপুস্তকের আলোচনায় ততটুকু মাত্র সময় দিয়া অধিকাংশ সময় ধর্ম্মপুস্তক ও দর্শন শাস্ত্রের অনুশীলনে নিযুক্ত থাকিতেন এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভের চেষ্টা করিতেন। দর্শন শাস্ত্র তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল। তিনি ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে এণ্ট্রেন্স ও ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিএ পরীক্ষায় সংস্কৃত সাহিত্যে অনার্স লইয়া সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হন এবং "বিদ্যারত্ন" উপাধি লাভ করেন। ইনি ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে উক্ত কলেজ হইতে এমএ পরীক্ষায় সংস্কৃতে প্রথম স্থান প্রথম শ্রেণীতে অধিকার করিয়া "শাস্ত্রী" উপাধি লাভ ও সুবর্ণ পদক প্রাপ্ত হন। কিন্তু তিনি এতদূর বিনয়ী ছিলেন যে এই উপাধি কখনও ব্যবহার করিতেন না।

ইহার পর তাঁহার বিদেশে গিয়া পাশ্চাত্য দর্শন আলোচনার প্রবল ইচ্ছা ছিল। কিন্তু পরিবার প্রতিপালনের গুরুভার তাঁহার স্কন্ধে পতিত হওয়ায় তিনি এই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের সাহায্যে তিনি কটক রেভেন্সা কলেজে ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। সেখানে দ্বাদশ বৎসর সংস্কৃত ও ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপকের কার্য্য করিয়া ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় যে কলেজে তিনি ছাত্র ছিলেন তাঁহার সেই প্রিয় সংস্কৃত কলেজে বদলি হন। এখানে তাঁহাকে ইংরাজী, সংস্কৃত, ইতিহাস ও দর্শনের অধ্যাপকতা কার্য্য করিতে হইয়াছিল। তাঁহার এই সকল বিষয়ে সমান জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য ছিল বলিয়াই এই সকল বিষয়ের অধ্যাপনা একাই করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। বহু বৎসর এইরূপ কঠোর পরিশ্রমের পর তিনি নিজে যখন অধ্যক্ষের কার্য্য করিয়াছিলেন তখন এই সকল বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

তিনি ১৯০৮ সালে চারি মাস অস্থায়ীভাবে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের কার্য্য করেন, পরে ১৯১০ সনে যখন মহামহোপাধ্যায় সতীশ চন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন তখন তাঁহাকে ঐ কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ করা হয়। ১৯২০ সনের এপ্রিল মাসে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মৃত্যুর পর তিনি স্থায়ীভাবে অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন এবং অবসর গ্রহণ করা অবধি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ পরীক্ষকরূপে, তারপর ম্যাট্রিক ও ইণ্টার মিডিয়েট পরীক্ষায় সংস্কৃতের প্রধান পরীক্ষক-রূপে এবং শেষে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৩২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সংস্কৃত, প্রাকৃত ও বাঙ্গালার অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

তিনি সরকারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া দেশের প্রচলিত শিক্ষা ও সামাজিক আচার সংস্কারে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। ইনি ১৯২০ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে সংস্কৃত কলেজে অধ্যক্ষের কার্য্য করিবার সময়ই মেদিনীপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সামাজিক সম্মিলনের সভাপতিরূপে এক অভিভাষণে সমাজ সংস্কার বিষয়ে নিজের স্বাধীন মত ব্যক্ত করেন। ইহাতে তিনি অসবর্ণ বিবাহ শাস্ত্র বিরুদ্ধ নহে এবং হিন্দু সমাজের রক্ষার জন্য প্রচলিত হওয়া আবশ্যক এইমত সমর্থন করেন। তিনি বঙ্গীয় সমাজ সংস্কার সমিতির প্রথম সম্পাদক ও পরে সভাপতি হন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালীর আমূল সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার মত ছিল পাশ্চাত্য জ্ঞানকে প্রাচীন জ্ঞানের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা এবং মাতৃভাষার মধ্য দিয়া প্রচার করা এবং সেই সঙ্গে জাতীয় মৌলিকতা ও বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা।

তিনি স্ত্রী শিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন এবং "স্ত্রী বিদ্যালয় সমিতি" গঠন করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার বাসস্থান বালিগঞ্জে একটী

নারী সমুন্নতি সমিতি, একটী ম্যালেরিয়া নিবারণী সমিতি ও ১টী হিন্দু বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করেন।

তিনি বালিগঞ্জে বালকদিগের জন্য "জগদ্বন্ধু ইনষ্টিটিউশন্" নামক উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন এবং বহুকাল সম্পাদকের কার্য্য করিয়াছিলেন, তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল ইহাকে ক্রমশঃ কলেজে পরিণত করা।

তিনি এই সকল জনহিতকর প্রতিষ্ঠান রক্ষার ও উন্নতির জন্য কেবল যে নিজের বহুমূল্য সময় দিতেন তাহা নহে, আবশ্যক হইলে ঋণ করিয়াও অর্থব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

ইনি বহু বাংলা ও সংস্কৃত স্কুল পাঠ্য পুস্তক অভিনব প্রণালীতে রচনা করেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হেম চন্দ্রের "দেশী নামমালা" নামক প্রাকৃত শব্দকোষ সম্পাদন করেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক বাংলা ভাষায় যে সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রচলিত ইহা তাঁহারই সম্পাদিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত তুলনা মূলক দর্শন ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় পুস্তক ইহার সারাজীবনের গবেষণার ফল। এই পুস্তকখানি তিনি সময় অভাবে এবং শেষ জীবনে অসুস্থতা নিবন্ধন শেষ করিতে পারেন নাই। পরে তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় পুস্তকখানি শেষ করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে তিনি দেখাইয়াছেন যে জগতের সকল দর্শন শাস্ত্রের মধ্যেই সত্য নিহিত আছে। এই সব মতবাদগুলি পরস্পর বিরোধী হওয়ার কারণ এই যে তাহারা কেহই একা সমগ্র সত্যকে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। সমগ্র সত্যকে লাভ করিতে হইলে পরস্পর বিরুদ্ধ এই মতগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য আনিতে হইবে এবং সেই সামঞ্জস্যের মধ্যেই পূর্ণ সত্য আত্মপ্রকাশ করিবে। গল্পে কথিত পাঁচটী অন্ধ ব্যক্তির হাতী সম্বন্ধে অভিমত যেমন

তাদের নিজেদের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা অনুসারে পরস্পর বিরোধী, অথচ খণ্ড ভাবে সত্য এও সেইরূপ। তাদের সকলের মতের সামঞ্জস্য আনিলে যেমন হাতীর পূর্ণরূপের বিবরণ পাওয়া যায় এখানেও প্রতিদার্শনিক সমস্যা সম্বন্ধে সকল বিরোধী মতের সামঞ্জস্যের মাঝখানে সেই সমস্যার পূর্ণ সমাধান পাওয়া যায়।

ইনি ১৯৩৩ সালে ৩০ শে নভেম্বর (১৫ই অগ্রহায়ণ ১৩৪০) বৃহস্পতিবার বালিগঞ্জে তাঁহার ১৮।১ ফার্ণ রোডস্থ ভবনে পাঁচ পুত্র এবং আট কন্যা রাখিয়া ও বৃদ্ধা মাতাকে শোকসাগরে ভাসাইয়া কয়েকদিন মাত্র জ্বর ভোগের পর পরলোক গমন করেন। তাঁহার সাধ্বী স্ত্রী শ্রীমতী রাজবালা দেবী তাঁহার মৃত্যুর মাত্র তিন মাস পূর্ব্বে দেহত্যাগ করেন।

তিনি সত্যবাদী, অল্পভাষী, বিনয়ী এবং মৃদুস্বভাবের লোক ছিলেন এবং জীবনে কখনও পান তামাক চুরুট পর্য্যন্ত স্পর্শ করেন নাই।

ডাঃ ৺ জ্যোতির্ম্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-বি :—ইনি মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইনি ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ২রা ডিসেম্বর কলিকাতায় ১৮নং চাষাধোপা পাড়া ষ্ট্রীটে মামার বাড়ীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি হিন্দুস্কুল হইতে এণ্ট্রেন্স্ ও সেণ্টজেভিয়ারস্ কলেজ হইতে ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হইতে এম্-বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯১১ সালে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ভগিনী লীলাবতী দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

তিনি মেডিকেল কলেজে চক্ষু ও দন্ত চিকিৎসার পরীক্ষায় উচ্চ সম্মান লাভ করেন। এম বি পাশ করার পর প্রিন্সিপাল ক্যালভার্ট সাহেব ইঁহাকে মেডিকেল কলেজে চক্ষু হাসপাতালের হাউস সার্জ্জেন নিযুক্ত করেন। ইহার পর তিনি বাঁকিপুর ও হাতুয়ার মহারাজার হাঁসপাতালে

এক বৎসর এ্যাসিষ্টেন্ট্ সার্জ্জেনের কাজ করিয়া পুনরায় কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন ও প্রথম মেও হাসপাতালের হাউস সার্জ্জন ও পরে বেলগেছিয়া মেডিকেল কলেজের চক্ষু বিভাগের সার্জ্জেনের কার্য্য করেন ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে জুবিলি গবেষণায় প্রাইজ ও স্বর্ণ পদক এবং দ্বারভাঙ্গা বৃত্তি প্রাপ্ত হন। তিনি ১৯২০ হইতে ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বঙ্গ দেশীয় বিদ্যালয় সমূহের স্বাস্থ্য পরীক্ষকের কার্য্য করেন ও পাঁচ বৎসর কলিকাতা মেডিকেল কলেজের চক্ষু হাসপাতালের ছাত্রদের চক্ষুপরীক্ষা ও দরিদ্র ছাত্রদিগকে বিনামূল্যে চশমা বিতরণ কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সেনা বিভাগের রিজার্ভ অফিসার নিযুক্ত হন এবং তিন বৎসর পরে পরীক্ষা দিয়া "ক্যাপ্টেন" উপাধি লাভ করেন। তিনি কলিকাতায় ৪৬নং কৈলাস বসু ষ্ট্রীটে নিজের স্বোপার্জ্জিত অর্থে একটী বাড়ী ক্রয় করিয়া নিজব্যয়ে একটী চক্ষু চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিলেন।

তিনি ইংরাজী, হিন্দি, উর্দ্দু ও বাংলাভাষায় পাঁচ ছয় খানি অভিনব প্রণালীতে স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধীয় পুস্তক রচনা করিয়াছেন। এই পুস্তকগুলি বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বিদ্যালয় সমূহে পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছে।

তিনি কেন্দ্রীয় ম্যালেরিয়া নিবারণী সমিতির একজন অক্লান্তকর্ম্মী এবং তাঁহার কার্য্যের জন্য ঐ সমিতি তাঁহাকে কৈলাসবসু সুবর্ণ পদক প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার স্বগ্রাম খাঁটুরিয়ায় তিনি একটী ম্যালেরিয়া নিবারণী সমিতি ও কালাজ্বরের কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছেন।

দুঃখের বিষয় এই পুস্তকখানি ছাপা হইবার আগে কয়েকটী শিশু সন্তান ও বিধবা পত্নীকে রাখিয়া তিনি নিউমনিয়া রোগে আক্রান্ত হইয়া মাত্র ৪৫ বৎসর বয়সে আকস্মিকভাবে ৩রা জুলাই ১৯৩৬ সনে দেহ

ত্যাগ করেন। এই ঘটনায় তাঁহার আত্মীয় স্বজন সকলের মনে বিশেষ আঘাত লাগিয়াছে।

শ্রীযুক্ত প্রভাময় বন্দ্যোপাধ্যায়:—ইনি মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পুত্র। ইনি ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ১০ই নভেম্বরে জন্মগ্রহণ করেন ও সংস্কৃত কলেজ হইতে বি এ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ভারতীয় ইতিহাসে এম এ পাশ করিয়া হিন্দুস্কুলে শিক্ষকের কার্য্য করেন। পরে রামসাগর উচ্চ ইংরাজীস্কুলে অনেকদিন প্রধান শিক্ষকের কার্য্য করেন। রামসাগরে, বার বার ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়া তিনি কার্য্যে ইস্তফা দিয়া সম্প্রতি কলিকাতা ফিরিয়া আসিয়াছেন এবং স্কুলপাঠ্য পুস্তক লিখনে মন দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়:—ইনি মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃতীয় পুত্র। ইনি ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের ৫ তারিখে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়স হইতেই তিনি মেধাবী ছাত্র বলিয়া পরিচিত হন। ইনি বালিগঞ্জে জগদ্বন্ধু ইন্‌ষ্টিটিউসন হইতে ১৯২২ সনে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া পাশ করেন এবং ইতিহাস ও সংস্কৃতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে ১৯২৪ সনে আইএ পরীক্ষায় পঞ্চম স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হন। ১৯২৬ সনে ঐ কলেজ হইতেই দর্শন শাস্ত্রে প্রথম বিভাগ অনার্সের বি এ পাশ করেন। বি এ পরীক্ষার ৬ মাস বাদেই তিনি এলাহাবাদে ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় সিভিল সার্ভিস প্রতিযোগীতা পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হন। তিনি এই পরীক্ষায় বাংলা হইতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। বাংলা হইতে, তাঁহার পূর্ব্বে বা পরে এই পরীক্ষায় সংস্কৃত ও দর্শন শাস্ত্র লইয়া কেহ কৃতকার্য্য হন নাই, এই এক তাঁহার বিশেষত্ব। পরে শিক্ষা সমাপ্ত করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে দুই বৎসরের জন্য ইংলণ্ডে প্রেরিত

হন। তিনি ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমন করিয়া প্রথমে কৃষ্ণনগরে এ্যাসিস্‌টেন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, পর পর. দুই বৎসর কুষ্টিয়ায় সাবডিবিশনাল অফিসার, একবৎসর ময়মনসিংহে জয়েণ্ট-ম্যাজিষ্ট্রেট, এবং বরিশালে কিছুদিন জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রট ও এ্যাডিশন্যাল জজের কার্য্য করিয়া এখন চট্টগ্রামে এ্যাডিশন্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিতেছেন।

তিনি খুব জন প্রিয় কর্ম্মচারী। ইনি নিরামিষাসী ও জীব হিংসার বিরোধী। দুই বৎসর কাল বিলাতে অবস্থান কালে অনেক বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও ইনি নিরামিষাহার ত্যাগ করেন নাই। ইনি বাংলাভাষায় কয়েকটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ ও সুন্দর কবিতা পুস্তক প্রভৃতি রচনা করিয়াছেন এবং পিতার অসমাপ্ত তুলনা মূলক দর্শন সম্বন্ধে পুস্তকখানি লিখিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশ করিয়াছেন। সংস্কৃতভাষায় ইঁহার বুৎপত্তি দেখিয়া গৈলা কবীন্দ্র কলেজের পণ্ডিতমণ্ডলী ইঁহাকে "বিদ্যাভূষণ" উপাধি দিয়া ভূষিত করিয়াছেন। ইনি শ্রীহট্টের মুরারীচাঁদ কলেজের অধ্যাপক শ্রীনলিনীমোহন শাস্ত্রীর কন্যা শ্রীমতী আশার পাণি গ্রহণ করিয়াছেন। ইঁহার স্ত্রী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইণ্টার মিডিয়েট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মহিলা।

শ্রীযুক্ত শোভাময় বন্দ্যোপাধ্যায় :—ইনি মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায়ের চতুর্থ পুত্র। ইনি ১৯০৯ সালের ৪ঠা আগষ্ট বালিগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। হিন্দুস্কুল হইতে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি প্রেসিডেন্সিতে ভর্ত্তি হন এবং সেখান হইতে বিএ, ও এমএ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৩৫ সালে বিএ ল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি কলিকাতা হাইকোর্টের এ্যাডভোকেট হইয়াছেন। ছাত্রাবস্থায় ইনি খেলায় বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন এবং একজন বিশিষ্ট ফুটবল খেলোয়াড় বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রেসিডেন্সি কলে-

জের টীমের হইয়া অনেক প্রতিযোগীতায় খেলিয়াছেন এবং অনেক শীল্ড কাপজয় করিয়া মেডেল প্রাপ্ত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত তেজোময় বন্দ্যোপাধ্যায় :—ইনি মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্র। ইনি ১৯১০ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর বালিগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। মোটর ও ইলেকট্রিকের ইঞ্জিনিয়ারী শিক্ষা ইনি যোগ্যতার সহিত আয়ত্ত করিয়া প্রথম বিভাগে ডিপ্লোমা পাইয়াছেন এবং স্বাধীন ব্যবসার দ্বারা জীবিকা অর্জ্জনে মন দিয়াছেন।

খাঁটুরাস্থ শাণ্ডিল্যগোত্রীয় সর্ব্বানন্দী মেলের কাঁটাদিয়া বন্দ্যঘটী বংশাবলী

(কনৌজাগত)

ক্ষিতীশ
|
জয়নারায়ণ
|
বরাহ
|
সুবুদ্ধি
|
বৈনতেয়
|
বিবুধেষ
|
সুভিক্ষ
|
ভয়াশহ
|
ধরণী
|
মহাদেব
|
মকরন্দ
|
দাশরথী
|
ভীষ্ম
|
মাধব
|
আদিত্য
|

পীতাম্বর
গঙ্গাগতি
গোবিন্দ
রূপনারায়ণ
মহাদেব
চন্দ্রশেখর
রামরাম
রামপ্রাণ
রামরতন
কেশব
রামধন
উমাকান্ত
রাধামোহন
দীনবন্ধু
শ্রীশচন্দ্র (প্রথম বিধবা বিবাহ করেন)
যাদব
ধরণী
বন্ধু
হারাণ
শিবনাথ
বেণী
মুরলীধর
পঞ্চানন
হরি
জ্যোতির্ম্ময়
প্রভাময়
হিরণ্ময়
শোভাময়
তেজোময়
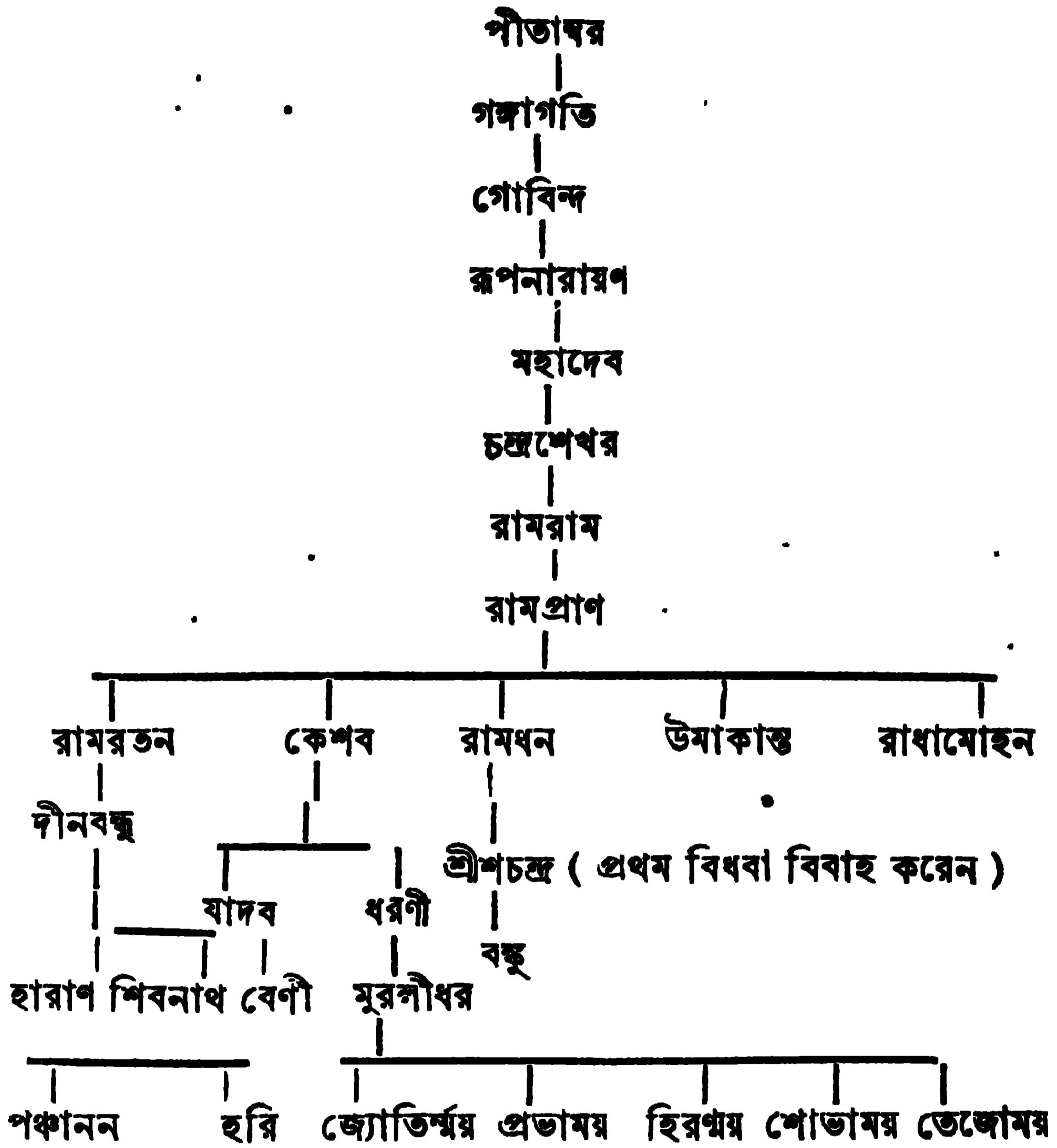
ছাপরার উকীল শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ গুপ্ত

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথের পূর্ব্বপুরুষদের আদি নিবাস হালিসহর শিবের গলি। ইঁহারা জাতিতে বৈদ্য, কাশ্যপ গোত্র। যতদূর জানিতে পারা যায় ইঁহার পিতামহ ৺গোপীনাথ গুপ্ত ম্যালেরিয়ার তাড়নায় প্রায় ১১০ বৎসর পূর্ব্বে নৌকাযোগে সপরিবারে হালিসহর হইতে ছাপরায় আসিয়া বসবাস করেন। তিনি ছাপরাতে ভূসম্পত্তি অর্জ্জন করেন। তাঁহার সন্তানগণ তাঁহার ঐ সম্পত্তির মধ্যে একটি বাজার স্থাপন করেন। ঐ বাজার তাঁহার বংশধর "বংশীধর বাবুর বাজার" বলিয়া প্রসিদ্ধ। ৺গোপীনাথ গুপ্ত মহাশয়ের পুত্র ৺বংশীধর গুপ্ত ছাপরার একজন খ্যাতনামা উকীল ছিলেন এবং তিনিও যথেষ্ট সম্পত্তি অর্জ্জন করেন। ৩২ বৎসর কাল ওকালতী করিয়া ৬৩ বৎসর বয়সে ১৯১৫ সালের বৈশাখ মাসে তিনি ৺কাশীধামে শিবলোক প্রাপ্ত হন।

তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত অমৃতময় গুপ্ত এম্ এ বি এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বর্ত্তমানে এলাহাবাদ হাইকোর্টে ওকালতী করিতেছেন। এলাহাবাদ হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ উকীল ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছে। বংশীধর বাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র—(অর্থাৎ তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ৺গোপালচন্দ্র গুপ্ত মহোদয়ের পুত্র) শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ গুপ্ত ১৮৮৫ সালের ২৬শে জানুয়ারী ছাপরায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯১০ সালে এম্ এ বিএল্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি ছাপরাতে ওকালতী করিতেছেন। তাঁহার বিবাহ কলিকাতার খ্যাতনামা কবিরাজ ৺দেবেন্দ্রনাথ সেন মহোদয়ের তৃতীয়া কন্যার সহিত হইয়াছে। তিনি ছাপরায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ উকীল বলিয়া

পরিগণিত এবং সর্ব্বসাধারণে তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা ভক্তি করে। তিনি

ছাপরায় একটি প্রাসাদোপম বাটী নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং তাঁহার খুল্লতাত ভ্রাতাদের সহিত সহোদর ভ্রাতার ন্যায় সদ্ভাবে দিনযাপন করিতেছেন। তিনি তাঁহার খুল্লতাত ভ্রাতাদের অভিভাবক। তাঁহার পিতৃব্য পুত্রেরা তাঁহাকে যেরূপ শ্রদ্ধাভক্তি করে, তাহা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। ৺বংশীধর বাবুর মৃত্যুর পর তিনি তাঁহার সন্তানদের সহিত একান্নভুক্ত হইয়া তাঁহাদের অভিভাবকস্বরূপ সকল কার্য্য পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার পুত্র কন্যাগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠা কন্যা সুজাতা ও কনিষ্ঠা কন্যা নমিতা অকালে পরলোক গমন করিয়াছেন; উপস্থিত তাঁহার পুত্র অজিতকুমার সন ১৯৩৬ সালে পাটনা ইউনিভার্সিটী হইতে ম্যাট্রিক্ পরীক্ষায় সপ্তম স্থান অধিকার করিয়া ১৫৲ টাকা বৃত্তি ভোগ করিতেছেন। অজিতকুমার পাটনা সায়েন্স কলেজে অধ্যয়ন করিতেছেন: তাঁহার অপর পুত্র অশোককুমার ছাপরা "সারণ একাডেমিতে" পড়িতেছে।

ইঁহারা ছাপরার বাঙ্গালী অধিবাসীদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম। অবসর প্রাপ্ত বিভাগীয় কমিশনার মিঃ জে এন্ গুপ্ত আই, সি, এস্, সি, আই, ই, ও বি, ই উক্ত যতীন্দ্র বাবুর খুল্লতাত পুত্র। বাল্যে মিঃ জে এন্ গুপ্তও ছাপরা জেলাস্কুলে অধ্যয়ন করিতেন।

যতীন্দ্র বাবু অতি অমায়িক, মিষ্টভাষী, সরলপ্রাণ। ছাপরার যাবতীয় সদনুষ্ঠানে তিনি একান্ত মনে যোগদান করিয়া থাকেন।

ভগবান ইঁহাদিগকে দীর্ঘায়ু করুন।

বংশ তালিকা

স্বর্গীয় দেবীচরণ গুপ্ত—ঠাকুর দাসী দেবী
স্বর্গীয় রামচন্দ্র গুপ্ত—গোবিন্দময়ী
স্বর্গীয় গোপীনাথ গুপ্ত—স্বর্ণময়ী
৺গোপালচন্দ্র
৺ভবতারিণী
৺উপেন্দ্রনাথ
৺শিবাণী শ্রীযুক্তা
৺বংশীধর
নগেন্দ্রবালা
গঙ্গাধর
শ্রীযুক্তা অন্নপূর্ণা
৺অক্ষয়কুমার
নগেন্দ্রবালা
সরলাবালা
ইন্দুমতী
যতীন্দ্রনাথ
প্রভাবতী
সুজাতা
অমর নাথ
অজিৎ কুমার
অশোক কুমার
নমিতা
শরৎচন্দ্র
শৈলবালা
হৃষিকেশ
বীণাপাণি
মধুসূদন
রেখা
শীলা
খুকু
পঞ্চানন
দাসু
সুধীরচন্দ্র
বিজয়চন্দ্র
মণ্টুরাণী
রাধুরাণী

ছবি
দেবী
বেবী
সরোজলতা
তরুলতা
মণিময়
সুলতা
সুষমা
অমৃতময়
শান্তিময়
অনুজা
করুণাময়
কল্যাণকুমার
বিভূতিকুমার
করবী
কেতকী
সীমা
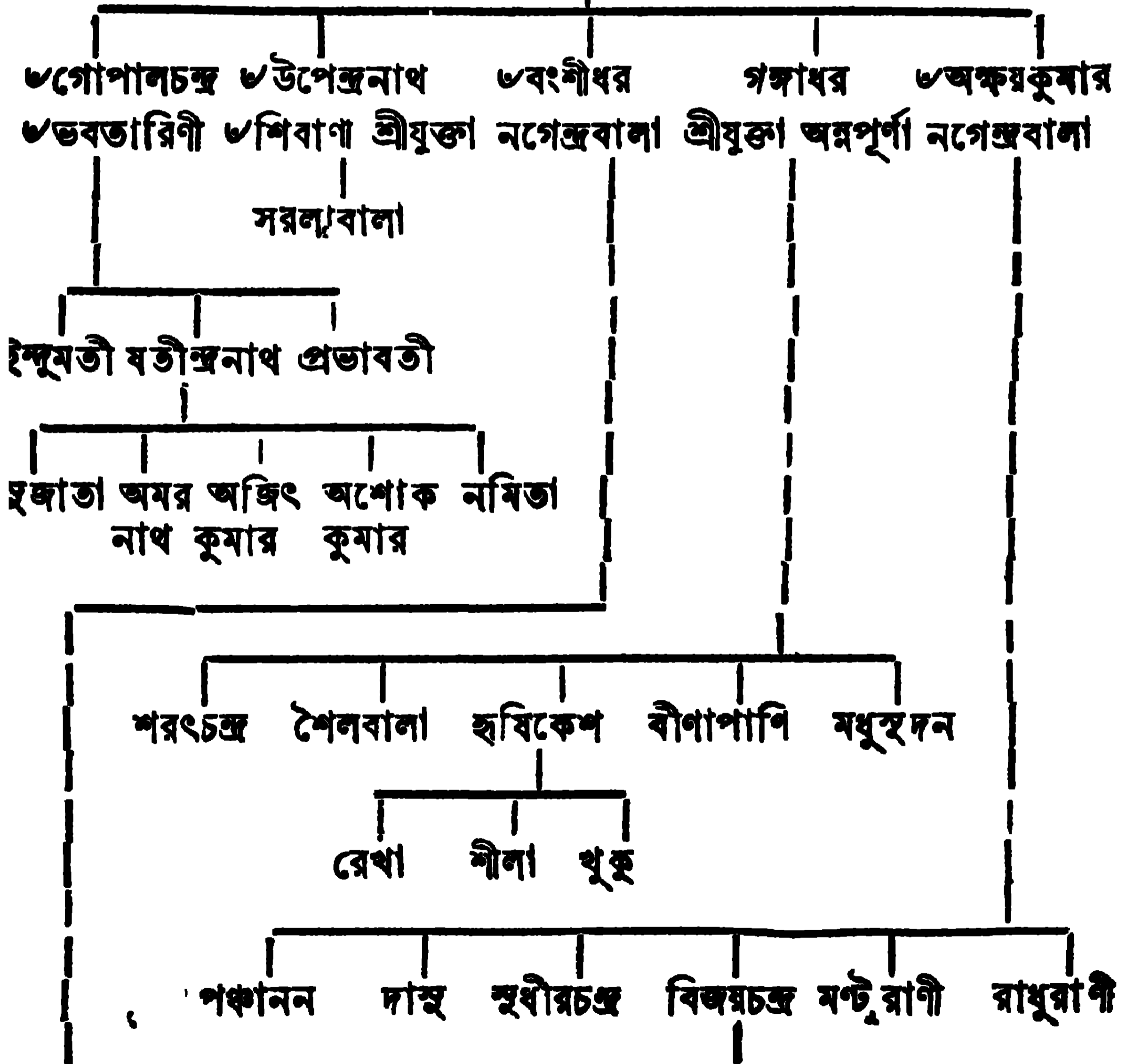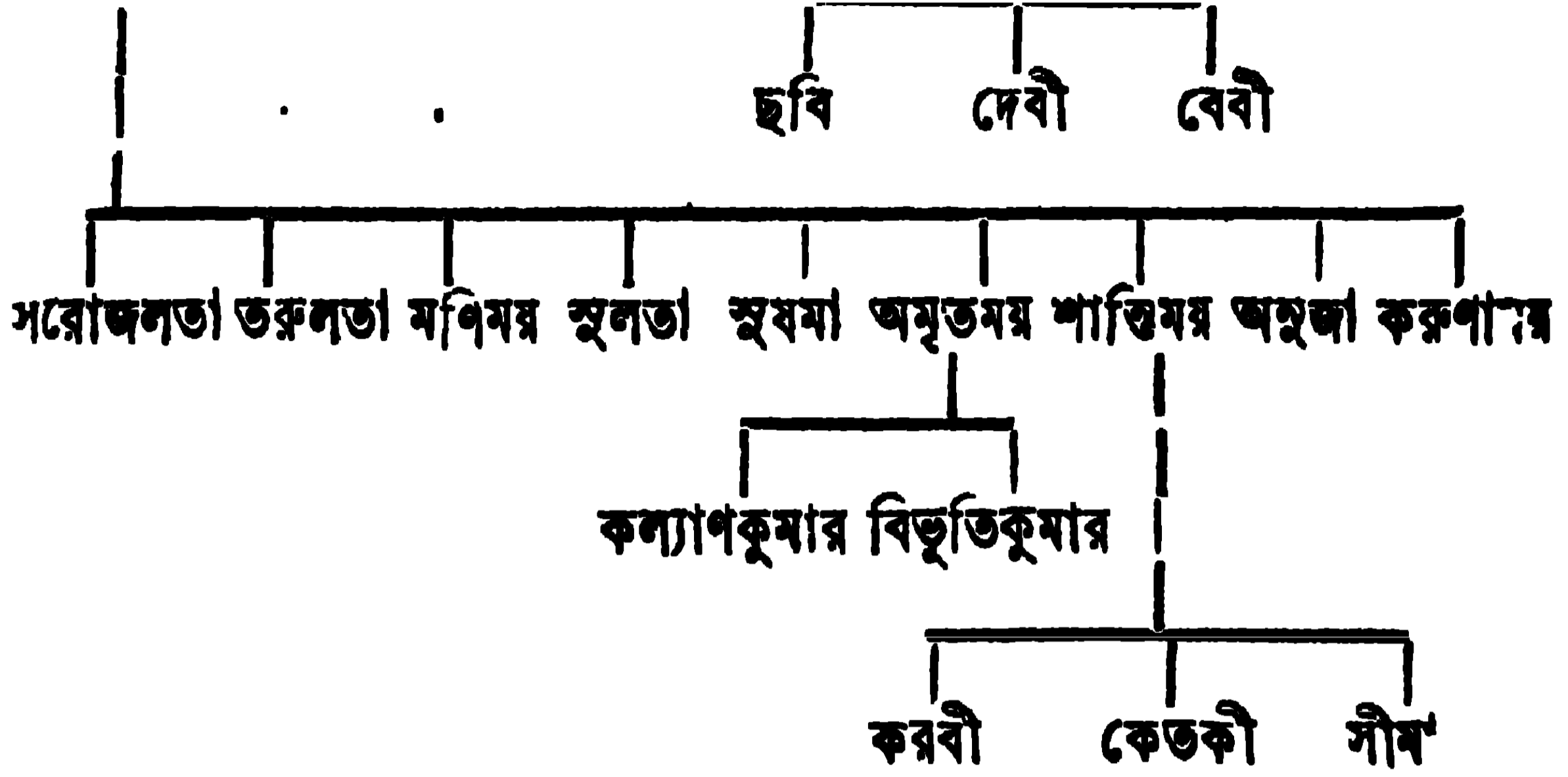
৺বিনোদ বিহারি বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গের রাজা আদিশুর কান্যকুব্জ হইতে যে পাঁচজন ব্রাহ্মণকে বঙ্গদেশে আনিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ভট্টনারায়ণ শাণ্ডিল্য গোত্রের আদিপুরুষ। ভট্টনারায়ণের ষোল পুত্র, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্র আদিবরাহ হইতেই রামেশ্বর চক্রবর্ত্তীর বংশের উৎপত্তি। ভট্টনারায়ণ হইতে অধঃস্তন একবিংশ পুরুষ দুর্গাদাস—যথা ১। ভট্টনারায়ণ ২। আদিবরাহ ৩। সুবুদ্ধি ৪। বৈনতেয় ৫। বিবুধেয় ৬। শুদ্ধি ৭। গঙ্গাধর ৮। পশুপতি ৯। শকুণি ১০। মহেশ্বর ১১। মহাদেব ১২। দুর্ব্বলী ১৩। হরি ১৪। উদয়ণ ১৫। মাধব ১৬। বিষ্ণুমিশ্র ১৭। পৃথ্বীবর ১৮। গঙ্গাধর ১৯।। ভগীরথ ২০। শ্রীপতি ২১। দুর্গাদাস। সাগর দিয়া গ্রামে বাসনিবন্ধন ইঁহার উপাধি সাগর হয়। ইঁহারই মধ্যম পুত্র রামেশ্বর ও তাঁহার অপর তিন ভ্রাতা (রাম কৃষ্ণ, রাঘব ও রামকান্ত) "চারি চক্রবর্ত্তী" নামে প্রসিদ্ধ ও বন্দ্যোবংশে "সাগরদিয়া" নামে বিশেষ খ্যাত হইয়াছিলেন। রাঘবের পুত্র জয়রাম। তাঁহার তিন পুত্র রুদ্ররাম, রঘুরাম ও কেশবরাম। ৺লালমোহন বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্য প্রণীত "সম্বন্ধ নির্ণয়" নামক গ্রন্থের ২য় সংস্করণের ৩৮৭ পৃষ্ঠার ফুটনোটে রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী সম্বন্ধে নিম্নলিখিত শ্লোকটী উল্লেখ করা আছে :—

> আসীদ্ রামেশ্বরাখ্যোঃ কুলকুলতিলকো নির্ম্মল রাঢ়বঙ্গে
> সদ্‌বৃত্তৈঃ সদ্‌বিচারৈ সমকুল সদৃশোনাস্তি কশ্চিৎকুলীনঃ।
> শ্রীগোপীনাথ নাম্না অজককুলবরৈস্তস্যগোবিন্দমুখ্যৈ
> বিশ্রামে লব্ধ কীর্ত্তিঃ কুলদলবিজয়ী সাগরে সেতুবন্ধঃ ॥

২। রামেশ্বরের দ্বিতীয় পুত্র গোপীনাথ (২৩), তৎপুত্র রামবল্লভ (২৪), তৎপুত্র ইন্দ্রনারায়ণ (২৫), তৎপুত্র রামহরি (২৬), তৎপুত্র

নীলমণি (২৭)। এই পর্য্যন্ত ইঁহাদের বাস বিক্রমপুরের অন্তর্গত মালক দিয়া গ্রামে. ছিল।, তথা হইতে নীলমণি গঙ্গাতীরে বাস করিবার জন্ত বলাগড়ে আসিয়া ৺কালিদাস মুখোপাধ্যায়ের চারি কন্তার পাণিগ্রহণ করেন। দ্বিতীয়া কন্তার গর্ভে দুইপুত্র ও এক কন্তা জন্মে, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ বিষ্ণু (২৮), নীলমণির চতুর্থ পুত্র*। ইনি বড়িশাসাবর্ণ চৌধুরিদের ঘরে ভঙ্গ হন। তৎপুত্র পঞ্চানন (২৯) বড়িশা সাবর্ণ চৌধুরীদের দৌহিত্র। মাতার নাম তারামণি দেবী। তিনি শরস্থনা, বলাগড়, কুড়ুলগাছি, নারিট, জিরাট ও চাকদহের নিকট ৬ স্থানে ৬টী বিবাহ করেন। বলাগড়ে ৺চন্দ্র কুমার ও কালীকুমার মুখোপাধ্যায়ের ভগ্নীর গর্ভে বিশ্বেশ্বর ও রামলাল (৩০) এবং কুড়ুলগাছির "বাবু"দের অর্থাৎ স্বনামধন্ত জমীদার মজুমদার বাবুদের বাড়ী ৺ রামকুমার মজুমদারের কন্তা ভবসুন্দরী দেবীকে যে বিবাহ করেন সেই স্ত্রীর গর্ভে বিনোদ (৩০) ১২৫৩। ৫ ফাল্গুন জন্মগ্রহণ করেন। সরস্থনায় যে বিবাহ করেন সেই স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র যোগেন্দ্রনাথ রতন সরকার গার্ডেন ষ্ট্রীট নিবাসী মহারাজা রমানাথ ঠাকুরের দৌহিত্রী সর্ব্বময়ী দেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তৎপুত্র নরেন্দ্রনাথ এখন চন্দননগরে বাস করেন। এটর্ণি শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় নরেন্দ্রের মাসতুতো ভ্রাতা।

৩। ৺বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় এলাহাবাদ Pension Pay Office এ উচ্চপদে কার্য্য করিতেন এবং উচ্চ অঙ্গের ধ্রুপদ গায়ক ও মজলিসি লোক হিসাবে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বিশেষ সুপরিচিত ও সম্মানিত ছিলেন।

* নীলমণির জ্যেষ্ঠপুত্র রামলোচন রায় বাহাদুর রামতারণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতামহ ; সুতরাং রামশরণ, রামতারণ, নিস্তারণ, বিশ্বেশ্বর, রামলাল, বিনোদ ও যোগেন্দ্রের প্রপিতামহ একই বক্তি (নীলমণি)।

শেষ বয়সে ইনি পেনসন লইয়া বড়িশায় বাস করেন এবং কলিকাতা সমাজেও বিশেষ সুপরিচিত ও সম্মানিত ছিলেন। এখনও পুরাতন গায়কগণের নিকট ইঁহার নাম করিলে অনেকেই তাঁহার উদ্দেশে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া থাকেন।

৪। রামলাল বলাগড় নিবাসী ও হালিসহর উপনিবাসী ৺শ্যামা কিশোর মুখোপাধ্যায়ের কন্যাকে বিবাহ করেন। শ্যামাকিশোর আলিগড়ে ৺কালী প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যাকে বিবাহ করেন। কালী প্রসাদের পুত্র দীননাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র রায় সাহেব সংসার চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় Public works Department এর accounts বিভাগে বিশেষ সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন। Retired Inspector General of Registration Rai Bahadur প্রিয় নাথ মুখোপাধ্যায়, রায় সাহেব সংসার চন্দ্রের ভগ্নীপতি। রামলালের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীশ চন্দ্র E. I. Ry. এলাহাবাদে কার্য্য করেন এবং এলাহাবাদের মহসিনগঞ্জে ইঁহার বাড়ী। ইনি বেনারস নিবাসী Telegraph Deparment এর Deputy Superirtendent শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের এক কন্যাকে দ্বিতীয় বার বিবাহ করেন। এই নিবারণ বাবুর কনিষ্ঠ পুত্রের সহিত ৺নিস্তারণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চতুর্থ পুত্র শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যার বিবাহ হইয়াছে।

৫। বিনোদের মাতুলালয় কুড়ুলগাছি নদীয়াজিলার মধ্যে একখানি বিশিষ্ট ভদ্রগ্রাম। এখানে অনেকগুলি জমিদারের বাস এবং আলিপুরের Late Public Prosecutor রায় বাহাদুর ৺নগেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্বশুর বাটী এই গ্রামে। E. B. Ry. main line এ Sealdah হইতে ৭৫ মাইল দূরবর্ত্তী Darsana Railway Station হইতে ৫ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। বিনোদের মাতুল মজুমদার বাবুদের পূর্ব্বেকার বৈভব ও চালচলন এখন স্বপ্নবৎ বোধ হয়। পূর্ব্বে ইঁহারা প্রবল

প্রতাপান্বিত জমিদার ছিলেন। ঐ গ্রামস্থ অন্যতম জমিদার ৺ রাজকৃষ্ণ রায়ের কন্যা মধুমতী দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তিনি প্রথম জীবনে মাতুলদের বিস্তীর্ণ জমীদারীর ম্যানেজার ছিলেন। মধ্য জীবনে তিনি তাঁহার ভগ্নীপতির পিতা বলাগড়ের সংলগ্ন তেঁতুলে নিবাসী স্বনামধন্য ৺গিরীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের Estateএ ম্যানেজারী করিয়াছিলেন। শেষ বয়সে অল্পদিনের জন্য ৺রাজা দিগম্বর মিত্রের Estate এ স্বর্গীয় কুমার মন্মথনাথ ও নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ডায়মণ্ডহারবার Sub Divisionস্থ জমীদারী খাড়ীর নায়েবী করিয়াছিলেন। তিনি অতিশয় ধার্ম্মিক ছিলেন। ১৯১৬ সালের ১০ই আগষ্ট ৫৯নং ডাক্তার লেনে তাঁহার মৃত্যু হয়। পূর্ব্ব বৎসর ১৯১৫ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর পত্নী মধুমতী দেবী গঙ্গালাভ করেন। মধুমতির মাতার নাম ক্ষেমাঙ্গিনী, পিতামহীর নাম চন্দ্রমণি ও প্রপিতামহীর নাম রাধামণি।

৬। বিনোদের জ্যেষ্ঠ পুত্র হরি প্রসাদ (জন্ম ২৪ ফেব্রুয়ারী ১৮৭৮) প্রথমে ওয়ালটেয়ারে East coast Railwayতে Cash ও Pay Department এ কর্ম্ম সুরু করেন। পরে অল্পদিন B N. Ry ও A. B. Ryতে কর্ম্ম করিয়া ১৯০২ সালে ৩৯নং চৌরিঙ্গী রোডস্থিত Examiner of Telegraph Accounts office এ Governmant Service এ প্রবেশ করেন। তথায় অল্প দিন কর্ম্ম করিবার পর Central Telegraph office এর Head-clerk এর পদের জন্য একজন বিশেষ দক্ষ লোকের প্রয়োজন হওয়ায় তৎকালীন Director General of Telegraphs Examiner of Telegraph Accounts office হইতে একজন লোক মনোনয়ন করিয়া দিতে বলিলে তিনি হরিপ্রসাদকে মনোনয়ন করেন। তিনি ১৯০৪ সালে Central Telegraph office এর Head clerk & Accountant এর পদে নিযুক্ত হইয়া বিশেষ কৃতিত্বের সহিত ১৯১৬ সাল পর্য্যন্ত কার্য্য করিবার পর Post & Telegraphs একত্রিত হওয়ায়

এবং Post Master General officeএ একজন Telegraph Department এ সুদক্ষ লোকের প্রয়োজন হওয়ায় তৎকালীন P.M.G. Mr. P.G. Rogers I C.S. এর উদ্যোগে P.M.G. officeএ বদলি হন এবং কালক্রমে ঐ আফিসের সর্ব্বোচ্চ Ministerial পদ Superintendent পদে উন্নীত হইয়া ১৯৩৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। ইনি ও ইঁহার মধ্যম ভ্রাতা হালিসহর নিবাসী ৺হরি গোপাল মুখোপাধ্যায়ের [শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র নাথ কুমার প্রণীত "বংশ পরিচয়' ২য় খণ্ড ৪৯১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য] চতুর্থ ও পঞ্চম কন্যা প্রমীলাবালা' ও কানন বালা দেবীকে বিবাহ করেন। হরি গোপাল বাবু ভবানীপুর বকুলবাগান নিবাসী ৺ রাখাল দাস মুখোপাধ্যায়ের খুড়তুতা ভ্রাতা। Central Telegraph officeএর Head clerkএর পদে কার্য্য করিবার সময় হরি প্রসাদ অনেকের অন্ন সংস্থান করিয়া দিয়াছিলেন। ইঁহারও মাতুলালয় কুড়ুলগাছি গ্রাম। মাতুল ৺ষষ্ঠী দাস রায় বর্দ্ধমান জিলার চুপির দেওয়ান বংশের বংশধর ও প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদার ছিলেন। ভবানীপুর বকুলবাগানের ৺রাখাল দাস মুখোপাধ্যায় Chuadangaয় Sub-Divisional officer থাকাকালে এই ষষ্ঠী বাবুর সহিত তাঁহার বিশেষ সৌহার্দ্দ্য ও ধর্ম্ম সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। ৺রাখাল বাবুর সুযোগ্য পুত্র Retired Presidency Magistrate. শ্রীযুক্ত আশু বাবু অদ্যাবধি এই ধর্ম্ম সম্বন্ধের সম্মান করিয়া থাকেন। ৺ষষ্ঠী দাস রায় অপুত্রক অবস্থায় পরলোক গমন করায় ভাগিনেয় হিসাবে হরিপ্রসাদ ও তাঁহার অপর পাঁচ ভ্রাতা মাতুলের বিস্তীর্ণ জমিদারীর ভাবী উত্তরাধিকারী ছিলেন, কিন্তু অদৃষ্টের উপহাসে তিনি সম্পত্তির পরিবর্ত্তে মোকদ্দমার উত্তরাধিকারী হইয়া ইংরাজী ১৯১৪ হইতে ১৯২৫ পর্য্যন্ত দীর্ঘকালীন মোকদ্দমায় অজস্র অর্থব্যয়ে একেবারে জেরবার হইয়া পড়িয়াছিলেন। যাহা হউক বরাবর ধর্ম্ম পথে থাকায় এবং পিতৃ

পুণ্যে অবসর গ্রহণ করিবার অল্পদিন পূর্ব্বে ভবানীপুর ১।১।৫নং বেণীনন্দন ষ্ট্রীটে দুই অংশযুক্ত ত্রিতল বাটী নির্ম্মাণ করিয়া এক অংশ ভাড়া দিয়া অপর অংশে নিজে বাস করিতেছেন।

৭। হরিপ্রসাদ বরাবরই শিবশক্তির অনুগৃহীত ব্যক্তি। ১৯১৩ সালের জুন মাসে (যখন ৩৩নং সেরাং লেন, তালতলাতে বাস করিতেন) মাতার অসুখ হওয়ায় প্রতিবেশী জ্যোতিষী শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট ঐ অসুখের ফলাফল জানিতে চান। সেদিন রবিবার। আশুবাবু হরিপ্রসাদের হাত দেখিয়া বলেন যে, মাতার মৃত্যুযোগ নাই—তীর্থদর্শন-যোগ আছে। ঐ সময়ে হরিপ্রসাদের অর্থ-স্বচ্ছলতা এবং আফিস হইতে ছুটী পাইবার সম্ভাবনা না থাকায় ঐ গণনার সত্যতায় সন্দেহ প্রকাশ করেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, তাহার ২।১ দিন পরেই লক্ষ্ণৌর Director of Telegraphs অফিস হইতে হরিপ্রসাদের অফিসে এক পত্র আসে যে, তথাকার এক মহাজন কলিকাতা টেলিগ্রাফ অফিসের জনৈক Telegraph Masterএর নামে এক Court Attachment পাঠাইয়াছিল, কিন্তু তাহার টাকা আদায় না হওয়ায় সে Secretary of Stateএর নামে damageএর নালিশ করিয়াছে। এই মকদ্দমার তদ্বির জন্য হরিপ্রসাদ মাতৃ-সমভিব্যাহারে কাশী যাত্রা করেন এবং মাতাকে কাশীতে রাখিয়া লক্ষ্ণৌ গিয়া সরকারী কার্য্য শেষ করিয়া ফিরিবার পথে মাতাকে সঙ্গে করিয়া ৺বৈদ্যনাথধাম দর্শন করিয়া কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করেন। বাবা বিশ্বনাথ ও বৈদ্যনাথের অসীম কৃপা ব্যতীত অবশ্যই এরূপ সংঘটন সম্ভব নহে। মাতুল-সম্পত্তি-সংক্রান্ত মকদ্দমা ৪ বৎসর চলার পর হরিপ্রসাদ শত্রুপক্ষ কর্ত্তৃক এতই উৎপীড়িত হইয়াছিলেন যে, আত্মসম্মান বিসর্জ্জন দিয়া একরফানামা করিতে বাধ্য হন। পরে এই রফানামা রদ-রহিত হয়। হাইকোর্টে যখন এই ব্যাপার দৃঢ় হয় তখন হরিপ্রসাদের পক্ষের এডভোকেট শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র

সরকার বলিয়াছিলেন, "নাবালক ও স্ত্রীলোকের কৃত রফানামা রদ-রহিত হওয়া আইনে সম্ভব। কিন্তু আপনাদের মত "শিক্ষিত সাবালকে"র কৃত রফানামা রদ-রহিত হওয়া আইনে সম্ভব নহে। আপনি যথেষ্ট পূজা-অর্চ্চনা করেন বলিয়াই ইহা সম্ভব হইল"। বস্তুতঃ রুদ্রচণ্ডীর প্রসাদে এই অসম্ভব ব্যাপার সম্ভব হইয়াছিল।

ভগবানের কৃপায় ১৯২৭-২৮ সালে ঢাকার Deputy Postmaster-General আফিসে Personal Asisstant-রূপে কার্য্য করিবার সময় দোলাইগঞ্জ ষ্টেশনে হরিবাবুর ভাগ্যে এক সাধুসন্দর্শনলাভ ঘটে। সাধু মাতুল-সম্পত্তি-সংক্রান্ত সমস্ত কথা শুনিয়া বলেন, "তুমি তিন দিন পর আমাব সহিত সাক্ষাৎ করিও—আমি চিন্তা করিয়া দেখিয়া উত্তর দিব।" ৩ দিন পরে সাক্ষাৎ করিলে সাধু বলিলেন—"আমি চিন্তা করিয়া দেখিলাম তোমার শত্রুপক্ষ তোমাকে সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিয়াই ক্ষান্ত ছিল না— তোমার জীবন এবং চাকুরিও নষ্ট করিবার যথেষ্ট ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, কিন্তু সফল হয় নাই। যাহা হউক যাহা গিয়াছে তাহা আর পাইবে না—তবে যাহাতে তাহার সমকক্ষ কিছু পাও তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিব।" এই মহাপুরুষের ব্যবস্থানুযায়ী "আশুতোষ"-শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া হরিপ্রসাদ নিত্য পূজা করেন। বেণীনন্দন ষ্ট্রীটে বাটী নির্ম্মাণ জন্য ১৯৩১ সালে যখন ৩২বি চন্দ্রনাথ চ্যাটার্জ্জীর ষ্ট্রীটে বাসা করিয়া থাকেন, ঐ সময়ে অষ্টম পুত্রের কঠিন পীড়া হওয়ায় হরিপ্রসাদ কাতর-ক্রন্দনে ঈশ্বরকে ডাকেন। ফলে সেই রাত্রেই স্বপ্ন দেখেন যে, ৺ সিদ্ধেশ্বরী মাতা বলিতেছেন, "মহানবমীর দিনে একটী কচি পাঁটা দিয়া পূজা দিলে তোর পুত্র আরোগ্য হইবে।" এই আদেশ পালন করায় পুত্রটী নিরাময় হইয়া গিয়াছে।

৮। হরিপ্রসাদের নয় পুত্র ও এক কন্যা। জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ মুরারি-মোহন রায় বাহাদুর রামতারণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৌহিত্রীকে (প্রথম

জামাতা ৺ শ্রীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ কন্যা) বিবাহ করিয়াছেন। তিনি কলিকাতা G.P.O. তে ও মধ্যম পুত্র শ্রীমান প্যারী মোহন Central Telegraph officeএ কর্ম্ম করেন। পিতা, পিতামহের মত ইঁহারাও বিশেষ ধার্ম্মিক ও পরোপকারী। কন্যাটীর বিবাহ কলিকাতার স্বনামধন্য Stevedore শ্রীযুক্ত সন্তোষ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাগিনেয় শ্রীমান সূর্য্য কুমার মুখোপাধ্যায়ের সহিত হইয়াছে। কালীঘাট ১০নং নকুলেশ্বরতলা লেনে ইঁহার নিজ বাটী এবং ইঁহার খুল্লতাত শ্রীযুক্ত কালী চরণ মুখোপাধ্যায় দেবচরিত্র লোক। সূর্য্য কুমার E.B.Rly. Engineering বিভাগে কার্য্য করেন এবং বর্ত্তমানে (ফেব্রুয়ারি ১৯৩৭) কাঁচড়াপাড়ায় নিযুক্ত আছেন।

৯। হরি প্রসাদের মধ্যম ভ্রাতা প্রতাপ চন্দ্র Alipore Telegraph Work-Shopএর Head clerk. ইনি একজন প্রথম শ্রেণীর তবলা বাদক। ইঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীমান যামিনী মোহন (J.Banerjee) পূর্ব্বে Mohon Bagan A.C. Teamএর নামজাদা খেলোয়াড় ছিলেন। ১৪৪ হরিশ মুখার্জ্জি রোড নিবাসী অবসর প্রাপ্ত স্কুল ইন্‌সপেক্টার শ্রীযুক্ত শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়ের কন্যাকে যামিনী বিবাহ করিয়াছেন। প্রতাপের একমাত্র কন্যা শ্রীমতি মনিমালার বিবাহ কৃষ্ণনগরের সংলগ্ন ঘূর্ণির ৺ গোপীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের একমাত্র পুত্র শ্রীমান কালিদাসের সহিত হইয়াছে। কালিদাস জব্বলপুরে Spence Training Collegeএ Chemistryর Professor ও Nagpur Unixersityর fellow. তৃতীয় ভ্রাতা শরৎ চন্দ্র পোষ্ট আফিসের ইনস্পেক্টর। বর্ত্তমানে মেদিনীপুরে চাকুরী করিতেছেন। ইনি বাকুলের ৺অখিল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ভাগিনেয়ী জামাই ৭১নং হাজরা রোড নিবাসী ৺প্রবোধ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ করেন। ইঁহার ছয় পুত্র :—যতীন্দ্রমোহন, ক্ষিতি, সতী, সুধী, কৃষ্ণ ও লালুমোহন। চতুর্থ ভ্রাতা অমূল্যকুমার

বড়বাজারের প্রসিদ্ধ চাউল ব্যবসায়ী বর্দ্ধমান জেলার কুচুট-কালেশ্বর নিবাসী ৺ রাখালদাস চট্টোপাধ্যায়ের দৌহিত্রী বর্দ্ধমান শ্যামসাগর নিবাসী উকীল ৺ শরৎকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ করেন। ১লা জুলাই ১৯৩৫ সালে তিনি মারা গিয়াছেন। তাঁহার পুত্র শ্রীমান শৈলেন্দ্র বর্দ্ধমানে মাতুলালয়ে বাস করিতেছেন। পঞ্চম ভ্রাতা শ্রীপতি বলাগড়ে ৺সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ করেন। তিনি ১৯২৩ সালে মারা গিয়াছেন। তাঁহার দুই পুত্র—শ্রীমান্ দুর্গাদাস ও কালীদাস বলাগড়ে বাস করিতেছেন। ষষ্ঠ ভ্রাতা প্রাণকৃষ্ণ সিমুরালি-ষ্টেসনের নিকট চাঁদুরিয়ার ৺ উপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ করেন। তিনি ১৭ই জানুয়ারি ১৯৩৬ সালে মারা গিয়াছেন। তাঁহার পুত্র শ্রীমান্ ভোলানাথও মাতুলালয় চাঁদুড়িয়াতে বাস করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

এড্‌ভোকেট্‌

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সিপাহী বিদ্রোহের সময় কলিকাতার উত্তরে বরাহনগরে যোগেন্দ্র চন্দ্র মুখোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন।

স্থানীয় পাঠশালায় তাঁহার শৈশব ও বাল্য শিক্ষা হয়। অতঃপর কাশীপুর হাইস্কুল হইতে তিনি ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এফ্‌ এ ও ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে বিএ পাশ করিয়া তিনি ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি এ ল্‌ পাশ করেন। ঐ খ্রীষ্টাব্দেই তিনি জেলাকোর্টের উকিল এবং ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে হাই-কোর্টের উকিল শ্রেণীভূক্ত হন। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মজঃফরপুরে ওকালতী করিতে থাকেন, এখনও তিনি তথায় ওকালতী করিতেছেন। ওকালতীতে যোগদান করিবার অল্পকাল মধ্যেই তিনি বিস্তৃত পশার করেন এবং বর্ত্তমানে তিনি উকিলগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাঁহার গভীর আইন জ্ঞান, জেরা করিতে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা তাঁহাকে উকিল-গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান প্রদান করিয়াছে। তাঁহার গুণে সকলে এত মুগ্ধ হইয়াছিল যে, যখন পাটনায় হাইকোর্ট স্থাপিত হয়, তখন উক্ত হাই-কোর্টের একজন বিচারপতি তাঁহাকে পাটনা হাইকোর্টে ওকালতী করিতে অনুরোধ করেন; কিন্তু তাঁহার একজন আত্মীয়ের মৃত্যু হওয়ায় তিনি তিনদিন মাত্র পাটনায় থাকিয়া মজঃফরপুরে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হন।

যোগেন্দ্র বাবু সংস্কৃত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, তিনি আট বৎসর বয়ঃক্রম হইতে সংস্কৃত অধ্যয়ন করিতেছেন। ইহা ছাড়া সংস্কৃত ভাষাতেও তাঁহার বিশেষ জ্ঞান আছে।

হিন্দু ধর্ম্ম, শাস্ত্র, পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রেও তাঁহার গভীর জ্ঞান আছে। তিনি আজীবন শিক্ষা ব্যাপারে উৎসাহশীল, এইজন্ত মজঃফরপুরে ও নিকটবর্ত্তী জেলা সমূহে তিনি শিক্ষা বিস্তারে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ তিনি তাঁহার অন্ততম পিতৃব্য জমিদার জগদীশ কুমার মুখোপাধ্যায়ের সহিত এক যোগে "মুখার্জ্জীর সেমিনারী" নামে একটি উচ্চ ইংরাজী বিত্তালয় স্থাপন করেন, সেই স্কুলটি উত্তর বেহারের শ্রেষ্ঠতম হাইস্কুল। মজঃফরপুরে একটি উচ্চ শ্রেণীর কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্ত তিনি প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন, সেই কলেজটি গবর্ণমেণ্ট নিজহস্তে লইবার পূর্ব্বে তিনি উহার ট্রাষ্টি ছিলেন। গবর্ণমেণ্ট কলেজটি স্বহস্তে লইবার পরও তিনি উহার কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটির সদস্ত ছিলেন। মজঃফরপুরে বালিকাবিত্তালয় প্রতিষ্ঠাকল্পেও তিনি অগ্রণী ছিলেন, উক্ত বালিকাবিত্তালয়ের তিনি কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটির সভাপতি। উত্তর বেহারে এরূপ বালিকাবিত্তালয় আর দ্বিতীয় নাই!

তিনি মজঃফরপুর গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজ ও গবর্ণমেণ্ট সাহায্য প্রাপ্ত স্কুলের কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটির সদস্য।

মজঃফরপুরে কো-অপারেটিভ ক্রেডিট বা সমবায় ঋণদান আন্দোলনের অন্ততম প্রবর্ত্তক। তিনি স্থানীয় জেলা বোর্ডেরও সদস্য।

রাজনীতি ক্ষেত্রে তিনি ধীর পথাবলম্বী। কিছুকাল পূর্ব্বে ত্রিহুত জাতীয় লীগের সভাপতিরূপে তিনি বলিয়াছিলেন যে, সর্ব্বাগ্রে দেশবাসীকে শিক্ষিত করিতে হইবে। শিক্ষিত হইলেই ব্যবস্থাপক সভায় কিরূপ প্রতিনিধি প্রেরণ করা যাইবে, সে বিষয় তাহারা নিজেরাই বিচার করিতে পারিবে। তিনি রাজনীতি ক্ষেত্রে দেশে হুলুস্থুল, বিদ্রোহ প্রভৃতি বাধাইবার আদৌ পক্ষপাতী নহেন। স্বভাবতঃ তিনি বিনয়ী এবং নীরবে কর্ম্ম করিতেই ভালবাসেন, সেইজন্ত তিনি সংবাদ পত্রে নাম প্রকাশ করিতে সততই অনিচ্ছুক।

১৯৩৫ সালের মে মাসে তিনি নানা গুণের জন্য কিং জর্জ্জ সিলভার জুবিলী পদক পুরস্কার প্রাপ্ত হন।

তিনি মজঃফরপুরে কতদূর জনপ্রিয় তাহা এই ঘটনা হইতে বুঝা যাইবে। তাঁহার ওকালতীর পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ণ হইলে মজঃফরপুরের উকিল সভা তাঁহাকে একখানি অভিনন্দন পত্র দেন। উক্ত অভিনন্দনের সারমর্ম্ম এই যে, আপনি এই দীর্ঘ কালের মধ্যে কখনও নিজেকে জাহির করিবার চেষ্টা করেন নাই।

আপনি আমাদের নেতা ও সভাপতি এবং উত্তর বেহারের উকিলগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, আইনে আপনার প্রগাঢ় জ্ঞান, জেরায় আপনার সমতুল্য নাই। আপনার গুণে এই প্রদেশের সুদূর পল্লী হইতেও লোকজন আকৃষ্ট হইয়া আপনার নিকট আইসে, আপনি জুনিয়র উকিলদিগকে সুপরামর্শ দানে উপকৃত করিতেছেন।

আপনি এই নগরের "মুখার্জ্জীর সেমিনারী স্কুল," "চাপমান বালিকা বিদ্যালয়" ও "ভূমিহার ব্রাহ্মণ কলেজ" প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ছিলেন এবং কৃষকদিগের উপকারার্থে সমবায় ঋণদান সমিতি এই প্রদেশের সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। যখন প্লেগের জন্য এই সহরের সমস্ত অধিবাসী সহর ত্যাগ করিয়াছিল তখন আপনি নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া প্লেগদমনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন, ব্যবস্থাপক সভার সদস্যরূপে আপনি এই প্রদেশের অনেক হিত সাধনে চেষ্টা করিয়াছেন এবং বাঙ্গলা ভাষায় বহু কবিতা লিখিয়া আপনি বাঙ্গলা সাহিত্যেরও সেবা করিতে ছাড়েন নাই; গোপনে বহু লোককে বহু দান করিলেও আপনি কখনও তাহা প্রকাশ করেন নাই। আপনার এই সমস্ত গুণের জন্য আজ আমরা আপনাকে এই উকিল সমিতির সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন-সদস্যরূপে অভ্যর্থনা করিয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছি তিনি যেন আমাদের নেতারূপে বহু বৎসর আপনাকে জীবিত রাখেন।

যোগেন্দ্র বাবু উক্ত অভিনন্দনের উত্তরে বলেন যে, "যখন আমি প্রথম মজঃফরপুর আসি তখন এখানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব দেখিয়া আমি জগদীশ কুমার মুখোপাধ্যায়ের সহিত এক যোগে "মুখার্জ্জীর সেমিনারী" প্রতিষ্ঠা করি; ইহা ছাড়া চাপম্যান বালিকাবিদ্যালয় ও ভূমিহার ব্রাহ্মণ কলেজ প্রতিষ্ঠায়ও প্রাণপণ যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছিলাম। আমি কয়েক বৎসর জেলা বোর্ডের সদস্য ছিলাম। ১৯০৬ সালে এই সহরে প্লেগের প্রাদুর্ভাব হইলে আমি নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া প্রতি কুটীরে গিয়া প্লেগাক্রান্ত রোগীদের সেবা পরিচর্য্যা হইতে আরম্ভ করিয়া তাহাদের কাপড়চোপড় পর্য্যন্ত জীবাণু বর্জ্জিত (Disinfection) করিয়া দিতাম। আমি ইন্দুর বংশ ধ্বংশ করিতেও বদ্ধপরিকর হইয়াছিলাম, এই সমস্ত কারণে প্লেগ প্রশমিত হয়। আমি সিভিল জাষ্টিস্ কমিটীতে সাক্ষ্য দিয়া বলিয়াছিলাম এদেশে বিচারে অত্যন্ত বিলম্ব হয়।

আমি সমবায় ঋণদান আন্দোলনে যোগদান করিয়া ইহার কৃতকার্য্যতার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলাম এবং ১৯১২ সালে আমার প্রস্তাবানুসারে একটি বিল পাশ হইয়াছিল। "নর্থ বিহার লিবারেল এসোসিয়েসন" নামে এ প্রদেশে যে রাজনৈতিক সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, আমি তাহার সভাপতি ছিলাম, সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্যও আমি চেষ্টা করিয়াছিলাম। আমি আত্মপ্রশংসা করিতেছি না; আমার দৃষ্টান্তে আরও সকলে অনুপ্রাণিত হৌন ইহাই আমার অভিপ্রায়।

বিগত ১৯৩৪ সনে উত্তর বিহার প্রাঞ্চল ভূকম্পনের ফলে বিধ্বস্ত হইলে, তিনি নিজের প্রতি বিন্দুমাত্র দৃষ্টিপাত না করিয়া অকাতরে বিপন্ন ব্যক্তিবর্গকে সাহায্য করেন। ইহাই তাঁহার নিঃস্বার্থপরতার একমাত্র পরিচয়।

তাঁহার কার্য্যে প্রসন্ন হইয়া ১৯২৯ সনে মাননীয় বিহারের লাটসাহেব তাঁহাকে কাউন্সিলের সদস্য মনোনয়ন করেন। তথায় তিনি ১৯২৯

হইতে ১৯৩২ সন পর্য্যন্ত বিহারে বাঙ্গালীগণের প্রতিনিধিরূপে অতি দক্ষতাসহকারে কার্য্য করেন। তাঁহাদিগের কষ্ট নিবারণার্থে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। কিন্তু স্বাস্থ্য তাঁহার বিপক্ষে থাকায় ১৯৩২ সনে তিনি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন; ইহা ব্যতীত তিনি লেজিসলেটিভ এসেম্ব্লীরও মেম্বার ছিলেন।

তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার দ্বারা তিনি দেশবাসীগণকে সাহায্য করিতে কোনদিন বিন্দুমাত্রের জন্য পশ্চাৎপদ হন নাই। দেশের এবং দেশবাসীগণের কষ্ট তিনি বুঝিয়াছিলেন, তাই বোধ হয় ইহার কারণ। "তিনি দীর্ঘজীবি হউন" এই আমরা বিশ্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি।

শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ মিত্র বি, এল্।

বাঙ্গালার বাহিরে যে সমস্ত বাঙ্গালী আপন প্রতিভা ও মনীষাবলে বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন, তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ মিত্র মহাশয়ের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বৈকুণ্ঠ নাথের পিতার নাম স্বর্গীয় যদুনাথ মিত্র। ইহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মিত্র। তিনি ছাপরার সুপ্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীব। দ্বিতীয় ভ্রাতার নাম শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মিত্র, তিনি কলিকাতায় হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন। তাঁহার তৃতীয় ভ্রাতার নাম শ্রীযুক্ত প্রিয় নাথ মিত্র। তিনি দ্বারভাঙ্গার বিখ্যাত উকীল। বৈকুণ্ঠ বাবুই যদুনাথ বাবুর কনিষ্ঠ পুত্র। তিনি ছাপরায় জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে তিনি সারণ একাডেমীতে বিদ্যাভাস করেন। অতঃপর কলিকাতায় আসিয়া তিনি জেনারেল এসেম্বলী ইন্‌ষ্টিটিউসন হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। অতঃপর প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি, এ পাশ করিয়া এম্-এ অবধি পাঠ করিয়া রিপণ কলেজ হইতে তিনি বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

১৯১১ সালে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী আরম্ভ করেন। হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল ৺উমাকালী মুখোপাধ্যায়ের নিকট তিনি কাজ শিখিয়াছিলেন। ১৯১৬ সালে পাটনা হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি পাটনা হাইকোর্টে ওকালতী আরম্ভ করেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই তিনি নিজ প্রতিভাগুণে পসার প্রতিপত্তি লাভ করেন।

১৯২২ সালে তিনি পাটনায় একটি অন্ধশিক্ষক ও একটি অন্ধ ছাত্র লইয়া একটি অন্ধবিদ্যালয় স্থাপন করেন। ক্রমে ক্রমে ঐ স্কুলটি তাঁহার

"স্যার এড্ওয়ার্ড গেট্ স্কিন ক্লিনিক"এর দারোদ্‌ঘাটন উপলক্ষে
সেক্রেটারি শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ মিত্র ও সভ্যবৃন্দ।

উদ্যোগে পরিবর্দ্ধিত হয়। জনসাধারণের ও বিহার গবর্ণমেণ্টের সাহায্যের দ্বারা তিনি স্কুলের জন্য একটি বৃহৎ বাটী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে ৩৪টি ছাত্র ও তিনজন শিক্ষক ঐ স্কুলে রহিয়াছেন। তাঁহার এই জন-সেবার ভাব দর্শনে পাটনা হাইকোর্টের তৎকালীন বিচারপতি স্যার লিও-নার্ড আডামীর অনুরোধে তিনি কুষ্ঠ চিকিৎসালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন। তিনি সাতবৎসর যাবৎ ঐ চিকিৎসালয়ের জন্য কঠোর পরিশ্রম করিয়া জনসাধারণ ও গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে উহার জন্য একটি স্বতন্ত্র বাটী নির্ম্মাণ করেন। ঐ বাটীর নাম "স্যার এড্ওয়ার্ড গেট স্কিন ক্লিনিক্" রাখা হয়। তৎকালীন গবর্ণর স্যার জন হুইটীর দ্বারা উহার দ্বারোদ্‌ঘাটন করান হয়।

বৈকুণ্ঠ বাবু অনেক দিন সুহৃৎ পরিষৎ ও হেমচন্দ্র লাইব্রেরীর যথাক্রমে সহকারী সভাপতি ও কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সদস্য ছিলেন। তিনি পাটনা "বাঙ্গালী প্রবাসী সমিতির" (Bengali Setteers' association) সহকারী সম্পাদক ও পরে সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত হইয়া তত্রত্য বাঙ্গালী-দের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিতেছেন। দানে তিনি মুক্তহস্ত। কথিত আছে যে কোনও সাহায্যপ্রার্থী তাঁহার নিকট আসিয়া বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া যায় না।

বেহার উড়িষ্যা কুষ্ঠ প্রতিকার কমিটি, যক্ষ্মা নিবারণী কমিটি, সেবা সুশ্রুষা কারিণীদের রেজিষ্ট্রেশন কমিটি এবং অন্যান্য অনেক প্রতিষ্ঠানের তিনি বে-সহকারী সদস্য। তিনি বিহার উড়িষ্যার যাবতীয় এড্-ভোকেটের দ্বারা নির্ব্বাচিত হইয়া পাটনা হাইকোর্ট বার কাউন্সিলের সদস্য পদে অধিষ্ঠিত আছেন।

বৈকুণ্ঠ বাবু ৬৯নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীটস্থ ৺কৃষ্ণ সখা দাস মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যাকে ১৯০৫ সালে বিবাহ করেন। ইঁহার দুই পুত্র ও চারি কন্যা। জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ অজিত কুমার পাটনা হাইকোর্টের এড্‌ভোকেট।

কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ অজয় কুমার গিরিডিতে অভ্রের ব্যবসায় করিতেছেন। বৈকুণ্ঠ বাবুর জ্যেষ্ঠ কন্যা শ্রীমতী রেণুকার বিবাহ কলিকাতার খ্যাতনামা জমিদার শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র কৃষ্ণ ঘোষের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ অনিল কৃষ্ণের সহিত হইয়াছে। দ্বিতীয় কন্যা ইলার বিবাহ স্বনামধন্য রায় বাহাদুর শ্রীশচন্দ্র ঘোষ এম এর একমাত্র পুত্র শ্রীমান্ উমা প্রসন্ন ঘোষ বি এস্ সির সহিত হইয়াছে। তৃতীয়া ও চতুর্থা কন্যার নাম শ্রীমতী গৌরী ও শ্রীমতী কল্যাণী। বৈকুণ্ঠ বাবুর প্রথম পুত্রের বিবাহ রঁাচির স্বর্গীয় কালিদাস ঘোষ মহাশয়ের চতুর্থা কন্যা শ্রীমতী মিরার সহিত হইয়াছে।

—বালি সমাজ—

উত্তর বাশুড়ী ঘোষ বংশাবলী, জেলা যশোহর

সাঙ্কেতিক চিহ্ন ঃ—সু—পুত্র-

প্র ম্—প্রকৃত মুখ্য

ম দ্বি—মধ্যাংশ দ্বিতীয়পো।

৺মকরন্দ ঘোষ হইতে বালি সমাজের ঘোষ বংশাবলী।

[রায় সাহেব অন্নদা কুমার ঘোষ, পাটনা]

১। ৺মকরন্দ ঘোষ সু ২ পুরুসোত্তম সু ৩ ভবনাথ সু ৪ মহাদেব সু ৫ গাবঘোষ সু ৬ নিশাপতি (প্রম্) সু ৭ উষাপতি সু ৮ প্রজাপতি সু ৯ বিভাকর সু ১০ (মুখ্য) হাড় ঘোষ সু ১১ কামেশ্বর সু ১২ শূলপাণি সু ১৩ পরমেশ্বর সু ১৪ গণপতি সু ১৫ নারায়ণ ঘোষ।

১৫ (ম দ্বি) নারায়ণ ঘোষের সন্তান—২২ লক্ষ্মীনারায়ণ সু ২৩ কৃষ্ণকিঙ্কর সু ২৪ সদাশিব সু ২৫ বনমালী সু ২৬ শশিশেখর, ইন্দুভূষণ।

ইঁহাদের আদি নিবাস বালিতে ছিল, ১৫ পর্য্যায় ৺নারায়ণ ঘোষ মহাশয় বালি হইতে যশোহরের অন্তর্গত বাশুড়ি গ্রামে বাসস্থাপন করেন।

পত্নী দীনমণি ঘোষ

বনমালি ঘোষ,

২৬ শশিশেখর (২রা অগ্রহায়ণ ১৩০৬ মৃত্যু)
পত্নী স্বর্ণময়ী ঘোষ, ১৩৪২।১০ শ্রাবণ মৃত্যু কাশীতে

২৬ ইন্দুভূষণ

মৃত্যু ২০শে বৈশাখ, ১২৯৭
পত্নী নিস্তারিণী ঘোষ
মৃত্যু ১৯২৬ সালের ৯ই জানুয়ারী
মন্মথনাথ ২৭
প্রমথনাথ ২৭
গোলাপকামিনী
কিরণচন্দ্র ২৭
তরঙ্গিনী
চপলা
চারুচন্দ্র ২৭
সুবোধচন্দ্র ২৮
সত্যব্রত ২৮
প্রবোধচন্দ্র মৃত
প্রমোদকুমার ২৮
দেবব্রত (মৃত)
শান্তিব্রত ২৮
শিবব্রত (মৃত)
সন্তব্রত ২৮
পূর্ণচন্দ্র ২৭
অন্নদাকুমার ২৭
কুসুমকুমারী (মৃত)
ললিতমোহন ২৭
সুরেন্দ্রনাথ ২৭
সতীশচন্দ্র
যোগেশ (মৃত)
মনোরমা (মৃত)
প্রশান্ত ২৮
জ্ঞানেন্দ্র ২৮
রেণুকা
রণজিৎ (মৃত)
রাধারাণী (মৃত)
অজিৎ (মৃত)
সমরজিৎ ২৮
ইন্দ্রজিৎ ২৮
জ্যোতির্ম্ময় ২৮
প্রভাত ২৮
রমেন্দ্র ২৮
নরেন্দ্র ২৮
যোগেন্দ্র (মৃত)
ননীবালা (মৃত)
সন্তোষ ২৮
সুবোধ ২৮
সুশীল (মৃত)
সুশান্ত ২৮
সুধাংশু ২৮
শিশির ২৮

প্রণব
২৯
সুজাতা
মুকুল
২৯
অরুণ ২৯
অজয় ২৯
সন্ধ্যারাণী
প্রফুল্ল
২৮
অনিল
২৮
গণেশ
২৮
অনাথ
২৮

২৫। বনমালী ঘোষ কলিকাতা জানবাজারের রাণী রাসমণির মকিমপুর পরগণার নায়েব ছিলেন। পরে তিনি কলিকাতা জানবাজার সদরে দেওয়ান হইয়া আইসেন। শুনা যায় যে তাঁহার মকিমপুর অবস্থিতিকালে নীলকরের ডোনাল্ড সাহেব তথাকার প্রজাদের উপর অত্যন্ত অত্যাচার আরম্ভ করেন। তখন বনমালীর সহিত পরামর্শ করিয়া রাণী রাসমণি ডোনাল্ড সাহেবকে জব্দ করিবার জন্য একদল (৫০ জন) বরকন্দাজ পাঠাইয়া দেন ও তাহারা ডোনাল্ড সাহেবকে প্রহার করে। তজ্জন্য তাহাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মোকদ্দমা হয়। বনমালী আইনে পণ্ডিত ছিলেন; তাঁহার তদ্বিরে আসামীরা বেকসুর খালাস পায়। বনমালী আরবী, পারশী ও উর্দ্দু ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। শুনা যায় যে জেলার কালেক্টর, এমন কি কমিশনার সাহেব পর্য্যন্ত তাঁহার কাছারীতে আসিয়া আরবী ও পারসী ভাষায় লিখিত জটিল দলিলাদি পড়াইয়া লইতেন ও আইনের পরামর্শ লইতেন। বনমালী অত্যন্ত পরোপকারী ও দাতা ছিলেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। উলা শান্তিপুর প্রভৃতি স্থান হইতে আগত কন্যাদায়গ্রস্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে তিনি কন্যাদায় উদ্ধারের জন্য এককালীন ৫০০৲।১০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত দান করিতেন। এইরূপ মুক্ত হস্তে দান করিয়া গিয়াছেন বলিয়া তাঁহার নাম এখনও যশোহর, খুলনা, নদীয়া, বরিশাল প্রভৃতি কতিপয় জেলায় প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। তিনি মৃত্যুসময়ে কিছুই সঞ্চয় রাখিয়া যাইতে পারেন নাই, বরং কিঞ্চিৎ দেনা রাখিয়া গিয়াছিলেন। তবে যশোহর ও খুলনা জেলাতে অল্প কিছু সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছিলেন। ঐ সম্পত্তি এখনও বর্ত্তমান আছে।

২৬ শশিশেখর ঘোষ (১)-ইনি বনমালীর জ্যেষ্ঠ পুত্র। নড়াইল কুরিগ্রামের দুর্গাকুমার বসুর একমাত্র কন্যার সহিত ইঁহার বিবাহ (কুল) হয়। ইনি প্রথমে নড়াইল কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসে ও পরে

নড়াইল জমিদার বাবুদের জয়েণ্ট এষ্টেটে বহু বৎসর যাবৎ অত্যন্ত দক্ষতার সহিত কার্য্য করেন ও ক্রমশঃ ডেপুটী ম্যানেজারের পদে উন্নীত হন। ইহার কিছুদিন পরে কাশিমবাজারের মহারাজা স্যর মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী বাহাদুরের বিশেষ অনুরোধে ইনি কাশিমবাজার রাজের বাহারবন্দ পরগণার নায়েবী পদ গ্রহণ করিয়া তথায় গমন করেন। তাহার কয়েক মাস পরেই মহারাজা বাহাদুর ইঁহার বুদ্ধিমত্তা ও কার্য্যদক্ষতায় বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া ইঁহাকে সদরে দেওয়ানী পদ দিবার অভিপ্রায়ে সদর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট করিয়া লইয়া আসেন। দুঃখের বিষয় কাশিম-বাজারে আসিবার ২।৩ মাস মধ্যেই ইনি নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হন ও ১৩০৬ সালের ২রা অগ্রহায়ণ তারিখে সৈদাবাদের গঙ্গা-তীরে তাঁহার ইহলীলা শেষ হয়। জমিদারী বিষয় সংক্রান্ত সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুস্তক "জমিদারী দর্পণ" শশিশেখরের স্মৃতি চিরস্থায়ী করিয়া রাখিয়াছে। ইনি পুণ্যাত্মা ছিলেন।

২৬। ইন্দুভূষণ ঘোষ (২)-ইনি বনমালীর কনিষ্ঠ পুত্র। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শশিশেখরের ন্যায় ইন্দুভূষণও রীতিমত লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন ও দাদার সঙ্গে একত্রে আইনের পরীক্ষা দিয়াছিলেন। ইনিও বিশেষ বুদ্ধিমান এবং পরোপকারী ও দাতা ছিলেন এবং তখনকার সমাজের অন্যতম নেতা ছিলেন। চোখের অসুখ থাকায় ইনি কখনও সরকারী বা বে—সরকারী চাকুরী করেন নাই। ইঁহার বুদ্ধিমত্তার জন্য দেশের অনেক সম্ভ্রান্ত লোক ইঁহার নিকট অনেক বিষয়ে পরামর্শ লইতে আসিতেন। ইনি যশোহর শ্রীধরপুরের জমিদার দেবেন্দ্র নাথ বসু মহাশয়ের একমাত্র ভাগিনেয়ীকে (হাজিরালী নিবাসী কৈলাশচন্দ্র রায় মহাশয়ের কন্যা) বিবাহ করেন। ১২৯৬ সালের শেষভাগে ইনি লিভার য়্যাব্‌সেস্‌ রোগে আক্রান্ত হন এবং খুলনা ও যশোহরে বহু চিকিৎসা স্বত্ত্বেও ১২৯৭ সালের ২০শে বৈশাখ তারিখে কুরিগ্রামের বাড়ীতে পরলোক

গমন করেন। ইনিও ধর্ম্মপ্রাণ ছিলেন এবং দুই ভাইয়ে মিলিয়া প্রতি বৎসর দেশের বাড়ীতে দুর্গোৎসবাদি পূজা করিতেন।

২৬। শশিশেখর ঘোষের বংশাবলী।

জ্যেষ্ঠপুত্র (১) ২৭ মন্মথনাথ—ইনি লেখাপড়ায় সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন। ইনি প্রথমে নড়াইল জমিদারদের জয়েণ্ট এষ্টেটে কিছুদিন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পদে চাকুরী করিয়া পরে কলিকাতায় ৺গোপাল লাল শীলের এষ্টেটে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইয়া যান। দুঃখের বিষয় ইনি ঐ চাকুরী পাইবার কিছুদিন পরেই পীড়িত হইয়া পড়েন এবং সন ১৩০৯ সালে ইহলীলা সম্বরণ করেন।

মধ্যম পুত্র (২) ২৭ প্রমথনাথ—ইনি জজ আদালতে, যশোহর ও খুলনায়, বহুদিন যাবৎ যশের সহিত চাকুরী করিয়া সন ১৩২৮ সালের পৌষ মাসে স্বর্গলাভ করেন। ইঁহার এখন এক পুত্র বর্ত্তমান আছেন।

তৃতীয় পুত্র (৩) ২৭ কিরণ চন্দ্র—ইনি শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে অধ্যয়নান্তে বর্ম্মায় পূর্ত্তবিভাগের চাকুরী লইয়া যান। তথায় ২২ বৎসর কাল কৃতিত্বের সহিত চাকুরী করিয়া লাহোর সেক্রেটেরিয়টের পূর্ত্তবিভাগ আফিসে বদলী হইয়া আইসেন। ইনি গত ১৯৩৪ সালের শেষভাগে সরকারী চাকুরী হইতে অবসর লইয়া এইক্ষণে কলিকাতায় বাড়ী করিয়া বাস করিতেছেন। ইঁহার ১ম পুত্র দেবব্রত শিল্পকলায় অসাধারণ দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় ইনি ২৮ বৎসর বয়সে ১৩৪২ সালের কার্ত্তিক মাসে নিউমোনিয়া রোগে কাশীধামে দেহত্যাগ করেন। ইহাঁর দ্বিতীয় পুত্র শান্তিব্রত (২৮) এম, বি, বি, এস্ পাশ করিয়া বর্ম্মায় ডাক্তারী করিতেছেন। শান্তিব্রত মজঃফরপুরে বিবাহ করিয়াছেন।

চতুর্থ পুত্র (৪) ২৭ চারুচন্দ্র—ইনি ১৯১১ সালে আইনের পরীক্ষা পাশ করিয়া ৩ বৎসর যাবৎ ওকালতী করেন। পরে জমিদারী চাকুরীতে

রায় সাহেব শ্রীযুক্ত অন্নদাকুমার ঘোষ

থাকিয়া নড়াইল, কাশিমবাজার, বাউফল প্রভৃতি কতিপয় বড় বড় এষ্টেটে দক্ষতার সহিত ল সেক্রেটারী ও ম্যানেজারী চাকুরী করিয়াছেন। ইঁহার একটী শিশু পুত্র বর্ত্তমান।

২৬। ইন্দুভূষণ ঘোষের বংশাবলী।

জ্যেষ্ঠ পুত্র (১) পূর্ণচন্দ্র (২৭)—ইনি লেখাপড়া বেশ শিখিয়াছিলেন, কিন্তু কখনও চাকুরী করেন নাই। গ্রামে ও দেশের মধ্যে ইনি একজন বুদ্ধিমান লোক ও দেবদ্বিজে ইঁহার খুব নিষ্ঠা আছে। ইনি ইউনিয়ান বোর্ড ইত্যাদিতে থাকিয়া গ্রামের অনেক হিতকর কার্য্য করিতেছেন ও সকলের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন। ইনি প্রতি বৎসর গ্রামে দুর্গোৎসব ইত্যাদি পূজা করিয়া থাকেন।

মধ্যম পুত্র (২) অন্নদাকুমার (২৭)-ইনি স্কুল কলেজের পাঠ শেষ করিয়া ১৯১১ সাল পর্য্যন্ত দেশে থাকিয়া সরকারী চাকুরী করিতেন। ১৯১২ সালে বঙ্গ্যারে পূর্ত্তবিভাগীয় আফিসে ইনি বদলী হন। ১৯১৪ সালে ইনি পাটনাতে আসেন ও তদবধি সপরিবারে পাটনায় বাস করিতেছেন। ইনি বিহারে আসিয়া নিজ অধ্যবসায়ের গুণে চাকুরীতে যথেষ্ট উন্নতি করেন ও বহু বৎসর যাবৎ বেহার ও উড়িষ্যা গভর্ণমেণ্টের জুডিসিয়াল্ ডিপার্টমেণ্টে রেজিষ্ট্রারের চাকুরী করিয়া গত মার্চ্চ ১৯৩৬ সালে সরকারী চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। ইনি গত ১৯২৭ সালে "রায় সাহেব" উপাধি প্রাপ্ত হন ও পরে গত ১৯৩৪ সালে ইঁহাকে সম্রাটের "সিল্‌ভার জুবিলী মেডাল" দেওয়া হয়। ইনি অনেক বৎসর যাবৎ স্থানীয় বাকিপুর হরিসভার সম্পাদকত্ব করিতেছেন। অন্যান্য ধর্ম্ম সংক্রান্ত অনুষ্ঠান ও সামাজিক অনুষ্ঠানেও ইনি বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট আছেন। পাটনার বাঙ্গালীরা অনেক বিষয়ে ইঁহার অভিমত লইয়া

কার্য্য করেন। ইনি বিনয়ী ও গরীবের বন্ধু। বহু বৎসর দেশ ছাড়া হইয়াও দেশের স্কুলকলেজ, রাস্তাঘাট ও অন্যান্য বহুবিধ উন্নতির দিকে ইঁহার বিশেষ দৃষ্টি রহিয়াছে। ইঁহার পত্নী লাবণ্য প্রভা ঘোষ গত ১৯২০ খৃঃ ৪ঠা মে বসন্ত রোগে পাটনায় ৺গঙ্গালাভ করেন। লাবণ্যপ্রভা তাঁহার পিতা যশোহর ঢাকুরিয়া নিবাসী অবসর প্রাপ্ত সব্‌জজ ৺হৃদয়নাথ মজুমদার মহাশয়ের একমাত্র কন্যা ছিলেন।

তৃতীয় পুত্র (৩) ললিতমোহন (২৭)—ইনি কলিকাতা হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজ হইতে ১৯০৪ সালে সর্ব্বপ্রথম এম্, বি, (হোমিও) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রায় বিশ বৎসর যাবৎ যশোহর সহরে বিশেষ দক্ষতার সহিত চিকিৎসা ব্যবসা করিতেছিলেন। ১৯২৩ সালের মধ্যভাগে ইনি আমাশয় রোগে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া চিকিৎসার্থ ইঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুরেন্দ্রনাথের কলিকাতা বাগবাজারস্থ বাসাতে আনীত হন ও তথায় কয়েক মাস যাবৎ অশেষ প্রকার চিকিৎসা সত্বেও ১৩৩১ সালের ৯ই ফাল্গুন দেহত্যাগ করেন। ইঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র প্রশান্তকুমার (২৮) বেহারবাসী হইয়া তথায় পুলিশ বিভাগে চাকুরী করিতেছেন; কনিষ্ঠ জ্ঞানেন্দ্রনাথ (২৮) মোটর ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষা করিয়াছেন ও বেহারে বাস করিতেছেন।

চতুর্থ পুত্র (৪) সুরেন্দ্রনাথ (২৭)—ইনি বহু বৎসর যাবৎ বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্টের অধীনে পুলিশ বিভাগে চাকুরী করিয়া গত কয়েক বৎসর যাবৎ সি, আই, ডি, ইন্‌স্‌পেক্টারের পদে কার্য্য করিতেছেন। ইঁহার পত্নী ও কয়েকটী ছেলেমেয়ে মারা গিয়াছে। এখন ছোট দুইটি পুত্র বর্ত্তমান।

পঞ্চমপুত্র (৫) সতীশচন্দ্র (২৭)—ইনি দেশে থাকিয়া নিজেদের বিষয় সম্পত্তি দেখিতেন। দেবদ্বিজে ইঁহার বিশেষ নিষ্ঠা ছিল ও ইনি গরীব দুঃখীকে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিতেন। ১৯৩৬ সালের ২০শে মার্চ্চ ইনি কলিকাতায় বসন্তরোগে আক্রান্ত হন ও অশেষ প্রকার চিকিৎসা

সত্ত্বেও ঐ মার্চ্চ মাসেই ইহলীলা সম্বরণ করেন। ইঁহার চারিটী পুত্র বর্ত্তমান আছে।

২৭। রায় সাহেব অন্নদা কুমার ঘোষের বংশাবলী।

জ্যেষ্ঠপুত্র (১) সন্তোষকুমার (২৮)—ইনি মজঃফরপুরে বসুদের ঘরে বিবাহ করিয়া কুল রক্ষা করিয়াছেন। ইনি কৃতবিদ্য ; এইক্ষণ পাটনা কলেজের অন্যতম অধ্যাপক। সম্প্রতি বিলাতের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইংরাজী অনার্সে বি,এ, পাশ করিয়া আসিয়াছেন। সন্তোষ-কুমারের পুত্র প্রণবকুমার শিশু।

মধ্যমপুত্র (২) সুবোধকুমার (২৮)—ইনি বিহার ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ হইতে বি, সি, ই, পাশ করিয়া বেহার গভর্ণমেণ্টে সহকারী ইঞ্জিনীয়ারের কর্ম্ম করিতেছেন। ইনিও পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র এবং বরাবর লেখাপড়ার বিশেষ চর্চ্চা রাখিয়াছেন। ইঁহার দুই পুত্র, অরুণ ও অজয়—তাহারা দুজনেই শিশু। কন্যা সন্ধ্যারাণী সকলের ছোট।

তৃতীয় পুত্র (৩) সুশীলকুমার (২৮)—ইনি ১৯২৭ সালে পাটনা কলেজ হইতে কৃতিত্বের সহিত আই, এস্, সি, পরীক্ষা পাশ করিয়া পাটনা মেডিক্যাল কলেজে ভর্ত্তি হইবার জন্য প্রস্তুত হন। এমন সময় মামার বাড়ীর দেশের পুকুরে স্নান করিতে গিয়া হঠাৎ জলমগ্ন হইয়া ১৩৩৩ সালের ২১শে চৈত্র মৃত্যুমুখে পতিত হন।

চতুর্থ পুত্র (৪) সুশান্ত কুমার (২৮)—ইনি পাটনা হাইকোর্টের অন্যতম উকিল। কর্ম্মী ও উদ্যমশীল। এইক্ষণ ডিষ্ট্রিক্টকোর্টে ওকালতী করিতেছেন।

পঞ্চম পুত্র (৫) সুধাংশুকুমার (২৮)—ইনি বি, এ, পাশ করিয়া পাটনা কলেজে ইতিহাসে এম্, এ পড়িতেছেন। সঙ্গীত বিষয়ে ইঁহার বিশেষ

অনুরাগ লক্ষিত হয়। ইনি বেশ মেধাবী ছাত্র এবং বঙ্গ সাহিত্যের চর্চ্চা রাখিয়াছেন।

ষষ্ঠ পুত্র (৬) শিশির কুমার (২৮)—ইনি আই, এ, পাশ করিয়া পাটনা কলেজে ইংরাজীতে বি, এ, পড়িতেছেন। লেখাপড়ায় ইঁহার বিশেষ আগ্রহ। ইনিও মেধাসম্পন্ন ; খেলাধূলা এবং সাহিত্য চর্চ্চায় ইঁহার বিশেষ অনুরাগ আছে।

বালেশ্বরের রায় সাহেব বিপিনবিহারী দে

রায় সাহেব বিপিনবিহারী দে মহাশয়েব নাম বঙ্গদেশে অনেকের নিকট অপরিচিত হইলেও বালেশ্বর জেলার ঘরে ঘবে তাঁহার নাম প্রবাদ-বাক্যের ন্যায় প্রচলিত। ইঁহারা প্রসিদ্ধ বনীয়াদী তাম্বুলী বংশীয। ইঁহাব পূর্ব্বপুরুষেবা হুগলী হইতে প্রায় দুই শত বৎসব পূর্ব্বে বালেশ্বরে আগমন কবিয়া তথায় বসবাস করিতে থাকেন। ইঁহার পিতামহ ৺মদনমোহন দে ব্যবসায় করিতেন, তাঁহার একখানি "সোলুপ" নামে ডিঙ্গী নৌকা ছিল, যাহাতে তিনি ব্যবসায কবিতেন। ইঁহাব জ্যেষ্ঠতাত লালবিহারী দে পার্শী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি মাত্র ২৫ বৎসব বয়সে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

বিপিনবাবুব পিতা ৺কুঞ্জবিহারী দে মহাশয একজন পবম বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি বড়াম্বা, দাসপাল্লা ও কেওঞ্জব রাজ্যের দেওয়ান ছিলেন। তিনি ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ৩৯ বৎসর বযসে মারা যান। কেওঞ্জর রাজ্যের আনন্দপুর নামক স্থানে তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তিনি বিপিনবিহারী, বিনোদবিহারী ও রাসবিহারী—তিন পুত্র রাখিয়া যান।

পিতার মৃত্যুকালে বিপিনবিহারী মাত্র পঞ্চদশবর্ষবয়স্ক ছিলেন। স্বর্গীয় মহারাজা বৈকুণ্ঠনাথ দে তাঁহাদিগকে পুত্রবৎ প্রতিপালন করিতেন।

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সত্যেন্দ্রনাথ দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তখন মহারাজা বিপিনবাবুকে তাঁহার এষ্টেটের ম্যানেজার-পদে নিযুক্ত করেন। বিপিনবাবু এই পদে বিশ বৎসরকাল কার্য্য করেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি মহারাজার দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন।

কর্ম্মনিষ্ঠ বিপিনবাবু শুধু উচ্চতর পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া অর্থোপার্জ্জন করিয়াই জীবনের কর্ত্তব্য শেষ করেন নাই; ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি রাজা শ্যামানন্দ দে বাহাদুর কর্ত্তৃক বালেশ্বরে প্রতিষ্ঠিত ভিক্টোরিয়া জুবিলি স্কুলের সেক্রেটারীর কার্য্য করিয়াছেন। তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টার ফলে প্রতি বৎসরই এই স্কুল হইতে বহু ছাত্র কৃতিত্বের সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইত। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে অদ্যাবধি তিনি শ্রীরামচন্দ্র সংস্কৃত টোলের সেক্রেটারীর কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। ময়ূরভঞ্জের স্বর্গীয় মহারাজা শ্রীরামচন্দ্র ভঞ্জ দেও বাহাদুরের দানের ফলে এই টোল ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। এত বড় টোল বালেশ্বর জেলায় আর দ্বিতীয় নাই। এই টোলে আয়ুর্ব্বেদ, কাব্য, পুরাণ, ধর্ম্মশাস্ত্র, কর্ম্মকাণ্ড, ব্যাকরণ, দর্শন, ন্যায় প্রভৃতি পড়ান হয়। প্রত্যেক বৎসর এই টোল হইতে বহু ছাত্র উপাধি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছে। বেহার-উড়িষ্যা বিভাগের সংস্কৃত টোল-পরিদর্শক হইতে আরম্ভ করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট ও সংস্কৃত-শিক্ষার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট প্রভৃতি বিপিনবাবুর মহতী কর্ম্মশক্তির প্রশংসা করিয়াছেন।

১২৭৯ বঙ্গাব্দের ২রা আশ্বিন মঙ্গলবার (ইংরাজী ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই সেপ্টেম্বর) বিপিনবাবুর জন্ম হয়। ইঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিনোদ-বিহারী দে কটক, বালেশ্বর, পুরুলিয়া ও অন্যান্য জেলায় ডিষ্ট্রিক্ট সাব-রেজিষ্ট্রার ছিলেন। কয়েকবার তিনি অস্থায়ী ইন্‌স্পেক্টর অব রেজিষ্ট্রেশন হইয়াছিলেন। যখন পিতার মৃত্যু হয়, তখন তাঁহার বয়স মাত্র ১১ বৎসর। এখন তিনি সরকারী চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার এক পুত্র শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর দে বি.এ. বি.টি. গবর্ণমেণ্ট সাব-রেজিষ্ট্রার এবং তাঁহার অন্য পুত্র নীরোদবিহারী দে বালেশ্বরের কালেক্টরেটের কোষাধ্যক্ষ (Treasurer)।

বিপিনবাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুত রাসবিহারী দে, আই-এ, এল্-টি (I. A., L. T.) স্কুল-সমূহের সাব-ইন্‌স্পেক্টর। পিতার মৃত্যুকালে তিনি মাত্র একবৎসরবয়স্ক ছিলেন।

বিপিনবাবু বালেশ্বরের যাবতীয় জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট এবং দেশের মঙ্গলজনক যাবতীয় অনুষ্ঠানের জন্য তিনি নিঃস্বার্থ ভাবে প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া থাকেন। ৩৫ বৎসবকাল বিপিনবাবু সেণ্ট্রাল হস্পিটেল কমিটির সদস্য আছেন। ৩০ বৎসর যাবৎ তিনি আবগারী পরামর্শকমিটির সদস্য-পদে অধিষ্ঠিত আছেন। ৮ বৎসর যাবৎ বিপিনবাবু স্থানীয় বিডন মাদ্রাসা এম্-ই স্কুলের সভাপতি ছিলেন। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে বালেশ্বর সহরে যে আদমসুমারী বা লোকগণনা হয়, তিনি উহার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন; কিন্তু অসুস্থতা-নিবন্ধন উক্ত পদ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে ব্যবস্থাপক সভার নির্ব্বাচনে ভোট দিবার জন্য মিউনিসিপ্যালিটী কর্ত্তৃক প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

রায় সাহেব বিপিনবিহারী দে মহাশয়ের জনহিতকর কার্য্য-তালিকা:—১৯০১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আজ পর্য্যন্ত ইনি একাদিক্রমে মিউনিসি-প্যালিটীর কমিশনার। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইনি গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মনোনীত কমিশনার ছিলেন, তৎপর হইতে জনসাধারণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়া আসিতেছেন।

১৯১১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দ এবং ১৯১৭ হইতে ১৯২২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মিউনিসিপ্যালিটীর ভাইস্-চেয়ারম্যান ছিলেন।

১৯২৩—১৯২৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান ছিলেন। ১৯২৪ হইতে ১৯৭২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নয় বৎসর তিনি মিউনিসিপ্যালিটির প্রেসিডেণ্টও ছিলেন। মিউনিসিপ্যালিটীতে দীর্ঘ ৩৭ বৎসবকাল কার্য্য করিয়া যে ভাবে করদাতাদের হিতসাধন করিয়াছেন তাহাতে প্রীত হইয়া বিভাগীয় কমিশনার ১৯১৩, ১৪, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১ ও ২২ খ্রীষ্টাব্দের মিউনিসিপ্যাল রিপোর্টে তাঁহার গুণগান করেন এবং ১৯১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২ খ্রীষ্টাব্দের গভর্ণমেণ্ট রিপোর্টে যথেষ্ট প্রশংসা করা হয়।

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইনি সদর লোকাল

বোর্ডের সদস্য ছিলেন। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এবং পুনরায় ১৯৩২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক মনোনীত হইয়া জেলা-বোর্ডের সদস্যপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯১৪ হইতে ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ২১ বৎসর অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা লাভ করেন এবং পারদর্শিতার জন্য গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ধন্যবাদ দেন।

১৯১৯—১৯২২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের অনারারি সেক্রেটারী ছিলেন।

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের অনারারি ডিরেক্টর ছিলেন। ১৯১৯—২০ খ্রীষ্টাব্দে কো-অপারেটিভ সোসাইটীর সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া তিনি যে সমস্ত সৎকার্য্য করিয়াছিলেন তাহা গভর্ণমেণ্ট-রিপোর্টে উল্লিখিত হইয়াছে।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার এইসমস্ত সৎকার্য্যের জন্য গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে "রায় সাহেব" উপাধি প্রদান করেন। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহাকে দিল্লী-দরবার মেডাল দেওয়া হয়।

উড়িষ্যার মিউনিসিপ্যালিটী-সংক্রান্ত কার্য্যকলাপ-সম্বন্ধে বিভাগীয় কমিশনারের মন্তব্য :—

১৯১৩—১৪; পৃষ্ঠা ২, প্যারা ৭—"বালেশ্বরে আদায়ের পরিমাণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছিল :"

পৃষ্ঠা ১২, প্যারা ৪৮—'ভাইস্-চেয়ারম্যান বিশেষ উৎসাহের সহিত কাজ করিয়াছেন।"

পৃষ্ঠা ৯, প্যারা ৪৪—Conditions have improved greatly in Balasore, where the staff has been completely reorganised. Babu Manmatha Nath Dey on whose work, as Vice-Chairman, Mr. Le Meshurier commented adversely in his

last report, was replaced in January, 1918 by Babu Bepin Behari De. The latter has done much good work in supervising the office."

অর্থাৎ বালেশ্বরের অবস্থার অনেক উন্নতি হইয়াছে, মিউনিসিপ্যালিটীর কর্ম্মচারিবর্গকে সম্পূর্ণ পুনর্গঠিত করা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ দে ভাইস্-চেয়ারম্যান থাকা কালে মিঃ লি মেশর তাঁহার বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য করিয়াছিলেন, তাঁহার স্থানে শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দেকে ভাইস্-চেয়ারম্যান নিয়োজিত করা হয়। বিপিনবাবু অফিস তত্ত্বাবধানপূর্ব্বক কাজ-কর্ম্মের অনেক সুব্যবস্থা করিয়াছেন।

১৯২০—২১ খ্রীষ্টাব্দ। পৃষ্ঠা ১১, প্যারা ৬৪—Rai Bahadur H. L. Khastagir, Chairman of the Balasore Municipality reports that Rai Saheb Bepin Behari De, Vice-Chairman, continued to take keen interest in his work and carefully supervised the work of the executive staff.

অর্থাৎ রায় বাহাদুর এইচ-এল্ খাস্তগীর (বালেশ্বর মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান) মন্তব্য করিয়াছেন যে, ভাইস-চেয়ারম্যান রায় সাহেব বিপিনবিহারী দে তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্য বিশেষ আগ্রহের সহিত করেন এবং কর্ম্মচারীদের কার্য্য বিশেষ যত্ন সহকারে পর্য্যবেক্ষণ করেন।

১৯২০—২১ খ্রীষ্টাব্দ, পৃষ্ঠা ১৪, প্যারা ৪৮ :—বালেশ্বরের মিউনিসিপ্যালিটীর ভাইস-চেয়ারম্যান রায় সাহেব বিপিনবিহারী দে আলোচ্য বর্ষে বিশেষ ভালরূপ কাজ করিয়াছেন।

১৯২১—২২ খ্রীষ্টাব্দ, পৃষ্ঠা ১৫, প্যারা ৪৮ :—"Mr. Gupta commends the work of the Vice-Chairman of Balasore, Rai Saheb Bepin Behari De, who has been Chairman and Vice-Chairman since Mr. Khastagir

was transferred on February 16th. Mr. Grunning, when he inspected in July 1921, considered that very considerable improvements had been effected by Mr. Khastagir and Rai Sahib Behin Behari De."

অর্থাৎ মিঃ গুপ্ত বালেশ্বরের ভাইস্-চেয়ারম্যান রায় সাহেব বিপিনবিহারী দে মহাশয়ের কর্ম্মদক্ষতার প্রশংসা করেন। মিঃ খাস্তগীর ১৬ই ফেব্রুয়ারী অন্যত্র বদলী হইলে রায় সাহেব বিপিনবিহারী দে মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যানের কার্য্য একযোগে করেন। মিঃ গ্রুণিং ১৯২১ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে মিউনিসিপ্যালিটী পরিদর্শন করিয়া এই মন্তব্য করেন যে, মিঃ খাস্তগীর ও রায় সাহেব বিপিনবিহারী দে কর্ত্তৃক মিউনিসিপ্যালিটীর যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

১৯২১-২২ খৃষ্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৭, প্যারা ২২ :—

"Government desire, in particular to record their gratitude to the gentlemen whose names have been specially mentioned in the reports.

Orissa Division Rai Saheb Bepin Behari De, Vice-Chairman, Balasore Municipality."

অর্থাৎ সরকারী রিপোর্টে যে সকল ভদ্রলোকের নাম কর্ম্ম-নৈপুণ্যের জন্য বিশেষ ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন করিতেছেন। উড়িষ্যা বিভাগস্থিত বালেশ্বর মিউনিসিপ্যালিটীর ভাইস-চেয়ারম্যান রায় সাহেব বিপিন বিহারী দে উঁহাদের মধ্যে অন্যতম।

১৯২১ খৃষ্টাব্দের ১৩ই নবেম্বর পাটনা হইতে স্বায়ত্ত-শাসন বিভাগের মন্ত্রীর অতিরিক্ত সেক্রেটারী বিভাগীয় কমিশনারকে জানান—

"I am to request that you will convey the thanks of Government to the Chairman and the Vice-Chairman of

the Municipality for the great interest they take in the health of the town."

অর্থাৎ বালেশ্বর মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান ও ভাইস্-চেয়ারম্যান নগরের স্বাস্থ্যরক্ষাকল্পে যেরূপ আগ্রহ-সহকারে কার্য্য করিয়া থাকেন, সেজন্য তাঁহাদিগকে আপনি গভর্ণমেণ্টের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিবেন।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর গভর্ণমেণ্ট তাঁহার নাম রেজিষ্ট্রীভুক্ত করিবার জন্য তাঁহাকে চিঠি দেন।

১৯২২ খৃষ্টাব্দের ২৪শে এপ্রিল তারিখে মিউনিসিপ্যালিটীর যাবতীয় কমিশনার একটি বিশেষ সভা করিয়া রায় সাহেবকে নিঃস্বার্থভাবে মিউনিসিপ্যালিটীর কার্য্যপরিচালনায় জন্য ধন্যবাদ দেন এবং তাঁহার সম্মানের জন্য সহরের একটি প্রশস্ত রাস্তা "Rai Sahib Bipin Bihari De Street" নামে অভিহিত করেন।

২১-৭-২১ তারিখে বিভাগীয় কমিশনার মিঃ জন এফ গ্রুনিং নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করেন :—

"The Chairman, and the Vice-Chairman Rai Sahib Bepin Behari De are doing their best to supervise the work of Municipality and the very considerable improvement effected is due to their effort."

অর্থাৎ চেয়ারম্যান এবং ভাইস্-চেয়ারম্যান রায় সাহেব বিপিনবিহারী দে মিউনিসিপ্যালিটীর কার্য্য বিশেষ যত্নের সহিত করিতেছেন। তাঁহাদের চেষ্টায় মিউনিসিপ্যালিটীর প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে রায় সাহেব বিপিনবিহারী দে মহাশয়কে গবর্ণমেণ্ট করোনেশন মেড্যাল পুরস্কারস্বরূপ প্রদান করিয়া সম্মানিত করিয়াছেন।

রায় সাহেব বিপিনবাবু অতীব অমায়িক, পরদুঃখকাতর এবং মহানুভব পরার্থে জীবনোৎসর্গই তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র। তিনি অহোরাত্র যে

ভাবে করদাতৃবর্গের সেবা করিয়া আসিতেছেন, সেরূপ নিঃস্বার্থ সেবা-পরায়ণতা সচরাচর বিরল। দীনদুঃখীর প্রতিও তিনি সতত করুণাপরায়ণ। বঙ্গদেশ ছাড়িয়া সুদূর বালেশ্বরে বসতি করিলেও বাঙ্গালার চিন্তা তিনি ভুলেন নাই। বাঙ্গালী তাঁহার বাড়ীতে যাইলে তিনি সযত্নে তাঁহার সেবা করেন। তিনি অধস্তন কর্ম্মচারীদেব প্রতি কখনও রূঢ় বাক্য প্রয়োগ করেন না। তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে মিউনিসিপ্যালিটীর অত্যন্ত নিম্নস্তরের কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত মুগ্ধ। অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট-রূপেও তিনি সূক্ষ্ম ও নিরপেক্ষ বিচার-শক্তির যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন।

১৯৩৫-৩৬ এবং ১৯৩৬-৩৭ খ্রীষ্টাব্দেব শাসন-বিবরণীতে মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান মহোদয় ধন্যবাদ-সহকারে স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি রায় সাহেব বিপিনবিহারী দে মহাশয়ের নিকট হইতে আন্তরিক সহযোগিতা ও মূল্যবান পরামর্শ ও সাহায্য পাইয়াছিলেন।

তিনি গত ১৫ বৎসরকাল গবর্ণমেণ্ট আপার প্রাইমারী মডেল বালিকা-বিদ্যালয়ের এডভাইসরী কমিটির সদস্য ছিলেন এবং এখনও আছেন।

১৯৩১ খৃষ্টাব্দে বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের গবর্ণর বাহাদুর প্রশংসনীয় জনসেবামূলক কার্য্যাবলীর জন্যও রায় সাহেব বিপিন-বিহারী দে মহাশয়কে একটি সনদ প্রদান করেন।

শ্রীযুক্ত মথুরানাথ মৈত্র, উকিল, ফরিদপুর

শান্তিপুর বঙ্গের মধ্যে বিখ্যাত স্থান। অনেকের নিকট ইহা সহর বলিয়া সমাদৃত। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমসাময়িক শিবাবতার শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের সাধন-আশ্রম বলিয়া শান্তিপুর বৈষ্ণব মহাজনগণের নিকট পুণ্যতীর্থ। শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর প্রথমা পত্নীর গর্ভজাত পুত্র মধুসূদনের সন্তানগণ "গোস্বামী ভট্টাচার্য্য-বংশ" নামে খ্যাত। মধুসূদন হইতে অধস্তন কয়েক পুরুষ পরে সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত রাধামোহন গোস্বামী বিদ্যাবাচস্পতি গোস্বামী ভট্টাচার্য্যমহাশয় এই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীঅদ্বৈতের পর তাঁহার ন্যায় পণ্ডিত আর কেহ শান্তিপুরে জন্মগ্রহণ করেন নাই।

শান্তিপুরের মৈত্র-পরিবার প্রাচীন কীর্ত্তিমান বংশ। পূর্ব্বোক্ত গোস্বামী ভট্টাচার্য্যমহাশয় তাঁহার একমাত্র কন্যাকে ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁহার কন্যাকে যথাক্রমে ফরিদপুর জেলার রুবলী গ্রামের এবং নদীয়া জেলার বিল্বপুষ্করিণী গ্রামের কুলীন মৈত্র-বংশ-সম্ভূত ব্যক্তির সহিত বিবাহ দেওয়া হেতু উক্ত দুই শাখা-বিভক্ত মৈত্র-বংশের শান্তিপুরে বাস। এই মৈত্র-বংশে বহু কৃতবিদ্য বিশিষ্ট ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীযুত মথুরানাথ মৈত্র পূর্ব্বোক্ত বিল্বপুষ্করিণীর মৈত্রবংশসম্ভূত এবং শান্তিপুরবাসী। তাঁহার পিতা ৺প্যারীলাল মৈত্র কৃষ্ণনগরে মাতুলালয়ে থাকিয়া ইউনিভারসিটি-সৃষ্টির বহু পূর্ব্বে ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়াছিলেন। কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত প্রফেসর উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাঁহার সহাধ্যায়ী ছিলেন।

মথুরানাথ ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ষোল বৎসর বয়সে শান্তিপুর স্কুল হইতে

এণ্ট্রান্স পাশ করেন এবং ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে জুন মাসে বি-এল্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর এক বৎসর স্কুল-মাষ্টারি করিয়া কিছুকাল আলিপুর জজ্-কোর্টে ওকালতি করেন। পরে ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাস হইতে ফরিদপুরে ওকালতি করিতেছেন। এই দীর্ঘকাল অর্থাৎ ৫০ বৎসরের ওকালতি-কার্য্যের মধ্যে কেবল ৪ মাস কাল মুন্সেফের কার্য্য করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসরের জন্য Bar Associationএর President ছিলেন। মথুরাবাবু তাঁহার পাঠ্যাবস্থা হইতেই সাধারণের কার্য্যে ও সভা-সমিতিতে যোগ দিতেন। তাহার সহপাঠী ও বন্ধুগণের উপর তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। শান্তিপুরের মিউনিসিপালিটী-সংক্রান্ত দলাদলি বড় প্রসিদ্ধ। এই জন্যই শান্তিপুর মিউনিসিপালিটীতে অনেক দিন যাবৎ সরকারী চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি সরকারী চেয়ারম্যান উঠাইবার আন্দোলনে যোগ দিয়াছিলেন। শান্তিপুরে Rate-payers' Association একটা জন-সাধারণের হিতকর অনুষ্ঠান। তিনি এই Associationএর Secretary-পদ অনেক বৎসর যাবৎ অলঙ্কৃত করেন। গবর্ণমেণ্ট একবার শান্তিপুর মিউনিসিপালিটীকে কোন কারণে মিউনিসিপাল Actএর ৬০ ধারামতে supersede করিয়া ২৪ জন কমিশনার স্থলে মাত্র ৯ জনকে কমিশনার মনোনীত করেন এবং রাণাঘাটের Subdivisional Officer চেয়ারম্যান হইয়া মিউনিসিপালিটীর কার্য্য চালাইতে থাকেন। তিনি ট্যাক্স বসান। মথুরবাবু দেওয়ানি আদালতে তিন জন Ratepayer দ্বারা মোকর্দ্দমা দায়ের করাইয়া হাইকোর্ট পর্য্যন্ত মোকর্দ্দমা করিয়া গবর্ণমেণ্টের উক্ত কার্য্য বেআইনি সাব্যস্ত করেন।

শান্তিপুর প্রভৃতি স্থানের পত্তনি-স্বত্ব নিলাম-বিক্রয় হইলে বাবু বিপ্রদাস পাল জমিদার উহা খরিদ করিয়া অনেক লোকের ব্রহ্মোত্তর রহিত করার মোকর্দ্দমা করিলে মথুরবাবু প্রজার পক্ষে থাকিয়া কার্য্য করেন, এবং উক্ত জমিদারের সমস্ত মোকর্দ্দমা ডিস্‌মিস্ হয়। জমিদার বিপ্রদাস

পাল কর্ত্তৃক শান্তিপুরগ্রাম জরিপ করার চেষ্টা হইলে তাহার বিরুদ্ধে মথুরবাবু Board of Revenueএর নিকট সাধারণের পক্ষে দরখাস্ত করিয়া কৃতকার্য্য হন। তিনি এখন পর্য্যন্তও যখন শান্তিপুরে যান, সর্ব্বপ্রকার জনহিতকর কার্য্যে যোগ দিয়া থাকেন। অনেক বৎসর যাবৎ শান্তিপুরের বিখ্যাত পুরাণ সভার তিনি সভাপতি ছিলেন। ১৯০৯ সালে যখন সমগ্র জেলায় Political Conference আরম্ভ হয়, সেই সময় নদীয়া Conferenceএর প্রথম অধিবেশন শান্তিপুরে হয়। মথুরবাবু Reception কমিটির President হন এবং পর বৎসর যখন নদীয়া District Conference কুষ্টিয়াতে হয় তখন মথুরবাবু President হন।

ফরিদপুরে ওকালতি করার সময় হইতেই তিনি ফরিদপুর জেলার যাবতীয় জনহিতকর কার্য্যে ব্রতী থাকেন। এখানে আসিয়া অবধি দেশমান্য ৺অম্বিকাচরণ মজুমদারের সহিত তাঁহার বিশেষ বন্ধুত্ব হয়। দেশের ও দশের অনেক কাজ তাঁহার সহিত একযোগে তিনি করিতেন। ফরিদপুর মিউনিসিপ্যালিটীতে অনেক বৎসর যাবৎ ভাইস্-চেয়ারম্যান ছিলেন, এবং অম্বিকাবাবু চেয়ারম্যান ছিলেন। অম্বিকাবাবু চেয়ারম্যানের পদ ত্যাগ করিলে মথুরবাবু চেয়ারম্যান হয়েন।

ফরিদপুর District Associationএর প্রথমে Secretary, পরে President হয়েন। অনেক দিন পূর্ব্বে ফরিদপুরে যখন একবার Provincial Conference হইয়াছিল, মথুরবাবু তখন Secretaryর কার্য্য করেন। আর একবার ফরিদপুরে যখন Conference হয়, এবং Mr. C. R. Das President হয়েন, মথুরবাবু সেই সময়ে Industrial Exhibitionএর President ছিলেন এবং মহাত্মা গান্ধী উক্ত Exhibitionএর দ্বারোদ্ঘাটন করেন। Sir Surendanath Banerjea যেবার মন্ত্রী হইয়া ফরিদপুরে আসেন, সেইবার সমগ্র ফরিদপুর District

Board ও মিউনিসিপালিটী একত্র হইয়া এক সভা আহ্বান করেন। মথুরবাবু উক্ত সভার President হয়েন। ফরিদপুর Rajendra College-প্রতিষ্ঠা-কার্য্যে মথুরবাবু অম্বিকাবাবুর সহিত এক হইয়া ঐ কার্য্য করেন। অম্বিকাবাবু তাঁহার জীবদ্দশা পর্য্যন্ত ঐ Collegeএর Governing Bodyর President ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ১২ বৎসর কাল মথুরবাবু ঐ Collegeএর Governing Bodyর Presidentএর কার্য্য করেন। পরে District Magistrate President হওয়াতে মথুরবাবু বর্ত্তমানে Vice-President আছেন এবং তাঁহার দ্বারা ঐ College-এর নানাবিধ উন্নতি হইয়াছে। ফরিদপুর জেলার জনহিত-কর কার্য্যে মথুরবাবুর প্রগাঢ় সহানুভূতি আছে।

ডাঃ স্যার কেদারনাথ দাস

স্যার কেদারনাথের ঊর্দ্ধতন সপ্তম পর্য্যায়ের গদাধর দাস কায়স্থ-ব্রাহ্মণ প্রধান বিষ্ণুপুরে বাস করিতেন। দাসেদের আদিনিবাস সেইখানেই। তাঁহারা বিষ্ণুপুরের গণ্যমান্ত ব্যক্তি ছিলেন। বর্গীর অত্যাচারে বিষ্ণুপুর যখন উৎপীড়িত সেই সময়ে দাসবংশ বিষ্ণুপুর হইতে বর্দ্ধমানের শ্রীপুর গ্রামে পলায়ন করেন। পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা তাঁহাদের হইল বটে, কিন্তু সম্পত্তি-রক্ষা হইল না। হৃতসর্ব্বস্ব দাসমহাশয়েরা বিষ্ণুপুরে ফিরিয়া যান নাই; শ্রীপুরেই বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। বহুবর্ষ পরে তাঁহাদের এক বংশধর—রামচন্দ্র দাস ভাগ্য-পরিবর্ত্তনের চেষ্টায় কলিকাতায় আগমন করেন এবং খড়দহের বিশ্বাস-বাবুদের বিস্তৃত জমিদারীর কর্ম্মচারী নিযুক্ত হন। কার্য্য-দক্ষতাগুণে অল্পদিনের মধ্যেই সেই জমিদারী-পরিচালনার গুরুভার তাঁহার উপর পড়ে। এই সময়ে কলিকাতায় বিপত্নীক রামচন্দ্র দ্বিতীয়দার গ্রহণ করেন এবং কলিকাতার কৃষ্ণ সিংহের গলিতে (অধুনা বেথুন রো) গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করেন।

রামচন্দ্রের পাঁচ পুত্র। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ যাদবকৃষ্ণ স্যার কেদার-নাথের পিতা। গভর্মেণ্টের শিক্ষা-বিভাগে নিযুক্ত থাকিয়া তিনি জীবনাতিপাত করেন। তৎকালীন সংবাদপত্রাদি হইতে পাওয়া যায়,—"He was an eminent educationist. * * * His career in the Educational Service was marked by uniform success." পাণিহাটীর সুপ্রসিদ্ধ যদুনাথ ঘোষের কন্যার সহিত তাঁহার

বিবাহ হয়। যাদবকৃষ্ণের তিনপুত্র ও দুই কন্যা, তন্মধ্যে স্যার কেদারনাথ জ্যেষ্ঠ।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ২৪শে ফেব্রুয়ারী রবিবাসরে কেদারনাথের জন্ম। বাটীর নিকটস্থ পাঠশালা ও জোড়াসাঁকো মডেল্ ভার্ণাকুলার স্কুলের পাঠ শেষ করিয়া তিনি হিন্দু স্কুলে ভর্ত্তি হন এবং তথা হইতে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তি-লাভ করেন। তৎপরে জেনারেল্ এসেম্ব্লিজ্ ইন্‌ষ্টিটিউসন্ (অধুনা স্কটিস্ চার্চ্চেস্ কলেজ) হইতে যথাসময়ে এফ-এ পরীক্ষায় সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা মেডিকেল্ কলেজের ছাত্রশ্রেণীভুক্ত হন।

প্রবেশিকা পরীক্ষার পূর্ব্বে বালক কেদারনাথের মাতৃবিয়োগ ঘটে। একাদিক্রমে কয়েকদিন সম্পূর্ণ অচৈতন্য অবস্থায় থাকিয়া তাঁহার মৃত্যু হয়। রোগিণীকে ঔষধ ও আহার্য্যাদি সেবন করান তদবস্থায় সাধারণভাবে সম্ভবপর ছিল না, 'ইন্‌জেকসন্ করিয়া করাইতে হইত। পুত্র কেদারনাথই নিপুণভাবে তাহা করিতেন।

রোগীর সেবা-কার্য্যে বালকের দক্ষতা লক্ষীভূত হয় তাঁহার অতি কোমল বয়স হইতেই। কেদারনাথ যখন দ্বাদশ বৎসরের সেই সময়ে তাঁহার এক খুল্লতাতের শিশুপুত্র টাইফয়েড-রোগাক্রান্ত হয়। জ্বরের উত্তাপ-গ্রহণ, রোগীকে 'স্পঞ্জ'-করণ, ঔষধদান সকলই করিতেন তিনি স্বেচ্ছায়। যাহা করিতেন ধারাবাহিকরূপে তাহা লিখিয়াও রাখিতেন। শিশু রোগী ছিল ডাক্তার 'চান্দ্রা'র চিকিৎসাধীন। কেদারনাথের দক্ষতায় বালকের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন এবং সেই বালক যে ডাক্তার হইবেই—ভবিষ্যদ্বাণী করেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে পূজিত চিকিৎসক-প্রবর স্যার কেদারনাথের চিকিৎসা-বিদ্যার অঙ্কুর এইভাবেই বালক-বয়সে দেখা দেয়। অচৈতন্য জননীকে যে সময়ে চিকিৎসকেরা মৃতা সাব্যস্ত করিয়া কক্ষত্যাগ করেন, সেই সময়ে কেদারনাথ জননীর

বক্ষের উপর 'কান পাতিয়া' দেখেন—হৃদ্‌স্পন্দন বন্ধ হয় নাই। তবে? চিকিৎসকেরা তখনও চলিয়া যান নাই, নিম্নতলে ছিলেন। ত্বরিৎপদে বালক তাঁহাদিগকে লইয়া রোগীর ঘরে আসে। পরীক্ষান্তে তাঁহারা দেখেন বালকের কথাই সত্য, রোগিণী মৃতা নহে। আবার চিকিৎসারম্ভ হয়, কিন্তু তাহা বৃথা হইয়া যায়। প্রায় তিন ঘণ্টা পরে রোগিণীর মৃত্যু ঘটে। সে যাহা হউক, চিকিৎসাবিদ্যায় কেদারনাথের মনীষা যে তখনও বর্ত্তমান এই দৃষ্টান্ত হইতে তাহা অবিসংশভাবে পাওয়া যায়।

চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা করিবার ইচ্ছা কেদারনাথের মনে স্পষ্ট জাগরিত হয় এই সময়েই। তাঁহার কেমন মনে হইয়াছিল চিকিৎসার কোনও ত্রুটি ঘটাতেই জননীর মৃত্যু হইল। কেদারনাথ ছিলেন মাতৃগতপ্রাণ। তিনি কেবল তাঁহার পুত্র ছিলেন না, কন্যাও ছিলেন। জননীর সাংসারিক সকল কার্য্যে কন্যার ন্যায় তিনি সাহায্য করিতেন অনুক্ষণ। জননীর আশীর্ব্বাদ পুত্র লাভ করেন—পদে পদে। শিশুকালে কৃশকায় কেদারনাথের হস্তাঙ্গুলি ছিল অধিকতর কৃশ। আত্মীয়বর্গ হাসাহাসি করিয়া বলিত—সাঁড়াশী। পুত্রকে বক্ষে চাপিয়া জননী বলিতেন, 'বাছার ওই আঙ্গুলই সোনা হবে'। সেই সাঁড়াশীর সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া মেডিকেল্‌ কলেজের ডাক্তার পেক্‌ একদিন বলিয়াছিলেন, "কি দিলে ডাক্তার দাসের মত আঙ্গুল পাওয়া যায়।" 'গেরস্ত'-সংসারে প্রাণ ভরিয়া মাতা পুত্রকে খাওয়াইতে পারিতেন না। স্নেহভরে সজল-নয়নে ছেলেকে তিনি বলিতেন, "খুদকুঁড়ো খেয়ে তুই রাজা হ—তখন তোরই খেয়ে সবাই ফুরিয়ে উঠতে পারবে না।" রোগাতুরের প্রতি পুত্রের সেবা-যত্নে তিনি আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতেন। আর তাঁহার প্রতি কোমলমতি পুত্রের স্নেহ-ভক্তিতে প্রাণ তাঁহার পূর্ণ থাকিত অহর্নিশ—বলিতেন, 'যার এমন ছেলে তার অভাব কিসের'? অভাব যদি ছিল না তবে

তিনি চলিয়া যাইলেন কেন? মাতৃসেবা, মাতৃপূজা যে কিছুই হইল না, সবই পড়িয়া র'হিল! এই হয় পুত্রের আক্ষেপ। তাই জননী-জাতির সেবার মানসে বুঝি তিনি চিকিৎসা-বিদ্যা-শিক্ষায় নিযুক্ত হন। জননীর আশীর্ব্বাদে, রুগ্ন জননীর প্রতি ত্রুটি-বিচ্যুতি-খণ্ডনে যে পুরুষকার তাঁহার প্রাণে জাগিয়া উঠে তাহা অবলম্বন করিয়া তিনি অগ্রসর হন পূর্ণ উৎসাহে। সেই পুরুষকার, সেই উৎসাহের ফলে বিদ্যামন্দিরে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন তিনি লাভ করেন। তাহারই অমিতবিক্রমে মাতৃজাতির পূজা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরভাবে করিয়া আজ তিনি জগৎ-পূজ্য। অসংখ্য ছাত্র তাঁহারই প্রদর্শিত পথে আজ কর্ত্তব্যপরায়ণ।

ছাত্ররূপেই কেদারনাথ তাঁহার অধ্যাপকবৃন্দের অশেষ প্রশংসা অর্জ্জন করেন। চিকিৎসা, বিদ্যামন্দিরের প্রথম বার্ষিক শ্রেণী হইতে পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণী পর্য্যন্ত জয়শ্রী তাঁহার প্রতি সদয়া হন। এই কয় বৎসরে পরীক্ষাদিতে তিনি লাভ করেন—৮টী স্বর্ণপদক। প্রতি বৎসর সর্ব্বোচ্চ বৃত্তিলাভ ত করেনই; এতদ্ভিন্ন অন্যান্য পারিতোষিক-লাভও ঘটে—অনেক। সেগুলি এই :—

অনার-সার্টিফিকেট্—১০, ডিউক্ অফ্ এডিনবরা প্রাইজ—সার্জ্জারিতে, ক্লিনিকাল্ সার্জ্জারি প্রাইজ, আনাটমিতে—প্রসেক্টরস্ প্রাইজ, দুর্গাচরণ লাহা-স্কলারসিপ্ (প্রথম এম্-বিতে ফার্ষ্ট হওয়ায়), আবদুলগণি-স্কলারসিপ্ (বৎসরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছাত্র পরিগণিত হওয়ায়), গুডিভ্ স্কলারসিপ্।

১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ফাইনাল্ এম্-বি পরীক্ষায় কেদারনাথ সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া মিড্ওয়াইফারিতে অনার্স ও স্বর্ণপদক এবং সার্জ্জারিতে ম্যাকলিয়ড মেডাল্ প্রাপ্ত হন। মিডওয়াইফারী পরীক্ষায় তিনি সবিশেষ কৃতিত্ব দেখান পূর্ণ সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়া। অশেষ গুণ-সম্পন্ন কেদারনাথের প্রতি অধ্যাপকবৃন্দ প্রীত ত ছিলেনই। শেষ

ডাক্তারী পরীক্ষায় তাঁহার অসামান্য সাফল্যে তাঁহারা অধিকতর প্রীতিলাভ করেন এবং পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেজিষ্ট্রারের নূতন পদ সৃষ্টি করিয়া সেই পদে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জল রত্ন কেদারনাথের প্রতি এই স্বাভাবিক আকর্ষণ তাঁহাদের গুণগ্রাহিতারই পরিচয়। মেডিকেল্ ও সার্জ্জিকাল রেজিষ্ট্রার-রূপে তিনি বিরাজ করেন ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। ইতিমধ্যে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে এম-ডি (মাদ্রাজ) পরীক্ষা দিয়া হেলায় তাহা তিনি উত্তীর্ণ হন।

ছাত্রাবস্থাতেই মিডওয়াইফারীতে তাঁহার প্রতিভা দেখিয়া Prof. Joubert তাঁহাকে মিডওয়াইফারী চিকিৎসার অনুসরণ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া রাখেন; সে প্রতিজ্ঞা তিনি পালন বর্ণে বর্ণে করেন। তাঁহারও মনোগত ইচ্ছা ছিল সেই চিকিৎসার অনুসরণ করা। আচার্য্যের অনুজ্ঞা পালিত সুতরাং হয় দ্বিগুণ উৎসাহে। এই চিকিৎসক-রূপে তাঁহার যশঃ চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে অল্পকালের মধ্যেই। ফলে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে তিনি ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুল ও হাসপাতালের মিডওয়াইফারী এবং অবস্‌টেট্রিকস ও গাইনিকলজির শিক্ষক নিযুক্ত হন।

ডাক্তার কেদারনাথ ক্যাম্বেল হাসপাতালের সহিত সংশ্লিষ্ট হইবার সঙ্গে সঙ্গে তত্রস্থ অবস্‌টেট্রিকস্ ও গাইনিকলজি বিভাগের সর্ব্বতোভাবে উন্নতি সাধিত হয়। আজ তিনি Bengal's greatest obstetric Guru (Indian Medical Gazette) বলিয়া পরিগণিত: তিনি যে ইহা হইবেন তাহা সূচিত হইয়াছিল ক্যাম্বেল হাসপাতালে পদার্পণ করিবামাত্র। হাসপাতালের সাজ-সজ্জা, চিকিৎসা-প্রকরণ প্রভৃতির যথাযোগ্য আয়োজন করিয়া লইয়া ডাক্তার কেদারনাথ হাসপাতালের রূপ ফিরাইয়া দিলেন। ধাত্রীবিদ্যা-সংক্রান্ত যে সকল চিকিৎসা-প্রকরণ

অবলম্বন করা এই হাসপাতালে তাঁহার পূর্ব্বে কল্পনাতীত ছিল সে সকলই অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল তাঁহার কার্য্যকালের আরম্ভ হইতে। প্রসবকরণ বা অস্ত্রোপচারোপযোগী রোগিণীগণ নূতন চিকিৎসকের সুচিকিৎসায় নবজীবন-লাভে কৃতকৃতার্থ হইয়া চিকিৎসকের যশোগান শতমুখে করিতে লাগিল। ক্যাম্বেল হাসপাতালের চিকিৎসার সুনাম দেশময় ছড়াইয়া পড়িল। রোগিণীর সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল উত্তরোত্তর। ডাঃ কেদারনাথের চিকিৎসার প্রতি অগাধ বিশ্বাস-হেতু ক্রমে অনেকেই মেডিকেল কলেজের 'ইডেন্' অপেক্ষা ক্যাম্বেলের পক্ষপাতিনী হইল অধিক।

এদিকে তখন স্বাধীন ব্যবস্থা-ক্ষেত্রেও কেদারনাথের স্থান পুরোভাগে সুপ্রতিষ্ঠিত। কলিকাতায় ত বটেই, সুদূর পল্লীগ্রামের ঘরে ঘরে তাঁহার চিকিৎসা-প্রতিভার কথা সকলের মুখে মুখে। স্থানীয় চিকিৎসক সমাজে সকলেই তাঁহার প্রশংসাবাদী। দেশবাসী এতদিন বিদেশীয় চিকিৎসকের প্রতিই আস্থাবান্ ছিলেন অধিক। ডাঃ কেদারনাথের অসামান্য কৃতিত্বে তাঁহাদের সে ধারণার পরিবর্ত্তন ঘটে। দেশীয় চিকিৎসকের মর্য্যাদা দেশবাসীর নিকট প্রতিষ্ঠার অগ্রণী ডাঃ কেদারনাথ। এ বিষয়েও তিনি তাঁহাদের গুরুপদবাচ্য।

এই সূত্রে 'ইণ্ডিয়ান মেডিকেল গেজেট' হইতে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। "Dr. Kedarnath holds a unique position * * * There is no other obstetrician in India who has 40 (now 42) years of specialist work to look back upon. For four decades he has been working and observing in one field (Obstetric and Gynæcology) alone. নিজ আলয়েও এই বিষয়-সংক্রান্ত রোগ ব্যতীত আত্মীয়বর্গের অন্য কোনও রোগের চিকিৎসা কখনও ডাঃ কেদারনাথ করেন নাই।

চিকিৎসা-শাস্ত্রের কেবল একটা বিষয় এমনভাবে ধরিয়া থাকায় কেদারনাথ ব্যতীত ভারতবর্ষে আর দ্বিতীয় ব্যক্তি আছেন কি না সন্দেহ। M. S. Journal জানাইয়াছেন—"Dr. Das * * * is the only Indian who has devoted himself to the exclusive pratice of obstetrics.।" গুরুবাক্য-পালনের সঙ্গে সঙ্গে মাতৃজাতির সেবা মাতৃভক্ত কেদারনাথ এইভাবেই করিয়া আসিতেছেন।

একনিষ্ঠভাবে এই কার্য্যে ব্রতী থাকিয়া যে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জ্জন তিনি করেন ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত তাহা প্রসারিত হয়। অশেষ খ্যাতি ও কীর্ত্তিসম্পন্ন এই চিকিৎসক কিন্তু তথাপি ক্যাম্বেলের মায়া পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। তাঁহার মহামূল্য সময়ের অনেকাংশ ব্যয় পূর্ব্বের ন্যায় হইতে লাগিল হাসপাতালে দরিদ্রের চিকিৎসায়। কাঞ্চনের মায়া অনায়াসে ত্যাগ করিয়া দরিদ্র নারীর সেবায় তিনি নিজেকে নিয়োজিত রাখিলেন। চিকিৎসার কোনও ত্রুটী তাহাদের না হয় সেজন্য হাসপাতালের সাজ-সরঞ্জাম অপ্রতুল বোধ হইলে নিজ ব্যয়ে সে সকলের পূরণ তিনি করিয়া লইয়াছেন। দরিদ্র-নারায়ণের পূজার এ তাঁহার অপূর্ব্ব ধারা।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ বিশ বৎসর এই ভাবেই ডাক্তার কেদারনাথ ক্যাম্বেল হাসপাতালের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁহার মত গুণীকে (নামমাত্র পারিশ্রমিক দিয়া) ভারতবর্ষের কোথাও গভর্ণমেণ্ট এত কাল ধরিয়া রাখিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। কেদারনাথও 'ধরা' রহিতেন না যদি তিনি হৃদয়বান্ না হইতেন। দরিদ্রের মুখ চাহিয়া তাহাদের সেবা করিবার লোভে পড়িয়া তিনি টাকা-পয়সার হিসাব তুচ্ছ জ্ঞান করিলেন। এমন হৃদয়বান্, এত মহৎ না হইলে ভগবান দয়াও করেন না।

সরকারী কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিবার আর এক গূঢ় উদ্দেশ্য তাঁহার ছিল।

সে আর কিছুই নহে—চিকিৎসাবিদ্যার্থীদিগের তথা দশের ও দেশের কল্যাণ-কামনা। দেশের লোকসংখ্যা-হিসাবে চিকিৎসকের সংখ্যা অতি অল্প—অবিদিত তাঁহার ছিল না। পল্লীতে পল্লীতে সুচিকিৎসকের অভাবে কি সর্ব্বনাশ সাধিত যে হইতেছে তাহাও তিনি জানিতেন। সেই কারণেই দেশের ভবিষ্যৎ আশা-ভরসা ছাত্রসমাজের সহায় হইয়া দেশমাতৃকার হিতসাধনের জন্য তিনি কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাঁহার শিক্ষিত বিদ্যার সকলই তাহাদিগকে দান তিনি করেন নিজকে উজাড় করিয়া দিয়া। কেদারনাথের ন্যায় শিক্ষকের শিক্ষকতায় এইরূপে শত-সহস্র যুবক আত্ম ও পরসেবার সুবর্ণ-সুযোগ প্রাপ্ত হয়। বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে সেই সকল ছাত্র চিকিৎসকরূপে পল্লীবাসীর কি মঙ্গল-সাধন করিতেছেন।

মেডিকেল কলেজে ৮ বৎসর এবং ক্যাম্বেলে ২০ বৎসর একুনে এই ২৮ বৎসরে চিকিৎসা-কার্য্য ব্যতীত চিকিৎসা-বিষয়ক অন্যান্য অনেক কার্য্যে তিনি লিপ্ত হইয়া পড়েন। কেদারনাথের ডাক্তার হইবার দুই বৎসরের মধ্যেই ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় প্রথম মেডিকেল কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। সেই কংগ্রেসের সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন কলেজ হইতে সদ্য-বহির্গত কেদারনাথ। মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের রেজিষ্ট্রারের কার্য্যে অল্পকালের মধ্যেই তাঁহার দক্ষতার পরিচয় পাওয়ায় কর্ত্তৃপক্ষ অযাচিতভাবে তাঁহাকে সহকারী সম্পাদক নির্ব্বাচিত করিয়া সম্মানিত করেন।

ছাত্রাবস্থাতেই কেদারনাথের চিকিৎসা-বিষয়ক প্রবন্ধাদি লিখিবার অভ্যাস হয়। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে (ফাইনাল্ এম্-বির পূর্ব্ববৎসরে) তাঁহার একটী চিন্তাশীল প্রবন্ধ—'Missed Labour' ও Indian Medical Gazetteএ প্রকাশিত হইয়া অধ্যাপকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তাঁহারা সেই প্রবন্ধের প্রশংসাবাদ করিয়া লেখককে লিখিবার অভ্যাস

রাখিতে উপদেশ দেন। তদবধি গবেষণামূলক বহু প্রবন্ধ সম্পাদন তিনি করিয়াছেন। Lancet, Edin. Medical Journal, Jr. of Obstetrics and Gynæcology, British Empire, Transac. Amer. Gyn. Society, Progs. Royal Society of Medicine, Davidson's Hygiene and diseases of warm climates, Jour. Med. Assn. Trans. Medical Congress, Trans. Far Eastern Assn. of Trop. Med. Indian Medical Gazette, Indian Medical Record, Calcutta Medical Journal, Medical Reporter, Ind. Jr. of Statistics প্রভৃতিতে তাঁহার প্রবন্ধসমূহ সমাদরের সহিত স্থান পাইয়া সেই সকল পত্রিকার গৌরব বৃদ্ধি করে।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার কেদারনাথ দাস চিকিৎসকরূপে তাঁহার ২২ বৎসরের অভিজ্ঞতা ছাত্রমণ্ডলী ও নবীন চিকিৎসকবর্গকে জ্ঞাপন করিবার জন্য Handbook of Obstetrics নামক পুস্তক প্রকাশিত করেন। এই পুস্তক সম্বন্ধে দেশী ও বিদেশী চিকিৎসা-সম্বন্ধীয় সুবিখ্যাত পত্রিকাগুলির অভিমত সংক্ষিপ্তভাবে নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

Indian Medical Gazette :— 'It is a pleasure to read and recommend to others to read this book *** an excellent teaching volume ** inimitable interesting style of a practical and experienced clinical and a gifted teacher * * *'

The Lancet :—"Students in India are to be congratulated on having at their disposal such an excellent book as this * *

The American Journal of Medical Sciences :—"* * * A thoroughly practical book on obstetrics."

La clinica obstetrica :—"* * A complete precise clear treatise * * *"

M. S. Journal :—"The work under review is entirely to our heart * * *"

The Bulletin and Medical Book Reporter :—"** Many doctors in Canada will be glad to have in their library this work * * *."

British Medical Journal :—"**The latest production of this kind * * *"

Surgery, Gyn. and Obstetrics :—"The book must be classed as a throughly modern work * * *"

The Edinburgh Medical Journal :—"It is not an elaborate treatise and yet one finds in it many things which the ordinary medium-sized text book does not contain".

কেবল ছাত্রপাঠ্যোপযোগী করিয়া ডাঃ দাস্ ১৯২০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার Text Book of Midwifery প্রকাশিত করেন। "A distinct advance on many of its predecessors" বলিয়া Indian Medical Gazette ইহার অভ্যর্থনা করেন। Surgery, Gyn and Obstetrics-এর অভিমত—"There is nothing in this work to indicate that it was not written by an American or European scholar।" ভারতবর্ষের প্রায় সকল মেডিকেল কলেজে তদবধি এই পুস্তকই পড়ান হইতেছে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বৈজ্ঞানিকগণ ডাক্তার দাসকে অবষ্টেট্রিকস্ ও গাইনকলজির একজন Authority বলিয়া বিবেচনা করেন। Handbook of Obstetrics সমালোচনাকালে

এডিনবরা মেডিকেল্ জর্ণালও ইহার আভাস দিয়াছেন—"A number of leading problems about which there is a difference of opinion * (we) have always found the advice he (Dr. Das) gives sound and well-balanced."

উপরি-উক্ত দুইখানি পুস্তকে পাশ্চাত্য পণ্ডিত-সমাজ ডাক্তার দাসের মনীষার যে পরিচয় প্রাপ্ত হন তাহার শতগুণ প্রাপ্ত তাঁহারা হন তাহার Obstetrics Forceps, its History and Evolution পুস্তকে (১৯২৮ সালে প্রকাশিত)। যে প্রতিভার পরিচয় দিয়া রবীন্দ্রনাথ, জগদীশ ও রামান্ আজ জগদ্বরেণ্য, নিজ ক্ষেত্রে থাকিয়া চিকিৎসকাগ্রগণ্য কেদারনাথও সেই প্রতিভার পরিচয় দেন 'Obstetrics Forceps'-এ। ইহার পূর্ব্বে এই জাতীয় পুস্তক ইয়োরোপ, আমেরিকার কোথাও প্রকাশিত হয় নাই। এ কথা Journal of Obstetrics and Gynæcology of the British Empire স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছে—"The only special work on this subject that has ever been published in the English language and surely by far the most complete treatise that has ever been published in any language."

অগাধ-পাণ্ডিত্যপূর্ণ এই অপূর্ব্ব পুস্তক-প্রণয়নে কেদারনাথের স্থায় মনীষীর প্রয়োজন হয় দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর। সেই কথার উল্লেখ করিয়া চিকিৎসা-বিষয়ক শ্রেষ্ঠ পত্রিকাখানি সরলভাবে বলিয়াছে,—"The author is to be sincerely congratulated on having not only produced such a masterpiece but also on having rendered such a signal service to the history of obstetric medicine." জার্ম্মাণি, জাপান, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা সর্ব্বত্র এই একই কথা।

চিকিৎসা-জগতের যুগপরিবর্ত্তনকারী এই গ্রন্থখানিকে অবষ্টেট্রিকসের পীঠস্থান আমেরিকার চিকিৎসা-বিষয়ক শ্রেষ্ঠ পত্রিকা American Journal of Obstetrics and Gynæcology "Monumental work" বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। জাপানের মতে ইহা "The most complete work that has ever been written on this subject।" গভর্মেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্টের নবম অধ্যায় ২৬ ধারা অনুযায়ী পার্লামেণ্টের জ্ঞাতার্থ বিবৃতিতে (১৯২৯—৩০ 'ইণ্ডিয়া') বিজ্ঞান-উন্নতি-বিষয়ক (Advancement of Science) বিভাগের ৩৭৮ পৃষ্ঠায় ডাঃ কেদারনাথ দাসের এই 'Monumental work'এর উল্লেখ আছে। এই Monumental work প্রণয়ন করিয়া Obstetric Medicineএর 'signal service'এর পুরস্কার-স্বরূপ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ডাঃ কেদারনাথ দাসকে ১৯২৯ সালের কোটস্ মেডাল-দানে সমাদর করিয়াছে।

ডাক্তার কেদারনাথের পাণ্ডিত্যের সুযোগ গ্রহণ করিয়া ইয়োরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর 'শ্রেষ্ঠীগণ' চিকিৎসা-সম্বন্ধীয় তাঁহাদিগের নিজ নিজ গ্রন্থে তাহার অংশাবশেষ অন্তর্ভূক্ত করিয়া ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতের এবং তাঁহাদিগের নিজেদের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। যাঁহারা এরূপ করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই বিশ্ববিশ্রুত। তাঁহাদিগের নাম—গিবনস্, লায়ন্, কাষ্টেলিনি ও চামার্স, গিলবার্ট ই ব্রুক্, এনস্প্যাচ্. ডব্ল্যাণ্ড, গুল্ড, ডিলি উইলিয়ম্স। ইঁহাদের কেহ কেহ মৃত বহুকাল। মৃত হইলেও ইহারা অমর। ইঁহাদের কীর্ত্তিই ইঁহাদিগকে অমর করিয়া রাখিয়াছে।

পরীক্ষা পাশ করিয়াই কেদারনাথের লেখাপড়া 'সাঙ্গ' হয় নাই—বাড়িয়া যায়। 'বাড়িলে' ত হইবে না—পড়েন কি? তাহার

ব্যবস্থা তিনি নিজে করিলেন। ইয়োরোপ ও আমেরিকা হইতে ধীরে ধীরে অসংখ্য অমূল্য পুস্তক আসিয়া বিশাল লাইব্রেরীতে পরিণত হইল। ২।১০ খানা ব্যতীত সে সকলের সমস্তই মিড্‌ওয়াইফারী, অবষ্টেট্রিকস্ ও গাইনিকলজি-সম্বন্ধীয়। পড়িবার ভাবনা আর রহিল না, কিন্তু আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়াই চলিল। ফলে লাইব্রেরীর আকার হইতে লাগিল বৃহৎ হইতে বৃহত্তর। ১৯১৭ সালের ২৬এ মে'র 'হিন্দু পেট্রিয়ট' এই লাইব্রেরীর চিত্র প্রকাশিত করিয়া ইহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—"The most complete and up to date of its kind." লাইব্রেরীর সে সুনাম আজিও অক্ষুণ্ণ। Midwifery, Obstetrics, Gynæcology-সম্বন্ধীয় যাবতীয় পুস্তক (প্রাপ্য ও দুষ্প্রাপ্য), 'প্লেট,' এটলাস্ প্রভৃতিতে লাইব্রেরী পূর্ণ। এই জাতীয় এমন লাইব্রেরী ভারতবর্ষে আর দ্বিতীয় নাই।

লাইব্রেরীর অসংখ্য পুস্তকের কোন্ খানি কোন্ স্তরে আছে তাহা কেদারনাথের ওষ্ঠাগ্রে। পুস্তকে কি কোথায় আছে তাহাও তাঁহার ওষ্ঠাগ্রে। তাই তিনি কেদারনাথ। তাঁহার লেখনীপ্রসূত Obsteric Forceps তাই মহাজনের মাথার মণি। দেশে শত শত কেদারনাথের আবির্ভাব হয়—তাঁহার ঐকান্তিক বাসনা। নবীন বা প্রবীণ যে কোনও চিকিৎসক স্বচ্ছন্দে এই মহামূল্য লাইব্রেরীর সুযোগ গ্রহণ করিতে পারেন। তাঁহাদের—এমন কি, ছাত্রবৃন্দের জন্যও ইহার দ্বার অবারিত।

কেদারনাথের অতুলনীয় পাণ্ডিত্য ও চিকিৎসা-নৈপুণ্যের জন্য বেনারস ভারত ধর্ম্মমহামণ্ডল তাঁহাকে 'ধাত্রী-বিদ্যামহার্ণব' উপাধিতে বিভূষিত করেন। পাশ্চাত্য চিকিৎসাপ্রণালী-অভিজ্ঞ কোনও চিকিৎসক কেদারনাথের পূর্ব্বে 'ধর্ম্মমহামণ্ডল' কর্ত্তৃক এমনভাবে সম্মানিত হইয়াছেন—জানা নাই। ধাত্রী-বিদ্যা প্রভৃতি আলোচনা ও গবেষণার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্র—আমেরিকা। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিণের American Associa-

tion of Obstetricians, Gynœcologists and Abdominal Surgeons ধাত্রীবিদ্যামহার্ণব কেদারনাথকে অনারারী ফেলো-পদে বরণ করেন। ভারতবর্ষের ইহা বহু ভাগ্য এবং সে ভাগ্যোদয় হয়—কেদারনাথেরই কল্যাণে। কেদারনাথ ব্যতীত অন্য কোনও ভারতবর্ষীয়কে তাঁহার পূর্ব্বে বা পরে এই সম্মান প্রদত্ত হয় নাই। তাঁহার পাণ্ডিত্য ও গুণপণার সমাদর গভর্মেণ্টও করেন ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে-তাঁহাকে C. I.E. উপাধি দানে।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে সরকারী কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিলে কেদারনাথ কারমাইকেল মেডিকেল কলেজের অবটেট্রিক্স ও গাইনিকলজিষ্টের পদ গ্রহণ করিতে আহূত হন। বাঙ্গালীর এই গৌরবময় অনুষ্ঠানের সহায় হইতে তিনি কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন নাই। একাদিক্রমে ২২ বৎসরকাল সরকারী কার্য্যেও পরিশ্রম করিবার পরে বিশ্রাম লওয়া তাঁহার হইল না। পদ গ্রহণ তিনি করিলেন কর্ত্তব্যের অনুশাসনে। তিন বৎসব এই কার্য্যে নিযুক্ত থকিবার পর ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে কলেজ কাউন্সিল্ কর্ত্তৃক তিনি প্রিন্সিপাল নির্ব্বাচিত হ'ন।

দায়িত্বপূর্ণ এই গুরুভার অকুণ্ঠিতচিত্তে তিনি গ্রহণ করিলেন। সে পদগ্রহণে 'ব্যবসায়ে'র প্রভূত ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা থাকিলেও তিনি তাহা অস্বীকার করিতে পারিলেন না। যে সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া জীবনের শ্রেষ্ঠাংশকাল 'ক্যাম্বেলে' অতিবাহিত তিনি করেন সেই উদ্দেশ্যেরই বশবর্ত্তী হইয়া অর্থোপার্জ্জনের সুবিধা-অসুবিধা তাঁহার তুচ্ছ বোধ হইল। তদুপরি বাঙ্গালীর অনুষ্ঠানকে সার্থক করিয়া বাঙ্গালীর কীর্ত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করা—মনে হইল তাঁহার পরম কর্ত্তব্য। টাকা আনা পাই-পয়সার হিসাব এ ক্ষেত্রে স্থান পায় না।

রাজনীতি-চর্চ্চা বলিয়া যাহা এ দেশে বিদিত তাহার 'ধার' দিয়াও ডাঃ কেদারনাথ জীবনে কখন যান নাই। সে কেমন ধারা, তাহার

আকৃতি কেমন, দেখিবার অবসর পর্য্যন্ত তাঁহার ছিল না। যোগাসনে উপবিষ্ট যোগীর ন্যায় অহর্নিশ অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও রোগাতুরের যন্ত্রণা-লাঘবের উপায়-নির্দ্ধারণের চেষ্টায় তিনি ধ্যানস্থ। সেই সকল লইয়াই তাঁহার জগৎ। তাহারই উন্নতিকল্পে তিনি একনিষ্ঠ। বহির্জগতের অন্য যাহা কিছু সকলই তাঁহার অজ্ঞাত। এ সাধনা কখন নিষ্ফল হয় না। কেদারনাথেরও হয় নাই। ফলভাগী একা তিনি নহেন—তাঁহার সঙ্গে তাঁহার প্রিয় দেশবাসীও। তাঁহার সাধনায় সমগ্র সভ্য-জগৎ স্তম্ভিত, চমকিত—ভারতবর্ষের গুণগানে উচ্চকণ্ঠ। দেশের গৌরববর্দ্ধন কেদারনাথের দেশ-সেবার মূলমন্ত্র।

সেই মন্ত্র মনে রাখিয়াই কারমাইকেল্ মেডিকেল কলেজের ভার গ্রহণ তিনি করেন। তাঁহার ইচ্ছা—তাঁহার সাধ এমন করিয়া গড়িয়া তিনি ইহা তুলিবেন যে, দরিদ্র বাঙ্গালীর কর্ম্মবীর-খ্যাতি দেশদেশান্তরে প্রচারিত হইয়া বাঙ্গালীর নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠায় উজ্জ্বল করিয়া রাখিবে। কি তাঁহার আকাশ-কুসুম-রচনা! তিনি তাহা মনে করেন না। কল্পিত চিত্রে তাঁহার বাস্তবের ছায়া দেখিতে পাইয়াই সোৎসাহে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ তিনি হন। স্বজাতি বাঙ্গালীর প্রতি তাঁহার আন্তরিক আস্থা আছে বলিয়াই সে কার্য্য করিবার চেষ্টা করিতে তিনি সাহসী হন। মধ্যবিত্ত গৃহস্থের সন্তান—ঐকান্তিক অধ্য-বসায়-বলে সাফল্যের শিখরে অধিষ্ঠিত। মনে প্রাণে তিনি বিশ্বাস রাখেন—God help those who help themselves.

সেই সময়েই কেদারনাথের সম্মুখে উপস্থাপিত হয়—দেশ-সেবা করিবার জন্য শুভসংযোগ। বিদ্বৎজন-সেবিত আমেরিকা মহাদেশ সাগ্রহে তাঁহাকে আহ্বান করেন—তাঁহার মুখে ভারতবর্ষের কথা শুনিতে। দেশগর্ব্বী কেদারনাথ সে সুযোগ পরিত্যাগ করিলেন না; ওয়াসিংটন যাত্রা করিলেন।

ওয়াসিংটনে উপস্থিত হইয়া ভারতবর্ষের কেদারনাথ যে সমাদর—যে অভ্যর্থনা প্রাপ্ত হন তাহা অপরিমেয়। তাঁহার পাণ্ডিত্য ও কৃতিত্বের সংবাদ স্থানীয় বিজ্ঞান-শাস্ত্রবিদেরা পূর্ব্ব হইতেই রাখিতেন এবং দূর হইতে তাঁহাকে শ্রদ্ধা-নিবেদন করিতেন। সেই শ্রদ্ধাস্পদকে নিকটে পাইয়া তাঁহাদের আনন্দের সীমা থাকে নাই। আমেরিকান গাইন-কলজিকাল সোসাইটীর সপ্ত চত্বারিংশত্তম বার্ষিক অধিবেশনে কেদারনাথের বক্তৃতা করিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। নির্দ্ধারিত দিবসে সভাস্থল মার্কিন ও বিদেশীয় পণ্ডিত-মণ্ডলীতে পরিপূর্ণ—কেদারনাথের বাণী শুনিতে। বক্তা সেদিন অসুস্থ ছিলেন কিন্তু সে কথা কাহাকেও না জানাইয়া তিনি বক্তৃতামঞ্চে আরোহণ করিলেন। তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ছিল—Midwifery in India। ধাত্রীবিদ্যার্ণব কেদারনাথ সুস্পষ্টভাবে সে বক্তৃতা করিলেন—ভারতের বাণী শুনাইলেন। শ্রোতা মুগ্ধ—বক্তৃতা-শেষে ভারতবর্ষের জয়গানে মুখরিত।

বক্তৃতা-প্রসঙ্গে উচ্চপ্রশংসা আমেরিকান পত্রাদিতে (চিকিৎসা-সম্বন্ধীয়) যথাকালে প্রকাশিত হয়। সম্পূর্ণ বক্তৃতা Transactions American Gynœcological Societyতে মুদ্রিত হইয়া চিকিৎসা-সম্বন্ধীয় পত্রাদিতে উদ্ধৃত হইয়াছিল। ধাত্রীবিদ্যায় ভারতবর্ষের স্থান পৃথিবীর অন্যান্য কেন্দ্রের তুলনায় কোথায় নির্দ্ধারিত হইয়া গেল।

ওয়াসিংটন, নিউইয়র্ক……প্রভৃতির বিদ্যাপীঠ পরিদর্শন করিয়া ডাঃ কেদারনাথ আমেরিকা ত্যাগ করেন। আমেরিকা হইতে তিনি লণ্ডন যাত্রা করিলেন। লণ্ডন হইতে সমগ্র কন্টিনেন্টের বিদ্যাপীঠ স্বচক্ষে তাঁহার দেখিবার কথা। তাহা সম্ভবপর হয় নাই। লণ্ডন হইতেই স্বদেশে প্রত্যাগমন তাঁহাকে করিতে হয়।

লণ্ডনে অবস্থানকালে ডাঃ কেদারনাথ কলিকাতার মিডওয়াইফারী শিক্ষা-সংক্রান্ত মনোমালিন্য লণ্ডন ও কলিকাতার কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের

মধ্যে যাহা ঘটিয়াছিল তাহা মিটাইবার যথেষ্ট চেষ্টা করেন, কিন্তু সফল-কাম হন নাই। লণ্ডনস্থ শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকবর্গের নিকট যথোচিত সমাদর তিনি লাভ করিলেন, তাঁহার প্রস্তাবের ন্যায্যতা সম্বন্ধে স্বীকারোক্তি অনেকের নিকটেই পাইলেন বটে, কিন্তু মনোমালিন্যের উচ্ছেদ হইল না।

আমেরিকা-যাত্রার পরবৎসরই ডাঃ কেদারনাথ American Gynæcological Societyর অনারারী ফেলো মনোনীত হন। স্ত্রী-রোগ-বিজ্ঞান ও প্রজনন-শাস্ত্রে অভিজ্ঞ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানবিদেরাই এই সর্ব্বোচ্চ সম্মানে সম্মানিত হন।

ইংলণ্ডের "রয়াল ইনষ্টিটিউট অফ হেলথ্" ও লণ্ডনের "রয়াল সোসাইটী অফ মেডিসিন" তাঁহাকে 'ফেলো' নির্ব্বাচন করেন। ইহার অনেক পূর্ব্বে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে অষ্টাদশ আন্তর্জ্জাতিক মেডিকেল কংগ্রেসের অবষ্টেট্রিক ও গাইনকলজিকাল বিভাগের তিনি সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তাঁহার অসামান্য প্রতিভার সম্মান ইয়োরোপ ও আমেরিকা মুক্তপ্রাণে করিয়া ভারতবর্ষের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করেন।

চিকিৎসা-সম্বন্ধীয় সকল কার্য্যে ও অনুষ্ঠানের উন্নতিকল্পে কেদার-নাথের সহযোগিতা এই সূত্রে উল্লেখযোগ্য।

স্যর কেদারনাথ কাউন্সিল অফ্ মেডিক্যাল রেজিষ্ট্রেসন, ইণ্ডিয়ান রেড্-ক্রস্ সোসাইটী, হেল্থ ওয়েল্ফেয়ার (সেণ্ট্রাল কমিটি) হেল্থ ওয়েলফেয়ার কর্ম্মীদিগের ট্রেণিং স্কুলের পরিচালনা-বোর্ড প্রভৃতি বঙ্গদেশের হিতকর অনুষ্ঠানগুলির অন্যতম সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়া এই সকল সদনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য সার্থক করিতে অপরিসীম যত্ন করিতেন।

কেদারনাথের ন্যায় চিকিৎসকের পক্ষে সময়ের সংকুলান করিয়া এ সকল অনুষ্ঠানে যোগদান করা দুরূহ। অনুষ্ঠানগুলির আহ্বান তথাপি তিনি প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন নাই।

এই স্থানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা উল্লেখযোগ্য। তিনি বহুদিন ডাক্তারী পরীক্ষার পরীক্ষক ছিলেন। তাহার উপর ফেলো, সিণ্ডিকেটের মেম্বর, প্রেসিডেণ্ট মেডিকেল 'বোর্ড অফ্ ষ্টাডিস্', মেডিক্যাল ফ্যাকালটির সভাপতি ইত্যাদি পদ তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন,—কর্ত্তব্যবোধে। মানুষের শত্রুর অভাব নাই। কেদারনাথেরও হয়তো ছিল। কিন্তু তাঁহার অতিবড় শত্রুও দেখাইতে পারিবে না—কর্ত্তব্য পালনে বিন্দুমাত্র ত্রুটি তাঁহার কখনো ঘটিয়াছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল কার্য্যেই তিনি বিশেষ মনোযোগী ছিলেন, কিন্তু ডাক্তারী শিক্ষার বিধি-ব্যবস্থা বিষয়ক কার্য্যে সমধিক মনোযোগী ছিলেন। মেডিকেল কলেজে ষান্মাসিক পরীক্ষা প্রবর্ত্তনের জন্য উদ্যোগী যাঁহারা হন—কেদারনাথ তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন।

চিকিৎসা-বিজ্ঞান ও সাধারণ বিদ্যা শিক্ষা প্রচারে কেদারনাথের একনিষ্ঠতা এই সকল সঙ্ঘের ও জনসাধারণের যে কি উপকার সাধন করিয়াছে তৎসম্বন্ধীয় কার্য্য-বিবরণী হইতে পাঠক পাঠিকা তাহার তথ্য নিরূপণ করিবেন। এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে এই সকল কার্য্য সুসম্পাদন করিবার অভিজ্ঞতা কেদারনাথের অসীম ছিল। দেশের কল্যাণ কামনায় সে অভিজ্ঞতা প্রয়োগে তিনি সতত যত্নশীল ছিলেন।

কারমাইকেল মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল পদ গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে কলেজ ও হাসপাতালের অবস্থার সহিত ইহার বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে ডাঃ কেদারনাথের কার্য্যকালে নানাদিকে কত উন্নতি সাধিত হইয়াছে। তাঁহার মনোমত চিত্র সম্পূর্ণ করিতে এখনও বিপুল পরিশ্রম এবং অর্থের প্রয়োজন। আপনাকে নিঃশেষ করিয়া পরিশ্রম করিতে কেদারনাথ কাতর ছিলেন না—আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবের নিষেধ অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি তাহা করিয়াছিলেন। যথাসাধ্য

অর্থদানেও তাঁহার কৃপণতা ছিল না। সহযোগী কর্ম্মিগণের ঐকান্তিক সাহায্য লাভে তিনি. ভাগ্যবান ছিলেন। গভর্ণমেণ্ট ও মিউনিসিপালিটীর সাহায্যে হাঁসপাতাল চলিতেছে, কিন্তু তিনি মনে করিতেন এই আদর্শ অনুষ্ঠান সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে এসকল পর্য্যাপ্ত নহে। বিশ্বের মাঝে—ইহার স্থান উর্দ্ধে স্থাপিত করিতে সকলের ঐকান্তিক সহযোগিতা অধিকতরভাবে প্রয়োজন। তাহার অভাব হইবে না কেদারনাথ পূর্ণভাবে বিশ্বাস করিতেন। না করিলে কর্ম্মবীর বার্দ্ধক্যেও যৌবনের বলে বলীয়ান হইয়া কলেজ ও হাঁসপাতালের উন্নতি সাধনের চেষ্টায় নিযুক্ত থাকিতেন না। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে যে বীজ রোপিত হইয়াছে তাহার বিনাশ নাই—বাঙ্গালী স্বার্থহীন হইয়া ইহাতে জলসেচন যতদিন করিবে। অসম্পূর্ণ চিত্র সম্পূর্ণ দেখিবার সৌভাগ্য তাঁহার না ঘটিতে পারে—সম্পূর্ণ কিন্তু ইহা একদিন হইবেই নিঃস্বার্থ কর্ম্মিগণের পুণ্যে। এ যাঁহার ধারণা নৈরাশ্য তাঁহার অভিধানে নাই। নাই বলিয়া শতসহস্র বাধা তুচ্ছজ্ঞান করিতে তিনি সমর্থ ছিলেন। নাই বলিয়া কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ শনৈঃ শনৈঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে।

কেদারনাথ নিয়মানুবর্ত্তিতার ঘোর পক্ষপাতী ছিলেন—আজীবন। মেডিকেল কলেজের ছাত্ররূপে কলেজ বা হাঁসপাতালে একদিনের জন্য অনুপস্থিত বা বিলম্বে উপস্থিত তিনি হন নাই। অন্যান্য বিধি নিয়মও পালন করিয়াছেন—অক্ষরে অক্ষরে। শিক্ষক ও অধ্যাপকরূপেও দৈহিক অসুস্থতা, সাংসারিক বিপদ বা সম্পদ—কিছুতেই তাঁহার 'হাজিরার' এতটুকু এদিক ওদিক করিতে পারে নাই—সময়ে যাইয়া তিনি কর্ত্তব্য পালন করিয়া আসিয়াছেন। কনিষ্ঠা কন্যার মরণাপন্ন পীড়া ও তাহার মৃত্যু এবং পত্নী ও দৌহিত্রীর মৃত্যুর পরদিনেও কলেজ ও হাঁসপাতালে যথা-সময়ে উপস্থিত তিনি হইয়াছিলেন। আপনার দুর্ভাগ্যের ফলভাগী

অপরকে করিবার তাঁহার কি অধিকার! অনুপস্থিত হইলে ছাত্র ও রোগীর শত অসুবিধা যে!

নিয়মানুবর্ত্তী হওয়া, কেদারনাথের পক্ষে ধর্ম্ম ছিল। তাঁহার অনুভূতি অভিজ্ঞতা—মানুষকে 'মানুষ' করিবার ইহাই একমাত্র উপায়। পুত্রাধিক ছাত্রবর্গকে এই ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত করিতে প্রয়োজন হইলে কঠোরতা অবলম্বনেও তিনি পশ্চাদপদ হন নাই। স্বল্প দৃষ্টিতে কাহারও কাহারও চক্ষে এ কঠোরতা অপ্রিয় বোধ হইলেও দীর্ঘ দৃষ্টিতে এই 'কঠোরতার' অন্তরালে কোমলতা, স্নেহ ও আশীর্ব্বাদ ওতঃপ্রোতভাবে বর্ত্তমান।

কেদারনাথের ছাত্রবর্গ ওরূপ 'কঠোরতা' সত্ত্বেও তাঁহার প্রতি অশেষ ভক্তিমান। গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে C. I. E ও 'নাইট্' উপাধিদানে সম্মানিত করায় ছাত্রবর্গের উল্লাস ও আনন্দোৎসব হইতে তাহা প্রতীয়মান।

শিক্ষাদান ব্যতীত স্যর কেদারনাথ ছাত্রবর্গের খেলাধুলা, থিয়েট্রিকাল ও Reunion প্রভৃতিতে উৎসাহ দানে বিরত কখনোই ছিলেন না। সবল ও সুস্থ দেহ লাভ করিয়া পাঠ্যজীবন ছাত্রগণ আনন্দে অতিবাহিত করে ইহাই তাঁহার ইচ্ছা ছিল।

১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে 'নাইট্' উপাধি প্রাপ্তির এক মাসের মধ্যেই স্যর কেদারনাথ ঘোর পীড়াগ্রস্ত হইয়া শয্যাগ্রহণ করেন! তাঁহার জীবন সঙ্কটাপন্ন হয়। মরণের সহিত অনেক দিবস যুদ্ধ করিয়া কর্ম্মবীর জয়লাভ করেন—ভগবৎ চরণে তাঁহার জন্য দেশবাসীর আকুল প্রার্থনায়। কাজ যে তাঁহার অনেক বাকি।

বর্ত্তমান কালের সহস্র সহস্র যুবকযুবতী, বালকবালিকা জন্মগ্রহণ করিয়াছে স্যর কেদারনাথের 'হাতে', তাহাদের এবং তাহাদের জনকজননীর তো কথাই নাই তদ্ব্যতীত সহস্র সহস্র নারী 'পুন র্জীবন' যাঁহারা লাভ করিয়াছে—কেদারনাথের চিকিৎসা কুশলতায়—তাঁহারা এবং

দেশের বিদ্বৎ ও ছাত্রমণ্ডলী এবং তাঁহার অসংখ্য আত্মীয়, বন্ধু ও প্রশংসাবাদী কেদারনাথের পীড়ার সংবাদে কাতর হইয়া ছুটাছুটি করিয়াছিলেন। এ চঞ্চলতা কেবল কলিকাতায় আবদ্ধ ছিল না। ভারতের নানা স্থান এবং ইউরোপ আমেরিকা হইতে বার্ত্তাযোগে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন ও স্যার কেদারনাথের 'সংবাদ' জানিবার আগ্রহ বিশেষভাবে দেখা গিয়াছিল। লোক-হৃদয়ে স্যর কেদারনাথের চিত্র কি ভাবে অঙ্কিত— ইহা হইতেই বুঝা যায়।

সংক্ষিপ্তভাবে কেদারনাথের ছাত্র ও চিকিৎসক জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনামাত্র উল্লিখিত হইল। তাঁহার গার্হস্থ্য জীবনের প্রয়োজনীয় কথার আলোচনা কিছু না করিলে চিত্র সম্পূর্ণ হইবে না। অতি সংক্ষিপ্তভাবে এইবার তাহা বলিব।

কেদারনাথের বিবাহ হয় যখন তিনি মেডিকেল কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। পত্নী আমোদিনী হুগলী নিবাসী রাখালচন্দ্র বসু সাবজজের কন্যা। ছাত্রাবস্থাতে বিবাহ হওয়ায় তাঁহার পাঠের কোন ব্যাঘাতই ঘটে নাই। সকল পরীক্ষাতেই সর্ব্বোচ্চ স্থান লাভই তাহার প্রমাণ।

বিবাহিত ছাত্রের এই সাফল্য ঘটে—নিয়মানুবর্ত্তিতার প্রতি পক্ষপাতের কারণে। লেখাপড়া সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র অমনোযোগ তাঁহার ছিল না। তদুপরি পত্নী, বয়সে বালিকা হইলেও স্বামীর কর্ত্তব্য কর্ম্মে সহায়ই ছিলেন। শিক্ষিতা—যে অর্থে এখন ব্যবহৃত হয় তাহা তিনি ছিলেন—বলা যায় না। প্রাথমিক পাঠাদি মাত্র আয়ত্তে তাঁহার ছিল। তবে যে শিক্ষায় নারী জগতপূজ্যা তাহার কিছুরই অভাব ছিল না। ছিল না বলিয়াই স্বামীর বিদ্যাভ্যাসে অন্তরায় হইয়া দাঁড়ান নাই। এমন স্ত্রী লাভ মহাভাগ্য—সে ভাগ্যে ভাগ্যবান যুবক কেদারনাথ হইয়াছিলেন।

স্থার কেদার নাথের জ্যেষ্ঠা কন্যার জন্ম হয় বিবাহের তিন বৎসর পরে—তখন তিনি তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। জনকজননী—তাঁহাদের আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধবের নিকট এই কন্যা "রাণী" বলিয়া পরিচিতা। 'রাণীর' জন্মের দুই বৎসর পরে তাহার এক সহোদর প্রভাস জন্মগ্রহণ করে। সেই বৎসরই কেদারনাথ ডাক্তারীর শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া "ডাক্তার" আখ্যা লাভ করেন এবং সরকারী চাকুরীতে নিযুক্ত হন। ইহার পরে ডাক্তার কেদার নাথের দুই পুত্র ও দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করে। তাহাদের নাম যথাক্রমে, সরযূবালা, নীহারবালা, প্রবোধচন্দ্র ও প্রতুলচন্দ্র।

যাদবকৃষ্ণ ছিলেন মধ্যবিত্ত গৃহস্থ। কেদারনাথ 'পাশ' হইবামাত্র সন্থ সন্থ চাকুরী লাভ হয় বলিয়া 'সংসার স্বচ্ছল' হয় ইহা বলাই বাহুল্য। অল্প-দিনের মধ্যে স্বাধীন ব্যবসায়েও পুত্রের অর্থোপার্জ্জন হইতে আরম্ভ হইল। বিপত্নীক যাদবকৃষ্ণ এ যাবৎ একাকী সংসারের ভার স্কন্ধে লইয়া দিন যাপন করিতেছিলেন, জ্যেষ্ঠাবধূর শুভাগমনে তাঁহাব উপর সাংসারিক-পরিচালনার কিছু ভার দিয়া কথঞ্চিৎ বিশ্রাম গ্রহণের চেষ্টা তিনি করিলেন তাহাতে হইল আরও বিপত্তি। শ্বশুরের সহিত পুত্রবধূর কথা কওয়ার রেওয়াজ তখন ছিল না। লোকজনের (পরে পুত্র কন্যার) মারফৎ বধূ 'দশবার' জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইতেন, 'এটা কী হবে, ওটা কী হবে না' ইত্যাদি। আর বিশ্রামকালে বধূর সেই সকল সমস্যার পূরণ করিয়া দিতেন যাদবকৃষ্ণ। পুত্র কেদারনাথ দূর হইতে ইহা দেখিতেন ও আনন্দ উপভোগ করিতেন আর অনভিজ্ঞা পত্নী তাঁহার এই ভাবে শিক্ষা-নবিশিণী করিয়া স্বামীর ও শ্বশুরের সংসারে আপনাকে নিয়োজিত রাখিতেন।

চিকিৎসক হইবার দশ বৎসরের মধ্যে কেদারনাথ ২২ নং বেথুন রোস্থ বাটীখানি স্বোপার্জ্জিত অর্থে ক্রয় করেন। পুত্রের সৌভাগ্যে

পিতার আনন্দ আর ধরে না। পিতার আনন্দ পরম আশীর্ব্বাদ বলিয়াই পুত্র অনুভব করিলেন। জননীর আশীর্ব্বাদ সেই ভাবে তিনি পাইলেন না—এই দুঃখ। নিজ পুত্র কন্যার নিকটে কতবার তিনি বলিয়াছেন "মা আমার খেটে খেটেই চলে গেল।" মার কথা বলিবার সময়ে কেদার নাথের কথাবার্ত্তা বালকের ন্যায় হইত। তাঁহাকে তখন দেখিলে ও তাঁহার কথা তখন শুনিলে সকলেরই মনে হইবে এই কেদারনাথ কেমন করিয়া ইউরোপ, আমেরিকায় পূজা পাইলেন, কেমন করিয়া ইনি অতবড় কলেজ হাঁসপাতালের বিলি ব্যবস্থা করেন, লোকে কেন ইঁহাকে অত সমীহ করিয়া চলে! কেদারনাথ তখন এত উদাস, এত চঞ্চল!

সম্পত্তি ক্রয় করিবার কয়েকদিন পরেই কেদারনাথের জেষ্ঠ্যা কন্যার বিবাহ কলিকাতার শ্রেষ্ঠ ডাক্তার সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারীর কনিষ্ঠ পুত্র সুশীল প্রসাদের সহিত হয়। সে বিবাহ উপলক্ষে যাহা কিছু করিবার করিলেন তাঁহার পিতা। পুত্রবধূর সাধ ইচ্ছা জানিয়া লইয়া অবশ্য যাদব কৃষ্ণ ব্যবস্থা যাহা করিবার করিয়াছিলেন। পুত্রবধূ তখন অভিজ্ঞা গৃহিণী —পূজ্যপাদ শ্বশুর মহাশয়ের ব্যবস্থা তিনি মাথা পাতিয়া লইলেন। অভিজ্ঞাগৃহিণীর এ কার্য্যও স্বামী লক্ষ্য করিলেন—মুখে কিছু বলিতে পারিলেন না, আনন্দের আবেগে।

ডাঃ কেদারনাথকে বাহিরের লোকে তখন জানিত—পুরা দস্তুর সাহেব। সাহেবী পোষাক, গম্ভীর প্রকৃতি, অল্পভাষী—তাঁহার কাছে যাইতে লোকে ভয় পাইত। এ সকলই যে সাহেবীয়ানার চরম নিদর্শন! কাজ কী 'ঘাঁটাইয়া'। তাহারা সুতরাং চমকিত হয় তাঁহার বাটীতে ৺জগদ্ধাত্রী পূজা হইবে শুনিয়া। এ পূজার ইতিহাস উল্লেখযোগ্য।

নবগৃহ প্রবেশের পর বৎসরে ৺জগদ্ধাত্রী পূজার তিন দিন পূর্ব্বে প্রাতঃকালে উঠিয়াই প্রতিবাসীরা দেখে ডাঃ কেদারনাথের বাটীর সন্ন খন্থ

চত্বরে একখানি জগদ্ধাত্রী প্রতিমা। সোরগোল হইতেই গৃহস্থ জানিতে পারিল—ব্যাপার কী! কেদারনাথ যথাবিহিত করিবার ভার পিতার উপর দিয়া নিজ কার্য্যে বাহির হইলেন। যাদবকৃষ্ণ দেখিলেন দুই দিনে পূজার ব্যবস্থা করা সম্ভবপর নহে। সিমলার বাজার তখন ছিল তাঁহাদিগের পুরাতন বাটীর সংলগ্ন। বাজারের মুরুব্বিদিগকে ডাকাইয়া তিনি তাঁহার বিপদের কথা বলেন এবং প্রস্তাব করেন, "এ পূজা তোমরা বাজারে কর, পূজার জন্য টাকা যাহা চাহিবে আমি দিব।" তাহারা এ প্রস্তাবে সম্মত হয় এবং বাজারে প্রতিমা লইয়া যায়। ব্যবস্থা সুচারুরূপে করিয়া যাদবকৃষ্ণ বাটীর মধ্যে গমন করিলেন। পুত্রবধূ ধরিয়া বসিলেন, "মা আমাদের বাটীতে এসেছেন, ওরা কেন নিয়ে গেল। আমাকে ওই ঠাকুর ফিরিয়ে এনে দিন, আমি পূজা কোর্ব্ব।" যাদবকৃষ্ণ তাঁহাকে নানামতে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন, কিছুতেই 'পাগলীবেটী' বুঝিল না। তাঁহার এক কথা, 'মা এসেছিলেন আমাদের বাটীতে যে।" ঠাকুর ফিরাইয়া আনিতে যাদবকৃষ্ণ অগত্যা লোক পাঠাইলেন। সেখানেও গোল—ঠাকুর ফিরাইয়া তাহারা দিবে না—বলিল, "তা কী হয় মাকে এনে ফিরে দিতে পারি!" পুত্রবধূ সে সংবাদে বিমর্ষ। উপায়! যাদবকৃষ্ণ মাথায় হাত দিয়া বসিলেন। অবশেষে অন্য প্রতিমা আনয়ন করা স্থির হইল। বালক বালিকার আনন্দে গৃহ তখন উত্তরোল। পূজার আয়োজনে গৃহকর্ত্রীর অসীম উত্তেজনা। এই আনন্দ কলরব ও চঞ্চলতার মধ্যে কেদারনাথ প্রথমার্দ্ধ দিবসের কার্য্য সমাপন করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। পিতা পুত্রকে সকল সংবাদ দিলেন দ্বিতলে যাইবামাত্র তাঁহাকে 'বেড়িয়া' পুত্র কন্যাগণ শুভ সংবাদ জ্ঞাপন করিল—তাহাদের মুখে হাসি ধরে না। জগজ্জননীর শুভাগমনের পূর্ব্বাভাষ যেন তাহাদের নয়নে বদনে প্রতিফলিত! গৃহিণী কোথায় ছিলেন ত্বরিৎ আসিয়া স্বামীকে বলিলেন, 'পূজো হবে জান?" স্বামী বলিলেন,

"নিশ্চয়, খুব ভাল ক'রে পূজো কর।" বলিয়াই পুত্র কন্তার দিকে তিনি ফিরিয়া দেখিলেন—আনন্দে তাহারা মাতোয়ারা। পিতা বিমুগ্ধ—পূজার কথাই হইতে লাগিল। এই কেদারনাথে সাহেবীয়ানার দোষারোপ! হরি, হরি!

উপর্য্যুপরি তিন বৎসর যথাবিধি পূজার পরে যাদবকৃষ্ণ লোকান্তরে গমন করেন। পুত্র যত বড় শক্তিমান হউন না কেন, মহাগুরু পতনের বেগ সহ্য করা তাঁহার পক্ষেও তুরূহ। এ ক্ষেত্রেও তাহা বটে। সাধ্বী পত্নী তাঁহাকে বলেন, "বাবার শ্রাদ্ধ বৃষোৎসর্গ ক'রে ক'রতে হবে।" স্বামী বলেন, 'তা হবে বৈকি।' তাহাই হইয়াছিল।

বিবাহের সময়ে আমোদিনী 'লেখাপড়া' সামান্তই জানিতেন—কথিত হইয়াছে। শ্বশুরালয়ে আসিয়া লেখাপড়া বন্ধ তিনি করেন নাই—লাগিয়া থাকেন। লেখাপড়ার যত্ন থাকায় চলনসই শিক্ষা লাভ শীঘ্রই হয়। তাহা নিয়োজিত তিনি করেন—রামায়ণ মহাভারতাদি পাঠে। জগদ্ধাত্রি পূজায় তাঁহার আগ্রহ ও শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে তাঁহার পূর্ণ আস্থার দৃষ্টান্ত—স্বধর্ম্মে তাঁহার অনুরাগের পরিচয়ই প্রদান করে। 'লেখাপড়া' শিখিয়া এ অনুরাগ তাঁহার উত্তরোত্তর বর্দ্ধিতই হয়। কুলগুরুর নিকট দীক্ষাগ্রহণান্তে শ্রীমদ্ভাগবৎ পাঠের আয়োজন তিনি করিলেন। সংস্কৃত শিক্ষা কিছু না করিলে পাঠের অসুবিধা পদে পদে জানিয়া সংস্কৃত শিক্ষা করিতে মনোযোগিনী তাঁহাকে হইতে হইল। গৃহকর্ত্রী দৈনিক সংসারিক কার্য্য যথাসময়ে সম্পন্ন করিয়া পর্য্যাপ্ত পাঠের সময় অনায়াসেই করিয়া লইলেন। যত্ন সার্থক হয়—ভাগবৎ পাঠে তিনি প্রচুর আনন্দ উপভোগ করেন। ইহার পূর্ব্বে স্বামীর দীর্ঘজীবন কামনায় তিনি সাবিত্রীব্রত সংকল্প করিয়াছিলেন। স্বামীর বিনা অনুমতিতে 'ব্রত' গ্রহণ বিধেয় নহে। অনুমতি-তো আমোদিনী পাইতেনই—আরো পাইতেন প্রচুর উৎসাহবাণী। তাঁহার শিক্ষা-পরিণতির চিত্রাংশ মাত্র

এই স্থানে প্রদত্ত হইল। স্বধর্ম্ম ও দেশাচারের প্রতি ডাক্তার কেদার নাথেরও মনোগতি এই সকল ব্যাপার হইতে অনুমান করিয়া লওয়া কঠিন নহে।

হিন্দু গৃহিণীর উপযুক্ত লোক হিতকর কার্য্যেও আমোদিনীর সবিশেষ উৎসাহ দেখা যায়। বৃক্ষ ও পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা ও কূপ খনন করানর উপকারিতা অশেষ, বিশেষতঃ ভারতবর্ষের ন্যায় গ্রীষ্মপ্রধান দেশে। এ সকল কার্য্যে মহাপুণ্য—দেশের আবাল বৃদ্ধ বণিতার বিশ্বাস। উন্নতি-শীল যুবকদের বিশ্বাসে 'ভাটা' পড়িয়াছে বলিয়াই মনে হয়। এই ফলে এই নূতন পুষ্করিণী ও কূপ খনন করা তো দূরের কথা বর্ত্তমান পুষ্করিণী আদির অবস্থা সংস্কার অভাবে শোচনীয়। দেশে ম্যালেরিয়া ও মারিভয় প্রভৃতির প্রাদুর্ভাব হয় অধিকাংশ ইহারই জন্য—অস্বীকার করিবার উপায় নাই। 'উন্নতিশীল' জগতের আবর্ত্তনে পড়িয়াও নিজ শিক্ষার প্রভাবে 'কাচে গেরো' না দিয়া কাঞ্চনের দিকেই ঝুকিয়া পড়েন—বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা, পুষ্করিণী ও কূপ খনন তিনি করাইয়া দেন। আমোদিনীর এ বদান্যতা কেবল বঙ্গদেশে নিবদ্ধ হয় নাই, সাঁওতাল পরগণাস্থ জামতাড়ার অধিবাসীবৃন্দও 'আমোদিনী' কূপের জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। পত্নীর এই সকল সাধু অনুষ্ঠানে কেদারনাথ সর্ব্বান্তঃকরণে সাহায্য করিয়াছিলেন।

গৃহিণীরূপে নানা কার্য্যে সতত ব্যস্ত থাকিলেও স্বামীসেবার ত্রুটি তাঁহার কখনো হয় নাই। স্বীয় সংসারে দাসদাসীর অভাব নাই, তথাপি সাংসারিক কার্য্যে উদয়াস্ত পরিশ্রমের অবধি তাঁহার ছিল না, আর স্বামীর সুখ স্বচ্ছন্দতা পরিদর্শন সাধ্বী স্বয়ং না করিলে তৃপ্তি পাইতেন না। পতি পুত্রের জন্য পরিশ্রমে ক্লান্তি বোধ তাঁহার হইত না। দেবর, দেবর জায়া ও তাঁহাদের পুত্র কন্যা প্রভৃতি এমন কি দাসদাসীর প্রতিও কর্ত্তব্য পালনে তাঁহার অখণ্ড দৃষ্টি ছিল। বাহ্যিক আড়ম্বরে আন্তরিকতার অভাব পূরণ করিয়া দেওয়া ছিল তাঁহার স্বভাব বিরুদ্ধ। তাহা করিতে

তিনি পারিতেন না। কেদার নাথের গৃহে সুতরাং অনাবিল শান্তিই বিরাজ করিত। তাহা না করিলে তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার সম্যক স্ফুরণ হইত কিনা সন্দেহ।

জেষ্ঠ্যা কন্যার বিবাহের কয়েক বৎসর পরে ডাঃ কেদার নাথের দ্বিতীয়া কন্যা সরযুবালার শুভবিবাহ সম্পন্ন হয়। ইহার কয়েক বৎসর পরে কলিকাতা বাগবাজার নিবাসী শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র নাথ বসুর কনিষ্ঠা কন্যার সহিত কেদার নাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রভাস চন্দ্রের বিবাহ হয়।

এই বিবাহের প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে ডাঃ কেদারনাথের কনিষ্ঠা কন্যা নীহারবালা টাইফয়েড রোগাক্রান্ত হইয়া ইহলীলা সম্বরণ করে। সুখের সংসারে মৃত্যু আনিয়া দেয় দুঃখের পশরা। ইহার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সস্ত্রীক কেদারনাথ বেরিবেরি রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার মানসিক শক্তির প্রাচুর্য্যে রোগ তখন তাঁহাকে পাড়িয়াও পাড়িতে পারে নাই। কসুর কিন্তু থাকিয়া যায়। কন্যাহারা পিতার মানসিক অবসাদের সুযোগ গ্রহণান্তর রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়।

দুর্ঘটনার পরে প্রায় এক মাস যাবৎ কর্ম্মবীর কেদারনাথের অবসন্ন ভাবের লাঘব বিন্দুমাত্র হয় নাই। সন্তানের শোক এমনি। শোকাপনোদনের চেষ্টায় কর্ম্মবীর কর্ম্মসাগরে ঝম্প প্রদান করিলেন—আর কাল বিলম্ব না করিয়া। বৃথা চেষ্টা। পিতৃশোক, মাতৃশোক সময়ে সব সহিয়া যায়, কিন্তু সন্তান শোক জীবনান্ত না হইলে বুঝি মুছিবার নহে। কেদার নাথের স্বাস্থ্যভঙ্গের সেই সূত্রপাত। আর হতভাগিণী জননী কন্যাশোকে উন্মাদিনী। সেই দুঃসহ শোক বাহ্যতঃ মুছিয়া তাঁহাকে ফেলিতে হয়—স্বামীর মুখ চাহিয়া। রুদ্ধ শোকে জর্জ্জরিত জননী কত সহ্য করিতে পারেন; রোগ বীজাণু তাঁহার দেহে লুক্কাইত অবস্থায় ছিল, পলে পলে তাহা বর্দ্ধিতাকার হইয়া ভীষণ পীড়াদায়ক হইল।

কন্যার মৃত্যুর কয়েক বৎসরের মধ্যে আমোদিনীর শারীরিক অসুস্থতা বিশেষভাবে দেখা যায়। ইহার ফল কী হইবে ভাবিয়া স্বামী শিহরিত। ইহার আভাস গৃহিণী বা অন্য কাহাকেও ঘুণাক্ষরে তিনি জানিতে কিন্তু দিলেন না। রোগ নিবারণে যথাবিধি চিকিৎসা প্রবর্ত্তিত হইল। তাহাও হইল এমন ভাবে যাহাতে কাহারও মনে না হয়—রোগ সাংঘাতিক। রোগীনী রোগ যন্ত্রণার উল্লেখ করিয়া মধ্যে মধ্যে অনুযোগ করিতেন। স্বামী বলিতেন —'ও ঠিক্ হয়ে যাবে'। কায়মনোবাক্যে পত্নী তাঁহার কথা বিশ্বাস করিতেন—রোগ যন্ত্রণা লাঘবও হইত অনেকাংশে। আশার ক্ষীণ রশ্মি ছিল ডাঃ কেদার নাথের সেইটুকু—সেই অগাধ বিশ্বাসের ফলে চিত্তে বল অর্জ্জন করিয়া রোগিনী যদি নিজের রোগ নিজে নিরাময় করিতে সক্ষম হন! অভিজ্ঞ চিকিৎসকের এই অভিনব চিকিৎসায় সাময়িক ফল শুভই হয়। দেহে সাংঘাতিক রোগ, তথাপি সাংসারিক পাঠ ও পূজাদি তিনি স্বচ্ছন্দে করিতেন—বিপুল পরিশ্রম করিয়া। স্থান ও বায়ুপরিবর্ত্তন রোগিনীর স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী হইতে পারে ভাবিয়া স্বামী সাঁওতাল পরগণার জামতাড়া প্রদেশে পল্লীভবন নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। উৎসাহ ভরে, অমোদিনীও সেই পল্লী নিবাসের শ্রীবর্দ্ধনে মনযোগিনী হন—রোগের অস্তিত্ব লইয়া। এই উন্মাদনা এবং পল্লীশ্রীর মনোশোভায় পতি, পুত্র, পুত্রবধু, কন্যা, জামাতা, দৌহিত্র ও দোহিত্রী সহ আমোদিনী আনন্দে অভিভূতা। ডাঃ কেদার নাথ পল্লীভবন নির্ম্মাণে—চিকিৎসার সাফল্য লাভ করিলেন হাতে হাতে। কিন্তু তাহা স্থায়ী হইল না। ২।৩ বৎসরের মধ্যে রোগ বর্দ্ধিতাকার ধারণ করিয়া রোগীকে শয্যাশায়ী করিল।

স্বামী তখনও বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন, ওঠিক হয়ে যাবে। করিলে কী হইবে স্ত্রীর মনে একটা সন্দেহের ছায়া, 'এত বড় ডাক্তার উনি, এত দিনেও রোগ ভাল হইল না' সেই ইতস্ততঃ ভাবই হয়—'কাল'। ডাঃ

কেদার নাথের এতাবৎ কার্য্যকরী চিকিৎসার পথে বৃহদাকার প্রাচীর-রূপে তাহা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। সাধারণ চিকিৎসা পূর্ণভাবে চলিতে লাগিল বটে, কিন্তু রোগিনীর অবস্থার অবনতি হইতে লাগিল উত্তরোত্তর। রোগাপেক্ষা রোগিনীর উৎসাহহীনতা অনিষ্ট সাধিল সমধিক। রোগ শয্যায় পড়িয়া কাছে জ্যেষ্ঠা কন্যাকে থাকিতে হইত—চক্ষুর অন্তরালে যাইতে তাহাকে দিতেন না একদণ্ডও। তাহাকে তিনি বলিতেন, 'আর বাঁচবো না আমি'।

সেই অবস্থায় যথাসময়ে সাবিত্রীব্রত বিধিপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হইল ব্রত-চারিণীর অপূর্ব্ব উৎসাহে। উত্থান শক্তি রহিত স্বাধ্বী শয্যোপরি উঠিয়া বসিয়া স্বামীর পাদপূজা করিলেন—ভক্তিভরে। পূজান্তে গললগ্নীকৃত-বাসে প্রণাম করিয়া স্বামীকে তিনি বলিলেন, বল, আমার ব্রত প্রতিষ্ঠা হবে। আশীর্ব্বাদ করিয়া গদগদ-ভাবে স্বামী বলিলেন, 'নিশ্চয়ই হবে'। শান্তির আশায় ভক্তিমতীর নয়ন বদন তখন রঞ্জিত—স্বামীকে আবার প্রণাম করিয়া তিনি শয়ন করিলেন।

ব্রতের পরে কিছু দিন রোগিনীর অবস্থার সবিশেষ উন্নতি দেখা গিয়াছিল। দৌহিত্রী বিজলী ছিল তাঁহার বড় স্নেহের। সুস্থদেহে তাহাকে লইয়া কত রঙ্গই তিনি করিয়াছেন। শয্যাশায়িনী মাতামহীর সাধ্যমত সেবা জননীর কাছে কাছে থাকিয়া সেও করিত। সে ছিল হাস্যময়ী। রোগিনীর কক্ষে তাহার সে হাসির রেখাও ফুটিত না। মাতা-মহীকে অপেক্ষাকৃত সুস্থ দেখিয়া হাসি হাসি মুখে বিজলী তাঁহার কাছে বসিল, কতদিন পরে মাতামহীও হাসিলেন—রঙ্গ করিলেন। অবসাদের পরে রোগিনীর এই প্রফুল্লতা সূক্ষ্মদর্শী চিকিৎসক কিছু অন্যভাবে গ্রহণ করিলেন।

উন্নতি স্থায়ী হইল না। রোগিনীর অবস্থার অবনতি হইতে লাগিল দ্রুতবেগে। এই রোগের হস্ত হইতে শত সহস্র নারীকে রক্ষা

করিয়া যিনি নিরাময় করিয়াছেন তাঁহারই ভার্য্যা চক্ষের সম্মুখে পলে পলে মৃত্যুর পথে অগ্রসর আর তিনি হস্তপদাবদ্ধ, তাহা রোধ করিবার উপায়-হীন। টিউমারের অবস্থা 'কাঁচা' থাকিয়া যাওয়ায় অস্ত্রোপচারের সুযোগ তিনি পাইলেন না। অথচ অস্ত্রোপচার ব্যতীত অন্য উপায় নাই। এ-কী রোগাসুরের প্রতিশোধ! কে জানে! হৃদয়ের জ্বালা হৃদয়ে আবরিত করিয়া সহজভাবে তিনি রোগিনীর কাছে যাইতেন, সহজ ভাবে উৎসাহবাণী শুনাইতেন, এই ভাবে আমোদিনীর দিন যখন সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিতেছিল সেই সময়ে একদিন স্বামীর কথা, কাণ পাতিয়া শুনিয়া সজলনয়নে স্বামী-সোহাগিনী বলিলেন, তুমি আর জ্বালিও না, যাও। দেবতুল্য স্বামীর অন্তরের জ্বালা পতিব্রতা অনুভব করিয়াছিলেন। হৃদয়ের সহিত কী ভীষণ যুদ্ধ করিয়া বাহ্যিক আকারে স্বামী সংযতভাবে তাঁহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেছেন, কথা কহিতেছেন স্বাধ্বী তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন। চিরসরলা তিনি। সরল উচ্ছ্বাসে সাশ্রু নয়নে স্বামীর সুখ-দুঃখের অংশ ভাগিনী রমণী শিরোমণি পতি পদে নিবেদন জানাইলেন, "আর লুকাইও না আমি সব জানি।"

স্বামীর যন্ত্রণা লাঘব করিবার জন্যই বুঝি, কালের করাল গতিরোধে সেবা পরায়ণা আর অধিক দিন অপেক্ষা করিলেন না। পতির আশীর্ব্বাদে সতী অপরূপভাবে ব্রত প্রতিষ্ঠা করিয়া দিব্য-লোকে চলিয়া গেলেন। পতিপুত্র কন্যা ও দৌহিত্রাদির আর্ত্তনাদ ফিরিয়াও তিনি শুনিলেন না।

এই গার্হস্থ্য চিত্র হইতে কেদার নাথের স্নেহ, মমতা, কর্ত্তব্য-পরায়ণতা ও সহিষ্ণুতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাঠক পাঠিকা প্রাপ্ত হইবেন। গুণবতী পত্নী বিয়োগে তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয় অধিকতর ভাবে। কর্ম্মময় জগতে গা-ঢালিয়া দিয়া তাহা রোধ করিতে তিনি বদ্ধপরিকর হন। সেই চেষ্টার ফলে জগতকে obstetric Forceps দান করিতে তিনি সমর্থ

হইয়াছেন। সেই চেষ্টার ফলে Carmichael Medical College আজ গৌরবের উচ্চশিখরে প্রতিষ্ঠিত।

পত্নীবিয়োগে সংসারের প্রতিও কথঞ্চিৎ দৃষ্টি তাঁহাকে রাখিতে হয়। পত্নীর মৃত্যুর দুই বৎসরের মধ্যেই মধ্যম ও কনিষ্ঠ পুত্রের বিবাহ দিয়া তিনি তাহাদিগকে ঘরবাসী করিয়া দেন। মধ্যম পুত্রের বিবাহ হয় ভবানীপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল চন্দ্র মিত্রের কন্যার সহিত এবং তৃতীয় পুত্রের বিবাহ হয় ভবানীপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র নাথ ঘোষের জেষ্ঠ্যা কন্যার সহিত। ইহার প্রায় চারিবৎসর পরে তাঁহার এক মাত্র দৌহিত্রী বিজলীর শোচনীয়ভাবে মৃত্যু হয় বিবাহের অল্পকাল মধ্যে। এই ব্যাপারের তিন বৎসর পরে স্যার কেদারনাথ রোগাক্রান্ত হন। বাহ্যিক দৃঢ়তা ও আন্তরিক কোমলতার মধ্যে পুনঃ পুনঃ যুদ্ধে তিনি ক্ষত বিক্ষত। কর্ম্মক্ষেত্রে বীরের ন্যায় তথাপি তাঁহার অপ্রতিহতগতি।

স্যার কেদারনাথ ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে "Erysipelas" রোগে আক্রান্ত হন। এই রোগে কিছু দিন ভুগিয়া তিনি সুস্থ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে নষ্ট হয়। ১৯৩৫ সালের ডিসেম্বর মাসে কেদারনাথ ব্রঙ্কো নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হন। ঐ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই মার্চ্চ সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময় তাঁহার মৃত্যু হয়। যেদিন তাঁহার মৃত্যু হয় সেইদিন প্রাতঃকালে তিনি তাঁহার পুত্রদিগকে ডাকিয়া বলেন যে, আজ সন্ধ্যায় তিনি দেহত্যাগ করিবেন। তাঁহার মুখে সেই কথা শুনিয়া তাঁহার দৌহিত্র দৌহিত্রী, আত্মীয় স্বজন যে যেখানে ছিল তাহাদিগকে আনা হয়। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি পুত্রদিগকে ডাকিয়া তাঁহার মৃত্যু অন্তে যাহা যাহা করিতে হইবে, সে সম্বন্ধে সমস্ত কথা বলেন। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাঁহার জ্ঞান অব্যাহত ছিল।

তিনি কারমাইকেল মেডিকেল কলেজের Obstetrical Museum এ ৩০ ত্রিশ সহস্র টাকা ও উক্ত কলেজে তাঁহার প্রায় দেড় লক্ষ টাকা মূল্যের বিরাট লাইব্রেরী দান করিয়া যান।

তিনি কতিপয় দুঃস্থ ছাত্রকে নিয়মিত অর্থ সাহায্য করিতেন। তাঁহার তিনি পুত্র—(১) ডাঃ প্রভাসচন্দ্র দাস, তিনি বিলাতফেরত দন্ত চিকিৎসক (২) ডাঃ প্রবোধচন্দ্র দাস এম্ ও, এম্ বি। ইনি ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে এম্ বি এবং ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে এম্ ও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইনি কারমাইকেল মেডিকেল কলেজের ধাত্রী বিভাগের চিকিৎসক (GynaeCologist) (৩) শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র দাস এম্ আই আর এ, ইনি বিখ্যাত মার্টিন কোম্পানীর রেলওয়ে বিভাগের অডিটর।

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
ও বি ই, বি এ।

বাঙ্গালীর মধ্যে যাঁহারা আপন কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, প্রতিভা, কর্ম্মদক্ষতা ও কৃতীত্ববলে সরকারী চাকুরীতে নিম্নস্তর হইতে অতি উচ্চস্তরে উন্নীত হইয়াছেন রায় বাহাদুর চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁহাদের অন্যতম। তিনি ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই নবেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা রায় বাহাদুর রাধিকা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় সি আই ই বাঙ্গালা, বেহার ও ছোট নাগপুররের স্কুল ইন্স্পেকটর ছিলেন। রাধিকা বাবু তাঁহার জন্মভূমি নদীয়া জেলার গোঁসাইদুর্গাপুর পরিত্যাগ করিয়া ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় বাড়ী করিয়া বাস করিতে থাকেন। চারুচন্দ্র হিন্দু স্কুল ও প্রেসিডেন্সী কলেজে শিক্ষা লাভ করেন। তিনি স্বর্গীয় বিচারপতি স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র ডাঃ শরচচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ করেন। বি এ পাশ করিয়া এম্ এ বি এল পড়িবার সময় চারুচন্দ্র ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটী চাকুরী পান। তখন তাঁহার বয়স মাত্র ২০ বৎসর। ১৯১২ সাল পর্য্যন্ত তিনি বঙ্গদেশের নানাস্থানে ডেপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেটী করিয়া বঙ্গ ভঙ্গ রদ হইলে বেহার সরকারের অধীনে বদলী হন। তথায় ১৯২৫ সাল পর্য্যন্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করেন। ১৯২৬-২৮ সাল পর্য্যন্ত বোর্ড অব রেভিনিউর সেক্রেটারী-স্বরূপে কার্য্য করেন। ১৯৩৩ সালে তিনি ভাগলপুর বিভাগের কমিশনার ও দুইবার ত্রিহুত বিভাগের অতিরিক্ত কমিশনাররূপে কার্য্য করেন। বর্ত্তমানে তিনি ভাগলপুর বিভাগের স্থায়ী কমিশনার।

চারু বাবু—ছোট ছোট গল্প,এবং ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় অনেক কবিতা লিখিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। তাঁহার দুই পুত্র (১) শচীপ্রসন্ন বি এ ও (২) তারা প্রসন্ন।

হাওড়া সালিখার "মুখোপাধ্যায়" বংশ।

এই বংশের পূর্ব্বপুরুষেরা, মুখোপাধ্যায়-বংশের আদিপুরুষ, কামদেব পণ্ডিতের বাসস্থান, কলিকাতার সন্নিকটবর্ত্তী খড়দহ গ্রামেই বাস করিতেন। আদিপুরুষ কামদেবের নিকট-বংশধর হইলেও তাঁহার সহিত এই বংশের ঠিক কত পুরুষের পার্থক্য, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। পরে ইঁহারা সেখান হইতে ২৪ পরগণা জেলার ডায়মণ্ডহারবার সাবডিভিশনের অন্তর্গত, মগরাহাট ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী রঙ্গিলাবাদ গ্রামে আগমন করেন এবং বিবাহ সূত্রে সেখানেই বসবাস স্থাপনা করেন। তদবধি ইঁহাদের নিবাস সেই স্থানেই। তবে অনেকদিন হইল তাঁহারা কর্ম্মোপলক্ষ্যে সালিখায় আসিয়া এখানেই বসবাস স্থাপনা করিয়াছেন।

স্বর্গীয় রামলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়, এই বংশের শ্রেষ্ঠ পুরুষ। তাঁহার মত ভাগ্যবান্ ও শ্রেষ্ঠ চরিত্রের লোক অত্যন্ত দুর্ল্লভ। ভাগ্যের সহায়তায় ও একনিষ্ঠ সত্যসাধনায় সংসারে মানুষ যে কি অবস্থা হইতে কি অবস্থায় উন্নীত হইতে পারে স্বর্গীয় রামবাবুর জীবন তাহার আদর্শ উদাহরণ। মাত্র নিজ ভাগ্যবলে, অথবা, মাত্র একনিষ্ঠ সাধনায়, পৃথিবীতে উন্নতি হয়তো সম্ভবপর হয় না। দৈব ও পুরুষকার উভয়েরই প্রয়োজন। একে, অন্যের সাহায্য ব্যতীত কিছুতেই স্ফূর্ত্তি ও পরিপুষ্টি লাভ করিতে পারে না। ইহাদের কোন্‌টি অধিক বলবান্, এ তর্কের মীমাংসা বোধ হয় কোনও দিনই মানুষের দ্বারা সম্ভব হইবে না। দৈব সহায়েই হউক, অথবা নাই হউক, সংসারে মানুষ যে অনেকাংশে তাহার নিজের ভাগ্যের নিয়ন্তা, হাওড়া সহরের এই স্বনামধন্য ব্রাহ্মণকুলতিলকের জীবনী হইতে আমরা তাহা দেখিতে পাই।

৺রামলাল মুখোপাধ্যায়

অতি দীনতম অবস্থার ভিতর তিনি পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু উত্তরকালে যে সুখ ও সমৃদ্ধির মধ্যে তিনি পরলোকগমন করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিলে তাঁহার স্থির লক্ষ্য এবং অটল প্রতিজ্ঞার কথা মনে পড়ে, যাহা পৃথিবীতে একান্তই দুর্লভ।

ইতরভদ্র সকলেই তাঁহার কাছে সমান ছিল এবং সকলেই তাঁহার নিকট সমান আদর পাইত। দুঃখীর দুঃখ দূরীকরণের জন্য তিনি সর্ব্বদা চেষ্টিত ছিলেন। কিন্তু সব চেয়ে সুন্দর ছিল তাঁর হৃদয়, কাহারও উপর ক্রুদ্ধ হইয়া তিরস্কার করিলে, তৎক্ষণাৎ মধুর ভাবে, মিষ্টকথায় তাহার ভুল বুঝাইয়া দিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিতেন। কবির ভাষায়, সে হৃদয় ছিল, "বজ্রাদপি কঠোরানি মৃদুনি কুসুমাদপি।"

২৪ পরগণা জেলার রঙ্গিলাবাদ গ্রাম তাঁহার পিতৃ-পিতামহের বাসভূমি। সেই গ্রামে সহায়সম্পদহীন এক ব্রাহ্মণ পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। রামলালের পিতামহ ভবানী চরণ প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রামের এক বর্দ্ধিষ্ণু বন্দ্যোপাধ্যায়-বংশে দারপরিগ্রহ করেন।

ভবানী চরণের শ্বশুর, জামাতার হীন অবস্থার জন্য কন্যাকে পিত্রালয়ে পাঠাইতে অস্বীকৃত হওয়াতে ভবানী চরণ দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন। কিন্তু ফুলশয্যার রাত্রেই সর্পাঘাতে সেই নবপরিণীতা বধূর মৃত্যু হয়। অতঃপর তিনিই প্রথম পূর্ব্বপুরুষদিগের বাসস্থান 'খড়দহ' ত্যাগ করিয়া প্রথম-শ্বশুরালয় রঙ্গিলাবাদ গ্রামে বসবাস আরম্ভ করেন এবং বন্দ্যোপাধ্যায়েরা জামাতাকে আন্দাজ ১৬ বিঘা জমি দান করেন। ভবানী চরণের ছয় পুত্র—গৌর মোহন, গোপী মোহন, মদনমোহন, রতনমোহন, মাধব চরণ ও রামকমল। রামলাল কনিষ্ঠ রামকমলের দ্বিতীয় পুত্র। রামকমলের প্রথমা পত্নী এক পুত্র শ্যামাচরণকে রাখিয়া অল্প বয়সেই পরলোক

গমন করেন। রামকমল দ্বিতীয়বার এক পিতৃ মাতৃহীনা অনাথা বালিকাকে বিবাহ করেন। তাঁহারই গর্ভে জ্যেষ্ঠ রামলাল বাঙ্গলা সন ১২৫১ অব্দের কার্ত্তিক মাসে সোদপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। রামলালের পিতার আর্থিক অবস্থা এতই হীন ছিল যে, নবপ্রসূতার পরিচর্য্যার সামান্য খরচও তিনি বহন করিতে সক্ষম ছিলেন না। তাই সেই পিতৃমাতৃহীনা অনাথা বালিকাকে সন্তান প্রসবের জন্য তাঁহার মাসীমাতার আশ্রয়ে সোদপুর গ্রামে পাঠাইয়া দেন। রামলালের বাল্য জীবন এই সোদপুর গ্রামেই অতিকষ্টে অতিবাহিত হইয়াছিল। সংসারের যাবতীয় কর্ম্ম তাঁহাকে করিতে হইত। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও পুস্তকপাঠে তাঁহার বিলক্ষণ অনুরাগ ছিল। তাঁহার মাতুল, অর্থাৎ তাঁহার মাতার মাসীর পুত্র শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই পুত্রের বিদ্যাশিক্ষার ভার লন এবং মাতুলালয়ে এই সোদপুর গ্রামের উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়েই তাঁহার প্রাথমিক বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ হয়। কিন্তু পিতৃগৃহের সহিত সংস্পর্শ তাঁহার চিরকাল ছিল। গ্রীষ্মাবকাশে ও অন্যান্য দীর্ঘাবকাশে তিনি মাতার সহিত রঙ্গিলাবাদ গ্রামে যাইতেন।

বিদ্যালয়ে বালক রামলাল অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন এবং তখনকার কালে Double Promotion এর প্রচলন ছিল বলিয়া তিনি মাত্র ১৪ বৎসর বয়সে সন ১৮৬১ খৃঃ অব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া ১০৲ টাকা বৃত্তি লাভ করেন। তাঁহার মাতুল কৈলাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তখন হাওড়ায় বাসা করিয়া Calcutta Docking Campanyতে চাকুরী করিতেন। পিতা রামকমল পৈতৃক বিষয়াদির ভাগ বণ্টনে তাঁহার অংশে মাত্র ৩।৪ বিঘা জমি লইয়া রঙ্গিলাবাদ গ্রামে দুইটি নাবালক পুত্র ও এক বিধবা কন্যাকে লইয়া বাস করিতেছিলেন, যুবক রামলাল ১০৲ টাকা বৃত্তি পাওয়াতে উৎসাহিত হইয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয়কে বিদ্যাশিক্ষা দিবার জন্য

উৎসুক হইলেন। তিনি ঐ দুই ভ্রাতাকে লইয়া কলিকাতায় চলিয়া আসেন এবং কলিকাতায় বকুলবাগানে নিজের দুই ভ্রাতাকে তাঁহার এক জ্যেষ্ঠতাতের বাসায় রাখিবার বন্দোবস্ত করাইয়া তাহাদের বিদ্যা-লয়ে ভর্ত্তি করাইলেন এবং তাঁহার বৃত্তি হইতে তাহাদের সকলের বেতন দিতে লাগিলেন। তিনি নিজে মাতুল কৈলাসচন্দ্রের হাওড়ার বাসায় থাকিয়া Duff college এ Fist Arts class এ ভর্ত্তি হইলেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় বৃত্তি পাওয়াতে তাঁহাকে কলেজের বেতন দিতে হইত না। Duff College এ প্রবেশ করিয়া তিনি অত্যন্ত অধ্যবসায়ের সহিতই পড়াশুনা করিতেছিলেন। কিন্তু ভাগ্যচক্রের পাকে এই সময়ই তাঁহার অন্যত্র কর্ম্মক্ষেত্রের সূচনা হইল। এই সময়ে—যখন ৪ টী পুত্র একটী নাবালিকা বিধবা কন্যা ও স্ত্রীকে লইয়া উপার্জ্জনহীন পিতা মাত্র ৪ বিঘা ভূমি সম্বলে অত্যন্ত সাংসারিক অস্বচ্ছলতার মধ্যে দিন কাটাইতে-ছিলেন—তখন তাঁহার মাতুলের অধীনে এক ২৫৲ টাকা মাহিনার চাকুরী খালি হইল। তখনকার কালে ৭৭ বৎসর পূর্ব্বে ২৫৲ টাকার মূল্য এখনকার কালের প্রায় ১০০৲ টাকার সমান ছিল। মাতুল এবং অন্যান্য পরিজনবর্গের অনুরোধে এবং সাংসারিক অস্বচ্ছলতার হেতু দরিদ্র পিতার সাহায্যার্থে যুবক রামলাল ১৬ বৎসর বয়সের প্রারম্ভেই বিদ্যার্জ্জনের অদম্য আশায় জলাঞ্জলি দিয়া, এই ২৫৲ টাকার চাকুরী গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন এবং তাঁহার বিদ্যাশিক্ষার এইখানেই সমাপ্তি ঘটিল। এখনও তিনি হাওড়ার বাসায়ই থাকিতেন এবং মাহিনার সমস্ত টাকাই দরিদ্র পিতার নিকট পাঠাইয়া দিতেন। বৃত্তির দশটাকা, বৈমাত্রেয় ভ্রাতার পুত্রের ও নিজ দুই কনিষ্ঠ ভ্রাতার লেখাপড়ায় ব্যয়িত হইত।

১৬ বৎসর বয়সে চাকুরীতে ভর্ত্তি হইবার পর ১৭ বৎসর বয়সে তিনি বিবাহ করিলেন। রঙ্গিলাবাদের নিকটবর্ত্তী কালিকাতলা গ্রামের লক্ষ্মী-

নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা শ্রীমতী বিলাসমণি দেবীকে তিনি বিবাহ করেন। বিবাহকালে বালিকার বয়স মাত্র ৭ বৎসর ছিল। তাঁহার পত্নী বিলাসমণি এখনও জীবিতা আছেন। চাকুরীতে তিনি শীঘ্রই কর্ত্তৃ-পক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁহার সাধুতা, কর্ম্মে একাগ্রতা এবং শ্রমশীলতার পুরস্কার তিনি অচিরেই লাভ করিলেন। চাকুরীতে ভর্ত্তি হইবার পাঁচ বৎসর পরে তাঁহার মাতুলের মৃত্যু হয়। মাতুল কৈলাসবাবু Calcutta Docking Campanyর বড়বাবু ছিলেন। Dock এর মধ্যেই তাঁহার বাসা ছিল। সেই বাসাতেই যুবক রামলাল থাকিতেন। মাহিনা ছাড়া বিনাভাড়ায় বাসস্থান ও জ্বালানি কাঠ তাঁহাদের সরবরাহ করা হইত। মাতুলের মৃত্যুর পর বড় সাহেব যুবক রামলালের কর্ম্মদক্ষতায় সন্তুষ্ট হইয়া অন্যান্য কর্ম্মচারীবৃন্দকে অতিক্রম করিয়া এই যুবককেই সেই কার্য্যে বাহাল করিলেন এবং তৎসঙ্গে তাঁহার মাহিনাও ২৫৲ টাকা হইতে একবারে ৪৫৲ টাকা বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইল। বলা বাহুল্য যে তখনকার কালে বিনাভাড়ায় বাসা জ্বালানি কাঠ সমেত ৪৫৲ টাকা মাহিনায় চাকুরী সমাজে একটা যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা এবং যশের বিষয় ছিল। কিন্তু অবস্থার পরিবর্ত্তন কোন দিন রামলালকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করে নাই। পদগর্ব্ব বা অহঙ্কার কি তা তিনি জানিতেন না। আফিসের বড সাহেব হইতে ডকের কুলী মজুরদের পর্য্যন্ত হৃদয় তিনি জয় করিয়াছিলেন।

তাই ক্রমশঃ স্থানীয় লোক সমাজে তাঁহার প্রতিষ্ঠা এবং সালিখায় সর্ব্বদলের ও সকল শ্রেণীর মধ্যে মুখপাত্ররূপে অচিরেই গণ্য হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণেতর সমস্ত জাতি ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সম্পদে বিপদে তাঁহার পরামর্শের জন্য নিত্য তাঁহার শরণাপন্ন হইত। মিতব্যয়িতা তাঁহার জীবনের একটি আদর্শ ছিল। এই মিতব্যয়িতার ফলে অল্পদিনের মধ্যেই তিনি তাঁহার সাংসারিক অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটাইতে সমর্থ হইলেন, কিন্তু অবস্থার পরি-বর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁহার দুঃস্থ আত্মীয় স্বজনের প্রতিপালন কোন-

দিন ভুলেন নাই। বিবাহের দুই বৎসর পরেই তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয় এবং সাত বৎসর পরে পিতৃবিয়োগ হয়। পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার বৈমাত্রেয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার তিন পুত্রকে এবং দুই কনিষ্ঠ সহোদর ভ্রাতাকে নিজের বাসায় রাখিয়া তাহাদের বিদ্যাশিক্ষার ব্যয়ভার এবং ভরণ-পোষণের সমস্ত ভার তিনি বহন করেন। এক ভ্রাতুষ্পুত্র ও এক ভ্রাতাকে Campbell Medical School হইতে ডাক্তারি পরীক্ষায় পাশ করাইয়া স্বগ্রামে চিকিৎসকের ব্যবসা করিয়া দেন এ.ং একভ্রাতাকে ও আর দুই ভ্রাতুষ্পুত্রকে বিদ্যাশিক্ষা শেষ করাইয়া সংসারে প্রতিষ্ঠিত করাইয়া যতদিন তাহারা নিজে না স্বাবলম্বী হয় তাহাদের সমস্ত ব্যয়ভার ঐ সামান্য আয় হইতেই বহন করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা মাসিক চারিটাকা মাত্র বেতনে কোনও জমিদারী সেরেস্তায় কাজ করিতেন; সুতরাং তাঁহার আয় কোনও কাজেই লাগিত না। কাজে-কাজেই ঐ অল্পবয়সেই রামলালকে তাঁহার জ্যেষ্ঠ বৈমাত্রেয় ভ্রাতার সংসারের ব্যয়ভারও বহন করিতে হইত।

ডকে বড়বাবুরূপে তিন বৎসর চাকুরী করিবার পর তিনি নিজ বাসগ্রামের উন্নতিকল্পে সচেষ্ট হন। রঙ্গিলাবাদে তাঁহার পৈতৃকা ভিটায় মাত্র দুইখানি ঘর ছিল। তিনি তাহার আমূল সংস্কার করাইয় সেই বাটী পাকা একতলা করিয়া ও বহুল পরিমাণে তাহার আয়তন বর্দ্ধিত করিয়া, সমগ্র পরিবারের সহিত সেখানে বাস করিতে আরম্ভ করেন ও ক্রমশঃ স্বীয় উপার্জ্জনের ব্যয়াবশিষ্ট হইতে স্বগ্রামেই সামান্য জমিজমা ক্রয় করিতে আরম্ভ করেন। এই সময়ে যখন তাঁহার বয়স ২৫ বৎসর, ১২৭৭ সালের ১৩ই আশ্বিন তাঁহার একমাত্র পুত্র সৌম্য-কান্তি আশুতোষ জন্মগ্রহণ করেন। এই আনন্দোৎসব চিরস্মরণীয় রাখিবার জন্য তিনি সেই বৎসরই তাঁহার বংশের লুপ্ত পৈতৃক ৺দুর্গা-পূজার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। সেই অবধি আজ প্রায় ৬২ বৎসর যাবৎ তাঁহার গৃহে মহাসমারোহে ৺শারদীয়া পূজা সম্পন্ন হইতেছে।

তাঁহার জীবনে ঠিক এই সময়ে এক ভীষণ দুর্ঘটনা ঘটে। বর্ষা-কালে, তাঁহার কর্ম্মস্থানে ডকের ভিতরে, একদিন প্রায় ৭০ ফুট উচু এক মঞ্চের উপর হইতে তিনি হড়কাইয়া পড়িয়া যান। মঞ্চ হইতে খালাসী-দিগের নামিবার এক অপ্রশস্ত সিঁড়ি ছিল তাহা দিয়া তিনি গড়াইয়া পড়িয়া যান। এই গুরুতর পতন ও আঘাতের ফলে তিনি সারাদিন অচৈতন্য থাকেন ও চিকিৎসকেরা তাঁহার জীবনের আশা একেবারেই পরিত্যাগ করেন। যাঁহার উপর এক বৃহৎ সংসারের যাবতীয় ভার ন্যস্ত রহিয়াছে, তাঁহার এই অবস্থায় সংসারে এক বিরাট শোকের ছায়া পড়ে। কিন্তু এই শ্রেষ্ঠ অমূল্য চরিত্রের দ্বারা ভগবান সংসারকে শিক্ষা দিবার জন্য যাহাকে প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহাকে কি উদ্দেশ্য সফল হইবার পূর্ব্বেই টানিয়া লন? ঈশ্বরের অসীম করুণায় তিনি সে যাত্রায় প্রাণ পাইলেন।

এই সময়ে তাঁহার পরিবারের আয়তন বৃদ্ধি পাওয়াতে তাঁহার গৃহে স্থান সঙ্কুলান দুরূহ হইয়া উঠিয়াছিল। সাংসারিক অশান্তিও এই সময়ে তাঁহাকে ভোগ করিতে হয়। তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতার পরিবারে যথেষ্ট আয়তন বৃদ্ধি হয়; কিন্তু তাহাদের প্রায়ই কাহারও কোনও আয়ের উপায় ছিল না। তথাপি তাঁহারই ভরণ পোষণে থাকিয়া তাঁহারই রঙ্গিলাবাদের বাড়ীতে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ও তাঁহার পরিবারস্থ সকলেই, রামলালের সহিত মনোমালিন্যের সূচনা করেন। যাহাকে আজন্ম অর্থ ও সেবার দ্বারা সাহায্য করা যায় পরিশেষে তাহারই নিকট হইতে অপমান কোন্ মানুষের সহ্য হয়? কিন্তু তিনি স্বীয় অপরিসীম ক্ষমাগুণের সাহায্যে অপমানিত হইয়াও ক্ষমা করিতে পারিয়াছিলেন। কোনওরূপ বিবাদ বিসম্বাদ না করিয়া স্বনির্ম্মিত রঙ্গিলাবাদের সমগ্র বাড়ী তাঁহাদের ছাড়িয়া দিলেন এবং পূর্ব্বাপর অর্থ-সাহায্যও করিতে লাগিলেন। নিজে তখন সালিখায় চলিয়া আসিলেন, এবং জমি ক্রয় করিয়া বাটী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

এইরূপ ক্ষমা, এরূপ অমানুষিক স্বার্থত্যাগ করিতে না পারিলে সংসারে কয়জন লোক স্বীয় নামের উজ্জ্বল মহিমায় জগৎকে মুগ্ধ করিতে পারে? ১৬ বৎসর বয়স হইতে ৩৯ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত তিনি চাকুরী করেন। তাঁহার চাকুরী জীবনের শেষভাগে কর্ম্মকুশলতার পুরস্কারের একটি ঘটনার উল্লেখ না করিলে তাঁহার জীবনী অসম্পূর্ণ থাকিবে। প্রায় ১৮৭৭।৭৮ খৃঃ অব্দে Calcutta Docking কোম্পানীর আর্থিক অবস্থার অস্বচ্ছল হওয়াতে এবং কোম্পানী বেশী লাভ করিতে না পারাতে বিলাত হইতে Board of Directors এর কয়েক জন সদস্য কোম্পানীর হিসাবপত্র এবং অবস্থার অনুসন্ধান করিতে আসেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল ব্যয়সংক্ষেপ বা Retrenchment। তাঁহাদের অনুসন্ধানের ফলানুযায়ী তাঁহারা সমস্ত কর্ম্মচারীদের বেতন হ্রাস করিলেন, এমন কি স্থানীয় Directors গণের Remuneration পর্য্যন্ত হ্রাস করিলেন, কিন্তু বড়বাবুর মাহিনার হ্রাস করা দূরে থাকুক বৃদ্ধি করিয়া দিলেন! তাঁহাদের Report এ তাঁহারা বড়বাবুর কাজ সম্বন্ধে বলেন, যে তিনি একা ১০জন কর্ম্মচারীর কাজ করেন এবং "Every pie of his salary is worth much more than its value." তাহার পর যতদিন পর্য্যন্ত এই কোম্পানীর অস্তিত্ব ছিল এবং যতদিন পর্য্যন্ত ইহার একটীও কর্ম্মচারী বিদ্যমান ছিল ততদিন পর্য্যন্ত রামলাল ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৮৮৩ খ্রীঃ অব্দে যখন Port Commissioners এই ডক ক্রয় করিয়া লন এবং এই কোম্পানী উঠাইয়া দিয়া যেদিন স্থানীয় Director বিলাত যাত্রা করেন সেই শেষ দিন পর্য্যন্ত রামলাল ইহার বড়বাবু ছিলেন।

বিধির অলঙ্ঘ্য বিধান মানুষের দুর্ব্বোধ্য! এই কোম্পানীর অস্তিত্ব লোপে রামলালের ভাগ্যাকাশে সৌভাগ্য সূর্য্যের উদয় হইল। এই কোম্পানী থাকিলে সারা জীবন বোধ হয় এই চাকুরীতেই তাঁহার অতিবাহিত হইত। ২৫ বৎসর দাসত্বের পর ৪০ বৎসর বয়সে চাকুরীহীন

হইয়া সাধারণতঃ মসীজীবি বাঙ্গালী নিস্তেজ ও নির্ব্বীর্য্য হইয়া অন্য চাকুরীর সন্ধান করিত। তিনিও যে তার সন্ধান করেন নাই তাহা নহে। ঠিক পরের মাস হইতেই অন্য এক Docking কোম্পানীতে তিনি ৬০৲ টাকা বেতনে এক নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারীর পদ লাভ করেন। কিন্তু মাত্র এক মাস সেখানে কাজ করিয়া তিনি মনে শান্তি পাইলেন না। কারণ "To reign is worth ambition though in hell"। নিজ আফিসের শীর্ষস্থানে পূর্ব্ব জীবন কাটাইয়া তেজস্বী রামলালের অধীনস্থ পদে মন টিঁকিল না। তিনি পদত্যাগ করিলেন এবং স্বাধীন ব্যবসায়ের সূত্রপাতের চিন্তা করিতে লাগিলেন।

প্রথম ২।১ বৎসর তিনি যৎসামান্য মূলধনে তাঁহার চাকুরী জীবনের অভিজ্ঞতার ফলে গঙ্গাতীরস্থ ভিন্ন ভিন্ন ডক হইতে নীলামের পুরাতন দ্রব্যাদি খরিদ করিয়া সালিখায় একটী "গোলা" স্থাপন করিলেন এবং সেই সব ব্যবহৃত দ্রব্যাদি যথা, দড়ি, wire, canvas এবং লৌহ দ্রব্যাদি একত্রে ক্রয় করিয়া পাইকারী দরে বেচাকেনা আরম্ভ করেন। মাত্র ২।১ বৎসরে এইরূপভাবে কার্য্য চালাইতে চালাইতে অন্যান্য ডক কোম্পানীর সাহেবদের সঙ্গে আলাপে তিনি একটী Hard-ware ও metal এবং অন্যান্য দ্রব্যের order-supplying ব্যবসায় আরম্ভ করেন। এই কারবারে তাঁহার প্রথম অংশীদার ছিলেন তাঁহার বন্ধু জনৈক ইংরাজ বণিক Mr. J. Bourillon.। জীবিতকাল পর্য্যন্ত এই দুই অংশীদারের মধ্যে কখনও কোন মনোমালিন্য ঘটে নাই। পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস ও নির্ভরতার উপর এই ব্যবসায়ের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকে,। সন ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে এই কারবার প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে Bourillon সাহেবের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রেরা যখন বিলাসী হইয়া পড়িলেন এবং ব্যবসায়ে আর মনোযোগ দিলেন না তখন রামলাল সাহেবের পুত্রদের সহিত হিসাব নিকাশ সম্পূর্ণ বুঝাইয়া দিয়া Ramlal

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়

Mookerjee & son নামে Order-supplying Business প্রতিষ্ঠিত করেন। আজও সেই কারবার তাঁহার পৌত্রগণ শ্রীযুক্ত বিজলীকুমার ও শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার মুখোপাধ্যায় চালাইতেছেন। ব্যবসাক্ষেত্রে "Honesty is the best policy" এই মন্ত্র রামলাল তাঁহার জীবনে প্রতিবিষয়ে পালন করিতেন এবং তাঁহার বংশধরগণকে এই শিক্ষা তিনি ভালরূপই দিয়া গিয়াছেন। ব্যবসাক্ষেত্রে পরিশ্রমের মূল্য কি তাহাও তাঁহার জীবনী হইতে শিক্ষা করা যায়। তিনি প্রতিদিন প্রাতে স্বগৃহে নিয়মিত-ভাবে কারবারের খাতাপত্র পর্য্যবেক্ষণ ও সময় মত আফিসে যাইয়া সন্ধ্যা পর্যান্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেন। ব্যবসাযের নিঁখুত ও নিয়মিত খাতা-পত্র রাখিবার উপকারিতা অনেক দেশীয় ব্যবসায়ী জানেন না বলিয়া ব্যবসাক্ষেত্রে বিপদগ্রস্ত হন। অনেক বাঙ্গালী ব্যবসায়ীর খাতাপত্র সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারা যায় যে তাঁহাদের খাতা ৩।৪।৫ মাস বা ততোধিক যাবত লেখা বাকী আছে। অর্থাৎ ৪।৫ মাস ধরিয়া তাঁহারা যদিও কাজ করিতেছেন, কাজে তাঁহাদের লাভ বা লোকসান হইতেছে কিনা বলিতে পারিবেন না। কিন্তু রামলাল তাঁহার ব্যবসায়ে এমন এক প্রণালীর উদ্ভাবন করেন যে, পাকা খাতা লেখা না হইলেও প্রতিদিন সন্ধ্যায় কাঁচা খাতা হইতে সমস্ত দিনের কারবারের কতটাকা নিট লাভ বা লোকসান হইল ব্যবসায়ী এক নিমেষে তাহা জানিতে পারিবে। Ramlal Mookerjee & Son এর ক্রমশঃ শ্রীবৃদ্ধি হওয়াতে কিছুকাল পরে, তিনি অন্যান্য পণ্যদ্রব্যের Marine Stores আর একটী কারবার তাঁহার পুত্রের নামে খোলেন—তাহাও আজ পর্য্যন্ত Ashutosh Mookerjee & Company নামে চলিতেছে। এই কারবারে তিনি মাত্র মূলধন দিয়াছিলেন। আর একজন তাঁহার বন্ধুকে সেই দোকান চালাইবার ভাব দিয়া তিনি তাঁহাকে অর্দ্ধেক অংশীদার করিয়া লন। অংশীদারী কারবার বাঙ্গালীরা চালাইতে পারে না বলিয়া আমাদের জাতির

দুর্ণাম আছে। কিন্তু এই দুই অংশীদারের মধ্যে জীবিতকাল পর্য্যন্ত কোনরূপ মনোমালিন্য ঘটে নাই। বরং উভয়েরই মৃত্যুর পর উভয়ের দুই পুত্র পরস্পর আজও সে কারবার অত্যন্ত বিশ্বাসের সহিত চালাইতেছেন। রামলালের এই নূতন কারবারের অংশীদার স্বর্গীয় বামাচরণ মুখোপাধ্যায় পূর্ব্বে অন্য একটী দোকানের অংশীদার ছিলেন। সেই কারবারের অবস্থা খারাপ হওয়াতে তিনি রামলালের শরণাপন্ন হন এবং রামলাল তাঁহাকে কিছু মূলধন দিয়া পুনরায় কারবারে প্রতিষ্ঠিত করেন। আজ তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত প্রসাদ দাস মুখোপাধ্যায় ও রামলালের পুত্র আশুতোষ সেই কারবারের মালিক। তাঁহারা আজ দেশে জমি জমা ছাড়া কলিকাতায়ও ২ খানি বাটী করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে বসবাস করিতেছেন।

প্রায় ৬৫ বৎসর বয়সে চক্ষুতে ছানি পড়িলে রামলাল কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণ করিয়াও তিনি প্রত্যহ বাটীতে বসিয়া কারবারের সমস্ত সংবাদ রাখিতেন এবং পুত্র ও পৌত্রগণকে সকল বিষয়ে উপদেশ ও পরামর্শ দিতেন। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমাদের দেশে যাঁহারা স্বকৃত উপার্জ্জনে অর্থসঞ্চয় করেন তাঁহারা সাধারণতঃ কৃপণ স্বভাবের হন। কিন্তু রামলালের জীবনে তাহার ব্যতিক্রম দেখিতে পাই। কার্পণ্য কি তাহা তিনি জানিতেন না; কিন্তু তথাপি মিতব্যয়িতার তিনি আদর্শ ছিলেন। হিন্দুর 'বারো মাসে তের পার্ব্বণ' তাঁহার গৃহে পালিত হইত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তদুপলক্ষ্যে সমাজের ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি বহু ভদ্রব্যক্তি তাঁহার বাটীতে নিমন্ত্রিত হইত এবং বাটীতে এত বন্ধু বান্ধবকে পরিতোষের সহিত আহার করাইতে তিনি খুব ভালবাসিতেন। ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া সালিখায় সমাজপতির শীর্ষস্থানের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে তিনি সতত তৎপর ছিলেন। তাঁহার গৃহে প্রতিদিন সন্ধ্যায় স্থানীয় বিশিষ্ট ভদ্র মহোদয়গণের সান্ধ্য

শ্রীবিজয়কুমার মুখোপাধ্যায়

মজ্‌লিশ বসিত। স্থানীয় সকল সম্প্রদায়ের লোকের অভাব অভিযোগ সুখ সুবিধার আলোচনা এবং অসুবিধা নিরাকরণের ব্যবস্থা সেখানে হইত।

তাঁহার কর্ম্মকুশল জীবনের মধ্যে তিনি তাঁহার পল্লী ও সমাজকে ভোলেন নাই। নিছক অর্থোপার্জ্জনের নেশায় পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের প্রতি কোনদিন তাঁর কর্ত্তব্যের ক্রটী হয় নাই। দুঃস্থ আত্মীয় স্বজনগণের অনেককেই তিনি নিজ ব্যয়ে বিদ্যাশিক্ষা দিয়া ও ভরণপোষণ করিয়া সংসারে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তাঁহার সুবৃহৎ পরিবারের মধ্যে তাঁহার নিজের পৌত্র ব্যতীত ও আত্মীয় স্বজন প্রত্যেকের কন্যার বিবাহ তিনিই দিয়াছিলেন এবং সমগ্র ব্যয়ভার তিনি নিজেই বহন করিতেন।

স্বগ্রাম রঙ্গিলাবাদ গ্রামে তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পুত্রের ব্যবহারার্থে এক ঔষধালয় নিজব্যয়ে স্থাপন করেন, তাহা অদ্যাবধি বর্ত্তমান। তাঁহারই চেষ্টায় রঙ্গিলাবাদ গ্রামে প্রথম ইংরাজী স্কুল স্থাপিত হয়। ইহাতেও তিনি সাধ্যমত অর্থ সাহায্য করেন। তাঁহার সুযোগ্য পুত্র আশুতোষ পিতার স্মৃতি রক্ষার্থে আজ কয়েক বৎসর হইল, কয়েক সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে এই স্কুলটিকে হাই-ইংলিশ স্কুলে পরিণত করিয়া Rangilabad Ramlal memorial H E, School নামকরণ করিয়াছেন। স্বীয় পল্লীগ্রামের উন্নতি সাধনে রামলাল আজীবন যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। গ্রামে জলকষ্ট নিবারণের জন্য তিনি এক সুবৃহৎ পুষ্করিণী তাঁহার গৃহের নিকট প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রকাণ্ড পুষ্করিণীর জলই গ্রামের লোকেরা পানার্থে ব্যবহার করে। ইহা ব্যতিত শালিখার বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার আন্তরিক সহযোগ ছিল। তিনি স্থানীয় "এ, এস্, স্কুল" নামীয় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের সর্ব্বৈব উন্নতি বিধানের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন এবং পর পর ছয় বৎসর এই স্কুলের কার্য্যকরী কমিটির সভাপতিরূপে

নির্ব্বাচিত হন। তিনি সাধারণের উপকারার্থে হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনাররূপে দাঁড়াইয়াছিলেন এবং সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ভোটে নির্ব্বাচিত হইয়া পল্লীর সংস্কারের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। শালিখার সব্ধ সম্প্রদায়ের নিকট তাঁহার মত জনপ্রিয় সে সময়ে কেহই ছিলেন না। অতঃপর আত্মীয় পরিজন বন্ধু বান্ধব পরিবৃত হইয়া, একমাত্র পুত্রকে রাখিয়া ১৯২২ খৃঃ অব্দে ৭৯ বৎসর বয়সে তিনি সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করেন। তাঁহার নিষ্পাপ ও কর্ম্ম জীবনের অনুকরণীয় আদর্শ আজও মুখোপাধ্যায় পরিবারের প্রত্যহ পালনীয়।

তাঁহার পত্নী বিলাসমণি দেবী আজও জীবিতা। তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় ৮৪ বৎসর। পুত্র আশুতোষ প্রেসিডেন্সি কলেজে First Arts পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া পরে কারবারে যোগদান করিয়া পিতার নিকট ব্যবসায়ের শিক্ষা লাভ করেন। আজ কয়েক বৎসর হইল তিনি তাঁহার দুই পুত্রের হস্তে ব্যবসায়ের ভার ন্যস্ত করিয়া কারবার হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু এখনও তিনি পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তি ও অন্যান্য বৈষয়িক কার্য্যাবলী পর্য্যবেক্ষণ করেন। তিনি বরাহনগরনিবাসী ৺কেদার নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একমাত্র কন্যা শ্রীমতী উষাঙ্গিনী দেবীকে বিবাহ করেন। ইনিও পিতার ন্যায় স্থানীয় বহু জনহিতকর কার্য্যে সংশ্লিষ্ট আছেন। তিনিও প্রায় ১২ বৎসর হাওড়া মিউনিসি-প্যালিটীর কমিশনার ছিলেন এবং এখন হাওড়ার একজন অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট। সালিখা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের তিনি সম্পাদক ও অন্যান্য বহু জনহিতকর স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের সহিত জড়িত।

তাঁহার জ্যেষ্ঠ পৌত্র শ্রীযুক্ত বিজলীকুমার মুখোপাধ্যায় সালিখা এ. এস্, স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে First Arts পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেন। পরে পৈত্রিক ব্যবসায়েই যোগদান করেন। তিনি স্বনামধন্য স্বর্গীয় সার গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়ের পৌত্রী,

শ্রীবিজলী কুমার মুখোপাধ্যায়

শ্রীশৈল কুমার মুখোপাধ্যায়

স্বর্গীয় উপেন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মধ্যমা কন্যা শ্রীমতী ভানুমতী দেবীকে বিবাহ করেন। ইনি হাওড়ার অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট এবং ৬ বৎসর মিউনিসিপ্যাল কমিশানার ছিলেন। ইনিও বহু জন-হিতকর কার্য্যের সহিত জড়িত। হাওড়া সহরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ক্লাব হাওড়া নর্থ ক্লাবের ইনিই প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক।

দ্বিতীয় পৌত্র শ্রীযুক্ত বিজয় কুমার মুখোপাধ্যায় সালিখা এ, এস্ স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্কটিশ চার্চ্চ কলেজে অধ্যয়ন করেন। পরে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত পৈতৃক ব্যবসায়েই যোগদান করেন। তিনি বরিশা নিবাসী শ্রীযুক্ত নন্দলাল বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী রাজরাণী দেবীকে বিবাহ করেন। অল্পকাল মধ্যেই প্রথমা পত্নীর মৃত্যু হইলে তাঁহারই কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী বীণাপাণি দেবীকে বিবাহ করেন। ইনি প্রায় ১২ বৎসর কাল হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটীর কমি-শনার রূপে কার্য্য করিয়া অত্যন্ত লোকপ্রিয় হইয়া উঠেন এবং উপস্থিত তিনি হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটীর সুযোগ্য ভাইস-চেয়ারম্যান।

কনিষ্ঠ পৌত্র শ্রীযুক্ত শৈলকুমার মুখোপাধ্যায়ও সালিখা এ, এস্ স্কুল হইতে প্রবেশিকা ও প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি, এ, পাশ করিয়া হাইকোর্টে এটর্ণি ব্যবসায়ে যোগদান করেন। সন ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে এটর্ণি পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। পরে তিনি প্রসিদ্ধ পুরাতন এটর্ণি সম্প্রদায় মেসার্স ফক্স এণ্ড মণ্ডলে যোগদান করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই সেই ফার্মের অংশীদার হইয়া-ছেন। ইনি একজন উৎসাহী যুবক এবং সালিখার বহু জনহিতকর অনুষ্ঠানের পরিচালনায় ব্যাপৃত। কলিকাতা হাইকোর্টে এবং সালিখার যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে ইনি অত্যন্ত জনপ্রিয়। ইনি ৺কাশীধামের শ্রীযুক্ত সুরথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠাকন্যা শ্রীমতী নন্দরাণী দেবীকে বিবাহ করেন।

রামলাল মুখোপাধ্যায়ের ৫টী পৌত্রী। ২জন বিবাহের অল্পদিন মধ্যেই পরলোক গমন করেন। অবশিষ্ট তিন জনের মধ্যে জ্যেষ্ঠা তরুবালার বিবাহ হইয়াছে খিদিরপুর নিবাসী ৺শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীমন মোহন চট্টোপাধ্যায়ের সহিত। ইনি বার্ড কোম্পানীর ক্যাশিয়ার। মধ্যমা সরযূবালার বিবাহ হইয়াছে ইটালী নিবাসী ৺কালী শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র ডাক্তার শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত। কনিষ্ঠা মলিনা দেবীর বিবাহ হইয়াছে কৃষ্ণনগর নিবাসী ডাক্তার ৺দীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীযুক্ত নির্ম্মল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত। ইনি Income tax officer.

রামলালের জ্যেষ্ঠ প্রপৌত্র (মধ্যম পৌত্র বিজয় কুমারের জ্যেষ্ঠ পুত্র) শ্রীমান্ নির্ম্মল কুমার সালিখা এ-এস্, স্কুল হইতে প্রবেশিকা ও বিদ্যাসাগর কলেজ হইতে আই-এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পিতৃ-ব্যবসায়ে যোগদান করিয়াছেন। ইনি Deputy Director of Statistics & Commercial Intelligence রায় বাহাদুর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃতীযা কন্যা কমলা দেবীকে বিবাহ করিয়াছেন। দ্বিতীয় প্রপৌত্র, (জ্যেষ্ঠ পৌত্র বিজলী কুমারের জ্যেষ্ঠপুত্র) শ্রীমান্ সন্তোষ কুমার, সালিখা এ-এস্, স্কুল হইতে প্রবেশিকা ও কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে আই-এ ও বি-এ, উত্তীর্ণ হইয়া, এম-এ, অধ্যয়ন করিতেছেন। তৃতীয় প্রপৌত্র, (বিজয় কুমারের দ্বিতীয় পুত্র) শ্রীমান বিমল কুমার প্রেসিডেন্সী কলেজে আই-এস সি, অধ্যয়ন করিতেছেন ও চতুর্থ প্রপৌত্র (বিজলী কুমারের কনিষ্ঠ পুত্র) শ্রীমান সরোজ কুমার সালিখা এ-এস্ স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষার উর্ত্তীর্ণ হইয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে আই, এ, অধ্যায়ন করিতেছেন।

মুখোপাধ্যায় পরিবার হাওড়ায় বিশেষ সমৃদ্ধ ও প্রতিষ্ঠিত। শিক্ষা, কৃষ্টি ও উদারতা এই পরিবারের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। ইহাদের

বিমল কুমার

নির্ম্মল কুমার
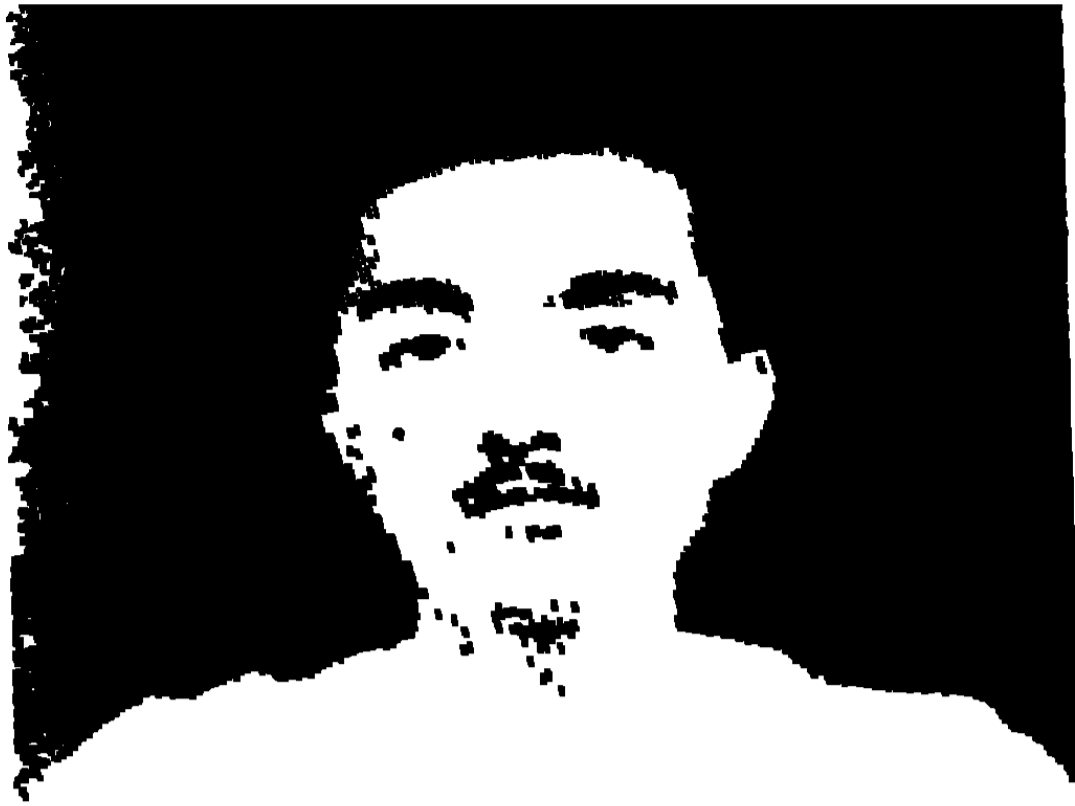
অশোক কুমার

সন্তোষ কুমার
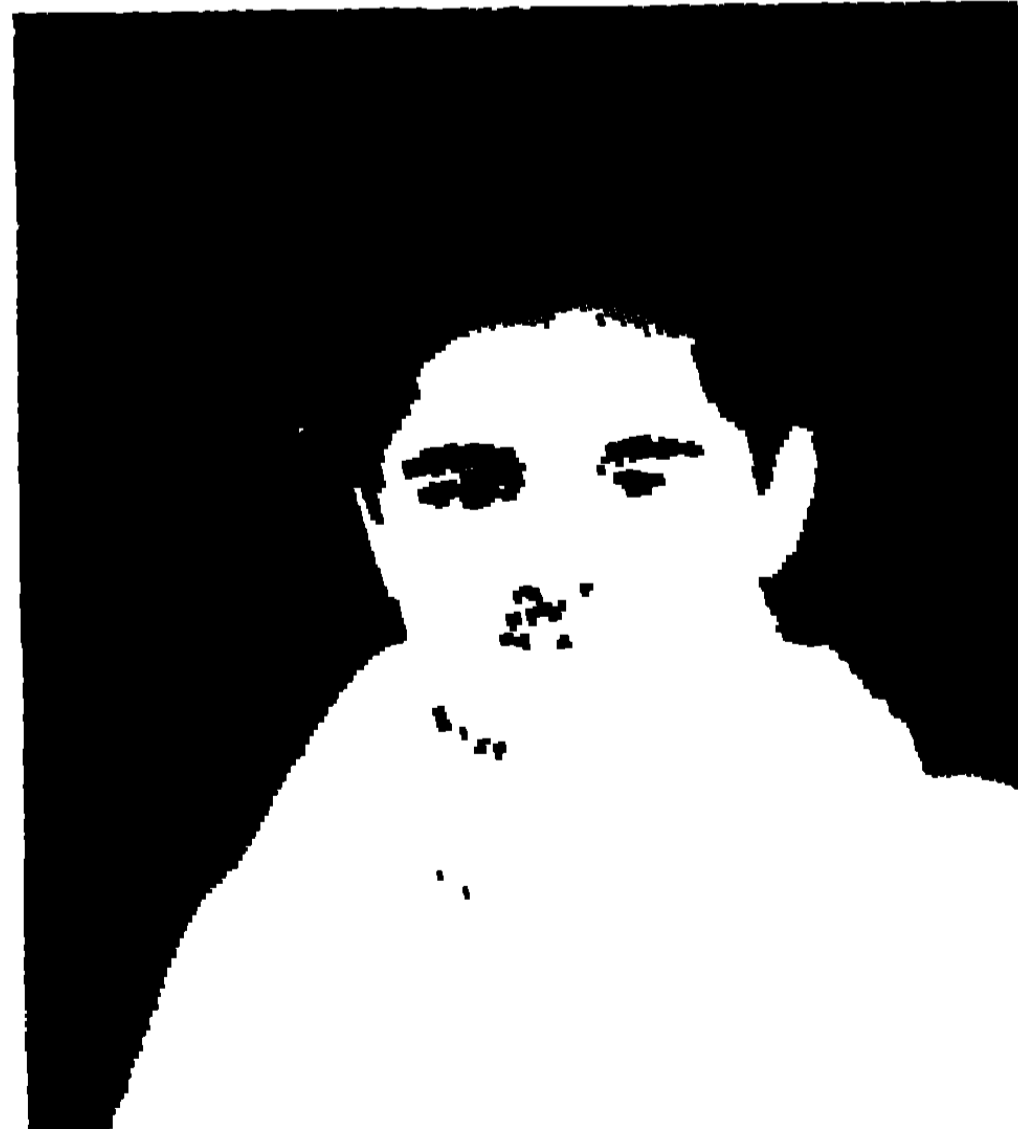
সরোজ কুমার

অমায়িক ব্যবহার সত্যই স্মরণ করাইয়া দেয়, ব্রাহ্মণের ঔদার্য্য, ধৃতি ও ক্ষমার আদর্শ। এই পরিবারের সকলেই সর্ব্বত্র অত্যন্ত জনপ্রিয়। ইঁহাদের দ্বার আপামর সাধারণের জন্য সদাই উন্মুক্ত এবং অবসর সময়ে কেহ আপনাকে সাধারণের নিকট হইতে নির্লিপ্ত করিয়া রাখেন না। পরোপকার, সামাজিকতা ও সহৃদয়তা এই বংশের বৈশিষ্ট্য। রামলালের বংশধরগণ সকলেই চরিত্রে ও ব্যবহারে পিতৃপিতামহের বংশ গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে সর্ব্বদা যত্নবান। এইরূপ একটী আদর্শ পরিবারের উন্নতি সকলেই কামনা করে।

হাওড়া সালিখার "মুখোপাধ্যায়" বংশ

পূর্ব্বপুরুষদিগের বংশ-লতা

৺বিহারী লাল
৺ক্ষীরোদ
৺প্রমথ
৺হরিচরণ
৺ননীলাল
৺কানাই
ডাঃ গিরীন্দ্রনাথ
নিরাপদ
ভোলানাথ
পান্নালাল
৺মন্মথ
৺রজনী
৺সুরেন্দ্র
কালিপদ
অনুকুল
নরেন্দ্র
৺গোবর্দ্ধন
ভোলানাথ
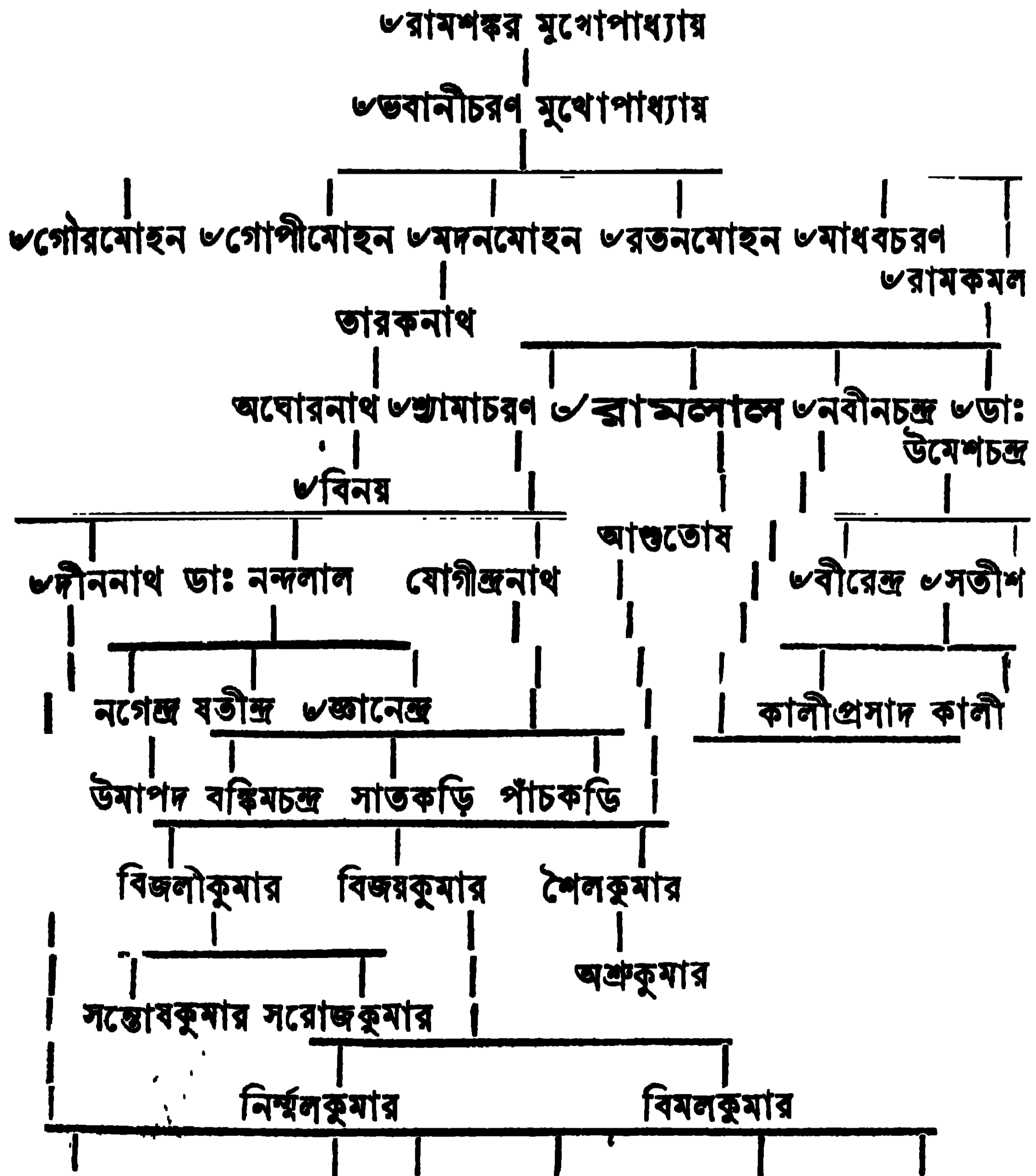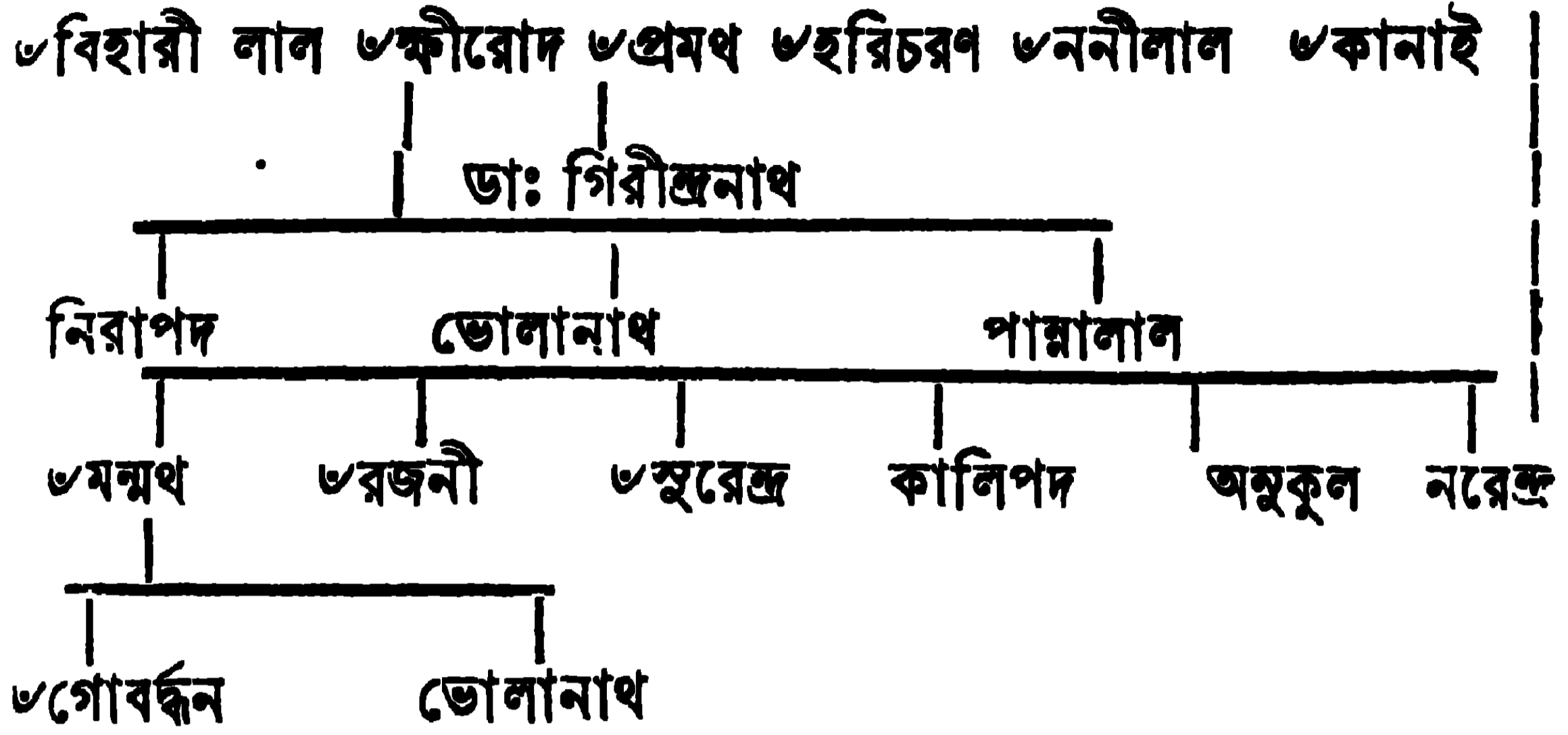
রায় তারকনাথ সাধু বাহাদুর সি, আই, ই।

বঙ্গের বিখ্যাত ব্যবহারাজীব, গন্ধবণিক জাতির গৌরবরবি, বিখ্যাত লেখক রায় তারকনাথ সাধু বাহাদুর ১২৭৪ সালের ২০শে কার্ত্তিক মঙ্গলবার প্রাতে কলিকাতা নগরীর চোরবাগান পল্লীর ৩৪নং ভুবন ব্যানার্জ্জী লেনস্থ বাটীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষেরা হুগলী জেলার অন্তর্গত পাণ্ডুয়া ষ্টেশন হইতে ছয় মাইল দূরে দাবড়া গোপাল নগরে বাস করিতেন। তারক নাথের পিতামহের পিতামহ স্বর্গীয় কালী প্রসাদ সাধু মহাশয় কলিকাতার চোরবাগানস্থ ভুবন ব্যানার্জ্জীর লেনে ১২০৪ সালে একখণ্ড জমি ক্রয় করেন। এই হইতেই তাঁহাদের কলিকাতা বাসের সূত্রপাত হয়।

তারক নাথের পিতা স্বর্গীয় রমানাথ সাধু মহাশয়ের দুই বিবাহ। প্রথমা স্ত্রী—দুইটি কন্যা রাখিয়া অল্প বয়সে পরলোক গমন করেন। ইহার কিছুকাল পরে রমানাথ সাধু মহাশয় চুঁচুড়া নিবাসী স্বর্গীয় পীতাম্বর সাহা মহাশয়ের চতুর্থ কন্যা শ্রীমতী মাতঙ্গিনী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। এই মাতঙ্গিনীদেবীই আমাদের তারক নাথের মাতা। মাতঙ্গিনী দেবীর দুই পুত্র ও দুই কন্যা জন্মে। পুত্রদ্বয় তারকনাথ ও কেদারনাথ এবং দুই কন্যা সুখদা ও সুরবালা। সুখদা এখনও জীবিতা আছেন। রমানাথ সাধু মহাশয় এসরাজ বাজাইতে দক্ষ ছিলেন।

বড়বাজার সাজুম্বা পীরের দরগার ভিতর ধারে ফুলপটীতে তারক নাথের পূর্ব্বপুরুষগণের ব্যবসার কেন্দ্র ছিল। এই স্থানে তাঁহারা কবিরাজী, হাকিমী ও ডাক্তারীর যাবতীয় প্রয়োজনীয় গাছ গাছড়া রাখিয়া বিক্রয় করিতেন। এই দোকানে ১৫।১৬ জন লোক নিযুক্ত

স্বর্গীয় রায় তারক নাথ সাধু বাহাদুর, সি. আই. ই.

ছিল। সেই সকল গাছ গাছড়া বহুদূর দেশ হইতে আনা হইত এবং তাহা বিক্রয় করিয়া বিস্তর টাকা লাভ হইত। এত টাকা লাভ হইত যে তারক নাথের পিতা ও পিতামহ দুই জনই পাল্কী ছাড়া চলিতেন না। তাঁহার পিতার যখন অর্থের এইরূপ প্রাচুর্য্য সেই সময়ে তারক নাথ জন্মগ্রহণ করেন। বাড়ীতে তখন কোন পুত্র সন্তান না থাকায় তারক নাথের জন্মগ্রহণে বাড়ীময় মহা আনন্দের সাড়া পড়িয়া যায়।

আট বৎসর বয়সে তারক নাথ নর্ম্মাল স্কুলে ভর্ত্তি হন। তারপর তারক নাথের বয়স যখন দশ বৎসর, তখন রমানাথ সাধু মহাশয় দেহত্যাগ করেন। ফলে তারক নাথ পিতৃহীন অনাথ বালকে পরিণত হন। তাঁহাদের বড়বাজারে গাছ গাছড়া বিক্রয়ের যে ব্যবসায় ছিল, তাঁহার পিতা যখন রোগশয্যায় তখনই দোকানের তথাকথিত আত্মীয় কর্ম্মচারীদের বিশ্বাসঘাতকতায় ব্যবসায়টি উঠিয়া গেল। তারক নাথের পিতা প্রায় দুই বৎসর যাবত ভুগিয়াছিলেন সেই সময় বাড়ীতে তাঁহাকে সেবা সুশ্রুষা করিতে কেহ না থাকায় তারক নাথের মাতুলালয়ে তিনি তারকনাথ ও তাঁহার মাতাকে লইয়া যান। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর তারক নাথের মাতুলেরা ঐরূপ গুরু দায়ীত্ব বহন করিতে রাজি হইলেন না, ফলে তারক নাথ মাতাকে লইয়া ভুবন ব্যানার্জ্জী লেনের বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন।

তাঁহার মাতুলেরা তারক নাথকে চুঁচুড়ায় কোন এক আত্মীয়ের বাড়ীতে তাঁহাকে বাতি তৈয়ারী করিবার জন্য মোম পরিষ্কারের কাজ জুটাইয়া দিয়াছিলেন। তারক নাথ সেইগুলি মাথায় করিয়া ছাদের উপর লইয়া যাইতেন, আবার শুকাইয়া গেলে ছাদ হইতে নামাইয়া আনিতেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহাকে বাড়ীর আবর্জ্জনাও পরিষ্কার করিতে হইত। একদিন বালক তারক নাথ ছাদে মোম শুকাইতে দিয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় ভয়ানক বৃষ্টি আসিল। তারক নাথ মোম গুলি

কুড়াইতে কুড়াইতে সামান্য কিছু ভিজিয়া গেল। ইহাতে তাঁহার মনিবেরা বিশেষ অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে মারিয়া তাড়াইয়া দিল। তারক নাথ মামার বাড়ীতে গিয়া সমস্ত কথা জানাইলেন, মামারা সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। অগত্যা চতুর্দ্দিকে নিরুপায় দেখিয়া তারক নাথ কলিকাতা চলিয়া আসিলেন। কলিকাতায় আসিয়া তিনি মতিলাল শীলের অবৈতনিক বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিতে লাগিলেন। তিনি ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইলেন, কিন্তু রাত্রিতে পড়িবেন এমন পয়সা ছিল না, তিনি গ্যাস পোষ্টের ধারে বসিয়া পড়িতেন এবং এক পয়সার বাজার করিয়া তদ্বারা দুই দিন চালাইতেন।

অতঃপর "জেনারেল এসেম্বি্ল ইন্‌ষ্টি টিউসনে" (বর্ত্তমান স্কটিশ চার্চ্চ কলেজ) ভর্ত্তি হইয়া ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে তথা হইতে এণ্ট্রান্স বা প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং দশটাকা বৃত্তিলাভ করেন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এফ্‌ এ পাশ করেন। এফ্‌ এ পাঠকালে তিনি কলেজ হইতে বাইবেলে প্রথম হইয়া একটি বিশেষ বৃত্তি লাভ করেন। এফ্‌ এ পাশ করিবার পর অর্থাভাবে তিনি জোড়াসাঁকো লাইব্রেরীর সহকারী লাই-ব্রেরীয়ানের পদ গ্রহণ করেন। ইহাতে তিনি কিছু কিছু অর্থ পাইতে লাগিলেন এবং ছাত্র পড়াইয়াও কিছু কিছু পাইতে লাগিলেন। ইহাতে নিজের পড়িবার ও পরিবার প্রতিপালনের ব্যয় কিয়ৎ পরিমাণে সংসাধিত হইতে লাগিল। বি এ পাশ করিবার পর তাঁহার সন্ধানে ২৫।৩০ টাকার দুই একটি চাকুরীর সন্ধান আসিতে লাগিল; কিন্তু তিনি চাকুরী গ্রহণ না করিয়া বি এল পড়িতে লাগিলেন। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সসম্মানে বি এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৯৪—৯৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি হাই-কোর্টের "এপিলেট সাইডের" উকিল শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র লাল চট্টোপাধ্যায়ের "আর্টিকেল্ড ক্লার্ক" ছিলেন। ওকালতী পাশ করিলে কি হয়? হাই-কোর্টে অর্থাভাবে তিনি "এনরোল" হইতে পারিলেন না, কারণ তাহাতে

৫ শত টাকার প্রয়োজন। কাজেই পুলিশ কোর্টে ওকালতী করিতে সঙ্কল্প করিলেন বটে, কিন্তু এখানেও গাউন ইত্যাদিতে ও এন্‌রোলমেণ্ট ফীতে প্রায় শতাধিক টাকার প্রয়োজন। এত টাকা তিনি কোথায় পাইবেন? তাঁহার মধ্যম মাতুল সিভিল সার্জ্জেন রায় সাহেব ব্রজনাথ সাহাকে একশত টাকার জন্য চিঠি লিখিয়া তিনি অকৃতকার্য্য হইলেন। অতঃপর তাঁহার খুল্লতাতের এক বন্ধু ভগবতী চরণ চট্টোপাধ্যায় তাঁহাকে এক শত টাকা সাহায্য করিলেন। ছয় মাসের মধ্যেই তারক নাথ সেই টাকা শোধ করিয়া দেন।

বি এ পাশ করিবার পর স্বর্গীয় রাধা মাধব সাহার প্রপৌত্রী শ্রীমতি সিদ্ধেশ্বরী দেবীর সহিত তারক নাথের শুভ পরিণয় হয়। শ্রীমতী সিদ্ধেশ্বরী রূপে গুণে অতুলনীয়া ছিলেন। তিনি সাক্ষাৎ লক্ষ্মী স্বরূপে তারক নাথের গৃহে আইসেন। তিনি যখন "কুমারী" ছিলেন তখন তাঁহার পিতার বাটী উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছিলেন. তখন তাঁহাদের বাটীতে হিন্দুর প্রত্যেক পূজা পার্ব্বণ মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন হইত। তাঁহার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে তারকনাথের সংসারের দিন দিন উন্নতি হইতে লাগিল। তারক নাথের সংসারে আসিয়া সিদ্ধেশ্বরী দেবীকে স্বহস্তে সমস্ত কাজ কর্ম্ম করিতে হইত, কারণ তারক নাথের অবস্থা তখন সুবিধাজনক ছিল না। কিন্তু এত কাজ কর্ম্মের মধ্যেও তাঁহার মুখে কখনও বিরক্তির ভাব কেহ দেখে নাই। স্বামীকে তিনি সাক্ষাৎ দেবতার ন্যায় ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন। এই পত্নীর গর্ভে তারক নাথের দুইটি কন্যা ও চারিটি পুত্র জন্ম গ্রহণ করে।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে তারক নাথ ওকালতী আরম্ভ করিলেন। প্রথম দিন কোর্টে যাইবামাত্র সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "বেণের ছেলে আবার ওকালতী করিতে আসিয়াছে! যাও না কেন বাবা মসলার দোকানে!" উকিলগণের এই শ্লেষবাণী শুনিয়া তারক নাথের মনে এই সঙ্কল্প

দৃঢ় হইল যে এই সমস্ত উকিলগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিতেই হইবে। প্রথম প্রথম তারক নাথ নামমাত্র ফী লইয়া দুই একটী মোকদ্দমা যাহা পাইতেন তাহার পাছে এরূপ খাটিতেন যে, প্রায় প্রতি মোকদ্দমাতেই তাঁহার জয় হইত। তাহার ফলে ক্রমে তিনি বড় বড় মোকদ্দমাও পাইতে লাগিলেন, সে সমস্ত মোকদ্দমাতেও তিনি জয় লাভ করিতে লাগিলেন,- ফলে অর্থও কিছু কিছু বেশী পাইতে লাগিলেন। অল্প দিনের মধ্যে তারক নাথের নাম ভাল উকিলরূপে সর্ব্বত্র প্রচারিত হইতে লাগিল, বড় বড় মক্কেল তাঁহার নিকট আসিতে লাগিল, ক্রমে বাঙ্গালা সরকারের দৃষ্টি তাঁহার দিকে পতিত হইল এবং বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে ২।১ টি মোকদ্দমায় নিযুক্ত করিতে লাগিলেন। তিনি অন্য কোনরূপ আমোদ প্রমোদে না মিশিয়া রাত্রিদিন কেবল মোকদ্দমার চিন্তা করিতেন এবং রাত্রি ২।৩ টা পর্য্যন্ত আইনের বই লইয়া আলোচনা করিতেন। বস্তুতঃ এই সময়ে স্বীয় ব্যবসায়ে উন্নতি করাই ছিল তারক নাথের সাধনা। মিঃ হিউম তখন গবর্ণমেণ্টের উকিল (Public Prosecutor) ছিলেন। তিনি হাইকোর্টের সেসনে মামলা চালাইতে গেলে তারকনাথ তাঁহার স্থলে পুলিশ কোর্টের মামলা চালাইতেন।

১৩২৫ সালের ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষে প্রতিপদ দিবসে তারক নাথের মাতাঠাকুরাণী ৺গঙ্গালাভ করেন। মাতার মৃত্যুতে তিনি শিশুর ন্যায় শোকার্ত্ত হইয়া কাঁদিয়াছিলেন। বাল্যে পিতৃহীন হওয়ায় মাতার স্নেহেই তিনি লালিত, পালিত, বর্দ্ধিত এবং শিক্ষিত হইয়াছিলেন। সেই মাতার মৃত্যুতে তিনি সংসার অন্ধকারময় দেখিলেন। তিনি মহাসমারোহ করিয়া মাতৃশ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন এবং মাতার নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য দমদমায় একটি বাগান বাটী ক্রয় করিয়া তথায় মাতার নামে একটি পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সেই পুষ্ক-

স্বর্গীয়া সিদ্ধেশ্বরী দেবী

রিণী প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে তিনি তথায় বিরাট ভোজনের ও ব্রাহ্মণ বিদায়ের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

১৯০৭ সাল হইতে প্রকৃতপক্ষে তারক নাথ পুলিশ কোর্টে সরকারী উকিলের কাজ করিতে থাকেন। ওকালতীতে যথেষ্ট অর্থাগম হওয়ায় তিনি ৯ নং মদন চ্যাটার্জ্জি লেনে একটি প্রাসাদোপম বাটী নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন।

১৯১২ সালে সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ ভারতবর্ষে আসিলে তিনি সরকার হইতে certificate of honour পাইয়াছিলেন। এই সার্টিফিকেট দিবার কারণ স্বরূপ লিখিত হইয়াছিল—your loyal and devoted assistance to the legal works of Government, তার পরেই তিনি দরবার পদক পান এবং ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে "রায় বাহাদুর" উপাধি প্রাপ্ত হন।

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে তারক নাথের সতী, সাধ্বী, রূপগুণময়ী পত্নী সিদ্ধেশ্বরীদেবী স্বর্গারোহণ করেন। মৃত্যুকালে তিনি দুই কন্যা ও চারিটি পুত্র রাখিয়া যান। তাঁহার স্মৃতি রক্ষার জন্য রায় বাহাদুর মধুপুরে "সিদ্ধেশ্বরী দুর্গা মন্দির" স্থাপন করেন। ইহার পূর্ব্বে তিনি মধুপুরে একটি অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তিনি আদালতের কার্য্যে ছুটি পাইলেই এই মধুপুরের বাটীতে যাইতেন। সে সময় তিনি পুত্র কন্যা এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজন সকলকে লইয়া যাইতেন।

তিনিই বাঙ্গালীর মধ্যে সর্ব্বপ্রথম সরকারী উকিল (Public Prosecutor) ১৯২৪ সালে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে "সি আই ই" উপাধি ভূষণে ভূষিত করেন। সরকারী উকিল পদে তাঁহার পূর্ব্বে আর কোন বাঙ্গালী নিযুক্ত হন নাই। ১৯৩৫ সালে তিনি সরকারী উকিলের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

সহধর্ম্মিণীর মৃত্যুর পর হইতে তিনি সাহিত্য সেবায় মনোনিবেশ

করেন। তাঁহার লিখিত প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস, কবিতা প্রভৃতি কলিকাতার বিশিষ্ট পত্রিকাসমূহে প্রকাশিত হইত। তাঁহার প্রণীত (১) ভোলানাথের ভুল, (২) মেনকারাণী (৩) ঋণ মোক্ষ (৪) মহামায়ার মহাদান (৫) হৃদ্দাদার (৬) স্মৃতি কথা (৭) উপক্ষিতের উপকারিতা এই কয়েকখানি পুস্তক সাহিত্য সমাজে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। তিনি স্বীয় সমাজের মুখপত্র "গন্ধবণিক" পত্রিকার অন্যতর সম্পাদক ছিলেন এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত "গন্ধবণিক সমাজ" পত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। মায়ের প্রতি তাঁহার যেরূপ অসীম শ্রদ্ধা ছিল, স্ত্রীর প্রতি তাঁহার যেরূপ প্রগাঢ় প্রীতি ছিল, তদ্রূপ ভ্রাতার প্রতিও তাঁহার অপরিসীম স্নেহ ছিল। তিনি দৈনিক যাহা উপার্জ্জন করিতেন, তৎ সমস্তই আপন ভ্রাতার হস্তে সমর্পণ করিতেন। কোন দিন ভ্রাতার নিকট টাকাকড়ির কোন হিসাব নিকাশ তলব করেন নাই। ভ্রাতা যাহা করিতেন, তাহাই হইত, বৈষয়িক কার্য্যে তিনি সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ছিলেন। অহোরাত্র তিনি আইনের সাধনা লইয়াই থাকিতেন। তাঁহার ন্যায় ভ্রাতৃবৎসল আধুনিক যুগে বিরল।

বাল্য ও ছাত্র জীবনে তিনি অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন বলিয়া দরিদ্রের মনোব্যথা তিনি তীব্রভাবে অনুভব করিতেন। কোন দরিদ্র ব্যক্তি কোন দিন বিফলমনোরথ হইয়া তাঁহার নিকট হইতে ফিরিয়া যায় নাই। তাঁহার বহু স্বজাতীয় ছাত্র তাঁহার বাড়ীতে থাকিয়া শিক্ষা লাভ করিত এবং তিনি বহু আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধবকে চাকুরী করিয়া দিয়াছিলেন। বহু বিধবা তাঁহার নিকট নিয়মিতভাবে মাসিক সাহায্য লাভ করিতেন। District charitable societyর সহকারী সভাপতিরূপে তিনি বহু অনাথার সাহায্য প্রাপ্তির ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। প্রধানতঃ তাঁহারই চেষ্টায় স্বজাতীয়দের সাহায্যের জন্য "দরিদ্র ভাণ্ডার" স্থাপিত হইয়াছিল এবং তিনি উহার সভাপতি ছিলেন।

স্বসমাজের উন্নতি বিধান তাঁহার জীবনের লক্ষ্য ছিল, এতদুদ্দেশ্যে তিনি গন্ধবণিক সমাজের মধ্যে যে চারিটি বিভিন্ন আশ্রম আছে, তাহার বিলোপ সাধন করিয়া যাহাতে পরস্পরের মধ্যে পুত্র কন্যার আদান প্রদান হয়, তাহার জন্য চেষ্টা করেন এবং Example is greater than precept এই নীতি বাক্য স্মরণ করিয়া দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের জন্য নিজের তিন পুত্রের বিবাহ "নাঅ" আশ্রমে দেন। এজন্য সমাজে তাঁহাকে অনেক প্রতিবন্ধকের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল এবং প্রভূত অর্থ ব্যয়ও করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তিনি সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া গন্ধবণিক সমাজ হইতে বিভিন্ন "আশ্রম" তুলিয়া দিয়া সকলকে এক করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

অতঃপর নানা ধর্ম্ম শাস্ত্র অনুশীলন করিয়া তিনি প্রমাণ করেন যে, গন্ধবণিকেরা বৈশ্যবংশ সম্ভূত। যাহাতে গন্ধবণিকেরা বৈশ্যোচিত ক্রিয়া কলাপ ও আচরণ প্রতিপালন করেন, তজ্জন্যও তিনি প্রভূত চেষ্টা করেন। গন্ধবণিক সমাজের মধ্যে বালবিধবার বিবাহের প্রচলন করিবার জন্য তিনি প্রভূত চেষ্টা করিয়াছিলেন। গন্ধবণিক মহাসভার সভাপতি পদে বৃত হইয়া তিনি অকুতোভয়ে তাঁহার এই সব মতবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

তিনি অন্যায়ের মহাশত্রু ছিলেন। গন্ধবণিক পত্রিকার মধ্যে যখন কয়েকটি স্বার্থপর লোক প্রবেশ করিয়া নানা প্রকার অন্যায়াচরণ করিতে লাগিল, তখন তিনি সে পত্রিকার সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া নিজেই এক-খানি স্বতন্ত্র পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করেন।

ভেষজ গাছ গাছড়া সম্বন্ধে তাঁহার একটি "নেশা" ছিল। তিনি নিজে নানারূপ ঔষধের গাছ গাছড়া তাঁহার মধুপুরের বাটীতে রোপণ করিয়াছিলেন। একটি গাছ গাছড়ার Laboratory খুলিবারও তাঁহার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু কুটিল কালের তাড়নায় তাঁহার সে আশা পরিপূর্ণ হয় নাই।

তিনি প্রতিবৎসর মহাসমারোহে নিজ বাটীতে দুর্গোৎসব করিতেন, শেষ জীবনে বিশেষ কারণে উহা বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বাটীতে তিনি শ্রীশ্রীনারায়ণ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। শেষ জীবনে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের নিকট থাকিবার অভিপ্রায়ে তিনি পুরীধামে একটি বাটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তিনি নিজে বেদাধ্যয়ন করিয়া যাহাতে দেশের লোক বেদের মর্ম্ম অনুধাবন করিতে পারে তদুদ্দেশ্যে সরল বাঙ্গালা ভাষায় তাহার অনুবাদ করিয়া মাসিক পত্রাদিতে প্রকাশ করিতেন। তিনি প্রত্যহ হরিনাম শুনিবার অভিপ্রায়ে কয়েকজন বৈষ্ণবকে মাসমাহিনায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহারা প্রতিদিন আসিয়া তাঁহাকে হরিনাম শুনাইত। তিনি একসময়ে কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার হইয়াছিলেন, কিন্তু অন্যান্য কাউন্সিলারদের সহিত মতের মিল না হওয়ায় সে পদ পরিত্যাগ করেন।

লেখা পড়াতে তাঁহার নিজের অনুরাগ ছিল বলিয়া তিনি চাহিতেন যে সকলেই লেখা পড়া শিক্ষা করুক। তাই আজ তাঁহার পুত্রেরা অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াও সকলেই সুশিক্ষিত। ব্যবসায়ের প্রতিও তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল; ব্যবসা শিক্ষার মানসে তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অনাথকে বিলাত পাঠাইয়াছিলেন।

রায় বাহাদুর বি, এ পরীক্ষার বাঙ্গালার পরীক্ষক ছিলেন এবং আইনের পরীক্ষারও পরীক্ষক ছিলেন।

স্বজাতি সেবার ন্যায় দেশসেবাও তিনি করিয়া গিয়াছেন। দেশের যিনি যখন কোন বিপদে পড়িয়া তাঁহার নিকট আসিয়া উদ্ধারের নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়াছেন, অমনি তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়া তাহাকে বিপদমুক্ত করিয়াছেন। সাধু তারক নাথ যথার্থই তাঁহার "সাধু" নাম সার্থক করিয়া গিয়াছেন।

১৯৩৭ সালের ১৪ই জানুয়ারী বাঙ্গালা ১৩৪৩ সালের ১লা মাঘ

তারক নাথ রাত্রি ১১ ঘটিকার সময় ইহলীলা সমাপ্ত করেন। তাঁহার মৃত্যু সংবাদ সহরে রাষ্ট্র হইবামাত্র বহু গণ্যমান্য লোক তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হইয়া তাঁহার মৃত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। যাঁহারা সেই রাত্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে স্যার মন্মথ নাথ মুখোপাধ্যায়, স্যার হরিশঙ্কর পাল, অনারেবল এস্ কে সিংহ, মিঃ এইচ্ কে দে, রায় বাহাদুর ভূপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রায় বাহাদুর কে পি মৈত্র, রায় বাহাদুর ডাঃ হরিধন দত্ত, রায় বাহাদুর অমৃত লাল মুখোপাধ্যায়, রায় বাহাদুর পূর্ণচন্দ্র লাহিড়ী, রায় বাহাদুর জে, সি গুহ, রায় বাহাদুর পি, জি, মুখাৰ্জ্জী, মিঃ এ কে রবার্টসন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

পাবলিক প্রসিকিউটর অফিস, বঙ্গোদয় কটনমিল, ন্যাশনাল ইন্‌সিওরেন্স কোং, পুলিশকোর্ট বার এসোসিয়েসন্, জোঁড়াসাঁকো পুলিশ ষ্টেশন, চোরবাগান বালক সঙ্ঘ, গন্ধবণিক ছাত্রাবাস, গন্ধবণিক মহাসভা ও কলিকাতার মেয়রের পক্ষ হইতে তাঁহার শবাধারে পুষ্পমাল্য প্রদান করা হয়।

পরদিবস বেলা দশ ঘটিকায় শবাধার পট্টবস্ত্র, চন্দন ও পুষ্পে সুসজ্জিত করিয়া এক বিরাট শোভাযাত্রা করিয়া সঙ্কীর্ত্তন সহকারে নিমতলা শ্মশান ঘাটে লইয়া যাওয়া হয়। তথায় যাঁহারা শবানুগমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রত্যেককে স্নানান্তে রায় বাহাদুরের পুত্রেরা নূতন বস্ত্র ও নূতন গামছা দান করেন।

তাঁহার মৃত্যুতে বাঙ্কশাল পুলিশ কোর্ট, হাইকোর্ট, রাণী ভবানী স্কুল, প্যারিচরণ বালিকা বিদ্যালয়, মতিলাল শীল ফ্রী স্কুল, ন্যাশনাল ইন্‌সিওরেন্স কোং, বঙ্গোদয় কটন মিল, কলিকাতা হোমিওপ্যাথিক কলেজ, গন্ধবণিক মহাসভা, গন্ধবণিক ছাত্রাবাস, চোরবাগান সার্ব্বজনীন দুর্গোৎসব সমিতি, গোবিন্দ সুন্দরী আয়ুর্ব্বেদ কলেজ, ডিষ্ট্রীক্ট্ চেরিটেবল

সোসাইটি, গন্ধবণিক পত্রিকা, গন্ধবণিক দাতব্য সভা প্রভৃতি স্থানে শোকসভার অধিবেশন হইয়াছিল।

রাণী ভবানী স্কুল, প্যারিচরণ বালিকা বিদ্যালয়, কলিকাতা পুলিশ কোর্ট, ন্যাশনাল ইন্‌সিওরেন্স কোং, বঙ্গোদয় কটনমিল, মতিলাল শীল্‌স্ ফ্রী স্কুল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান একেবারে বন্ধ ছিল।

বৈশ্যোচিত নিয়মে পঞ্চ দশাহে রায় বাহাদুর তারক নাথের শ্রাদ্ধ সুসপন্ন হয়। কলিকাতায় ইহার পূর্ব্বে গন্ধবণিক সমাজে পঞ্চ দশাহে আর কখনও অশৌচ পালন করা হয় নাই। শ্রাদ্ধ বাসরে সুপ্রসিদ্ধ কীর্ত্তন গায়ক, কীর্ত্তনকলানিধি শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র নাথ বসু ও ময়নাডালের শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মিত্র ঠাকুরের পুত্রেরা কীর্ত্তন করেন। প্রায় ২ শত পণ্ডিতকে অর্থ ও তৈজস পত্রাদি দান করা হইয়াছিল। বিভিন্ন চিকিৎসালয় ও দরিদ্র ভাণ্ডারে কম্বল, বাসন ও অর্থ দেওয়া হয়; অপরাহ্নে ৫ সহস্র দরিদ্র নারায়ণের সেবা হয়।

শ্রাদ্ধের পরদিবস প্রায় এক সহস্র ব্রাহ্মণ মধ্যাহ্নে ভোজন করেন এবং সন্ধ্যায় বন্ধু, বান্ধব ও আত্মীয় স্বজন সর্ব্বসমেত প্রায় চারি সহস্র লোক ভোজন করেন। এক কথায় তাঁহার ন্যায় পদস্থ লোকের উপযুক্ত শ্রাদ্ধাদি করিতে ব্যয়ের বিন্দুমাত্র ত্রুটি তাঁহার পুত্রেরা করেন নাই।

শোক সভা।

বিগত ২৪শে জানুয়ারি রবিবার সন্ধ্যা ৫ ঘটিকায় গন্ধবণিক মহাসভার ও গন্ধবণিক দাতব্য সভার ভূতপূর্ব্ব সভাপতি এবং গন্ধবণিক পত্রের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক স্বজাতিগৌরব রায় বাহাদুর তারক নাথ সাধু সি, আই, ই, মহোদয়ের পরলোকগমনে শোকপ্রকাশ করিবার জন্য ২১ নং মুক্তারাম রো স্থিত গন্ধবণিক মহাসভা গৃহপ্রাঙ্গনে একটী সাধারণ সভা হইয়াছিল।

উক্ত সভায় বহু গণ্যমান্য স্বজাতি উপস্থিত ছিলেন।

কলিকাতা মহানগরীর মেয়র স্যার হরিশঙ্কর পাল, বৈশ্যরত্ন মহোদয় সকলের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মাননীয় সভাপতি মহোদয় সভা আহ্বানের উদ্দেশ্য সর্ব্বসমক্ষে ব্যক্ত করিয়া তাঁহাদিগকে তাঁহাদের বক্তব্য বিষয় বলিতে অনুরোধ করেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত ভূপতি চরণ পাল মহাশয় একটী শোকগাথা পাঠ করেন।

কবিতাটী যথারীতি পঠিত হইবার পর শ্রীযুক্ত কিরণ চন্দ্র দত্ত মহোদয় বলেন—

আজ রায় বাহাতুর তারক নাথ সাধু সি, আই, ই, মহোদয়ের পরলোকগমনে শোকপ্রকাশ করিবার জন্য আমরা এখানে উপস্থিত হইয়াছি তা মাননীয় সভাপতি মহাশয় পূর্ব্বেই বলেছেন। আজ যিনি আমাদের মধ্যে না থাকায় আমরা বিহ্বল হ'য়ে পড়েছি তিনি রায় বাহাতুর তারক নাথ সাধু। আপনারা সকলেই জানেন যে তিনি দুঃস্থ পরিবারে জন্মগ্রহণ করে স্বীয় প্রতিভাবলে বাঙ্গালীদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম পাব্লিক প্রসিকিউটার হয়েছিলেন। তিনি আজীবন পরোপকার করে গিয়েছেন। তিনি কত লোককে যে পুলিসের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন তার ইয়ত্তা নাই। তিনি ছিলেন নির্ভীক। আবশ্যক বোধে কাহারও নিকট মাথা নত করেন নি। উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত থেকেও তিনি স্বজাতির অশেষ কল্যাণ সাধন করে গিয়েছেন। তিনি অনেক সময় গোপনে দান করতেন। তিনি ছাত্রদের পড়ার যাতে সুবিধা হয় সেজন্য মহাসভা গৃহে একটী অবৈতনিক কোচিং ক্লাশের বন্দোবস্ত করে গিয়েছেন। তিনি দাতব্যসভায় প্রচুর অর্থদান করে গিয়েছেন। তাঁর সভাপতিত্বে দাতব্যসভার কাজ অনেকদূর এগিয়েছিল।

সভাপতি মহোদয়ের অনুরোধে শ্রীযুক্ত সত্যকুমার দাঁ মহাশয় বলেন, তারক বাবুর কথা বলিতে গেলে অনেক কিছুই বল্‌তে হয়। তাঁর মত মহৎ লোকের জীবনী কি আর বলে শেষ করা যায়? কোন সময়ে এক সভায় তারক বাবু বলেছিলেন, বেণের ছেলে যদি বিলাত না যাবে ত যাবে কে? সে সময় বিলাত গেলে প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে হত। এই নিয়ে ব্রাহ্মণ এবং বণিকে অনেকদিন ধরে গোলমাল চলেছিল। কিন্তু সেই থেকে বিলাত গেলেও প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে হত না। বেণের ছেলের যাতে লেখাপড়ার সুবিধা হয়, সেজন্য তিনি স্কটিস চার্চ্চ কলেজে বৃত্তি দানের ব্যবস্থা করে গিয়েছেন। দুইজন আই, এস্, সি ও দুইজন বি, এস, সি-কে এই ষ্টাইপেণ্ড দেবার ব্যবস্থা আছে। বৃত্তির বিশেষত্ব এই যে—"First preference will be given to the Gandha Banik Students.

সভাপতি মহাশয়ের অনুমতিক্রমে শ্রীযুক্ত সত্যপদ দে মহাশয় বলিতে থাকেন—

আমি বি, এ, পাশ করার পর মাঝে মাঝে তাঁর কাছে যেতাম, তিনি বল্‌তেন, "দেখ সত্য, আমি আমার জাতিকে এর চাইতে আর এক ষ্টেপ উঁচুতে দেখ্‌তে চাই। আমি বেনেটোলার অধিবাসিবৃন্দের পক্ষ থেকে তাঁর মৃত আত্মার প্রতি আমাদের আন্তরিক ভালবাসা জানাচ্ছি।

অতঃপর নরেন্দ্রনাথ সাধু মহাশয় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, "ভাই সব, ঐ যে হাসি মাখা মুখখানা দেখচ, আজ আর সে নাই। ভায়া নাই! আমি এতই দুঃখিত যে, আমার বলবার ক্ষমতা নাই। কেবলই মনে হচ্ছে, ভায়া নাই! তবে দু'একটা গুণ আপনাদের বলি শুনুন—তিনি বাপ মাকে সাক্ষাৎ দেবতা বলে মনে কর্‌তেন। মায়ের আদেশে কত বার যে কত লোককে পুলিশের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন, তার সংখ্যা করা যায় না।

অতঃপর শ্রীযুত গিরিজাশঙ্কর ধর মহাশয় বলেন—

আমি সমগ্র গন্ধবণিক ছাত্রগণের পক্ষ হইতে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি। মহাভারতের এক স্থানে মহাবীর কর্ণ বলিয়াছিলেন, "দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম মদায়ত্তং তু পৌরুষম্।" তারকনাথ সাধু মহাশয়ও তাহা গর্ব্বসহকারে বলিতে পারিতেন। তাঁহার জন্ম হইয়াছিল সাধারণ দরিদ্র পরিবারে, কিন্তু নিজের অসাধারণ অধ্যবসায়ের দ্বারা তিনি গন্ধবণিক সমাজের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি হইয়াছিলেন। বর্ত্তমানকালে যদি গন্ধবণিক ছাত্রদের কেহ আদর্শ স্থানীয় থাকেন, তাহা হইলে তিনিই। তিনি ছাত্রদের সব চেয়ে উপকার করিয়াছেন, তাঁহার জীবনের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া—"হে তরুণ ছাত্র—মাভৈঃ! পৌরুষ অবলম্বন কর; সিদ্ধি করায়ত্ত।" তাঁর মত মহাপুরুষ আর কখনও এই জাতিতে জন্মিবে কিনা বলা কঠিন।

শ্রীযুক্ত অনাথনাথ সাহা মহাশয় তারক বাবুর জীবনী সম্বন্ধে যে সারগর্ভ প্রবন্ধ লিখিয়া আনিয়াছিলেম, তাহা তাঁহার অনুরোধে বিপুলবাবু পাঠ করেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত দেবনাথ দাস মহাশয় বলেন—

তারক বাবুর সব গুণ বলে শেষ করা যায় না। তিনি অনেক কুসংস্কার সংশোধন করবার চেষ্টা করে গিয়েছেন। সেজন্য আমরা তাঁর কাছে চিরঋণী। বিধবা বিবাহ তিনি সমর্থন করতেন। আমাদের সকলেরই কর্ত্তব্য তাঁর স্মৃতি রক্ষার কোন ব্যবস্থা করা। ভগবানের নিকট আমরা তাঁর আত্মার শান্তির জন্য প্রার্থনা করছি।

দেবনাথ বাবুর বক্তৃতা শেষ হইবার পর, শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র সাধু মহাশয় বলিতে থাকেন—

যাঁর স্মৃতি তর্পণ বাসরে আজ আমরা উপস্থিত, তাঁর গুণ-গরিমা কোন গন্ধবণিকের অবিদিত নাই। গীতায় আছে—

পরিত্যাগ করেছেন। আর জীবনে এতদূর উন্নতি করেছিলেন যে, তিনি স্কটিস চার্চ্চ কলেজে দরিদ্র বালকের লেখাপড়ার সুবিধার জন্য ৪টী বৃত্তির ব্যবস্থা করে গিয়েছেন। প্রথমে যখন ওকালতি আরম্ভ করেন, তখন খুব সামান্য ফি নিতেন। পরে একদিন এমন এল, যেদিন কেউ তাঁর সমকক্ষ ছিলেন না। গবর্ণমেণ্ট তাঁর কার্য্যকুশলতা দেখে ইংরেজের পরিবর্ত্তে তাঁকে সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালী পাবলিক প্রসিকিউটার করেছিলেন, তাঁর ওকালতির শেষ সময়ে তিনি সাহিত্য সেবায় মনোনিবেশ করেন এবং নানাপ্রকার পুস্তক প্রণয়নপূর্ব্বক সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করে গিয়েছেন। তাঁর কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, ধর্ম্মনির্ভরতা ছিল অসাধারণ। স্ত্রী-বিয়োগে পুত্রকন্যাদিগকে মাতৃবিয়োগজনিত দুঃখ বুঝতে দেন নাই। আমার মনে হয় যদিও তিনি আজ ধরাধামে নাই, তথাপি তাঁর আত্মা এখানে উপস্থিত আছে, তাঁর স্মৃতিরক্ষার জন্য আমাদের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। আমাদের সমাজে যে সমস্ত শাখা ছিল, সেগুলি তিনি এক-করার জন্য নানাপ্রকার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর দান ছিল অপরিসীম। বিধবা এবং নিরাশ্রয়দের জন্য তাঁর প্রাণ স্বতঃই কেঁদে উঠত। আমাদের গন্ধবণিক-দাতব্য সভাও তাঁর কাছে চির ঋণী।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় প্রস্তাব করেন :—

১। গন্ধবণিক জাতির শ্রেষ্ঠরত্ন, সমাজসেবী, বিদ্যোৎসাহী, স্বজাতি-প্রেমিক রায় বাহাদুর তারকনাথ সাধু সি, আই, ই, মহোদয়ের পরলোক গমনে সমগ্র গন্ধবণিক জাতির পক্ষ হইতে "গন্ধবণিক-মহাসভা," "গন্ধ-বণিক দাতব্য সভা" ও "গন্ধবণিক পত্র" কর্ত্তৃক আহূত সাধারণ সভায় সমবেত স্বজাতিগণ রায় বাহাদুরের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করিতে-ছেন। রায় বাহাদুর উক্ত প্রতিষ্ঠানত্রয়ের কর্ণধার থাকিয়া জাতির লুপ্ত গৌরব উদ্ধার করিবার জন্য যে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছেন এবং সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিকল্পে যেরূপ আদর্শ দেখাইয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার স্বজাতিগণ চিরকৃতজ্ঞ থাকিবেন।

২। রায় বাহাদুরের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি এই সভার আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়া উপরিউক্ত মন্তব্যের প্রতিলিপি তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত অনাথনাথ সাধু মহাশয়কে প্রেরণ করা হউক।

সকলে দণ্ডায়মান হইয়া প্রস্তাব সমর্থন করেন।

শ্রীযুক্ত কানাই লাল দত্ত মহাশয় কর্ত্তৃক সভাপতি মহাশয়কে ধন্য-বাদ জ্ঞাপন করা হয়।

অতঃপর সভাভঙ্গ হয়।

রায় বাহাদুরের মৃত্যু উপলক্ষ্যে তদানীন্তন চিফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট অনারেবল মিঃ এস, কে সিংহের সভাপতিত্বে এক শোক সভা হইয়াছিল। সভায় রায় বাহাদুর পি, জি মুখোপাধ্যায়, মিঃ কে, সি, গুপ্ত, গবর্ণমেণ্ট কাউন্সিল মিঃ এ, কে, বসু প্রভৃতি শোক প্রকাশ করিয়া বক্তৃতা করেন। ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ সিংহ বলেন—

He was always found to have been entirely an able and capable lawyer conducting his cases very fairly and conscientiously.

Proceeding, the Magistrate said that the late Rai Bahadur had to pass critical times during the years of anxiety and trouble in the political atmosphere of the country and he used to conduct political cases with undaunted courage and with extreme fairness and impartiality.

He had, continued the Magistrate unique literary achievements and he presented the Magistrate with his writings. The deceased was a nice gentleman and a

capable lawyer. In his death, the Magistrate felt a personal sorrow.

Concluding the Magistrate said they should perpetuate his memory in the precints of the Court and suggested to the members of the Police Court Bar to form a committee for the purpose.

"Government have lost in him a trusted servant and we an amiable and trusted friend. I hope you would send my deep concern to the members of the bereaved family,"

রায় বাহাদুর তারকনাথ যেমন অসামান্য মেধাবী ছিলেন, নিজে যেরূপ অক্লান্ত চেষ্টা ও পরিশ্রমের দ্বারা সকলকে আশ্চার্য্যন্বিত করিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পরও তেমনি পঞ্চদশাহ অশৌচ পালিত হইয়া তাঁহাকে অমর করিয়া তুলিল। তিনি চিরকালই বৈশ্য বলিয়া নিজের পরিচয় দিতেন এবং বৈশ্যোচিত সকল কর্ম্মই করিতেন এবং ফলে যাহাতে গন্ধবণিক জাতি মাত্রেই পঞ্চদশাহ পালন করেন, ইহাই তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। একটী উদাহরণই ইহার পক্ষে যথেষ্ট হইবে। শ্রদ্ধেয় ৺অবিনাশ বাবু যখন মারা যান, রায় বাহাদুর তখন খুব কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া উত্থানশক্তি রহিত। এরূপ সময় তাঁহার পুত্র তাঁহাকে জানাইল যে বাঁকুড়ায় অবিনাশ বাবুর পুত্রের পঞ্চদশাহ অশৌচ পালনের কথা বলায় তথায় ভীষণ গণ্ডগোলের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহা শুনিয়া রায় বাহাদুর তাঁহার পুত্র জলধিকে বলিলেন "তুমি নিজে বাঁকুড়ায় যাইয়া যাহাতে সেখানে পঞ্চদশাহ অশৌচ পালন করা হয়, তাহার চেষ্টা কর এবং এটী হওয়া চাই।" পুত্র জলধির এরূপ অবস্থা যে পিতাকে ছাড়িয়া কোথাও বাহির হইবার উপায় নাই। এমন কি তাঁহার কোর্টে বাহির

হওয়াও বন্ধ। সুতরাং জলধি তো পিতাকে ছাড়িয়া যাইতে একেবারেই নারাজ। কিন্তু পিতা তারকনাথ বলিলেন, "তুমি আমার জন্য ভাবিও না। যেখানে উদ্দেশ্য সৎ, সেখানে কখনও ভগবান কুফল দেন না। আমার কিছু হইবে না তুমি শীঘ্র বাঁকুড়ায় চলিয়া যাও।" পুত্রকে বাধ্য হইয়া বাঁকুড়ায় যাইতে হইল এবং তথায় অবিনাশ বাবুর শ্রাদ্ধকার্য্য শেষ করিয়া তবে ফিরিতে হইল। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে পঞ্চদশাহ অশৌচ পালন বা বৈশ্যোচিত আচার ধর্ম্ম পালনে স্বর্গীয় তারকনাথের কিরূপ আগ্রহ ছিল এবং বলিতে এই দুঃখের মাঝেও আনন্দ হয় যে, তারকনাথের মৃত্যুর পর তাঁহার উপযুক্ত পুত্রগণ পিতার আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী পঞ্চদশাহ অশৌচ পালন করেন। ইহাই কলিকাতায় সর্ব্বপ্রথম পঞ্চদশাহ অশৌচ পালন।

রায় বাহাদুরের চারিটি পুত্র শ্রীমান অনাথ নাথ, শ্রীমান জলধিনাথ, শ্রীমান অমিয় নাথ ও শ্রীমান মিহিরনাথ সাধু। অনাথনাথ National Insurence Companyর Special Agent ও বঙ্গোদয় Cotton Millএর একজন উদ্যোক্তা। জলধি বাবু এডভোকেট ও তদীয় পিতৃদেব প্রতিষ্ঠিত "গন্ধবণিক সমাজ" পত্রিকার সম্পাদক। অমিয় বাবু ও এড্ভোকেট এবং National Insurenceএর কেশিয়ার এবং মিহির বাবু Aryasthan Insurence কোম্পানীর Special Agent.

রায় বাহাদুরের দুই কন্যা; জ্যেষ্ঠ কন্যা বিধবা; তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল হাইকোর্টের উকিল বিভূতিভূষণ সাহার সহিত, কনিষ্ঠ কন্যার বিবাহ হইয়াছিল, সাবডেপুটী কলেক্টর শ্রীযুক্ত সুশীল কুমার সাহার সহিত, কন্যাটী এক্ষণে মৃতা।

রায় বাহাদুরের মৃত্যুতে সত্যই বঙ্গদেশের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। তিনি আরও কিছু দিন বাঁচিয়া থাকিলে বঙ্গ সাহিত্যের ভাণ্ডারে বহু অমূল্য সম্পদ দান করিতে পারিতেন। যতদিন বাঙ্গালা সাহিত্য থাকিবে

ততদিন তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। তাঁহার মাতৃপিতৃ-ভক্তি সকলের আদর্শস্থানীয় হওয়া কর্ত্তব্য। তাঁহার ন্যায় কয়জনে এ সংসারে দারিদ্র্যের নিম্নস্তর হইতে উন্নতির চরম সোপানে উপনীত হইয়াছেন? তিনি যে শুধু লেখক ছিলেন তাহা নহে, একজন উচ্চ দরের বাগ্মীও ছিলেন। পুলিশকোর্টে তাঁহার সওয়াল জবাব ও বাগ্মিতা শুনিবার জন্য বহু লোক সমবেত হইত। নূতন উকিলেরা তাঁহার সওয়াল জবাবের সময় উপস্থিত হইয়া মোকদ্দমা পরিচালনা প্রণালী শিক্ষা করিতেন। বড় বড় ইংরাজ ব্যারিষ্টারও তাঁহার ইংরাজী শব্দের উচ্চারণ ভঙ্গী, অপূর্ব্ব বাক্য-বিন্যাস ও ইংরাজীসাহিত্যে পাণ্ডিত্য দর্শনে বিমোহিত হইতেন। তিনি দেবদ্বিজ, বৈষ্ণব প্রভৃতির পরম ভক্ত ছিলেন। সুখের বিষয় তাঁহার পুত্রেরা সকলেই পিতার যাবতীয় সদ্‌গুণের অধিকারী হইয়াছেন। ভগবান তাঁহাদিগকে নীরোগ ও দীর্ঘায়ু করুন।

স্বর্গীয় নীলকমল মুখোপাধ্যায়

স্বর্গীয় নীলকমল মুখোপাধ্যায় মহাশয় বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার অজয় তীরবর্ত্তী পুরুলিয়া গ্রামে ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ভরদ্বাজ গোত্রীয় উচ্চ শ্রেণীর কুলীন বংশ-সম্ভূত। নীলকমল মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রথমে কৃষ্ণনগর কলেজে, তৎপরে কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হন। তিনি গবর্ণমেণ্ট বৃত্তি লাভ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে তিনি কলেজ পরিত্যাগ করেন। তিনি স্বর্গীয় দ্বারকানাথ ঠাকুরের পৌত্রীকে বিবাহ করেন।

তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা মুসলমান নবাবদের অধীনে কাজ করিতেন এবং সে সময় তাঁহারা ধনী বলিয়া বিবেচিত ছিলেন। তাঁহার পিতামহ ৺রাজবল্লভ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে নীল ও রেশম সরবরাহ করিবার প্রধান কণ্ট্রাক্টর ছিলেন এবং এই দুই ব্যবসায় কোম্পানীর এক চেটিয়া ছিল। রাজবল্লভের ৯।১০টি রেশমের কারখানা ও অনেক নীল কুঠী ছিল। ইহা ছাড়া তাঁহার জমিদারীও ছিল। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী নীল ও রেশমের এক চেটিয়া ব্যবসায় পরিত্যাগ করিলে রাজবল্লভ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বহু টাকা ক্ষতিগ্রস্ত হন। কলিকাতা বাঁশতলা ষ্ট্রীটে তাঁহার সওদাগরী ও এজেণ্টগিরি ব্যবসা ছিল। সেই সময় তিনি গবর্ণমেণ্ট লটারীতে এক বৎসর এক লক্ষ টাকা পাইয়াছিলেন।

নীলকমল বাবুর পিতা নীলমাধব মুখোপাধ্যায় মহাশয় হিন্দু কলেজে শিক্ষা করেন। তখন হিন্দু কলেজ ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কলেজ ছিল।

তিনি পাঠ সমাপ্ত করিবার পর গবর্ণমেণ্টের শাসন বিভাগে প্রবেশ করেন, তখন লর্ড বেন্টিঙ্ক কেবলমাত্র শাসন বিভাগ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তিনি ৪০ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। নীলকমল বাবু হিন্দুস্থান ব্যাঙ্কিং ফার্ম্মে প্রবেশ করেন এবং হাইকোর্টের একজন এটর্ণীর আর্টিকেল্ড ক্লার্ক হন। কিন্তু পিতার মৃত্যু হওয়ায় পরে তিনি ব্যাঙ্ক অব হিন্দুস্থানে (চায়না জাপান লিমিটেড) প্রবেশ করেন। কয়েক বৎসরের মধ্যে তিনি ব্যাঙ্কের প্রথম সহকারী বা দেওয়ান হন। চাকুরীতে বীতশ্রদ্ধ হইয়া তিনি ব্যবসা করিবার জন্য পাবনায় যান এবং তথায় দ্বারকানাথ ঠাকুরের জমিদারীর ম্যানেজিং ট্রাষ্টিগিরি লইতে বাধ্য হন। পরে তিনি কলিকাতার মেসার্স গ্রেহাম এণ্ড কোং'র কার্য্যে প্রবেশ করেন। গ্রেহাম কোম্পানীতে মুচ্ছুদ্দী হইয়া প্রবেশ করিয়া শান্তিপুর কৃষ্ণনগরে তাঁত লইয়া আসিয়া প্রথমে বিলাতে সেই তাঁত প্রেরণ করেন। বিলাত হইতে সেই তাঁতের দ্বারা কাপড় তৈয়ারী হইয়া আসিত। তিনি কেরোসিন তৈলেরও চীফ এজেন্সী লয়েন। এই উপলক্ষে তিনি বহু বেকার লোককে এজেন্সী দিয়া অন্নের সংস্থান করিয়া দিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া তিনি চিনির মুচ্ছুদ্দি ছিলেন। তাহাতেও অনেক বেকার লোকের সংস্থান হইয়াছিল। তাঁহার কারবার বাঙ্গালা, দিল্লী, আসাম, যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতি স্থানে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। ঐ সমস্ত স্থানে তিনি বহু লোককে চাকুরী দিয়া প্রতিপালন করিয়াছিলেন। তাঁহার দুইটি পৌত্র ছিল; স্বর্গীয় নরনাথ মুখোপাধ্যায় ও নীলানাথ মুখোপাধ্যায়। নরনাথ বাবু ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। নীলকমল বাবুর পরলোক গমনের পর তিনি (নরনাথ বাবু) তাঁহার কার্য্য চালাইয়াছিলেন এবং তিনি পেট্রোলেরও উক্ত গ্রেহাম কোম্পানীর মুচ্ছুদ্দি হন। নরনাথ বাবুর পুত্রের নাম শ্রীযুক্ত নরেশনাথ মুখোপাধ্যায়, ইনিও পৈতৃক কারবার চালাইয়া আসিতেছেন।

কাউন্সিলার

শ্রীযুক্ত নরেশনাথ মুখোপাধ্যায় এম্‌এল্‌ এ

কর্পোরেশনের নির্ব্বাচিত কাউন্সিলার শ্রীযুক্ত নরেশনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় একজন ব্যবসায়ী, জমিদার, জাহাজের কণ্ট্রাক্টর ও ষ্টিভেডর।

নরেশ বাবু—১৯০১ সালের ২৩ শে মার্চ্চ জন্মগ্রহণ করেন। কৃতিত্বের সহিত এণ্ট্রান্‌স ও এফ্‌ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি বি-এ পাশ করেন।

১৯২২ সালে মেসার্স গ্রেহাম এণ্ড কোংর অফিসে লৌহ ও ইস্পাতের বেনিয়ান স্বরূপে তিনি প্রথমে কর্ম্মজীবন আরম্ভ করেন। ১৯২৬ সালে তিনি মেসার্স গ্লাডষ্টোন উইলি এণ্ড কোংর লৌহাদির বেনিয়ান হন। ১৯৩০ সালে তিনি মেসার্স ডরম্যান লং এণ্ড কোংর বাঙ্গালা, বেহার উড়িষ্যা ও আসামের জন্য সোল ডিষ্ট্রিবিউটর হন। ইনি মেসার্স টার্ণার মরিসন এণ্ড কোং, মেসার্স গ্রেহাম্‌ ট্রেডিং কোং, মেসার্স জেম্‌স্‌ ফিণ্ডলে এণ্ড কোং ও মেসার্স গ্লাডষ্টোন উইলি এণ্ড কোংর কণ্ট্রাক্টর ও ষ্টিভেডর।

১৯২৩ সালে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ইনি ট্যারিফ বোর্ডের সমক্ষে Indian galvanised sheet merchant দের পক্ষ হইতে সাক্ষ্য দিবার জন্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ট্যারিফ বোর্ড নরেশ বাবুর প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং ইস্পাতের উপর বহু পরিমিত শুল্ক হ্রাস করেন; তাহার ফলে বাঙ্গালার দরিদ্র রায়তদের বিশেষ উপকার হয়।

সম্রাটের রজত জুবিলি উৎসবের একটি সাবকমিটির তিনি সেক্রেটারী ও উদ্যোক্তা ছিলেন। তাঁহার কার্য্যগুণে তাঁহাকে একটি জুবিলি পদক পুরস্কার দেওয়া হইয়াছিল।

ইনি ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্সের সাব কমিটির মেম্বর, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সদস্য, মহাবোধি সোসাইটি, রামকৃষ্ণ ষ্টুডেণ্ট্‌স্ হোম, বাঙ্গালার যক্ষ্মা সমিতি, সেণ্ট্ জন এম্বুলেনস্ এসোসিয়েসন, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও অন্যান্য অনেক প্রতিষ্ঠানের সদস্য।

কলিকাতা কর্পোরেশনের ১৯৩৬ সালের সাধারণ নির্ব্বাচনে তিনি কর্পোরেশনের সদস্য নির্ব্বাচিত হন। ইনি জলসরবরাহ ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটির ১৯৩৬-৩৭ সালের জন্য সদস্য ; ১৯৩৬-৩৭ সালের জন্য পাবলিক ইউটিলিটি ও মার্কেট ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটির সদস্য। ক্যাম্বেল হাসপাতালের পরিদর্শক কমিটিতে কর্পোরেশনের প্রতিনিধি, চিত্তরঞ্জন হাসপাতালের ও জাতীয় আয়ুর্ব্বিজ্ঞান পরিষদের কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটির সদস্য। ইহা ছাড়া ন্যাশনাল ইনফারমারি (দুরারোগ্য ব্যাধিক্লিষ্ট ভিক্ষুকদের জন্য হাসপাতাল) ও গোবরার আলবার্ট ভিক্টর হাসপাতালের ১৯৩৭-৩৮ সালের জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটির সদস্য।

কলিকাতা ২৯ নং বেনিয়াপুকুর রোডে প্রাসাদোপম বাড়ীতে তিনি বাস করেন।

ইনি কংগ্রেসের পক্ষ হইতে বেঙ্গল লেজেস্‌লেটীভ কাউন্সিলের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। নরেশ বাবুর একমাত্র পুত্র নীরেশনাথ St. Xavier Collegeএ Senior Cambridge পড়িতেছেন।

নীলকমল মুখোপাধ্যায়
নীরদনাথ
নরনাথ
নীলানাথ
নরেশনাথ
নীলেশনাথ
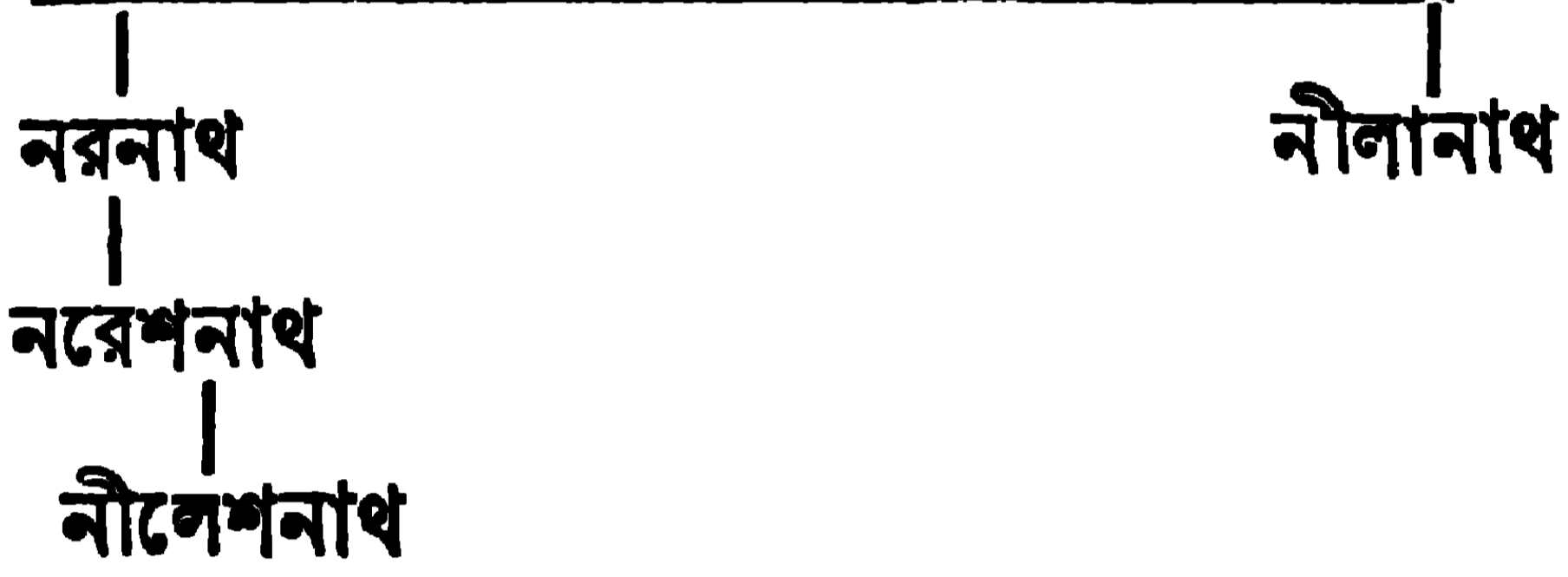
শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র মিত্র

ইনি হুগলী জেলার অন্তর্গত সুপ্রসিদ্ধ কলাছড়ার মিত্র বংশোদ্ভব। এই বংশের আদিপুরুষ কলাধর মিত্র মুর্শিদাবাদে নবাব সরকারে কর্ম্ম করিতেন। তাঁহার সাধুতা ও কার্য্যদক্ষতার জন্য নবাব তাঁহাকে খলসিনি নামক গঙ্গাতীরস্থ গ্রাম জাইগীর প্রদান করেন। তিনি খলসিনিতে গিয়া গঙ্গার ঘাটে বসিয়া আছেন, এমন সময় গঙ্গাস্নানার্থী ব্রাহ্মণগণের কথোপকথন শুনিয়া তিনি ঐ জায়গীর লইতে অস্বীকৃত হইলেন। ব্রাহ্মণেরা বলিতেছিলেন—"কে একজন মিত্র জাইগীর পাইয়াছে, তিনি আমাদের সহিত অসদ্ব্যবহার করিবেন।"

ব্রাহ্মণগণের এইরূপ কথোপকথন শুনিয়া তিনি নবাবকে গিয়া বলেন যে, তাঁহাকে যেন খলসিনির পরিবর্ত্তে কৈশিকী নদীর তীরে বিজন স্থান জাইগীর স্বরূপ প্রদান করা হয়। নবাব তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করেন। সেই কৈশিকী নদীর দক্ষিণতীরে নিজের বাসভবন ও উহার উত্তর তীরে পুরোহিতের বাসভবন নির্ম্মাণ করেন। কৈশিকী নদী সরস্বতী নদীর একটি উপনদী, উহা এক্ষণে মজিয়া গিয়াছে। যেস্থানে পূর্ব্বে খরস্রোত প্রবাহিত হইত, তাহা এক্ষণে পুষ্করিণী ও বাগানে পরিণত হইয়াছে।

সরস্বতী নদী হইতে পূর্ব্ব দিকে পুষ্করিণী শ্রেণী ও খাল দেখিয়া এক সময়ে উহা যে নদী ছিল, তাহা উপলব্ধি করিতে পারা যায়। তাঁহার বংশীয় বেণী মিত্র, বাণেশ্বর মিত্র ও শ্রীকৃষ্ণ মিত্রের নাম অবলম্বনে বেণীপুর, বাণেশ্বর পুর ও শ্রীকৃষ্ণপুরের নামকরণ হইয়াছে। এই বংশের রামহরি মিত্র, তারিণীচরণ মিত্র, রামবল্লভ মিত্র সম্মানসূচক সরকারী চাকুরী করিতেন। তাঁহারা অনেক বড় বড় পুষ্করিণী খনন ও দেবালয়

এবং শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। এই বংশের মিত্র জগবাসপুর, আগুনসি, কোনা, বাক্‌সা, পাঁতিহাল প্রভৃতি স্থানে গিয়া বাস করিয়া মিত্র বংশের বিস্তৃতি সাধন করিয়াছিলেন। এই বংশীয় উপেন্দ্র নাথ মিত্র কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হইতে এম্ বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা কর্পোরেশনে কর্ম্ম করিতেন। তিনি গ্রামের উন্নতির জন্য সচেষ্ট ছিলেন।

এই প্রসিদ্ধ কলাছড়ার মিত্র বংশের বর্ত্তমান বংশধরের নাম শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র মিত্র। সতীশ বাবুর পিতার নাম বৈদ্যনাথ, পিতামহের নাম রাম চাঁদ এবং প্রপিতামহের নাম রামদেব, অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহের নাম হরে কৃষ্ণ। সতীশ বাবুর পিতামহ রাম চাঁদ বাবু নিমকমহলে কর্ম্ম করিতেন। বৈদ্যনাথ বাবু কলিকাতায় আইসেন, ইনি Ewing & coর বড়বাবু ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র মিত্র। সতীশ বাবু ১৮৬৮ সালে অক্টোবর মাসে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি হিন্দু স্কুলে অধ্যয়ন করেন। স্বর্গীয় কুমার মন্মথনাথ মিত্র, স্বর্গীয় রমানাথ ঘোষ তাঁহার সহপাঠী ছিলেন। সতীশ বাবু Ewing Coতে তাঁহার পিতার সহকারী ছিলেন, পরে Balmer Lawrie কোংর দালাল হন। এক্ষণে উক্ত কোম্পানীর তিনি মুৎসুদ্দী। তিনি Octavious Steel কোম্পানীর সহিতও সংশ্লিষ্ট আছেন। সতীশ বাবু Bengal National Chamber of Commerceএর ভূত পূর্ব্ব সহকারী সভাপতি। এতদ্ব্যতীত জালান মিত্র কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী। কলিকাতা ক্লাবের ও ব্রিটীশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়সনের কার্য্যকরী সমিতির সদস্য। তিনি বহু সৎকার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন। ইনি প্রায় দুই বৎসর হইল কলিকাতার অনারারি প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট্ পদ গ্রহণ করিয়াছেন। অভাবগ্রস্ত দীন দরিদ্র লোককে তিনি গোপনে সাহায্য করেন। তাঁহার দক্ষিণ হস্ত যাহা দান করে, তাহা তাঁহার বামহস্ত জানিতে

পারে না। তাঁহার একমাত্র পুত্র প্রভাস তাঁহার সহকারী। তাঁহার পৌত্র বলেন্দ্র পিতামহের নিকট কার্য্য শিক্ষা করিতেছেন। নিম্নে ইঁহাদের বংশ-তালিকা প্রদত্ত হইল :—

হুগলী জেলার কলাছড়ার মিত্র বংশ
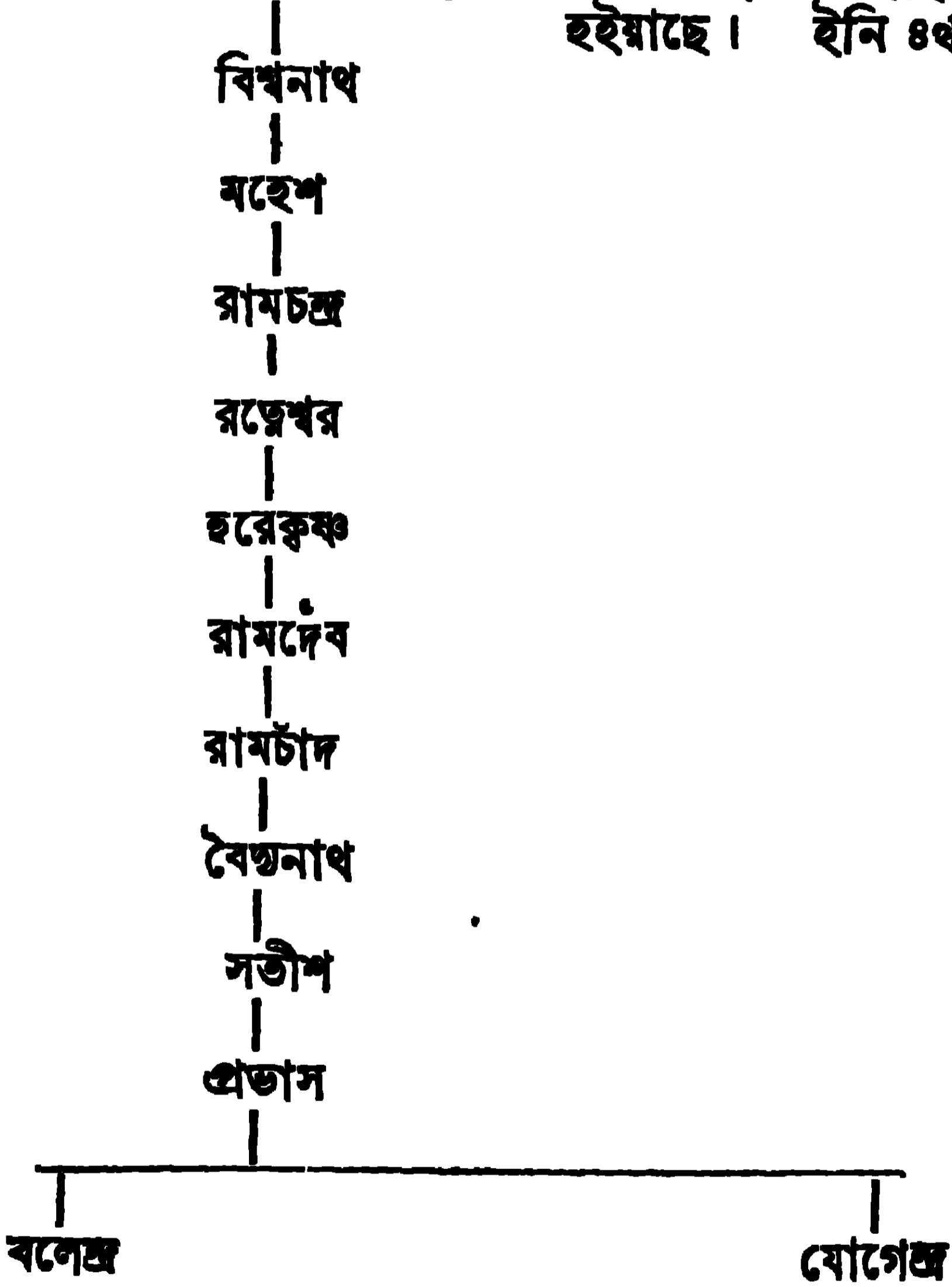
স্বর্গীয় অধ্যক্ষ ললিতকুমার ঘোষ

স্বর্গীয় অধ্যক্ষ ললিতকুমার ঘোষ

বরিশাল জেলার অন্তর্গত সুন্দর গ্রামে ১২৮৮ সালের ১৩ই পৌষ বৃহস্পতিবার কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে অধ্যক্ষ ললিতকুমার ঘোষ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় মহেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় অত্যন্ত তেজস্বী পুরুষ ছিলেন; কিন্তু তাঁহার আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না। ইঁহারা ভাৎসলার বিখ্যাত কুলীন ঘোষ-বংশেরই বংশধর। কিন্তু মাতুল-বিত্ত পাইয়া দীর্ঘদিন এই গ্রামে অকুলীন-স্থানে বাস হেতু ইহাদের কৌলীন্য-মর্য্যাদা ভঙ্গ হয়। পিতার ৭টী সন্তানের মধ্যে ইনি সর্ব্বকনিষ্ঠ। ইঁহারা ৩ ভাই ও ৪ ভগিনী ছিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এত বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন যে, ললিতবাবু চিরদিন তাঁহাকে পিতার ন্যায় ভয় ও ভক্তি করিয়া আসিয়াছেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ৺গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ মহাশয় অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছিলেন; কিন্তু আর্থিক অনাটনের জন্য ইংরাজি বিদ্যা শিক্ষা করিতে পারেন নাই। ইনি অতি অল্প বয়স হইতেই চাকুরী করিয়া পরিবার প্রতিপালন করিতেন। ইনি স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয়ের এষ্টেটে কাজ করিতেন। চন্দ্রমাধব ঘোষের দুষ্ট প্রজারা অনেকবার ইঁহার প্রাণনাশের চেষ্টা করিয়াছিল এবং একবার গৃহে অগ্নিসংযোগ করিয়া সর্ব্বস্ব ধ্বংস করিয়াছিল। অনেক কষ্টে সকলের প্রাণরক্ষা হইয়াছিল। উদারহৃদয় চন্দ্রমাধব ঘোষ ক্ষতিপূরণস্বরূপ তাঁহাকে পুনরায় গৃহ-নির্ম্মাণের জন্য অর্থ প্রদান করিয়াছিলেন। ইঁহার প্রথম পুত্রটি কৈশোরেই মারা যায়। তিনটি কন্যার একটি বিবাহের অল্প পরেই একটি কন্যা-সন্তান রাখিয়া মারা যায়। সেই কন্যাটিকেও মাতামহ প্রতিপালন করিয়া পরে কনিষ্ঠ ভ্রাতার সাহায্যে উপযুক্ত পাত্রে অর্পণ করেন। অন্য

স্বর্গীয় অধ্যক্ষ ললিতকুমার ঘোষ

বরিশাল জেলার অন্তর্গত সুন্দর গ্রামে ১২৮৮ সালের ১৩ই পৌষ বৃহস্পতিবার কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে অধ্যক্ষ ললিতকুমার ঘোষ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় মহেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় অত্যন্ত তেজস্বী পুরুষ ছিলেন; কিন্তু তাঁহার আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না। ইঁহারা ভাৎসলার বিখ্যাত কুলীন ঘোষ-বংশেরই বংশধর। কিন্তু মাতুল-বিত্ত পাইয়া দীর্ঘদিন এই গ্রামে অকুলীন-স্থানে বাস হেতু ইঁহাদের কৌলীন্য-মর্য্যাদা ভঙ্গ হয়। পিতার ৭টী সন্তানের মধ্যে ইনি সর্ব্বকনিষ্ঠ। ইঁহারা ৩ ভাই ও ৪ ভগিনী ছিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এত বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন যে, ললিতবাবু চিরদিন তাঁহাকে পিতার ন্যায় ভয় ও ভক্তি করিয়া আসিয়াছেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ৺গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ মহাশয় অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছিলেন; কিন্তু আর্থিক অনাটনের জন্য ইংরাজি বিদ্যা শিক্ষা করিতে পারেন নাই। ইনি অতি অল্প বয়স হইতেই চাকুরী করিয়া পরিবার প্রতিপালন করিতেন। ইনি স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয়ের এষ্টেটে কাজ করিতেন। চন্দ্রমাধব ঘোষের দুষ্ট প্রজারা অনেকবার ইঁহার প্রাণনাশের চেষ্টা করিয়াছিল এবং একবার গৃহে অগ্নিসংযোগ করিয়া সর্ব্বস্ব ধ্বংস করিয়াছিল। অনেক কষ্টে সকলের প্রাণরক্ষা হইয়াছিল। উদারহৃদয় চন্দ্রমাধব ঘোষ ক্ষতিপূরণস্বরূপ তাঁহাকে পুনরায় গৃহ-নির্ম্মাণের জন্য অর্থ প্রদান করিয়াছিলেন। ইঁহার প্রথম পুত্রটি কৈশোরেই মারা যায়। তিনটি কন্যার একটি বিবাহের অল্প পরেই একটি কন্যা-সন্তান রাখিয়া মারা যায়। সেই কন্যাটিকেও মাতামহ প্রতিপালন করিয়া পরে কনিষ্ঠ ভ্রাতার সাহায্যে উপযুক্ত পাত্রে অর্পণ করেন। অন্য

২টি কন্যাও সৎপাত্রে অর্পণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ২টি কন্যাই সন্তানহীনা, এখন বিধবা অবস্থায় জীবিতা আছেন। গোবিন্দবাবুর-সর্ব্বপ্রথম পুত্র ও এই সর্ব্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা সমবয়সী ছিলেন। পুত্রের অকাল মৃত্যুতে ইঁহারা স্বামী স্ত্রী এই ভাইকে পুত্র-নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিয়া ছিলেন। ভাইও চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকিয়া পিতার ন্যায় ভক্তি করিয়া ইঁহাদের ভরণপোষণের ভার বহন করিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগে এরূপ কর্ত্তব্যপরায়ণতা ও ভ্রাতৃবাৎসল্য বিরল। ৺গোবিন্দবাবুর পত্নী অত্যন্ত সাধ্বী ছিলেন। ৮ বৎসর বয়সে বিবাহের পর স্বামি-গৃহে আসিয়াছিলেন আর কখনও স্বামীকে ছাড়িয়া পিতৃগৃহে যাইয়া রাত্রি যাপন করেন নাই। ইঁহাদের মৃত্যুও অতীব আশ্চর্য্য। পরিণত বয়সে ৺ গোবিন্দবাবুর পত্নী বাতবিসর্প-রোগে ভুগিয়াছিলেন। ললিত-বাবু সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। ৺ গোবিন্দবাবু বেশ সুস্থই ছিলেন। হঠাৎ ১৯২২ সালের অগ্রহায়ণ মাসের একদিন হাট হইতে আসিয়া ইনি জ্বরবিকারে আক্রান্ত হন। ২দিন অজ্ঞান থাকিয়া তৃতীয় দিনে সন্ধ্যার সময় তিনি দেহত্যাগ করেন। পত্নীও অত্যন্ত পীড়িত, কিছুই জানিতে পারিলেন না। গ্রামে প্রত্যেকের নিজেদের বাড়ীতেই সৎকার হয়। সৎকারের সব বন্দোবস্ত করিয়া গৃহে আসিয়া আত্মীয়গণ দেখিল, পত্নীও প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। চিরসাথী স্বামীর সহিত একই চিতায় সাধ্বী পত্নীর শবদেহ ভস্মীভূত হইল। ধর্ম্মজীবনের সাধনায় এরূপ কাম্য মৃত্যু লাভ করা যায়।

দ্বিতীয় ভ্রাতা ৺রাজকুমার ঘোষ মহাশয় গ্রাম্য স্কুলের পণ্ডিত ছিলেন, তিনি একজন সুদক্ষ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারও ছিলেন। তাঁহার খুব হাতযশ ছিল। ১৯২১ সালের অগ্রহায়ণ মাসে একদিন আহার করিতে বসিয়া হঠাৎ পেটে তীব্র বেদনা উঠিয়া দু'দিন মাত্র কষ্টভোগ করিয়া ৫৬ বৎসর বয়সে সজ্ঞানে ইনি মারা যান। ইঁহার ৩

পুত্র ও ৩ কন্যা। জ্যেষ্ঠ শ্রীকুমুদবিহারী ঘোষকে ললিতবাবু শিশুকাল হইতে নিজের কাছে রাখিয়া পুত্র-নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। তিনি ৺ কুঞ্জবিহারী গুহ ঠাকুরতা মহাশয়ের মধ্যমা কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন। সম্প্রতি পাটনাতেই T. K. Ghosh Academyতে শিক্ষকতা করিতেছেন। দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান সুবোধকুমার ঘোষকেও ললিতবাবুই প্রতিপালন করিয়াছিলেন, সে এখন পাটনাতেই তাঁহার পরিবারেই আছে। কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান সুধীরকুমার ঘোষ দোকান করিয়া দেশেই অবস্থান করিতেছে।

ললিতবাবু শিশুকাল হইতেই অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও মেধাবী ছিলেন। তাহার বহুমুখী প্রতিভা ছিল। যে কোন কাজ ২।১ বার দেখিলেই তিনি তাহা শিখিতে পারিতেন। অঙ্কশাস্ত্রে শিশুকাল হইতেই তাঁহার গভীর অনুরাগ ও অসাধারণ জ্ঞান ছিল। তাঁহার গভীর মনঃসংযোগতা ছিল। যে কোন কাজ যখন করিতেন তাহাতেই এরূপ অভিনিবিষ্ট হইতেন যে, বাহ্যজগৎ ভুলিয়া যাইতেন। তাঁহার পিতা একদিন মাত্র দেখাইয়া দেওয়াতে একদিনেই বর্ণপরিচয় লিখিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। স্কুলেও সর্ব্ববিষয়ে প্রধান ছাত্র ছিলেন। একদিন স্কুল-পরিদর্শক (Inspector) স্কুল-পরিদর্শনে আসিয়া একটি অঙ্ক কষিতে দেন। ক্লাসে কেহই সে অঙ্ক জানিত না, এমন কি স্বল্প-বিদ্বান পণ্ডিতেরও তাহা বোধগম্য ছিল না; কিন্তু এই অসাধারণ মেধাবী বালক সেই অঙ্ক শুদ্ধভাবে কষিয়া সেদিন স্কুলের ও পণ্ডিতের সুনাম রক্ষা করেন। শৈশবে তিনি বড়ই দুরন্ত ছিলেন। প্রত্যেকটি বিষয় জানিতে, শিখিতে ও নিজের হাতে করিবার একান্ত আগ্রহ তাঁহার ছিল। একদিন তাঁহার পিতা ঘর তৈরী করিবার জন্য বাঁশের কঞ্চি, কাঠ ইত্যাদি রাখিয়াছিলেন; সেই দুরন্ত বালক ভ্রাতুষ্পুত্রীদের জন্য সেই বাঁশ, কাঠ ইত্যাদি কাটিয়া অতি সুন্দর ঘর তৈরী করিয়া দিয়াছিলেন। পিতা আসিয়া ক্রুদ্ধ হওয়াতে শাস্তির ভয়ে সমস্ত

গাছের উপর লুকাইয়াছিলেন। রাত্রি গভীর হইলে ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া বিনিদ্রিতা মাতার গৃহের দ্বারে চুপে চুপে আসিয়া উপস্থিত হন, মা দুরন্ত ছোট পুত্রকে কোলে তুলিয়া লইয়া খাওয়াইয়া ঘুম পাড়াইয়া রাখেন, কিন্তু পুনরায় প্রভাত হইলে পিতার ভয়ে পলাইয়া যান। এই নিজের হাতে সব জিনিষ করিবার আগ্রহ তাঁহাকে সর্ব্ববিষয়ে উপযুক্ত করিয়াছিল। পরবর্ত্তী জীবনে যখন নিজে পাটনাতে বাড়ী তৈয়ার করেন, তখনও কোন engineerএর সাহায্য না লইয়া নিজে স্ত্রীর সাহায্যে Plan ইত্যাদি সব তৈয়ারী করিয়া নিজ গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ, কিন্তু বিশেষ রাগীও ছিলেন। পিতার সেই রাসভারী ভাব সব পুত্রেই অল্প-বিস্তর বিদ্যমান ছিল। এই দুরন্ত অথচ মেধবী বালককে লইয়া মাকে সর্ব্বদা ভয়ে ভয়ে দিন কাটাইতে হইত। দরিদ্র পিতা পুত্রের এরূপ বুদ্ধি, মনোযোগ ও সুলক্ষণ দেখিয়া তাঁহাকে উচ্চশিক্ষা দিতে মনস্থ করিলেন। পুত্রকে সুশিক্ষা দিবার জন্য অনেক দারিদ্র্য-কষ্ট তিনি সহ্য করিয়াছিলেন। পুত্র যোগ্যতার সহিত এণ্ট্রান্স পাশ করিল। এফ্‌-এ পরীক্ষার সময় পিতার অসুখ হইল। পাছে পুত্রের পরীক্ষার ব্যাঘাত হয়, এইজন্য স্নেহবৎসল পিতা পুত্রকে সংবাদ দিতে দেন নাই। বড় স্নেহের পুত্রের সহিত আর শেষ দেখা হইল না! পিতার কর্ত্তব্য পালন করিয়া তিনি অমরধামে চলিয়া গেলেন। তাঁহার সেই আশালতা যে একদিন কত বড় মহীরুহে পরিণত হইয়া তাহার যশঃসৌরভে সমগ্র গ্রাম, সকল আত্মীয়-স্বজন ও সমস্ত বিহারবাসী বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিল তাহা দেখিবার সৌভাগ্য তিনি লাভ করিয়া যাইতে পারেন নাই সত্য, কিন্তু তাঁহার ললিত যে একদিন মানুষের মত মানুষ হইবে—এ ধারণা, এ সান্ত্বনা লইয়া তিনি যাইতে পারিয়াছিলেন। এফ্‌-এ পরীক্ষা দিতে দিতে পিতাকে মৃত্যুশয্যায় শয়ান—স্বপ্নে দেখিয়া পরীক্ষান্তে পুত্র ছুটিয়া আসিলেন, পথে একদিন ষ্টীমার চড়ায় আটকাইয়া

রহিল। অতি কষ্টে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর অবস্থায় বাড়ী আসিয়া স্নেহময় পিতাকে আর দেখিতে পান নাই। সেই বেদনা চিরদিন তাঁহাকে কষ্ট দিয়াছে।

গ্রাম্য স্কুল হইতে সম্মানের সঙ্গে ছাত্রবৃত্তি পাশ করিয়া ৯ বৎসর বয়সে, যে বয়সে বালকগণ মায়ের স্নেহাঙ্কে আশ্রয় গ্রহণ করে সেই শিশু বয়সে—তাঁহাকে পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন ত্যাগ করিয়া বরিশালে একটি হোটেলে শিক্ষা লাভের জন্য আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। বড় ভাই অতিকষ্টে ৫৲ টাকা করিয়া পড়ার জন্য পাঠাইতেন। অতি কষ্টে, অতি দারিদ্র্যে পড়াশুনা করিয়া এবং বাংলা স্কুল হইতে ছাত্রবৃত্তি পাশ করিয়া ১৪ বৎসর বয়সে এণ্ট্রাস পাশ করেন। তখন পর্য্যন্ত সেই গ্রামের কোন বালক এণ্ট্রান্স পাশ করে নাই। পুত্রের কৃতিত্বে পিতার সে কি আনন্দ! বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ হইতে ২ বৎসর পরে সসম্মানে এফ্‌-এ পাশ করেন। তিনি স্বাবলম্বী পুরুষ ছিলেন। নিজের চেষ্টা ও অসাধারণ অধ্যবসায়-গুণেই এরূপ প্রতিকূল অবস্থায়ও বিদ্যাশিক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এফ্‌-এ পরীক্ষার পরই পিতৃ-বিয়োগ হওয়াতে মনে বড়ই আঘাত পান। এই সময় দেশের বাড়ীতে তিনি ভীষণ নিউমোনিয়া-রোগে আক্রান্ত হন। জীবনের কোন আশাই ছিল না। কিন্তু যে পুরুষ-সিংহ একদিন দেশের ও দশের মুখ উজ্জ্বল করিবেন তাঁহার জীবনের এত শীঘ্র অবসান ভগবানের অভিপ্রেত ছিল না, তাই ভগবৎ-প্রসাদে তাঁহার জীবন রক্ষা পায়।

১৬ বৎসর বয়সে B. A. পড়িবার জন্য তিনি প্রথম কলিকাতাতে আসেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা স্যর চন্দ্রমাধব ঘোষের বাড়ীতে কাজ করিতেন। চন্দ্রমাধব বাবু এই কিশোর বালকের বিদ্যানুরাগ ও কৃতিত্বে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে নিজের বাড়ীতে থাকিয়া পড়াশুনা করিতে অনুমতি দেন। যখন কলিকাতায় আসিলেন, তখন কিশোর বালকমাত্র। ঐ বয়সে সমস্ত

রাত ট্রেণের কষ্ট ভোগ করিয়া শিয়ালদহ হইতে ভবানীপুর পদব্রজে গমন করিয়া, দ্বিপ্রহরে রৌদ্রে ধূলি-ধূসরিত অবস্থায় ক্ষুৎপিপাসাকাতর বালক চন্দ্রমাধববাবুর বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি Scottish Churches College-এ ভর্ত্তি হন। দারিদ্র্য, পুস্তকাভাব ও নানা অবস্থা-বিপর্য্যয়ের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়াও গণিতশাস্ত্রে Honours লইয়া তিনি B. A. পাশ করেন। এই সময় হইতেই বঙ্গের পুরুষ-সিংহ স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সহিত পরিচিত হন ও তাঁহার বাড়ীতে Private tutor নিযুক্ত হন। দরিদ্রের সন্তান হইলেও পরবর্ত্তী জীবনে এই দুই মহাপুরুষের চরিত্রের প্রভাব তাঁহার জীবনে প্রতিফলিত হইয়াছিল। বড় লোকের সংস্পর্শে প্রতিপালিত হওয়াতে তাঁহার চরিত্রে অর্থের উপর আসক্তি কখনও স্থান পায় নাই। তিনি চিরদিন ব্যয়ে মুক্তহস্ত ছিলেন। আশুবাবুর মত খাইতে ও খাওয়াইতে বিশেষ ভালবাসিতেন। বড়মানুষী কোনরূপ চাল তাঁহার ছিল না বটে, কিন্তু তিনি কখনও যেমন-তেমন ভাবে জীবন কাটাইতে পারিতেন না; একটু আরামপ্রিয় ও ভাল খাওয়া-পরার দিকে দৃষ্টি ছিল। নিয়মানুবর্ত্তিতা ও সৎ-অভ্যাস তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল। তিনি চিরদিন ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যা ত্যাগ করিতেন, এইজন্য জীবনে তাঁহার কখনও কোন কার্য্যে সময়াভাব হয় নাই।

তখন B.A.-পাস যুবক দেশে খুব কমই ছিল, বিশেষতঃ সুন্দরের মত গণ্ডগ্রামে একজনও ছিল না। এই কৃতী যুবকের নাম চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। দীর্ঘ ১৫।২০ বৎসর তিনিই সেই গ্রামের একমাত্র গ্রাজুয়েট ছিলেন। B. A. পাস করার পর কাচাবালিয়ার কুলীন ৺রজনীকান্ত গুহ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত তাহার বিবাহ হয়। রজনীবাবু রাজবাড়ীতে ডাক্তার ছিলেন। পাঠ্যাবস্থায় বিবাহ তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না; কিন্তু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বড়ই সম্মান ও ভয় করিতেন; তাঁহার কথার উপর কোন কথা

বলিতে সাহস করিতেন না। একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিবাহ করিলেন, কিন্তু এজন্য দীর্ঘদিন মনে শান্তি পান নাই এবং চিরদিন এই আক্ষেপ করিতেন যে, এই বিবাহই তাঁহার জীবনে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভুল।

M. A পাশ করিয়া তিনি স্যর আশুতোষ মুখার্জ্জির ছেলেদের পড়াইয়া মাসিক ৫০৲ ও ২টি নেপালী ছেলেকে পড়াইয়া ১০০৲ টাকা—এই ১৫০৲ টাকা উপার্জ্জন করিতেন। ১৯০১ সালে তিনি সম্মানের সহিত M. A. পাশ করেন। বিখ্যাত গণিতজ্ঞ ৺ গৌরীশঙ্কর দের তিনি বিশেষ প্রিয় ছাত্র ছিলেন। সামান্য চেষ্টা করিলেই তিনি Govt-এর শাসন বিভাগে উচ্চপদ প্রাপ্ত হইতে পারিতেন, কিন্তু তখন স্বদেশীর যুগ, সব যুবকই—বিশেষ বরিশালবাসী যুবকেরা অশ্বিনীবাবুর ভাবে অনুপ্রাণিত। যদিও সংসারের অবস্থা তখন অত্যন্ত শোচনীয়, অভাব-রাক্ষস তাহার মুখব্যাদান করিয়া ছুটিয়া আসিতেছিল, তবু এই নির্ভীক যুবক তাঁহার মনের তেজ ও সঙ্কল্প ত্যাগ করেন নাই। দেশাত্মবোধ-সম্পন্ন যুবক তাঁহার উচ্চশির অবনত করিলেন না। আশুবাবু Merchant Office-এ একটি ভাল কাজের জোগাড় করিয়া দেন, সাহেব অত্যন্ত সন্তুষ্টচিত্তে ইঁহাকে কাজে গ্রহণ করেন। ইহাতে যথেষ্ট উন্নতি ছিল। ১০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত মাহিনা হইতে পারিত, কিন্তু এ কাজও বেশীদিন করা পোষায় নাই। সাহেবের সহিত মতদ্বৈধ হওয়াতে এবং তাহার ব্যবহারে নিজকে অপমানিত জ্ঞান করিয়া তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া কার্য্য ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসেন। কাহারও অন্যায় প্রভুত্ব তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। জীবনে তাই সামান্য অবস্থায় তুষ্ট থাকিয়াই চলিয়া গিয়াছেন। নিজের স্বাধীন সত্ত্বা বজায় রাখিতে পারিবেন না বলিয়া কখনও Govt. College-এ পর্য্যন্ত চাকুরীর চেষ্টা করেন নাই। স্বাধীন কাজ ওকালতীই তাঁহার কাম্য ছিল, কিন্তু অভাব-অনটনের জন্য জীবনে তাঁহার সে আশা পূর্ণ হয় নাই। ১৯০৫ সালে পুনরায় ভীষণ নিউমোনিয়াতে তিনি

আক্রান্ত হইলেন। কয়েক দিন অজ্ঞান অবস্থায় কাটিয়া যায়। দেশ হইতে সকলে কলিকাতায় আসিলেন। সেই সময় সেই নেপালী ছাত্র দুইটির যত্ন, অর্থব্যয় ও ঐকান্তিকতাতেই তিনি জীবন ফিরিয়া পাইলেন। সুস্থ হইলে নেপালী ছাত্র দুইটি তাঁহাকে স্বাস্থ্যলাভার্থ তাহাদের দেশ নেপালে লইয়া যায়। সেখানে ২।৩ মাস থাকিয়া তিনি পূর্ণস্বাস্থ্য ফিরিয়া পান। পূর্ব্বে লম্বা ও পাতলা ধরণের ছিলেন। নেপাল হইতে ফিরিয়া পাটনায় চাকুরী গ্রহণ করার পর তাঁহার চেহারার পরিবর্ত্তন হয়। বাড়ীতে অবস্থা তখন অত্যন্ত শোচনীয়, অন্ন জোটা ভার হইয়া উঠিয়াছে; সকলেই পরিবারের একমাত্র আশাস্থল এই যুবকের মুখ চাহিয়া আছেন। তখন আর ভাল-মন্দ বিচার করিবার ক্ষমতা ছিল না। নেপাল হইতে আসিয়াই পাটনা বিহার ন্যাশনাল কলেজের কর্ত্তৃপক্ষের কাছ হইতে এখানকার কলেজের গণিতের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিবার জন্য আমন্ত্রিত হইলেন। B. N College এর কর্ত্তৃপক্ষ তখন কলিকাতায় থাকিতেন এবং তাঁহাদের সঙ্গে পূর্ব্ব হইতে বিশেষ হৃদ্যতা ছিল। সেই বন্ধুতা জীবনে কখনও ভঙ্গ হয় নাই। তাঁহাদের নিয়োগপত্র পাইয়া, আশুবাবুর আশীর্ব্বাদ ও অভিমত গ্রহণ করিয়া, B. N. College এর অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিয়া পাটনা আসিলেন। ১৯০৬ সালের August মাসে তিনি এখানকার কার্য্যভার গ্রহণ করেন। তদবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত তিনি সেই কলেজে সম্মানের সহিত অধ্যাপকের ও অধ্যক্ষের কাজ করিয়া গিয়াছেন। জীবনের একমাত্র লীলাক্ষেত্র—এই কলেজ তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল। সেই বৎসরই দেশ হইতে মাতা ও পত্নীকে পাটনায় আনয়ন করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পাটনায় আসিবার ২।৩ মাস পরেই তাঁহার মাতৃদেবী মৃত্যুমুখে পতিত হন। মাতার মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই ললিতবাবুর মনে হইত, তাঁহার মা আর বাঁচিবেন না, সেইজন্য কলেজ হইতে ছুটী লইয়া মাকে সমস্ত তীর্থ করাইয়া

আনিলেন। যে রাত্রে পাটনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন সেই রাত্রেই দুরন্ত কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়া তাঁহার মাতা পরদিন দ্বিপ্রহরে সজ্ঞানে গঙ্গাতীরে দেহত্যাগ করিলেন। তিনি বড়ই মাতৃবৎসল ছিলেন। পরবর্ত্তী জীবনেও অসুস্থ হইলেই শিশুর মত মা মা করিয়া কাঁদিতেন।

অধ্যাপনা করিতে করিতে ১৯০৮ সনে Law পরীক্ষা দেন এবং সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। ওকালতি করিবার ইচ্ছাই তাঁহার প্রবল ছিল, কিন্তু অভাববশতঃ তাঁহাকে অধ্যাপনা করিয়াই জীবন যাপন করিতে হয়। তাহার যেরূপ সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা ও যেরূপ ধীর বুদ্ধি এবং পাণ্ডিত্য ছিল তাহাতে তিনি ওকালতি করিলে সে ক্ষেত্রেও বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সক্ষম হইতেন।

বিবাহের পর দীর্ঘ দশবৎসর পরে তাঁহার প্রথমা কন্যা জন্মগ্রহণ করে। একটি ৬ বৎসর বয়স্কা কন্যা ও ২ বৎসর বয়সের শিশুপুত্র রাখিয়া ১৯১৬ সালের অগ্রহায়ণ মাসে তাঁহার প্রথমা পত্নী সহসা ৩।৪ ঘণ্টার বেদনাতে প্রাণত্যাগ করেন। বিদেশে দুইটি নাবালক শিশু লইয়া তিনি বিশেষ বিব্রত হইয়া পড়েন। তিনি অত্যন্ত সন্তান-বৎসল ছিলেন, মাতৃহারা পুত্র-কন্যাকে দূরে রাখিয়া একাকী পাটনায় বাস করা তাঁহার পক্ষে বড়ই কষ্টকর হইল। সেইজন্য বাধ্য হইয়া ১৯১৭ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করিলেন। ঢাকার সুযোগ্য উকিল বানরীপাড়ার বিখ্যাত কুলীন-বংশীয় বাবু যোগেন্দ্রনাথ গুহ ঠাকুরতার তৃতীয়া কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ সম্পন্ন হয়। যোগেন্দ্রবাবু পূর্ব্ব-বঙ্গে বিশেষ সুপরিচিত। তাঁহার ৮টি কন্যা ও ২টি পুত্র ছিল। তন্মধ্যে ১ পুত্র ও কনিষ্ঠ ১৬ বৎসর বয়স্কা কন্যা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। তিনি বৃদ্ধ বয়সে উপযুক্ত জামাতা, কন্যা ইত্যাদির বিয়োগে বিশেষ মনোকষ্টে কালযাপন করিতেছেন। তিনি কন্যাদের বিশেষ সুশিক্ষিতা করিয়াছিলেন এবং বিশেষ কৃতী জামাতৃগণকে লাভ করিয়া-

ছেন। ললিতবাবু সুশিক্ষিতা প্রেমময়ী পত্নীর হস্তে সন্তান ২টির ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। তাঁহার পত্নীও অতি যত্নে ও আদরে তাহাদের প্রকৃত মায়ের মত বুকে তুলিয়া লইয়া প্রতিপালন করিয়াছেন। মৃত্যু পর্য্যন্ত তাঁহার জীবনের ও পারিবারিক শান্তি ও আনন্দ কখনও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। ১৯১৬ এবং ১৯১৭ সনে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের পরীক্ষক ছিলেন। ১৯১৭ সালে প্রথম পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। তিনি সেই বৎসরেই উহার নানা বিভাগে সদস্য, পরীক্ষক ও tabulator নিযুক্ত হন। ১৯১৮ সালে সংসার ও পুত্রকন্যা প্রতিপালন করিয়াও তাঁহার সুযোগ্যা পত্নী বিশেষ সম্মানের সহিত প্রথম বিভাগে Matric পাশ করেন। ললিতবাবু চিরদিন সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্ব-কাজে তাঁহার নিত্য সঙ্গিনী-পত্নীর সাহচর্য্য ও সাহায্য লাভ করিয়া গিয়া-ছেন। ১৯১৯ সনে তাঁহাকে Senate এর Fellow নির্ব্বাচিত করা হয়। তদবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত তিনি যোগ্যতার সহিত ঐ পদে নিযুক্ত থাকিয়া কার্য্য করিয়া গিয়াছেন।

১৯২১ সালে তাঁহার অসাধারণ যোগ্যতার জন্য তাঁহাকে Syndicte-এর সদস্য করা হয়। ইহার পূর্ব্বে কোন বে-সরকারী কলেজের অধ্যাপক-কে ঐরূপ বিশিষ্ট পদে নিয়োজিত করা হয় নাই। তিনি মৃত্যু পর্য্যন্ত প্রতিবার ঐ পদে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। এত দীর্ঘ দিন ক্রমান্বয়ে আর কেহই ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত থাকেন নাই এবং মৃত্যুর সময় তিনিই Syn-dicateএর একমাত্র বাঙ্গালী সদস্য ছিলেন। শেষে এরূপ দাঁড়ায় যে, পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক বিভাগের তিনি সদস্য নির্ব্বাচিত হন, সকলে মনে করিতেন বোধ হয় তাঁহাকে ছাড়া University চলিতে পারে না। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়-সংক্রান্ত প্রত্যেক ব্যাপারে তিনি এতদূর অভিজ্ঞ ছিলেন যে, তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে Moving Enclyclopedia আখ্যা দিয়াছিলেন। Patna Universityকে তিনি নিজের হাতে গড়িয়া

তুলিয়াছিলেন। বেহারের শিক্ষার উন্নতির জন্য এবং পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য তিনি সর্ব্বপ্রকার পরিশ্রম করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। যতদিন Patna University থাকিবে ততদিন প্রত্যেক সদস্যের মনে Universityর প্রত্যেক পাতায় পাতায় তাঁহার স্মৃতি ও নাম জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা থাকিবে। তিনি তাঁহার নিজের কলেজেও অধ্যক্ষ হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত Governing Bodyরও সদস্য ছিলেন এবং চিরদিন সুনাম ও যোগ্যতার সহিত তাঁহার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন।

১৯২৬ সালে বহু অর্থব্যয় করিয়া তাঁহার প্রথমা কন্যার উলপুর কুলীন-বংশীয় ৺শ্রীশচন্দ্র বসু রায়ের প্রথম পুত্র শ্রীমান্ সুধীরচন্দ্র বসুর সহিত বিবাহ দেন।

শ্রদ্ধেয় দেবেন্দ্রনাথ সেন ১৯৩৫ সালে Principalএর পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। College Council ললিতবাবুকেই Principal-এর পদের জন্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বিবেচনা করিয়া ১৯৩৫ সালেব ১লা মার্চ্চ তাঁহাকে সেই পদে নিযুক্ত করেন। কলিকাতার এবং স্থানীয় সংবাদপত্র-সমূহও তাঁহাকে Principalএর পদে নিযুক্ত হইতে দেখিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। 'Behār Herald' লিখিয়াছিলেন :—

"We hail with unstinted delight the appointment of Mr. L. K. Ghosh M. A. the Head of the Department of Mathematics and the Seniormost member of the Staff to the Principalship of B. N. College. Mr. Ghosh is one who is in every point worthy of the glorious tradition created by his predecessor. In view of the severe financial stress through which the College is passing it needed most imperatively a Principal of Mr. Ghosh's administrative capacity to stear it clear of all difficulties.

"It will be but superfluous to dialate upon the exceptional merits of Mr. Ghosh as a professor of Mathematics. In view of his commanding personality (for those of his type are generally austere and difficult of approach), it is remarkable how widely popular he is amongst his students. The secret of his popularity lies in his deeply generous and sympathetic nature. If he is loved and respected by his countless pupils he is no less loved and admired by his colleagues for his dignified bearing, his sense of humour and his tolerance and cool judgment. It is a proof of no ordinary eminence and ability that he has been for years a member of the Governing Body of the College, has been representative of the College year after year in the Senate of the University of Patna since the year 1919 and has been returned, term after term, to the University Syndicate ever since his first election to it in 1921. In University circles he is respected as one whose knowledge of University regulations and administrative work is believed to be unsurpassable. His selection is an act which is the outcome of rare foresight, unclouded judgment and a most judicions selection. The appointment to the Principalship of B. N. College of a man of Mr. Ghose's calibre is significant in so far as it is a happy augury for better days for the College." অন্যান্য কাগজও তাঁহার মনোনয়ন এইভাবে সমর্থন করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিল।

তিনি আজীবন ছাত্রদের হিতৈষী ছিলেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রগণের পক্ষ লইয়া সর্ব্বদাই তাঁহাকে সংগ্রাম করিতে হইত। তাই ছাত্রগণের মনে তাঁহার স্মৃতি আজ এত পবিত্র ও প্রিয়।

তিনি "Plane Trigonometry" এবং "Matriculation Mensuration" নামে ২খানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। পুস্তক ২খানির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

তিনি যে সময় কলেজের অধ্যক্ষতা গ্রহণ করেন তখন কলেজের অবস্থা বিশেষ সুবিধাজনক ছিল না। কলেজের ব্যয় অত্যন্ত বেশী হওয়াতে Govt. টাকা দিতে অস্বীকৃত হইলেন (তখন College Govt.-aided হইয়াছে)। ললিতবাবু প্রফেসর ও প্রিন্সিপালের কাজ একাই সম্পন্ন করিয়া Govt-কে অর্থব্যয় কম দেখাইয়া তাঁহাদের সন্তুষ্ট করিয়া সব টাকা আদায় করিয়া, কলেজের আর্থিক সমস্যার সমাধান করিয়া তাহার উন্নতি সাধন করেন। তিনি নিজে বিশেষ স্বার্থত্যাগ করিয়া ও আন্তরিকতা, শৃঙ্খলা ও যত্নের সহিত অতি অল্প সময়ের মধ্যে ইহার সর্ব্ব বিভাগের বিশেষ উন্নতি সাধন করিলেন। দুঃস্থ ছাত্রগণের তিনি একান্ত বন্ধু ছিলেন এবং B. N. Collegeই দরিদ্র ছাত্রদের একমাত্র আশ্রয়স্থল ছিল। তিনি বিশেষ পরিশ্রমে তাহাদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিয়া তাহাদের Free Studentship ও University fees দিবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। কলেজের নানা বিভাগে আরও অনেক উন্নতি করিবার একান্ত বাসনা তাঁহার মনে ছিল, কিন্তু Principal-পদে মাত্র ৮ মাস কার্য্য করিবার পর নিয়তির কঠোর বিধানে সকল বাসনা অপূর্ণ রাখিয়া, অভাগিনী পত্নী ও হতভাগ্য পুত্র-কন্যা, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবর্গ, ছাত্রগণ এবং সমস্ত পাটনাবাসীকে গভীর শোকসাগরে ভাসাইয়া ১৯৩৫ সালের ২৭শে নভেম্বর ১১ই অগ্রহায়ণ মাত্র ৫৩ বৎসর বয়সে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। Ex-

Principal D. N. Sen সত্যই বলিয়াছিলেন, "During the short period of only eight months, the management of the B. N. College appears to have undergone a complete revolution." W. C. Dutta লিখিয়াছেন "By his inimitable courtsey and genial behaviour he endeared himself to all of his friends, Colleagues and pupils. To those of us who had the privilege of being closely associated with him, his untimely death will be looked upon as a great personal loss. He died in harness, and though not full of years, yet full of glories and honours. May the departed soul rest in peace"

মাত্র ৩ দিনের নিউমোনিয়াতে তিনি মারা যান। এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় পাটনাবাসী স্তম্ভিত হইয়া গেল। তিনি স্বাস্থ্যবান, সুগঠিত-তনু, কমনীয়-কান্তি পুরুষ ছিলেন। তাঁহার প্রশস্ত ললাট, সহাস্য বদন, উন্নত নাসিকা, আকর্ণ-বিশ্রান্ত চক্ষু, প্রশস্ত বক্ষ, আজানুলম্বিত বাহু, উন্নত দেহ, প্রভুত্বব্যঞ্জক স্বর গভীর বুদ্ধিমত্তা পৌরুষের ও পরিচয় প্রদান করিত। তিনি যে এমন অকস্মাৎ এ ভাবে চলিয়া যাইতে পারেন—ইহা সকলেরই ধারণাতীত ছিল। শনিবারও কলেজে যাইয়া তিনি দৈনিক কর্ত্তব্য শৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন করিয়াছিলেন। শনিবার কলেজ হইতে আসিয়া জ্বরে আক্রান্ত হন। রবিবার হইতেই সহরের দুই জন বিখ্যাত চিকিৎসক তাঁহার চিকিৎসার ভার গ্রহণ করেন। ২ বৎসর পূর্ব্বেও আর একবার নিউমোনিয়াতে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। উপর্য্যুপরি নিউমোনিয়াতে বোধ হয় ফুসফুস দুর্ব্বল ছিল। সোমবার ডাক্তারেরা নিউমোনিয়া বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন ও তদুপযোগী চিকিৎসা করিতে থাকেন। সোমবার সমস্ত দিনরাত নিদ্রাহীনতা ও রোগ-

সত্ত্বেও D. P. I-কে চিঠি দিলেন, কলেজের Clerk ও

অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে ধীরভাবে কথাবার্ত্তা বলিয়াছিলেন। মঙ্গলবার বেশ ভালই ছিলেন। সন্ধ্যার সময়ও বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে ধীরভাবে হাসিমুখে কথাবার্ত্তা বলিয়াছিলেন। তখনও কেহ ধারণা করিতে পারেন নাই, এই তাঁহাদের সঙ্গে শেষ দেখা। রাত্রি ৮টার সময়ও ২।৩ জন চিকিৎসক পরীক্ষা করিয়া অবস্থা বেশ ভালই এবং ৪।৫ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিবেন, এরূপ আশ্বাস দিলেন। কিন্তু রাত্রি ১০টার সময় নিজেই heartএর কিছু উপসর্গ বোধ করিয়া ডাক্তার ডাকিতে বলিলেন। তখনই ৩।৪ জন বিখ্যাত ডাক্তার ছুটিয়া আসিলেন। সমস্ত রাত এই মহাপ্রাণকে ধরিয়া রাখিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু হায় সকলি বৃথা হইল! রাত্রি ১২টার সময় নিজেই স্ত্রীকে বলিলেন, "রাত্রি ৩।৪টার সময় আমি যাইব! When death comes I welcome it, তবে দুঃখ হচ্ছে—এতগুলি শিশুসন্তান সহ তোমাকে এ ভাবে একা ফেলে যাচ্ছি। কিন্তু আমি জানিতাম না আমাকে এত শীঘ্র যেতে হবে, তাই কোন Provision করে যেতে পারলাম না।" রাত ২টার সময় নিজে বিশেষ ব্যস্ত হইয়া চেক্ সহি করিলেন। রাত্রি ৩টার সময় পত্নীকে হাতে নাড়ী নাই, তাহাও দেখাইলেন। তখন heartএর অবস্থা অত্যন্ত খারাপ, ডাক্তারেরা বলিলেন, আর কয়েক মিনিটের মধ্যে সব শেষ হইয়া যাইবে। কিন্তু তার পরও ১ ঘণ্টা ধীরভাবে পত্নী, পুত্র, কন্যা, ভৃত্য, পরিজন সকলকে আশীর্ব্বাদ করিয়া, আদর করিয়া বিদায় লইলেন; পুত্রদের বলিলেন, "Try to be a man"। বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে handshake করিয়া বিদায় লইয়া, ভগবানের নাম করিতে করিতে, শেষ নিঃশ্বাসের সহিত ঘড়িতে ৪টা বাজিয়া গিয়াছে—তাহাই দেখাইয়া, নির্ভীক, মৃত্যুঞ্জয়ী বীর রাত্রি ৪টা ১০ মিনিটের সময় ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। মৃত্যুর ২ মিনিট পূর্ব্বে বলিলেন, "আয়নাখানা দেও ত দেখি, যাবার সময় চেহারা কিরূপ হইল?"

এই বলিয়া আয়নাতে চেহারা দেখিলেন। স্নেহ-বৎসল পিতা পাছে শিশু পুত্র কোনরূপে আঘাত পায়—এই ভয়ে যখন শ্বাসকষ্ট বোধ করিতেছিলেন তখনও table fan চালাইতে দিলেন না। শ্বাস যখন একটু প্রবল হইল তখন স্ত্রীর হাত নাড়ীতে রাখিয়া বলিলেন, "এই শ্বাসকে নাভিশ্বাস বলে"। একজন বন্ধু বলিলেন, "আপনি কেন ব্যস্ত হচ্ছেন, এখনি ভাল হয়ে যাবেন।" তখন মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "আমি আর কেন ব্যস্ত হব, আমি ত যাচ্ছি। ব্যস্ততা, দুঃখ, কষ্ট আমার স্ত্রীর।" সেই বেদনা-পূর্ণ হাসিটী মুখে লইয়াই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বড় শান্তিতে শ্রান্ত বীর ঘুমাইয়া পড়িলেন। চোখে অসাধারণ দিব্য দীপ্তি, অমলিন বদন-মণ্ডল, স্থির অকম্পিত স্বর, ধীর স্থির ভাব দেখিয়া কাহারও বুঝিবার শক্তি ছিল না যে, তিনি শেষ বিদায় লইতেছেন। মৃত্যু যেন সেই দেব-দেহকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। ভগবান যেন তাঁহার প্রিয় পুত্রকে তাঁব স্নেহ-ক্রোড়ে টানিয়া লইলেন। পত্নীকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "Do not weep. এই শিশুদের একটু বড় করিয়া তুমি আসিও। এখন ত ওদেব রেখে তুমি আসিতে পারিবে না। I shall wait for you." মৃত্যু আসিতেছে জানিয়া, এরূপ দৃঢ়তা ও সাহসের সঙ্গে তাহার সম্মুখীন হওয়া বিশেষ মনোবল ও সাধনার প্রয়োজন। তিনি চিরদিন ভগবৎ-বিশ্বাসী ও তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। তাই মৃত্যুর কাছেও মাথা নত করেন নাই। বহু জীবনের বহু সাধনায় এরূপ মৃত্যু লাভ করা যায়। বীর তিনি, বীরের যোগ্য মৃত্যু লাভ করিয়া সাধনোচিত ধামে গমন করিয়াছেন। অর্থলিপ্সা তাঁহার কখনও ছিল না। নীচতা, কাপট্য, পরনিন্দা তিনি অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। সম্মান, ভালবাসা, শ্রদ্ধা বা যাহা তাঁহার একমাত্র কাম্য ছিল তিনি জীবনে তাহা পূর্ণমাত্রায় ভোগ করিয়া গিয়াছেন। সকলের শ্রদ্ধা ও ভালবাসার মধ্যে কাজ করিতে করিতেই তিনি সম্রাটের মত গৌরবমণ্ডিত হইয়াই শেষ রাত্রি

প্রস্থান করিয়াছেন। শবের অনুগমন করেন বহুজন। জনসিন্ধু দেখিয়া—বাঙ্গালী, বেহারী, ইংরাজ, মুসলমান সকলের গভীর আন্তরিকতাপূর্ণ শোকোচ্ছ্বাস ও শবানুগমন দেখিয়া সকলের মনে হইয়াছিল, মরিতে যদি হয় তবে এমনি করিয়াই। তিনি অভাগিনী পত্নী, ৬টি পুত্র ও ২টি কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ অচলকুমার ঘোষ ডাক্তারী পড়িত, কিন্তু পিতার মৃত্যুতে বাধ্য হইয়া স্থানীয় Bank-এ কাজ করিতেছে। মধ্যম পুত্র ১৬ বৎসর বয়স্ক শ্রীমান্ অনিলকুমার ঘোষ I. Sc. পড়িতেছে। অন্যান্য পুত্রেরা একান্ত শিশু। শেষ পুত্র পিতার মৃত্যুর ৩ দিন পরে জন্মগ্রহণ করে। দ্বিতীয় কন্যাটি এখনও অবিবাহিত। পুত্রেরা পিতার উপযুক্ত হউক, তাঁহার সুনাম রক্ষা করুক, ইহাই প্রার্থনা।

বঙ্গের বাহিরে যে সকল বাঙ্গালী বিদ্যা, বুদ্ধি ও চরিত্র-বলে সর্ব্ব-সাধারণের শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পাত্র হইয়া দায়িত্ব-পূর্ণ পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন তিনি তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার সরলতা, নির্ভীকতা, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, চরিত্রের দৃঢ়তা ও অমায়িকতা তাঁহাকে পাটনার শিক্ষা ও সামাজিক ক্ষেত্রে এক বিশিষ্ট স্থান দান করিয়াছিল। তিনি বহু-পোষক ছিলেন। নিজের পরিবার ব্যতীত আর কয়েকটি অনাথ পরিবারের তিনি পালনকর্ত্তা ছিলেন।

তাঁহার অকাল মৃত্যুতে B. N. College এবং পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় ও পাটনার শিক্ষা-বিভাগের যে ক্ষতি হইল তাহা শীঘ্র পূরণ হইবার নহে। তাঁহার মৃত্যুতে সম্মান-প্রদর্শনের জন্য স্থানীয় সমস্ত স্কুল-কলেজ বন্ধ হইয়াছিল এবং University meeting বন্ধ হইয়াছিল। Senate, Syndicate ও Convocation-এ Chancellor ও Vice-Chancellor তাঁহার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন। স্থানীয় ও কলিকাতার সমস্ত সংবাদপত্র তাঁহার এই অকাল বিয়োগে গভীর শোক জ্ঞাপন করেন।

"Searchlight" লিখেন—"The news of the sudden demise of Mr. L. K. Ghose, Principal B. N. College, came as a bitter shock to the citizens of Patna in the early morning of Wednesday last, the 27th Nov. The sad event took place at his residence at 4-30 A. M. and the news soon spread like wild fire throughout the town. Regardless of the cold wind of the morning, the students and members of the Council and staff of the B. N. College, the Vice-Chancellor, Patna University, as well as numerous friends and acquaintances of the deceased rushed to his home to share the profound grief of the bereaved family.

"Mr. Ghosh's death was due to a virulent type of Broncho-pneumonia by which he had been attacked on Saturday, the 23th instant. His dead body was taken to the cremation ghat in a procession consisting of a very large number of students, colleagues and friends of the deceased. The procession passed through the B N. College. The Ranthi was placed in the premises and flowers were showered upon it. A photograph of the dead body, along with those present was also taken to perpetuate Mr. Ghosh's association with the College. The procession then reached the cremation ghat at Goalghar.

"Among those present there were the Hon. Mr. Justice Khwaja Mohommad Noor, the Vice-Chancellor, P. U., Mr. Justice S. P. Varma, Mr. G. E. Fawcus, Director of Public Instruction, Principals Conselant, Armour, Mukerjee and Alam, Rai Bahadur A. N. Chatterjee, Dr. P. K. Sen. Rev. H. Bridges, Miss B Dey. Rai Bahadur S. N. Mukerjee. Rai Bahadur Kamala Prosad, Registrar, Patna University, Rai Shahib A. K. Ghose, Dr. A. N Sarker, Mr. S. N. Basu, Mr. S. M. Hafez, Rai Brij Raj Krishna, Mr. Baldev Sahaya and many other distinguished persons"

তাঁহার সতীর্থ Mr. C. T. Mitra College Magazine-এ লিখিয়াছিলেন—"We are now mourning the death of one at whose appointment to the post of Principal of this College we rejoiced in these pages barely nine months ago. We do not know if our tears will ever dry, for Principal L. K. Ghosh was much more a mere colleague to me. One to whom we turned alike in joy and sorrow for sympathy and solace. During our long and intimate association with him at College and outside we invariably found him kind and courteous and ever ready to lend a helping hand. On account of these and many other virtues he possessed, he had considerable influenee with the staff who virtually swore by him in every matter. Even when he rebuked he did so with a kind feeling which caused no offence and

irritation. There is hardly a member of the staff or one in wider circle of his friends outside who has not in some measure been benefitted by him—be it by a word of comfort or advice, by a gracious act or at least by a friendly gesture. In fact he had a warm heart for all, heart full of the freshness and spirit of youth which did not feel the least touch of advancing years. A man of strong common sense, presense of mind and keen intellect, Mr. Ghosh brought these invaluable gifts to bear upon his conversation and conduct in a manner which elicited praise even from the most chary. Courage was the key-stone of his character. It marked all his words and deeds to an extent not very frequently noticed in this age of compromise. He fought his own battles and those of his friends fairly and squarely and what is the wonder of us all is that he gave battle to great death itself and when time came surrendered to it gracefully like a true sportsman accepting his defeat at the hands of a fair foe. The wonderful equanimity and self-possession Mr. Ghose displayed at the moment of his death—bidding farewell to his friends, warmly shaking hands with them, thanking them and wishing the best of good luck to all who were present at his bed-side, seeing the image of death in his face as reflected in mirror, were in perfect keeping with the character he displayed throughout his

life and remind one of the brave heroes of past about whom one reads only in legends.

"Mr. Ghosh was a never-failing friend of the student community whose joys and sorrows he made his own. In him they have lost a teacher who not only had created a tradition in teaching of Mathemathics but whose counsel and guidance they valued most and for the like of which they will now look in vain. The measure of popularity which Mr. Ghosh had attained was indicated by long procession of mourners following his lifeless body in a flowery bier to the cremation ground along the principal thoroughfare of the town. It consisted of the Hon'ble Judges of the High Court, the Director of Public Instruction, the Hon'ble the Vice-Chancellor, Principals of Colleges, Advocates, Doctors, Professors and students of different Colleges. Such a procession, distinguished alike by its size and quality had perhaps never before been seen in the streets of Patna."

Patna Universityর Vice-Chancellor, Senate, Syndicate এবং Convocation-এ তাঁহার সম্বন্ধে বলেন—

"In the sad and untimely death of Mr. Ghosh we have lost a valuable friend and a helping colleague. It was a great shock to me to hear his death. My feeling of seperation was very acute as his death was so sudden. He was connected with the University since 1919 and a

member of the Syndicate since 1921. He had been a Professor of Mathematics of the B. N. College for the past twenty-nine years and it was only a few months ago that he assumed the charge of the Principalship of the College. He was a man of head and heart and his capacity for work for the benefit of students is well-known to you all. His knowledge of rules and regulations and all matters connected with the University was encyclopædic. He took a broad view of every problem that presented itself to the University. And his sober views had all along been of great value to Senate, Syndicate and to various University bodies of which he was a prominent member. His absence from the University and B. N College will be keenly felt. His wide experience, honesty of purpose and affable manners endeared him to all with whom he came in contact. He will always be remembered by his colleagues for his sound views on educational problems. In him the University had lost a very useful member who was always ready to devote his time to the cause of the University and the student community had lost an efficient and sympathetic teacher. He has left a large family and a very large circle of friends to mourn his loss. We convey our sincere sympathy to the bereaved family."

সত্যই ললিতবাবুর অকাল মৃত্যুতে B. N. College, Patna Uni-

versity এবং পাটনার শিক্ষা ও সামাজিক ক্ষেত্রে যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা পূর্ণ হওয়া দুষ্কর। তিনি চলিয়া গিয়াছেন কিন্তু যতদিন B. N. College এবং Patna University থাকিবে ততদিন তাঁহার সুনাম এবং যশঃ চির-অমলিন রহিবে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইঁহাদের পরিবারের সকলেই ২।৩ দিন মাত্র রোগ ভোগ করিয়া অগ্রহায়ণ মাসে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন!

তাহার সাধ্বী পত্নী যিনি চিরজীবন ছায়ার ন্যায় স্বামীর অনুবর্ত্তিনী ও সর্ব্বকার্য্যের সঙ্গিনী ছিলেন তাঁহার গভীর দুঃখে আমরা সহানুভূতি জ্ঞাপন করি এবং তাঁহার পুত্রগণ পিতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া সত্যিকারের মানুষ হউক, ইহাই ভগবৎ-চরণে প্রার্থনা করি।

রায় বাহাদুর সতীশচন্দ্র সিংহ, এম-এল-সি

পুরুলিয়া

"যঃ পিতা সঃ পুনঃ পুত্র"—পিতার গুণ পুত্রে বর্তায়। সতীশচন্দ্রকে সম্যকভাবে চিনিতে হইলে তাঁহার পিতাকে চিনিতে হইবে। নহিলে তাঁহার জীবনের বৈশিষ্টের সম্পূর্ণ উপলব্ধি হইতে পারে না।

সতীশচন্দ্রের জয়যুক্ত জীবনের মূলে তাঁহার স্বর্গগত পিতা রামচরণ সিংহ মহাশয়ের মধুর গুণাবলী ও অপূর্ব্ব ব্যক্তিত্ব বর্ত্তমান। ৺রামচরণ সিংহ মহাশয়ের আদিনিবাস হুগলি জেলাস্থিত হরিপাল থানার অন্তর্গত গজা গ্রামে। ১৮৮০ সালে ওকালতি পাশ করিয়া তিনি পুরুলিয়াতে আসিয়া বসবাস করেন। ১৯১২ সালে রামচরণ সিংহ স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তাঁহার নাম মানভূম-বাসী ভদ্র ও ইতর, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সকলেই শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিয়া থাকে। তাঁহার সারল্যের গল্পগুলি এখনও শুনা যায়। তাঁহার দীর্ঘায়ত দেহ, সৌম্য মূর্ত্তি, মধুর ব্যবহার, সহাস্য মুখমণ্ডল প্রথম দৃষ্টিতেই সকলের চিত্ত আকর্ষণ ও মুগ্ধ করিত। মানুষ ধনী হইয়াও যে কত বিনীত হইতে পারে, বড় হইয়াও যে কত অমায়িক হইতে পারে, রামচরণবাবু ছিলেন তাহার প্রকৃত উদাহরণ-স্থল। দেশের ছোট-বড় রাজন্যবর্গের তিনি একান্ত বিশ্বাসভাজন ছিলেন। উচ্চ রাজকর্ম্মচারীদের সত্যকার শ্রদ্ধা তিনি পাইতেন। আবার মানভূমের কুড়মি-মাহত, মাঝি-সাঁওতালের অকৃত্রিম ভক্তির পাত্রও ছিলেন তিনি। মানভূমের প্রধান রাজন্য পঞ্চকোটের মহারাজের সহিত তিনি সহাস্যমুখে যেমন আলোচনা করিয়াছেন, অজ্ঞাতনামা দীনহীনের সহিত স্মিতমুখে তেমনি মধুরভাবে আলাপ করিয়াছেন। তিনি ছিলেন মানভূম

রায় বাহাদুর সতীশচন্দ্র সিংহ

জেলার সরকারী উকিল এবং পাবলিক প্রসিকিউটর (Government Pleader & Public Prosecutor)। কর্ত্তব্যের অনুরোধে যাহাদের বিরুদ্ধে তাঁহাকে কার্য্য করিতে হইত তাহারাও কখনও তাঁহার প্রতি ক্ষুণ্ণ হইত না। জানিত, রামচরণবাবু দ্বারা কিছুতেই কাহারও অন্যায় বা অনিষ্ট হইতে পারে না। তিনি সরকারী উকীল ছিলেন কিন্তু নিজ মতের স্বাধীনতা কোন দিন বর্জ্জন করেন নাই। চিরদিন যাহা ন্যায়োচিত বলিয়া মনে করিতেন, যাহা কল্যাণকর বলিয়া বুঝিতেন তাহাই অকুণ্ঠিতচিত্তে অনুষ্ঠান করিতেন। লাভ-ক্ষতি গণনা করিয়া কোন দিন কর্ত্তব্যের পথ হইতে নিবৃত্ত হন নাই। স্বদেশী যুগে বহু সভায় বক্তৃতা করিয়া দেশবাসীকে তিনি উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহাব দেশাত্মবোধ অতি তীক্ষ্ণ ছিল। মাতৃভূমির প্রতি তাঁহার ঐকান্তিক আকর্ষণ ও শ্রদ্ধা ছিল। বিপন্নকে সাহায্য করিয়া, দরিদ্রকে অন্ন দান করিয়া তিনি অপার আনন্দ লাভ করিতেন।

এই পুরুষসিংহ রামচরণ সিংহ মহাশয়ের একমাত্র পুত্রই রায় বাহাদুর সতীশচন্দ্র। তাঁহার জন্ম ১৮৮০সালে নভেম্বর মাসে। পুরুলিয়া জেলা স্কুল হইতে তিনি এণ্ট্রান্স পরীক্ষা পাস করিয়া কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষা সমাপ্ত করেন। ১৯০৭ সালে তিনি পুরুলিয়া আদালতে ওকালতি-কার্য্য আরম্ভ করেন। পিতার সহকারীরূপে উত্তমরূপে নিজ ব্যবসায় শিক্ষা করিয়া তিনি অল্পদিনের মধ্যেই উকিলদের মধ্যে সুনাম অর্জ্জন করেন। তাঁহার নিয়মানুবর্ত্তিতা ও কার্য্যে মনঃসংযোগ এবং নিষ্ঠা সত্বরেই তাঁহাকে সকলের প্রশংসা ও বিশ্বাসভাজন করিয়া তুলে।

কিন্তু তাঁহার মধ্যে যে অপরিমেয় কর্ম্মশক্তি ছিল তাহা তাঁহাকে অর্থ-উপার্জ্জনে নিরত থাকিতে দেয় নাই। দেশের কাজ করিবার জন্য তাঁহার মনের মধ্যে যে আঁকাঙ্ক্ষা প্রথম জীবনেই অঙ্কুরিত হইয়াছিল তাহা ক্রমশঃ বিশালতা লাভ করিল।

১৯০৮ সালে তিনি স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার-পদে বৃত হইলেন এবং ঐ পদে থাকিয়া ১৯২৬ সাল পর্য্যন্ত তিনি সহরের উন্নতি-সাধনে যথাশক্তি আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। শেষ কয়েক বৎসর তিনি মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান থাকিয়া নিজ কার্য্যগুণে করদাতা ও জনসাধারণের বিশেষ প্রশংসা ও শ্রদ্ধা লাভ করেন।

শুধু মিউনিসিপ্যালিটী নয়, সহরের প্রত্যেক মঙ্গল-প্রতিষ্ঠানের সহিত সতীশচন্দ্রের যোগ ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠে।

১৯১৯ সালে তিনি সেকেণ্ড ক্লাস অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট হন। পরে ফার্ষ্ট ক্লাস ক্ষমতা পাইয়া প্রায় ১২ বৎসর ধরিয়া বিচারাসনে বসিয়া যথাশক্তি ন্যায় বিচার করিয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়াছেন। বিচারকালে কি ছোট, কি বড় সকলকেই সমান চক্ষে দেখিতেন। কর্ত্তব্যের অনুরোধে অনেক পুলিশ কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধেও তাঁহাকে লিখিতে হইয়াছে। তাঁহার রায় কখনও উচ্চ আদালতে রহিত হয় নাই। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিতেন যে, এমন নির্ভীক ন্যায়বিচারক দেখা যায় না। তিনি স্বেচ্ছায় যখন সেই পদ ত্যাগ করেন তখন তৎকালীন মানভূমের ডেপুটি কমিশনার সাহেব তাঁহাকে নিম্নলিখিত চিঠি লিখিয়াছিলেন—

D. O. No. 3351 CR.

Manbhum

Dy. Commissioner's Office

Purulia

August 5, 1931

My dear Rai Bahadur,
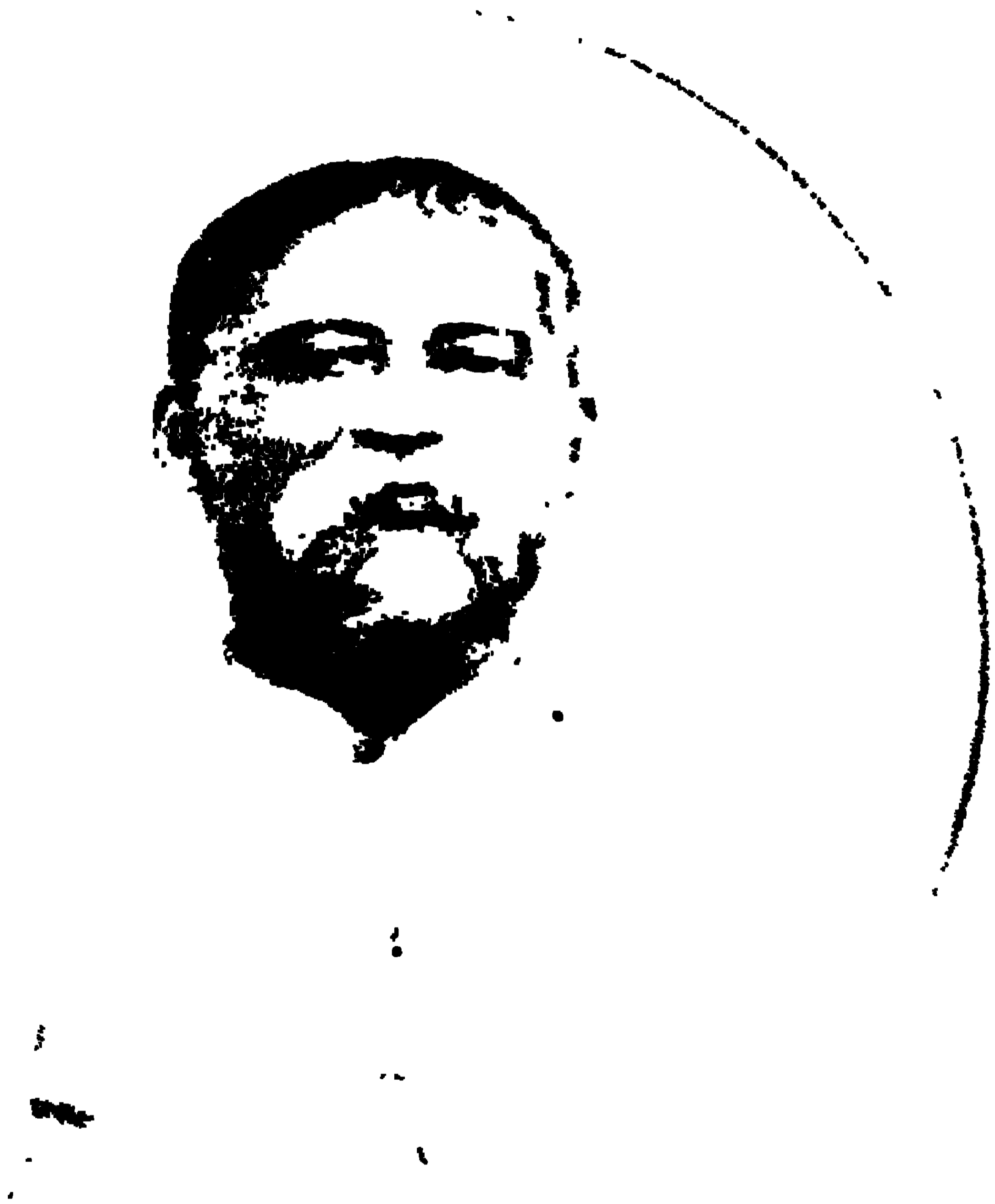
রায় বাহাদুর সতীশচন্দ্রের পিতা
স্বর্গীয় রামচরণ সিংহ।

I learn with regret that your term of Honorary Magistrateship is just over I felt very sorry that on account of domestic reasons you could not agree to a further term of appointment. As Honorary Magistrate you discharged your duties without fear and favour and your judgment were widely respected not only by the parties before you but by higher tribunals. Your independence was a source of strength in various ways and though I would be deprived of your services as an Honorary Magistrate, I hope that in the various spheres of official capacities you will continue to exert a sober and loyal influence on the people and carry out your duties with loyalty to the Government.

Yours sincerely
(Sd.) C. C. Mukherji.

Rai Bahadur Satis Chandra Sinha M. L. C.
Purulia.

বহু বৎসর ধরিয়া তিনি বিহারের মধ্যে বৃহত্তম স্কুল—মানভূম ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউশনের সেক্রেটারীর গুরুভার বহন করিয়াছেন।

বালিকাদেরও তিনি বিস্মৃত হন নাই। স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়ের সেক্রেটারী হইয়া তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন।

কৃষি ও শিল্পের উন্নতির জন্য মানভূমে যে কয়েকবার একজিবিশন হয়, তিনি সাধারণের বিশ্বাসভাজন বলিয়া তাঁহাকে সেক্রেটারী-স্বরূপে গুরুভার বহন করিতে হয়।

দেশের যুবকেরা অভিনয় করিবে, ফ্রেণ্ডস্ ইভনিং ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হইল, তিনি হইলেন তাহার প্রেসিডেণ্ট।

সকলে মিলিয়া পড়িবে, খেলিবে, সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর একটু নির্ম্মল আনন্দ ভোগ করিবে, এইজন্য ইউনিয়ন ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হইল, তিনি হইলেন তাহার একজন কর্ণধার।

সমগ্র মানভূম জেলার পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ কর্ম্মচারিগণ সংঘবদ্ধ হইয়া একটী ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা করিলেন। তিনি হইলেন তাহার সেক্রেটারী। ১৯২২ সাল হইতে ১৯২৯ সাল পর্য্যন্ত এ কার্য্যে তিনি প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়াছিলেন।

জেলের মধ্যে কয়েদীগণ যাহাতে তাহারই মধ্যে একটু ভালভাবে থাকিতে খাইতে পারে সেদিকে তাঁহার নজর পড়িল; তিনি হইলেন Non-Official Visitor. ১৯১২ সাল হইতে প্রায় ২৫ বৎসর কাল এই কাজে তিনি নিযুক্ত ছিলেন।

দেশের ঋণমগ্ন কৃষকদের উন্নতির জন্য কো-অপারেটীভ্ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইল। ১৯২২ হইতে ১৯২৬ পর্য্যন্ত তিনি ডিরেক্টর হইয়া ব্যাঙ্ক ও সমবায়-সমিতি পরিচালনা করিলেন। এই কো-অপারেটিভের ডিরেক্টরের কার্য্য করিবার সময় তাঁহার দৃষ্টি পড়িল সহরের বাহিরে পল্লী গ্রামের উপর। এতদিন ধরিয়া তিনি যে সমস্ত কার্য্য করিলেন সে সব তো সহরের জন্য। কিন্তু কেবল সহরই কি দেশ? সহরের বাহিরে হাজার হাজার গ্রামবাসী, লক্ষ লক্ষ নর-নারী রহিয়াছে; তাহাদের সুখ-দুঃখ, উন্নতি-অবনতির ভাবনা আজ তাঁহার হৃদয়ের দুয়ারে আঘাত করিল।

গ্রামগুলির রাস্তাঘাট যাহাতে একটু ভাল হয়, গ্রামের শিক্ষায়তন স্কুল ও পাঠশালাগুলির যাহাতে একটু উন্নতি হয়, মহামারীর দারুণ দিনে গ্রামবাসী যাহাতে এক ফোঁটা ঔষধ পায়—এই মহৎ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া তিনি ১৯২৪ সালে মানভূম ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডে প্রবেশ

রায় বাহাদুর সতীশচন্দ্রের পত্নী

রায় বাহাদুর সতীশচন্দ্রের মাতা
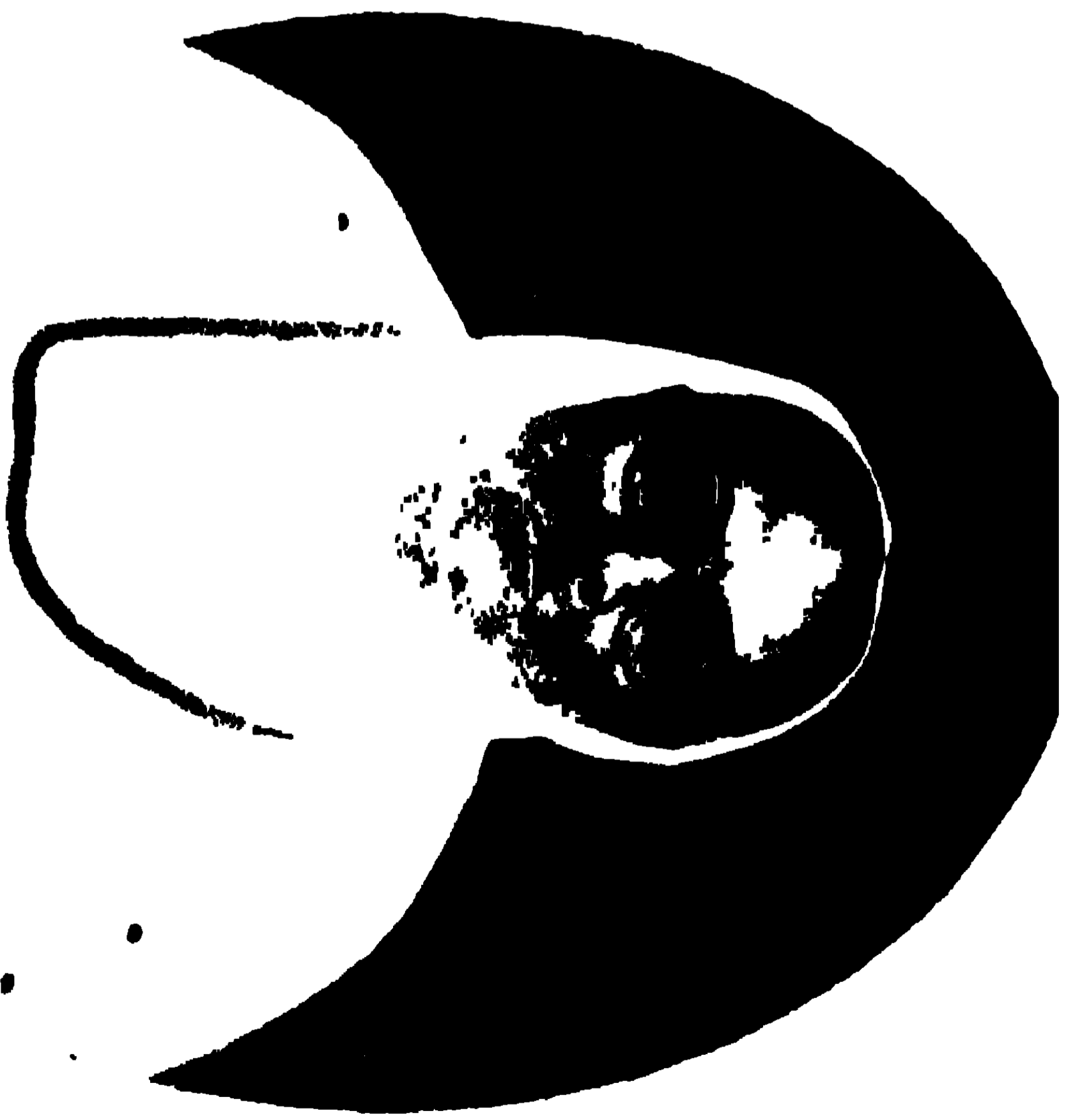
করিলেন এবং ১৯২৪ হইতে ১৯৩২ পর্য্যন্ত সভ্যরূপে বোর্ডের কার্য্য নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন। ১৯৩৩ সালে তিনি সর্ব্বসম্মতিক্রমে বোর্ডের চেয়ারম্যান মনোনীত হইয়া তিন বৎসর অতিরিক্ত পরিশ্রম ও দক্ষতার সহিত কার্য্য করিয়া, দেশবাসীর বহু উপকার করিয়া তাহাদের প্রীতিভাজন হয়েন।

১৯২৭ সালে দেশে বয় স্কাউট-আন্দোলন দেখা দিল। তদানীন্তন ডেপুটী কমিশনার মিষ্টার বি-কে গোখলে এই আন্দোলনে আত্মাহুতি দিলেন। ইহাতে ছেলেদের দেহের ও মনের উন্নতি হইবে—এ কথা সতীশ-চন্দ্র বুঝিলেন। তিনি দেশে যাহাতে বয় স্কাউট-প্রতিষ্ঠান চিরস্থায়ী হয় সে জন্য সহরের মধ্যে তাঁহার জননীর নাম-অনুসারে "হেমাঙ্গিনী-স্কাউট হল" প্রতিষ্ঠা করিলেন। অনেক অর্থব্যয় করিয়া একটী সুরম্য ভবন প্রস্তুত করিয়া দিলেন। ১৯২৮ সালের আগষ্ট মাসে এই সৌধের ভিত্তি স্থাপন করিয়া গেলেন স্বয়ং সার হিউ ষ্টিফেনসন—বেহার-উড়িষ্যার গর্ভণর। তিনি সেদিন সতীশচন্দ্রের গুণাবলী-সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহা চিরস্মরণীয়। এই বৎসর জুন মাসে সতীশচন্দ্রের অক্লান্ত দেশসেবার সরকারী পুরস্কার হইল ; তিনি হইলেন "রায় বাহাদুর"। বেহার-উড়িষ্যার গভর্ণর ১৯২৮ সালে ১০ই সেপ্টেম্বর তারিখে তাঁহাকে রায় বাহাদুরের সনদ দিবার কালে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

Rai Bahadur Satish Chandra Sinha,

You have rendered conspicuous public service as an Honorary Magistrate, a Municipal Commissioner, a Director of the Co-Operative Bank and a member of the District Board. For the last 20 years you have been an invaluable example to your district of a loyal, unselfish

worker whose co-operation can be looked for in all matters of public welfare."

রায় বাহাদুর খেতাবটার সহিত আজকাল একটা দুর্নাম অনেক স্থলেই সংযুক্ত হইতে দেখা যায়। রায় বাহাদুর হইলেই মানুষ সরকারের ক্রীতদাস হইয়া যায়—এই বিশ্বাস দেশে অনেকেরই আছে। রায় বাহাদুর সতীশচন্দ্রও কি তাই? প্রশ্নটা স্বাভাবিক। তাঁহার উক্তি হইতেই ইহা আমরা বিচার করিয়া দেখিব।

১৯৩০ সালে রায় বাহাদুর বিহার-উড়িষ্যা কাউন্সিলে সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন। যখন বিখ্যাত White Paper Proposalগুলি বিচারের জন্য কাউন্সিলে উঠিল, তখন কংগ্রেস দল তাহার বিরোধিতা করিলেন। মডারেটগণ তাহা গ্রহণ করিতে যুক্তি দিলেন। সতীশচন্দ্র সিংহ মহাশয় কংগ্রেস দলের নহেন—মডারেট। কিন্তু তিনি দৃঢ়ভাবে বলিলেন, "We find in it a determined attempt on the part of White Hall to keep India in perpetual bondage and only a vindication of whiteman's burden." ইহা কি একজন রায় বাহাদুরের মুখের কথা? এমন তেজ, এমন স্পষ্টবাদিতা যে একজন রায় বাহাদুরের থাকিতে পারে তাহা প্রায় অবিশ্বাস্য। কিন্তু সতীশচন্দ্রের এ তেজস্বিতা আছে। তিনি অন্য স্থানে বলিয়াছেন—"The history of constitution-making in India has all along been a history of broken pledges, but a time has come when British statsemanship has to realise that this process can not be repeated *ad infinitum*". এমন অনাড়ম্বরভাবে, সহজ সরল কথায় অথচ তেজের সহিত দেশের রাজনীতিক্ষেত্রে কয়জন কথা বলিতে পারেন? হতাশায় মর্ম্মবিদ্ধ হইয়া তিনি শেষে বলিলেন:—"Sir, India

wanted bread but the famous "Caravan" of Sir Samuel Hoare has only brought us hard stones."

আরও :—"The tragedy of the whole situation is that whatever concessions the British Government has made from time to time in the matter of constitutional reforms, they have always been actuated by disturst and suspicion and there is the indelible stamp of the same on every proposal with regard to the proposed constitution". (Bihar & Orissa Council Proceedings. Vol. 27, Pages 1542 to 1547, dated 22nd March 1933.) দেশের রাজনীতির ধারা-প্রবাহে রাজা-প্রজার সম্বন্ধ কোথায় বাধা পাইতেছে তাহার এমন নিখুঁত ও সহজ সত্য ব্যাখ্যা খুব কমই দেখা যায়। এই কাউন্সিলের বক্তৃতাগুলি হইতেই রায় বাহাদুরের চরিত্রের দৃঢ়তা ও তেজস্বিতার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইবে। আর সেইজন্যই তিনি কোনদিন favourtism পছন্দ করেন নাই।

যখন কাউন্সিলে Recruitment to Provincial services বা চাকুরীর কথা উঠিল, তখন তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিলেন, Favouritism নয়, merit চাই। যে পায়ে ধরিয়া চাকুরী পায়—সে চিরদিন পায়েই পড়িয়া থাকে, কখনও মাথা খাড়া করিয়া উঠিতে পারে না।

"It is only fit and proper that candidates with merit and grit should have the first preference. Besides the prospect of getting these jobs through merit will be incentive to our meritorious boys who otherwise remain uncared for........"(Bihar & Orissa Legislative Council Proceedings, Vol. 27, dated 13th Feb. 1933, page 343).

বেহারে সেকেণ্ড চেম্বার প্রতিষ্ঠার যে প্রস্তাব হইয়াছিল সেই সম্বন্ধে রায় বাহাদুর যাহা যাহা উক্তি করিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল:—"Such a house (Second Chamber) is bound to be conservative in its nature as its members will mostly come from the landed and moneyed classes. An Upper House will be an expensive decoration, which we can ill afford under the present circumstances. It will be just like a "show room" and will give out an odour of "aloofness". Sir, the days of conservatism are gone, and democracy is making a fast headway, as a look at the world outside will convince even a casual observer. It will not do for our landed gentry to keep themselves reserved for an Upper House. On the otherhand, Sir, I believe it will be to their interests to see that they are elected to an uni-cameral legislature by the votes of the people, I mean, the masses, who really count. What we want is a Government "of the people by the people and for the people". I expect, Sir, that in the next constitution we are really going to have such a Government. In that case, should we not all, the land-lord and the tenant, the aristrocrat and the plebian, the Capitalist and the labourer, rub shoulders and work together for the common good of all alike? (Bihar and Orissa Council Proceedings, dated 17th February 1933, page 103) এবং ছোটনাগপুরের বিশেষতঃ মানভূমের উন্নতিকল্পে যাহাতে ছোটনাগপুর Backward tract বলিয়া

গণ্য না হয় তৎসম্বন্ধে তিনি বেহার কাউন্সিলে বলিয়াছিলেন যে—
"I would like, Sir, simply to say a word with regard to Manbhum. Manbhum is one of the foremost and forward districts, not only in this province, but, I can say, in India. The residents are entirely Bengalis and formerly Manbhum was a part of Bengal. It is ludicrous to contend that Manbhum is backward. Culturally and economically, Manbhum is in no way inferior to any other part of Bihar, and there is no reason why it should be classed as backward. In the backward districts, Government did not at first grant the franchise of elected Chairman in their District Boards. But on reconsideration Government was pleased to allow this concession to the District Board of Manbhum. If one, Sir, is compelled to remain backward by a statute enacted long long ago, he will have to remain so for ever is a funny thing. There is no justification to keep a part of this province tied down as backward merely for the sake of a minority community—I mean the aborigines—who are also giving signs of walking abreast with other people of the province and in future proper opportunities being given they are certainly not to lag behind of other people, I do not find what harm there can be if the stigma of backwardness is removed from the forehead of Chota Nagpur. (Behar & Orissa Council Proceedings, dated 14th Feb. 1933, page 430).

১৯৩৩ সালে বেহার ও উড়িষ্যা কাউন্সিল হইতে রায় বাহাদুর বেঙ্গল নাগপুর রেলের এডভাইসারি বোর্ডের মেম্বার মনোনীত হয়েন। তথায় নিম্নশ্রেণীর যাত্রীদের সুবিধার জন্য বহু চেষ্টা করিয়া অনেক উন্নতি সাধন করেন।

১৯৩৫ সালের ইণ্ডিয়া এক্ট অনুযায়ী নূতন কনষ্টিটিউসনে ১৯৩৭ সালে যে বেহারে এসেমব্লি ও কাউন্সিলের সভ্য-নির্ব্বাচন হইয়াছিল তাহাতে এই স্বনামধন্য কর্ম্মবীর রায় বাহাদুর "No party" হইয়াও কাউন্সিলে অর্থাৎ সেকেণ্ড চেম্বারে সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন এবং ঐ সালে জুন মাসে কাউন্সিল-মেম্বারদের Oath দেওয়াইবার জন্য ও প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচন জন্য বেহারের মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর কর্ত্তৃক তিনি সভাপতি মনোনীত হয়েন।

রায় বাহাদুর নিজ জীবনে গুণের দ্বারাই উন্নতির চরম সীমায় উঠিয়াছিলেন। কি করিয়া জীবনে উন্নতির চরম শিখরে উঠিয়া আজ রায় বাহাদুর সকলের অবিমিশ্র শ্রদ্ধা-ভক্তি লাভ করিয়াছেন তাহা চিন্তা করিলে দেখা যায় তাঁহার চরিত্রে কতকগুলি অসাধারণ গুণের সন্নিবেশ আছে।

তিনি অক্লান্তকর্ম্মী। অলসতা ও দীর্ঘসূত্রতা তাঁহার মধ্যে কেহ দেখে নাই। কখনও কোন কাজ তিনি ফেলিয়া রাখেন না। জীবনে তাঁহার এমন সময় গিয়াছে যখন কর্ম্ম চারিদিক হইতে তাঁহাকে আপ্লুত করিয়া ফেলিয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেটের কাজ, মিউনিসিপ্যালিটির কাজ বা ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের কাজ, অন্যান্য জনসাধারণের কাজ এবং কাউন্সিলের কাজ একই সঙ্গে তাঁহাকে করিতে হইয়াছে। কিন্তু তিনি অক্লান্তকর্ম্মী। কোন দিন কর্ম্ম তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারে নাই।

নিয়মানুবর্ত্তিতা তাঁহার আর একটী বিশিষ্ট গুণ। যে সময় যে কাজ করিবেন ঠিক করিয়াছেন তাহা ঠিক সেই সময়েই করিবেন, কিছুতেই অন্যথা হইবে না। যদি কথা দেন—কাহারও সহিত কোন সময়ে দেখা করিব, তবে ঠিক সময়েই ঠিক স্থানেই তিনি হাজির হইয়াছেন দেখা যাইবে

এত বড় আশ্রিত-প্রতিপালক আজকালকার দিনে দুর্লভ। যে একবার তাঁহার স্নেহ-আশ্রয় লাভ করিয়াছে সে ধন্য হইয়াছে। তাহার সকল দুঃখ-আপদে রায় বাহাদুর চিরদিন তাহার পাশে থাকেন।

কিন্তু যে তাঁহার কাছে নীচতা করিল সে চিরদিনের জন্য তাঁহার সাহায্য হারাইল। ধরিবার সময় তিনি যেমন দৃঢ়ভাবে ধরেন ছাড়িবার সময় তিনি তেমনি নির্ম্মম।

এত বড় উচ্চপদস্থ কর্ম্মী কিন্তু তাঁহাতে পেচক-গাম্ভীর্য্য কোন দিন দেখা যায় নাই। পরন্তু তিনি সদানন্দময়। খেলায়, গল্পে, মনখোলা বন্ধুত্বে তাঁহার মত দ্বিতীয় একটী লোক চোখে ঠেকে না।

বন্ধু-বান্ধব লইয়া আনন্দ করিতে, লোকজনকে খাওয়াইতে তিনি ভালবাসেন। যিনি একদিনের জন্য তাঁহার বাড়ীতে অতিথি হইয়াছেন তিনি তাঁহার আদর-আপ্যায়ন চিরদিন স্মরণ রাখিবেন। দানে তিনি অকাতর। বিপদে পড়িয়া যে যখনই তাঁহার কাছে গিয়াছে সেই সাহায্য পাইয়াছে। তাহা ছাড়া পিতৃপুরুষের কীর্ত্তি অম্লান রাখিবার জন্য নিজ জন্মভূমিতে তিনি স্কুল ও ডাক্তার-সহ ডিস্পেন্সারী প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কিন্তু সর্ব্বান্তঃকরণে তিনি হোমিওপ্যাথির গোঁড়া। প্রতি সৎকার্য্যে, দেশের উন্নতিকর প্রতিষ্ঠানে তাঁহার দান আছেই।

তিনি অতিশয় মাতৃভক্ত। মাতাও তেমনি সাক্ষাৎ করুণাময়ী। সর্ব্বদা কেবল নিজ সন্তানের কেন—জগতের সকলের কল্যাণ-কামনায় তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ। সর্ব্বকার্য্যে সতীশচন্দ্র মাতৃ-পদধূলি লইয়া

অগ্রসর হয়েন। তাঁহার জননীর আশীর্ব্বাদ ও অক্ষয় কবচে আবৃত থাকিয়া তিনি সর্ব্বদা উন্নতির পদে অগ্রসর হইয়াছেন। এই স্নেহাতুরা জননীর আশীর্ব্বাদই তাঁহার জীবনের সম্বল ও উন্নতির মুল।

ভগবান রায় বাহাদুরকে আর একটি বড় দান করিয়াছেন—তিনি তাঁহার সাধ্বী পত্নী শ্রীমতী শৈলজিনী সিংহ। ইনি কলিকাতার বাদুড় বাগানস্থ প্রসিদ্ধ ৺ গোপালচন্দ্র মিত্রের পৌত্রী এবং ৺ অতুলচন্দ্র মিত্রের কন্যা। রায় বাহাদুর নিঃসন্তান। সেইজন্য এই সাধ্বী নিজেকে আত্মবলি দিয়া সন্তান-আশায় স্বামীর পুনরায় বিবাহ দিয়াছিলেন কিন্তু উক্ত দ্বিতীয় পত্নী ৯ বৎসর কাল জীবিত থাকিয়া নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করেন। এমন সেবাপরায়ণা সতী সহধর্ম্মিণী খুব কমই দেখা যায়।

Sterling qualities of head and heart—উদার মন, উচ্চ হৃদয়—এই দুইয়ের অপূর্ব্ব সমন্বয় রায় বাহাদুরের জীবনে বিশেষভাবে ঘটিয়াছে।

ধর্ম্মের অভয় আশ্রয়ও তাঁহার আছে। আসমুদ্র-হিমাচল ভারতবর্ষের প্রতি তীর্থ তিনি দর্শন করিয়াছেন। কিন্তু তিনি গোঁড়া নন। ব্যক্তিগতভাবে তিনি Theosophistদের মধ্যে একজন। ধর্ম্মবিশ্বাসে তিনি উদারপন্থী। এই দৃঢ়তা ও উদারতাই তাঁহাকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছে।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের অপূর্ব্ব দয়া, দাক্ষিণ্য, কর্ত্তব্যপরায়ণতা এবং ন্যায়পরায়ণতার প্রভায় সমগ্র মানভূমের উপর যে নিসর্গ-শোভা বিস্তার লাভ করিয়াছে তাহা সমগ্র ভারতে সুশোভিত হউক—ভগবানের নিকট ইহাই প্রার্থনা করি।

রাজা শ্রীযুক্ত নরসিংহ মল্ল উগলষণ্ড দেব

ঝাড়গ্রাম-রাজবংশ

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ঝাড়গ্রামের রাজ-বংশ অত্যন্ত প্রাচীন। পুরাতন নথিপত্র ও কিম্বদন্তী হইতে জানিতে পারা যায় যে, খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভেও ইহারা বর্ত্তমান ছিলেন। যে সময়ে শ্রীচৈতন্যদেব বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করেন ও সমগ্র দেশ কীর্ত্তনের বন্যায় ভাসাইয়া দেন, সে সময়েও ইঁহাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি নিতান্ত সামান্য ছিল না। এই রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম সর্ব্বেশ্বর মল্ল উগাল ষণ্ডদেব। ইনি চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়। কথিত আছে, ইনি সিক্রি (এক্ষণে ফতেপুর সিক্রি) হইতে পুরীধামে তীর্থ করিতে আসিয়াছিলেন। সে সময়ে বাঙ্গালা দেশের অবস্থা অরাজক। পাঠান রাজত্বের অবসান হইয়াছে বলিয়া দেশের সর্ব্বত্র তখন বিশৃঙ্খলা ও বিভ্রাট। তিনি তীর্থ হইতে ফিরিবার পথে এই অঞ্চলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন,—সময় ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুকূল। এইস্থানে ভাগ্য পরীক্ষা করা যাউক। তাঁহার বাহুতে ছিল বিপুল বল, হৃদয়ে ছিল অপরিমিত সাহস এবং মস্তিষ্কে ছিল তীক্ষ্ণ বুদ্ধি। সেগুলির সাহায্যে ১৫১৯ খৃষ্টাব্দে তিনি এই অঞ্চলে এক ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁহার প্রভূত শারীরিক বলের পরিচয়-চিহ্ন আজও তাঁহার বংশাবলী নিজ নিজ নামের সহিত ধারণ করিয়া রহিয়াছেন; উহা হইতেছে 'মল্লদেব' মল্লক্রীড়াকুশল এবং উগাল ষণ্ডদেব। বিপুল দৈহিক শক্তির অধিকারী না হইলে কেহ মল্লবীর বা মল্লরাজ হইতে পারে না।

খুব সম্ভব, সেই সময়ে এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা ও তাঁহার কোন ও কোনও বংশধরকে পার্শ্ববর্ত্তী শক্তিশালী রাজাদিগের সহিত প্রায়ই যুদ্ধে

লিপ্ত হইতে হইত। বহুকাল এই বংশ সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন। এক্ষণে ঝাড়গ্রাম পরগণা বা মল্লভূমির আকার ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু এই বংশের প্রাথমিক রাজগণের সময়ে ইহার আকার সুবিস্তীর্ণ ছিল। যে ভূভাগ উত্তরে শিলদা হইতে দক্ষিণে বালেশ্বর পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং যাহার ভিতরে পরগণা রোহিণী, নয়াবসান, নয়াগ্রাম প্রভৃতি অবস্থিত তাহাই এই প্রাচীন মল্লভূমি। দীর্ঘকাল এই বংশ এই সুবিস্তীর্ণ ভূভাগের অধিপতি ছিলেন।

নরহরি চক্রবর্ত্তী-প্রণীত 'ভক্তিরত্নাকর' ও 'রসিকমঙ্গল' নামক সুপ্রাচীন বৈষ্ণব-গ্রন্থদ্বয়ে মল্লভূমের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই দুই গ্রন্থে গোপীবল্লভপুর মঠের প্রতিষ্ঠাতা রসিকানন্দের জীবনী ও কার্য্য-কলাপের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। ঝাড়গ্রাম-রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হইবার অল্পকাল পরেই রসিকানন্দের আবির্ভাব হয়। তিনি ১৫৯০—১৬৫২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিলেন। 'রসিকমঙ্গল' রচয়িতা "গোপীজন বল্লভ দাস" রসিকানন্দের সমসাময়িক ও অনুরাগী বন্ধু ছিলেন। তিনি 'রসিকমঙ্গলে' লিখিয়াছেন যে, রসিকানন্দের জন্মস্থান রোহিণীগড় এবং গোপীবল্লভপুর মঠ মল্লরাজগণের রাজ্যমধ্যে অবস্থিত ছিল। প্রায় ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে রচিত পুস্তকে ইহার উল্লেখ হইতে সপ্রমাণ হয় যে, এই রাজবংশ অত্যন্ত প্রাচীন। সুতরাং স্পষ্টই বুঝা যায় যে, পরগণা রোহিণী ও গোপীবল্লভপুর (এক্ষণে নয়াবসান নামে অভিহিত) পূর্ব্বে ঝাড়গ্রামের মল্লরাজ-বংশের অধিকার-ভুক্ত ছিল। পরবর্ত্তী সময়ে সম্ভবতঃ ময়ূরভঞ্জ-রাজের সহিত যুদ্ধে এই দুইটী পরগণা তাঁহাদের অধিকার-চ্যুত হয়। এক্ষণে এই দুইটী পরগণার অধিকারী হইতেছেন ময়ূরভঞ্জ-রাজ।

মল্লভূমিরাজ্যের দৈর্ঘ্য ও বিস্তার যে পূর্ব্বে অনেক অধিক ছিল এবং ইহা যে অত্যন্ত প্রাচীন সে সম্বন্ধে আরও প্রমাণ আছে।

ঝাড়গ্রাম-রাজবংশের পরিবারিক উপাধি 'উগাল ষণ্ড'। ইহার অর্থ —দুর্গের ষণ্ড বা কেল্লার ষাঁড। কৌতূহলের বিষয় এই যে, নয়াবসান পরগণার পাতিনা গ্রামের নিকটে এখনও পর্য্যন্ত একটি হাট বসে, ইহার নাম উগাল ষণ্ডের হাট। এই অঞ্চলের অধিবাসীরা উগাল ষণ্ডের পূজা অদ্যাবধি করিয়া থাকে। ঝাড়গ্রাম-রাজবংশের এক রাজা বহুকাল পূর্ব্বে প্রহরাজ-বংশের প্রতিষ্ঠাতা নিমাইচন্দ্র প্রহরাজকে ২০ বর্গ মাইল পরিমিত ভূমি দান করিয়াছিলেন। তিনি দানের পূর্ব্বে এই অঙ্গীকার করেন যে, নিমাই এক প্রহরে অর্থাৎ তিনঘণ্টায় অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া যে পরিমাণ ভূমি অতিক্রম করিতে পারিবেন তাঁহাকে সেই পরিমাণ ভূমি দান করা হইবে। এই সর্ত্ত-অনুসারে ঝাডগ্রাম-রাজের পুণ্যাহ-উৎসব-উপলক্ষে প্রতি বৎসর বেলিয়াবেড়ার জমিদার, ঝাড়গ্রাম-রাজ এই পরগণার আদি মালিক বলিয়া সর্ব্বপ্রথম তাঁহাকে নজরাণা দিয়া থাকেন। আজ পর্য্যন্ত নয়াবসান ও বেলিয়া-বেড়া পরগণার বৃদ্ধ অধিবাসীরা প্রাচীন মল্লভূম-রাজগণের বংশধর বলিয়া ঝাডগ্রামের বর্ত্তমান রাজ-বংশকে সসম্ভ্রম সম্বর্দ্ধনা করিয়া থাকে। ইহা ব্যতীত নিকটবর্ত্তী পরগণার সম্ভ্রান্ত অধিবাসিবর্গের প্রাচীন কোষ্ঠী বা জন্মপত্রিকার প্রারম্ভে ভূম্যধিকারী নৃপতির প্রতি সম্মান-প্রদর্শনের পরিচয়-স্বরূপ 'মল্লাধিপতি'-শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, এদেশে ব্রিটিশ শাসন প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মল্লভূমের রাজন্যবৃন্দ প্রায় পূর্ণ স্বাধীনতা উপভোগ করিতেন। মেদিনীপুর জেলা এক সময়ে প্রসিদ্ধ হিন্দুরাজ্য উড়িষ্যার অঙ্গীভূত ছিল। ময়ূরভঞ্জ ও জলেশ্বর হইতে নারায়ণগড় ও সবঙ্গ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ ছয়টি 'দণ্ডপাট' বা রাজস্বপ্রদানকারী খণ্ডে বিভক্ত ছিল। কিন্তু এই খণ্ড বা বিভাগগুলির মধ্যে মল্লভূমের নাম পাওয়া যায় না। মুসল-মান নৃপতিগণের বিংশতি তম রাজস্বপ্রদানকারী বিভাগের মধ্যে মল্লভূমের

নামোল্লেখ নাই। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, মল্লভূমরাজ্য উড়িষ্যার ও বাঙ্গালার রাজধানী হইতে বহুদূরে—দুর্গম অরণ্য-মধ্যে পরিখা ও দুর্গ-বেষ্টিত স্থানে অবস্থিত বলিয়া এবং ইহার শাসকগণ প্রবল পরাক্রমশালী বলিয়া কয়েক শতাব্দী পর্য্যন্ত উহা উড়িষ্যা রাজ বা বাঙ্গালার নবাব—কাহারও আধিপত্য স্বীকার করেন নাই এবং এই দুইজনের কাহাকেও কর দেন নাই। আজও যে বড় বড় ফটক-দেওয়া সুদৃঢ ও প্রশস্ত প্রাচীর এবং সুদীর্ঘ পরিখা ঝাড়গ্রাম-রাজপ্রাসাদের চতুর্দ্দিকে দেখিতে পাওয়া যায, তাহা হইতে লোক বুঝিতে পারে যে, শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য কিরূপ দুর্ভেদ্য ব্যবস্থা মল্লরাজগণ করিযাছিলেন। শত্রুর পক্ষে এই সুরক্ষিত স্থানে আসিয়া রাজ্য অধিকার করা একরূপ অসম্ভব ছিল। কিন্তু মেদিনীপুর জেলা ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিযা কোম্পানীর অধিকারভুক্ত হইলে এই অবস্থার পরিবর্ত্তন হইল। কোম্পানী মেদিনীপুরের জঙ্গল-মহলগুলি শাসনের গণ্ডীব মধ্যে আনিবার জন্য প্রভূত চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিলেন; উহার ফলে এইসকল স্থান শীঘ্রই কোম্পানীর বশ্যতা স্বীকার করিল। মল্লরাজগণ প্রথমে কোম্পানীর বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু শেষে কোম্পানীকে কর দিতে সম্মত হইলেন। ১৭৬৭ হইতে ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোম্পানী তাঁহাদের উপর সামান্য নামমাত্র কর ধার্য্য করেন। তদবধি ঝাড়গ্রাম-রাজপরিবার ব্রিটীশ গভর্ণমেণ্টের সহিত মৈত্রী-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছেন। আজ পর্য্যন্ত সেই বন্ধন অটুট রহিয়াছে এবং এখন তাঁহারা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অনুরাগী ভক্ত। কেবল তাহাই নহে,—ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত এইরূপ মৈত্রী-স্থাপনের পর তাঁহারা জঙ্গল-মহলের অবাধ্য রাজন্যগণকে দমন করিবার কার্য্যে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগিতা করিয়াছেন। সম্ভবতঃ ইহারই পুরস্কার-স্বরূপ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ঝাড়গ্রামের তদানীন্তন নৃপতি দ্বিতীয় বিক্রমজিৎ

মল্ল উগাল ষণ্ডদেবকে 'ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার'-গ্রন্থে 'রাজা' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুরের কলেক্টরকে তিনি যে বিবরণী পাঠাইয়াছিলেন তাহাতে তিনি উল্লেখ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার পিতা শ্যামসুন্দরমল্ল উগাল ষণ্ডদেব এবং পিতামহ প্রথম বিক্রমজিৎ মল্ল উগাল ষণ্ডদেব রাজা উপাধিধারী ছিলেন।

এই দেশের প্রাচীন ভূম্যধিকারী বা রাজবংশে জ্যেষ্ঠাধিকার-প্রথা অর্থাৎ প্রথমজাত পুত্রসন্তানের পৈত্রিক সম্পত্তি প্রাপ্ত হইবার অধিকারের নিয়ম প্রচলিত আছে। ঝাড়গ্রাম রাজবংশেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। বংশানুক্রমে এই প্রথা কখনও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। অবশ্য অনুজগণকে যথাযোগ্য বৃত্তিদানের ব্যবস্থাও বিদ্যমান; এই ব্যবস্থা কখনও উপেক্ষিত হয় নাই।

নিম্নে এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা হইতে বর্তমান উত্তরাধিকারীর নাম বা তালিকা সময়ানুক্রমিক ভাবে পর পর দেওয়া হইল :—

	রাজগণের নাম	খৃষ্টাব্দ
১।	সর্বেশ্বরমল্ল উগাল ষণ্ডদেব	১৫১৯—১৫৩৪
২।	বিক্রমমল্ল উগাল ষণ্ডদেব	১৫৩৪—১৫৫৭
৩।	ভীমমল্ল উগাল ষণ্ডদেব	১৫৫৭—১৫৭৫
৪।	পৃথ্বীমল্ল উগাল ষণ্ডদেব	১৫৭৫—১৫৯০
৫।	সংসারমল্ল উগাল ষণ্ডদেব	১৫৯০—১৬২৬
৬।	ছক্কুমল্ল উগাল ষণ্ডদেব	১৬২৬—১৬৪৫
৭।	গঙ্গাধরমল্ল উগাল ষণ্ডদেব	১৬৪৫—১৬৯৫
৮।	শত্রুঘ্নমল্ল উগাল ষণ্ডদেব	১৬৯৫—১৭৩৫
৯।	আনন্দমল্ল উগাল ষণ্ডদেব	১৭৩৫—১৭৫১
১০।	মানগোবিন্দমল্ল উগাল ষণ্ডদেব	১৭৫১—১৭৬৭
১১।	বিক্রমজিৎমল্ল উগাল ষণ্ডদেব (প্রথম)	১৭৬৭—১৭৮৯

১২। শ্যামসুন্দরমল্ল উগাল ষণ্ডদেব ১৭৮৯—১৮৫৯

১৩। বিক্রমজিৎমল্ল উগাল ষণ্ডদেব (দ্বিতীয়) ১৮৫৯—১৮৭৫

১৪। নারায়ণমল্ল উগাল ষণ্ডদেব (পিতার জীবদ্দশায় ইঁহার মৃত্যু হয়,

১৫। রঘুনাথমল্ল উগাল ষণ্ডদেব ১৮৭৫—১৯১০

১৬। চণ্ডীচরণমল্ল উগাল ষণ্ডদেব ১৯১০—১৯২২

১৭। নরসিংহমল্ল উগাল ষণ্ডদেব ১৯২২—

(বর্ত্তমান অধীশ্বর)

প্রায় ১০ পুরুষ ধরিয়া ঝাড়গ্রাম-রাজবংশ সুখ-সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধির শিখরে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই সুদীর্ঘ কালকে এই রাজবংশের গৌরব-যুগ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে অশান্তির ও বিপদের সূত্রপাত হইল। বর্গী বা মহারাষ্ট্রীয়গণের আক্রমণই এই অশান্তির কারণ। বর্গীরা অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতেই বাঙ্গালাদেশ আক্রমণ করিতে থাকে। যে হেতু মল্লভূমরাজ্য উড়িষ্যার সন্নিহিত, এইজন্য বর্গী-আক্রমণের তীব্রতা এই অঞ্চলেই অধিক হইয়াছিল। বর্গীরা যে অঞ্চলে আসিয়া পড়িত সেই অঞ্চল একেবারে ধ্বংস করিয়া যাইত। ইহার উপর চুয়ার-বিদ্রোহের তরঙ্গও এই অরণ্য-রাজ্যের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল এবং তাহার ফলে এখানকার শান্তি নষ্ট হইয়াছিল। লোকে কৃষিকর্ম্ম ও ব্যবসায়-বাণিজ্য করিতে পারিত না। এইসকল দুঃখ-কষ্ট ও বিপদের উপর আসিয়া পড়িল ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ভীষণ দুর্ভিক্ষ। তখন লোকে প্রমাদ গণিল; দারুণ অন্নকষ্টে লোকে মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িতে লাগিল। ক্রমাগত বর্গীর হাঙ্গামা ও চুয়ার বিদ্রোহের ফলে ঝাড়গ্রাম রাজবংশের কোষাগার প্রায় শূন্য হইয়াছিল; ইহার উপর যখন এই দুর্ভিক্ষ আসিয়া পড়িল তখন ইঁহাদের আর্থিক অবস্থা একেবারে শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল অর্থের অভাবে এই রাজবংশের মান-সম্ভ্রম বিনষ্ট হইতে বসিয়াছিল। তখন

রাজা দ্বিতীয় বিক্রমজিৎমল্ল উগাল ষণ্ডদেবের পরবর্ত্তী আমল এবং তাঁহার পৌত্র রঘুনাথমল্ল উগাল ষণ্ডদেব নাবালক অবস্থায় সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইয়াছেন। এই সময়ে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যদি ঝাড়গ্রাম-রাজ এষ্টেটকে কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের পরিচালনাধীন করিয়া না দিতেন, তাহা হইলে এই সুপ্রাচীন রাজবংশের বোধ হয় অস্তিত্বই থাকিত না। ঝাড়গ্রাম-এষ্টেটকে দুইবার কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের পরিচালনাধীন করিয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ইহাকে রক্ষা করিয়াছেন। একবার ১৮৭৫ হইতে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ১২ বৎসর কাল, এই সময়ে বর্ত্তমান অধীশ্বরের পিতামহ রঘুনাথমল্ল উগাল ষণ্ডদেব অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছিলেন; আর একবার ১৯০৭ হইতে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ২২ বৎসর কাল—যে সময়ে রঘুনাথমল্ল দেব জীবিত এবং বর্ত্তমান অধীশ্বর নরসিংহমল্ল দেব অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছিলেন। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে নরসিংহ মল্লদেব প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া জমিদারীর পরিচালনা ভার কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের নিকট হইতে স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন।

নরসিংহমল্ল উগাল-ষণ্ডদেব

শ্রীল শ্রীযুত নরসিংহমল্ল উগল ষণ্ডদেব, বি-এ ঝাড়গ্রাম-রাজবংশের বর্ত্তমান বংশধর। ইনি এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা হইতে অধস্তন সপ্তদশ পুরুষ। ইঁহার বয়স এখন ৩০ বৎসর। ইনি যুগোপযোগী সুশিক্ষা লাভ করিয়াছেন। ইঁহার হৃদয় সমুন্নত, মতবাদ সমুদার ও রুচি মার্জ্জিত। ইনি জনসাধারণের প্রতি সহৃদয়তা-পরায়ণ ও রাজ্যের উন্নতি-প্রয়াসী। কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের নিকট হইতে সম্পত্তির পরিচালন-ভার গ্রহণ করিবার পর হইতে ইনি ইঁহার সুযোগ্য কর্ম্ম-সচিব রায়সাহেব শ্রীযুত দেবেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য, এম এ, বি-এল মহাশয়ের মন্ত্রণায় ও উপদেশে জমিদারীর কার্য্য এরূপ সুশৃঙ্খলতার

সহিত চালাইতেছেন যে, তাহার ফলে সম্পত্তির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হইয়াছে। সামান্ত ৮ বৎসরের মধ্যে এই সম্পত্তি সম্পূর্ণরূপে নানাবিধ উন্নতির পথে আসিয়াছে। বাঙ্গালা দেশে এইরূপ উন্নত আর্থিক-অবস্থা-শালী এষ্টেট খুব অল্পই আছে। এই পরিচালন কুশলতার জন্য বর্ত্তমান রাজা এবং তাঁহার কর্ম্মসচিব যে উভয়েই প্রশংসা-ভাজন, ইহা বলাই বাহুল্য। দশবৎসর পূর্ব্বে যাঁহারা ঝাড়গ্রাম-রাজবংশীয়গণের পুরাতন রাজবাটী দেখিয়াছেন, তাঁহারা বর্ত্তমান রাজপ্রাসাদ দেখিয়া তাহা চিনিতেই পারিবেন না। ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত কতিপয় পুরাতন অট্টালিকা ও মৃৎকুটীরের স্থলে এক্ষণে দেখিতে পাই এক বিশাল নবনির্ম্মিত প্রাসাদ। ইহা আধুনিক যুগোপযোগী, অনাড়ম্বর সৌন্দর্য্যপূর্ণ। ইহার ভিতরে বিরাজ করিতেছে শষ্পশোভিত ক্রীড়াঙ্গন এবং প্রশস্ত উদ্যান। প্রাসাদের নিজস্ব বৈদ্যুতিক 'পাওয়ার হাউস' আছে; তাহা হইতে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইয়া প্রাসাদের সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হয় এবং প্রাসাদস্থিত আলোক ও পাখা চলে ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কর্ম্মও হইয়া থাকে। নল-সহযোগে পানীয় জল সরবরাহেরও ব্যবস্থা প্রাসাদে আছে। বর্ত্তমান রাজা নরসিংহমল্ল তাঁহার জমিদারীতে—প্রজাদিগের মধ্যেই বাস করেন; উহাদের সুখ-দুঃখের ভাগী হন; উহাদের অভাব-অভিযোগের প্রতি দৃষ্টি রাখেন এবং সেগুলি দূর করিবার জন্য চেষ্টা করেন। নগর-বাসীরা যে সকল সুখ-সুবিধা নগরে বসিয়া ভোগ করিয়া থাকেন, বর্ত্তমান রাজা তাঁহার প্রাসাদে তাঁহার পরিবারবৃন্দকে সেই সুখ-সুবিধা-ভোগের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু প্রজাগণেরও অবশ্য প্রয়োজনীয় সুখ-সুবিধাগুলির প্রতি রাজ্যের পরিচালক-বৃন্দ উদাসীন নহেন। প্রজাগণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য ঝাড়গ্রাম এষ্টেট অন্যান্য লোকহিতকর কার্য্য অপেক্ষা অধিক অর্থব্যয় করেন। জমিদারীর মধ্যে অবস্থিত বালকবালিকাদের প্রত্যেক প্রাথমিক বিদ্যালয়,

সংস্কৃত টোল, মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয় পর্য্যন্ত এষ্টেট হইতে মাসিক সাহায্য পাইয়া থাকে; ইহা ব্যতীত গৃহনির্ম্মাণ বা অন্যান্য প্রয়োজনে ইহারা এককালীন অর্থসাহায্যও লাভ করিয়া থাকে। বর্ত্তমান অধীশ্বরের জননীর নামে প্রতিষ্ঠিত ঝাড়গ্রামের কুমুদকুমারী ইনষ্টিটিউসন নামক উচ্চ ইংরেজী স্কুলের বর্ত্তমান সমুন্নত অবস্থার মূল যে, এই রাজবংশের বদান্যতা, ইহা মেদিনীপুর জেলার ও বাঙ্গালার শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। প্রজাগণের জন্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতেও ঝাড়গ্রাম-রাজবংশ বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন। বর্ত্তমান অধীশ্বরের পিতৃ-নামে প্রতিষ্ঠিত চণ্ডীচরণ চ্যারিটেবল ডিস্পেন্সারী বা চণ্ডীচরণ দাতব্য চিকিৎসালয়ের সুবৃহৎ বাটী সম্পূর্ণ এই এষ্টেটের প্রদত্ত অর্থেই নির্ম্মিত হইয়াছে। দাতব্য চিকিৎসালয়ের রক্ষণোপযোগী অর্থদান ব্যতীত আধুনিক যুগোপযোগী ঔষধ-পত্র এবং শস্ত্রোপচারের যন্ত্র-পাতি এই ডিস্পেন্সারীতে রাখিবার জন্যও এষ্টেট হইতে মধ্যে মধ্যে অর্থসাহায্য করা হইয়া থাকে। রাজ-এষ্টেটের মেডিক্যাল অফিসারের অধীনে আর একটী ক্ষুদ্র দাতব্য চিকিৎসালয়ও জমিদারীর প্রদত্ত অর্থে পরিচালিত হইয়া থাকে। "সম্প্রতি ঝাড়গ্রাম-জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত চন্দরী নামক প্রসিদ্ধ গ্রামে একটি চ্যারিটেবল ডিস্পেন্সারী স্থাপনের জন্য এষ্টেট হইতে মুক্তহস্তে অর্থদান করা হইয়াছে; এই দাতব্য চিকিৎসা-প্রতিষ্ঠানটী মেদিনীপুর জেলা-বোর্ড কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেছে। ইহার পরিচালনের জন্য এষ্টেট হইতে নিয়মিত মাসিক অর্থ-সাহায্যও করা হয়। ঝাড়গ্রামের শুষ্কভূমিতে অত্যন্ত জলাভাব; এই জলাভাব দূর করিবার জন্য এষ্টেট খুবই চেষ্টা করিয়া থাকেন। এষ্টেটের টাকায় প্রজাগণের জলাভাব-মোচনের জন্য জমিদারীর নানা স্থানে কূপ ও ইঁদারা খনন করাইয়া দেওয়া হয়। ইহা ব্যতীত যখনই জল সরবরাহের জন্য গবর্ণমেণ্ট বা স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ কোনও কার্য্য করিতে

উদ্যোগী হন, তখন এষ্টেট সেই কার্য্যে অর্থসাহায্য করেন। এই রাজবংশের রাজা দ্বিতীয় বিক্রমজিৎমল্ল উগাল ষণ্ডদেব এখানকার অধিবাসিগণের পান ও কৃষিকার্য্যের সাহায্যার্থ জল সরবরাহের জন্য কেচন্দা বাঁধ ও মেলাবাঁধ নামক যে দুইটী সুবৃহৎ বাঁধ তৈয়ারী করেন সেই দুইটী তাঁহার পূর্ত্ত-প্রতিভার স্থায়ী নিদর্শন। এই বাঁধ দুইটী ঝাড়গ্রাম হইতে দেড় ক্রোশ দূরে অবস্থিত। কেচন্দা বাঁধ প্রায় ৬০ বিঘা এবং মেলা বাঁধ প্রায় ৩০ বিঘা জমির উপর অবস্থিত। এই দুইটী বাঁধ বা পুষ্করিণীতে জল সঞ্চিত করিয়া রাখা হয়। এই দুইটী ব্যতীত ঝাড়গ্রাম, চন্দরী গ্রাম, দহতমাল, কুকরাখুপী ও অন্যান্য স্থানেও কয়েকটী বৃহৎ বৃহৎ পুষ্করিণী আছে; সকলগুলিই ইঁহাদের জমিদারীর এলাকার ভিতরে।

ঝাড়গ্রাম-রাজবংশের বর্ত্তমান বংশধর শ্রীল শ্রীযুত নরসিংহমল্ল উগাল ষণ্ডদেব মেদিনীপুর জেলা-বোর্ডের উৎসাহশীল সদস্য। জেলার অধিবাসীদিগের কল্যাণকর সকল প্রকার কার্য্যে—বিশেষতঃ তাঁহার জমিদারীভুক্ত জনসাধারণের মঙ্গলজনক সকল অনুষ্ঠানে তিনি আগ্রহসহকারে যোগ দিয়া থাকেন।

নরসিংহমল্ল দেব সামাজিক ও জনপ্রিয় ভূম্যধিকারী। তিনি স্থানীয় সকল প্রকার সামাজিক অনুষ্ঠানে সকল শ্রেণীর লোকের সহিত মেলামেশা করিয়া থাকেন; তাঁহার শিষ্টাচার ও সৌজন্যে সকলেই মুগ্ধ। তাঁহার পিতামহের স্মৃতিরক্ষাকল্পে প্রতিষ্ঠিত 'রঘুনাথ মেমোরিয়াল ক্লাব'এর সুন্দর সৌধ ও টেনিস খেলিবার পাকা অঙ্গন একমাত্র এষ্টেট-প্রদত্ত অর্থেই নির্ম্মিত। এই অঞ্চলে এই ক্লাবটীই একমাত্র প্রতিষ্ঠান—যেখানে সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণ পরস্পর সম্মিলিত হইয়া খেলা-ধূলায় ও সাধারণ আমোদ-প্রমোদে যোগ দিতে পারেন। নরসিংহমল্ল দেব স্বয়ং ক্রীড়া-কুশল ও মৃগয়া-নিপুণ ব্যক্তি। তিনি অব্যর্থসন্ধানী বন্দুক-চালক। তিনি অত্যন্ত অধ্যয়নশীল ও পুস্তক-পাঠে অনুরাগী।

নরসিংহ মল্লদেব আরও একটি স্পোর্টিং ক্লাব বা খেলা-ধূলার সঙ্ঘ ও একটি উৎকৃষ্ট লাইব্রেরী বা পাঠাগার স্থাপন করিয়াছেন। এই পাঠাগারে বহু-বিষয়ক উত্তম উত্তম পুস্তক আছে। ঝাড়গ্রামে এমন কোনও সাধারণ-হিতকর সদনুষ্ঠান নাই যাহাতে ঝাড়গ্রাম-রাজবংশ অর্থসাহায্য না করিয়া থাকেন। এইরূপ সকল প্রতিষ্ঠানেরই তাঁহারা পৃষ্ঠপোষক। এইসকল ব্যতীত এমন বহু জনহিতকর অনুষ্ঠানে ইঁহারা অর্থসাহায্য করিয়া থাকেন যেগুলির নাম ও সংখ্যা করা সম্ভবপর নহে।

ঝাড়গ্রাম-রাজবংশ নিষ্ঠাবান্ হিন্দু এবং বাহ্যতঃ কিঞ্চিৎ রক্ষণশীল। ইঁহাদের গৃহদেবতা সাবিত্রী, চন্দ্রশেখর ও জগন্নাথ এবং জমিদারীর নানা স্থানে স্থাপিত বিবিধ বিগ্রহের যথোপযুক্ত পূজা ও ভোগ-রাগের জন্য পর্য্যাপ্ত দেবোত্তর সম্পত্তি বংশানুক্রমে দান করা আছে। এইসকল সম্পত্তির আয় হইতে পূজা-উৎসবাদি বার মাসে তের পার্ব্বণ সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত পুরোহিত ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণকে বৃত্তি-দানেরও সুব্যবস্থা এই রাজবংশীয়গণ করিয়া গিয়াছেন।

ঝাড়গ্রাম-রাজ্যের পরিমাণ-ফল ২০২ বর্গমাইল অর্থাৎ ২০২ বর্গমাইল স্থান ব্যাপিয়া এই জমিদারী বিস্তৃত। ঝাড়গ্রাম, চিয়াড়া ও মাৎকাতপুর পরগণা এই জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত এবং ইহারা পরস্পর সমান্তরাল-ভাবে অবস্থিত।

জমিদারীর প্রজাগণের অবস্থা মোটের উপর ভালই বলা যাইতে পারে, খুব সচ্ছল না হইলেও অসচ্ছল নহে। বাকী অনাদায়ী খাজনার উপর প্রাপ্য সুদ হইতে নরসিংহ মল্লদেব প্রজাদিগকে বর্তমানে রেহাই দিয়াছেন। এইজন্য প্রজাগণ সবিশেষ উপকৃত হইয়াছে এবং বর্ত্তমান অর্থ-কষ্টের যুগে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিয়াছে। এইজন্য ইহারা প্রাণ ভরিয়া ভগবানের নিকট নরসিংহমল্লদেবের কল্যাণ কামনা করিয়া থাকে। এক্ষণে জমিদারী-পরিচালন-ব্যবস্থা প্রজাগণের অনুকূল হইয়াছে বলিয়া

তাহারা ইহার সবিশেষ অনুরাগী এবং কোনও প্রকার অসন্তোষ তাহাদের মনে নাই। ঝাড়গ্রাম-জমিদারী সার্টিফিকেট প্রথা দ্বারা বাকী খাজনা আদায় করিবার অধিকার পান নাই বটে, কিন্তু ইহার প্রয়োজন নাই বলিয়া ইঁহারা তাহা করাইবার ইচ্ছাও পোষণ করেন না। ইঁহাদের জমিদারীতে খাজনা-আদায়ের গড়পড়্তা পরিমাণ এরূপ অধিক এবং বাকী খাজনা আদায়ের জন্য মামলা-মকদ্দমার সংখ্যা এতই অল্প যে, সার্টিফিকেট-প্রথার অধিকার-লাভের জন্য ইঁহারা গবর্ণমেণ্টের দ্বারস্থ হইতে বিন্দুমাত্র ইচ্ছুক নহেন। জমিদারদের এই সঙ্কটকালে গবর্ণমেণ্টের নিকট এই অধিকার পাওয়া এখন বিশেষ কঠিনও নহে।

ঝাড়গ্রাম-রাজবংশ চিরদিনই ব্রিটিশ-রাজের অত্যন্ত অনুরাগী ও ভক্ত। ইঁহাদের ব্রিটিশ-রাজানুগত্য বংশানুগত ও বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। মেদিনীপুরে ব্রিটিশ অধিকার-স্থাপনের প্রাক্কাল হইতে অদ্যাবধি ঝাড়গ্রাম-রাজবংশ দৃঢ়ভাবে ও আন্তরিকতার সহিত ব্রিটিশ রাজানুগত্য স্বীকার করিয়া আসিতেছেন এবং যখন প্রয়োজন হইয়াছে ও আহ্বান আসিয়াছে তখনই সর্ব্বান্তঃকরণে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহযোগিতা করিয়াছেন। ঝাড়গ্রামের বর্ত্তমান অধীশ্বর শ্রীল শ্রীযুত নরসিংহমল্ল উগাল ষণ্ডদেব মহোদয় এইরূপ সহযোগিতা ও আনুগত্যের পর্য্যাপ্ত পরিচয় দিয়াছেন এবং গবর্ণমেণ্টও ইহার প্রতিদান-স্বরূপ ইঁহাকে বিগত ১৯৩৫ সালের মে মাসে সিলভার জুবিলি পদক প্রদান করিয়াছেন।

ইঁহার পুত্রের নাম শ্রীমান্ বীরেন্দ্রবিজয়মল্ল উগাল ষণ্ডদেব।

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র রায় চৌধুরী

হাইকোর্টের এডভোকেট

কলিকাতা হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ এডভোকেট শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় অতীব কৃতী পুরুষ। তিনি অতি দরিদ্র অবস্থা হইতে নিজের কৃতিত্ববলে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠ হইয়াছেন। ইঁহার নিবাস—টাউন শ্রীপুর, জেলা খুলনা।

বাল্যকালে তিনি অতি দরিদ্র বলিয়া ভবানীপুর লণ্ডন মিশনারী সোসাইটীর স্কুলে অবৈতনিক ছাত্ররূপে ভর্ত্তি হন। তিনি অত্যন্ত মনোযোগী ও মেধাবী ছাত্র বলিয়া শিক্ষকেরা ও স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষ সাহেবরা তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। স্কুলের (তৃতীয় শ্রেণীর) শেষ পরীক্ষায় তিনি সমস্ত বিষয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন। স্কুলের পারিতোষিক-বিতরণের কয়েকদিন পূর্ব্বে তাঁহার পিতা কেদারনাথ রায় চৌধুরী সাংঘাতিকভাবে পীড়িত হইয়া পড়েন। তাঁহার মৃত্যুর দুই তিন দিন পূর্ব্বে স্কুলের পারিতোষিক-বিতরণ হয় এবং শরচ্চন্দ্র সমস্ত বিষয়ে পৃথক্ পৃথক্ প্রথম পুরস্কার লাভ করেন। সেই সমস্ত পারিতোষিক ইঁহার পিতা কেদারনাথকে তাঁহার মৃত্যু-শয্যায় দেখান হয়। মুমূর্ষু কেদারনাথের জীবনদীপ তখন নির্ব্বাপিতপ্রায়। এই অবস্থাতেও তাঁহার স্তিমিতনয়নে আনন্দাশ্রু বিগলিত হয় এবং শুষ্ক অধরে পুত্রের কৃতিত্ব-দর্শনে আনন্দ রেখা বিকশিত হয়। তিনি হর্ষ-গদগদকণ্ঠে পুত্রকে সস্নেহে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলেন, "তুমি হাইকোর্টের উকিল হও।"

এইরূপ আশীর্ব্বাদ করিবার কারণ এই যে, জীবনের শেষ অবস্থায় তিনি তাঁহার সরিকগণের সহিত মামলা-মোকদ্দমায় যৎপরোনাস্তি বিপর্য্যস্ত হইয়াছিলেন।

এই ঘটনার তিন দিন পরে বাঙ্গালা ১২৮৯ সালের ৪ঠা ফাল্গুন (১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী) তিনি দেহ ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তিনি ৫টি পুত্র, ৪টি কন্যা এবং বিধবা পত্নীকে রাখিয়া যান। পুত্রগণের মধ্যে শরচ্চন্দ্রই জ্যেষ্ঠ ছিলেন।

কেদারনাথের মৃত্যুতে সংসারের যাবতীয় ভার শরচ্চন্দ্রের উপর পড়ে। বিধবা মাতা, কনিষ্ঠ সহোদর ও সহোদরাদের প্রতিপালনের অন্য কোন উপায় নাই দেখিয়া শরচ্চন্দ্র অগত্যা স্কুল ত্যাগ করিয়া পিতার মৃত্যুর এক মাস পরে—১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে গভর্ণমেণ্ট টেলিগ্রাফ ষ্টোর্সে মাসিক পনর টাকার চাকুরী গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। অতঃপর গণিতের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ৬ মাসের মধ্যে তিনি মাসিক ত্রিশ টাকা বেতনে ভারত-গভর্ণমেণ্টের আবহ-বিভাগীয় (metrological) অফিসে একটি কেরাণীগিরি চাকুরী অস্থায়ীভাবে পান। অতঃপর মাসিক ২০—৩০৲ টাকা বেতনে তিনি ঐ অফিসে স্থায়ীভাবে কেরাণীর চাকুরী পান। এই অফিসে কাজ করিবার সময় তিনি ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রাইভেট ছাত্ররূপে এণ্ট্রান্স এবং ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে এফ-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি এফ-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিতেন না, যদি ডভ্‌টন কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ মিঃ ম্যাক্‌ডোনাল্ড তাঁহাকে কৃপাপূর্ব্বক ১০টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত এক ঘণ্টাকাল কলেজে আসিলে ছাত্র বলিয়া গ্রহণ করিবার অনুমতি না দিতেন এবং হাওয়া-অফিসের (metroloical) বড় কর্ত্তা মিঃ পেড্‌লার তাঁহাকে ১০॥টার পরিবর্ত্তে ১১—১৫ মিনিটে অফিসে উপস্থিত হইবার অনুমতি না দিতেন। ডভ্‌টন কলেজের পরবর্ত্তী প্রিন্সিপাল মিঃ আই-জে-বি কোলেন্স্ সাহেবও দয়া করিয়া তাঁহাকে পূর্ব্বের ন্যায় সুবিধা দেওয়ায় অর্থাৎ Doveton College-এ B. A Class না থাকায় উক্ত সাহেব তাঁহাকে মাত্র এক ঘণ্টাকাল উপস্থিত হইলেই শিক্ষকরূপে

গ্রহণ করায় তিনি ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে বি-এ পাশ করেন। বি-এ পাশ করিবার পর তিনি সিটি কলেজের আইন-বিভাগের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন। এবারেও হাওয়া-অফিসের কর্তা পেড্‌লার সাহেব তাঁহাকে পূর্ব্বের ন্যায় ১০॥টার পরিবর্ত্তে ১১--১৫ মিনিটের সময়ে অফিসে উপস্থিত হইবার অনুমতি দিয়াছিলেন।

বি-এ পাশ করিবার পর কয়েকদিন পরে (তখনও তাঁহার বেতন ২৬৲ টাকা মাত্র), একদিন হাওয়া-অফিসের সহকারী রিপোর্টার মিঃ ডেলাস তাঁহার সহিত একটা বিষয়ে গণনা করিতে বসেন এবং শরচ্চন্দ্রের প্রতিভা-দর্শনে তিনি এত দূর মুগ্ধ হন যে, তিনি তৎক্ষণাৎ সিমলায় হাওয়া-অফিসের সর্ব্বপ্রধান রিপোর্টারের নিকট শরচ্চন্দ্রের অল্প বেতন অথচ তাঁহার বিরাট প্রতিভার কথা লেখেন। মিঃ ডেলাস অঙ্কশাস্ত্রে এম্-এ ছিলেন; তাঁহার চিঠি পাইয়া সিমলার প্রধান রিপোর্টার শরচ্চন্দ্রকে মাসিক ২৫০৲ শত টাকা বেতন ও কিছু ভাতা দিয়া তাঁহাকে সিমলায় একজন সহকারীর পদে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু পিতৃভক্ত শরচ্চন্দ্র দেখিলেন, সিমলায় গেলে তাঁহার স্বর্গীয় পিতার অন্তিম বাসনা পরিপূরণ হইবে না—আইন-কলেজে আর পড়া হইবে না, তখন তিনি সিমলার চাকুরী পরিত্যাগ করিলেন। ইহাতে তাঁহার অফিসের সকলেই ও তাঁহার আত্মীয়স্বজনগণ তাঁহার প্রতি বিশেষ অসন্তুষ্ট হইলেন। কিন্তু ইহার পরেই নিজ গ্রাম শ্রীপুরে গিয়া তাঁহার মাতার নিকট সিমলার চাকুরী পরিত্যাগের বিষয় জানাইলে তাঁহার মাতা স্বর্গীয় স্বামীর মৃত্যুকালীন বাসনা স্মরণ করিয়া শরচ্চন্দ্রের কার্য্য সমর্থন করিলেন। বলা বাহুল্য, তখন শরচ্চন্দ্রের সাংসারিক অবস্থা অতি শোচনীয়। অতি সামান্য টাকা তিনি বাড়ীতে পাঠাইতেন, তাহাতে অতি কষ্টে তাঁহার মাতা, ভ্রাতা ও ভগিনীদের গ্রাসাচ্ছাদন হইত। কিন্তু এত কষ্ট ও অস্বচ্ছলতা সত্ত্বেও শরচ্চন্দ্র পিতার শেষ

বাসনা স্মরণ করিয়া হাইকোর্টের উকিল হইবার সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন না।

ইহার কয়েকদিন পরে খিদিরপুর স্কুলে মাসিক ত্রিশ টাকায় তাঁহার একটি মাষ্টারী জুটিল এবং কিছুদিন ঐ মাষ্টারী করিবার পর স্বর্গীয় মহাকবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহাকে মাসিক ৪০৲ টাকা বেতনে তাঁহার এক পুত্রের শিক্ষক-পদে নিযুক্ত করিলেন। যাহাতে শরচ্চন্দ্র সিটি কলেজের আইন-শ্রেণীতে পড়িতে পারেন, তজ্জন্য হেমচন্দ্র তাঁহার পুত্র ও শরচ্চন্দ্রকে সিটি কলেজের নিকট একটি মেসে থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন এবং উভয়ের যাবতীয় ব্যয়-ভার নিজে বহন করিতে লাগিলেন। স্বর্গীয় হেমচন্দ্রের পুত্রের গৃহ-শিক্ষকতা করিতে করিতে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বি-এল্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। কিন্তু বি-এল্ পাশ করিবার বৎসরাধিক পূর্ব্বেই হেমচন্দ্র শরচ্চন্দ্রের পিতার অন্তিম বাসনা শুনিয়া তাঁহাকে তাঁহার আর্টিকেল ক্লার্করূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। যাহাতে শরচ্চন্দ্র তাঁহার এম্-এ ও বি-এল ক্লাসে নিয়মিতভাবে উপস্থিত হইতে পারেন, সেজন্য তিনি শরচ্চন্দ্রকে পূর্ব্ব প্রকারে কলিকাতায় থাকিবার সমস্ত প্রকারের সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু কলিকাতায় থাকিয়া খিদিরপুরে গিয়া হেমচন্দ্রের নিকট আর্টিকেল্ ক্লার্কের কাজে যোগদান করা শরচ্চন্দ্রের পক্ষে সম্ভবপর না হওয়ায়, স্বর্গীয় হেমচন্দ্র তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ উকিল সুপ্রসিদ্ধ শ্রীনাথ দাস মহাশয়কে অনুরোধ করিয়া তাঁহার আর্টিকেল ক্লার্কপদে শরচ্চন্দ্রকে নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

বি-এল্ পাশ করিবার কয়েকদিন পরেই আর্টিকেল ক্লার্কের নির্দ্দিষ্ট কালও অতীত হইল। তখন হাইকোর্টের রেজিষ্ট্রার মিঃ বিচার্ডসন শরচ্চন্দ্রের অবস্থা অবগত হইয়া বিশেষ অনুগ্রহপূর্ব্বক বিচারপতিগণ দ্বারা তাঁহার হাইকোর্টের উকীল হইবার পরীক্ষা লওয়াইবার একটা দিন সত্বর স্থির করিয়া দিলেন। বিচারপতি স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ ও স্যার

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বিচারপতিদ্বয় প্রথম দিনেই তাঁহাকে কয়েকটি প্রশ্ন করিয়া তাহার সদুত্তর পাওয়ায় তাঁহাকে হাইকোর্টের উকিল-শ্রেণী-ভুক্ত করিয়া লইবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর হাইকোর্ট যেদিন পূজাবকাশের জন্য বন্ধ হইল, সেইদিনই মিঃ রিচার্ডসন তাঁহাকে উকীল-শ্রেণীভুক্ত করিয়া লন।

উকীল-শ্রেণীভুক্ত হইবার কয়েক মাস পরেই তিনি কলিকাতায় একটি বাড়ী ভাড়া করিয়া মা ও ভ্রাতা-ভগিনীদের লইয়া বাস করিতে থাকেন। ক্রমে হাইকোর্টে তাঁহার বিশেষ পসার ও প্রতিপত্তি হয়। কয়েক বৎসরকাল তিনি বহুবাজারে স্বর্গীয় শ্রীনাথ দাস মহাশয়ের বাটীর নিকটে বাটী ভাড়া করিয়া মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, স্ত্রী, পুত্র-কন্যাদি লইয়া বাস করেন এবং স্বর্গীয় শ্রীনাথ বাবুর সঙ্গে হাইকোর্টে কাজ করেন। ১৩০৬ সালের প্রথমেই আসিয়া ভবানীপুর বকুল বাগানে একটি বাড়ী ভাড়া করিয়া বাস করেন এবং বকুলবাগান রোডের উত্তরে জমি কিনিয়া নিজ বাসভবন প্রস্তুত করেন ও অল্পদিনের মধ্যেই সেই বাটীতে বাস করিতে আরম্ভ করেন।

১৩২৬ সালে টাউন শ্রীপুরে তিনি একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। কলিকাতা ও মফঃস্বলের অনেক হাই স্কুল ও বালিকা-বিদ্যালয়ের সহিত সভাপতি ও সহকারী সভাপতিরূপে তিনি সংশ্লিষ্ট আছেন। তিনি বহু বৎসর যাবৎ ভবানীপুর ব্যাঙ্কের সভাপতি এবং সাঁওতাল পরগণার ডি এ সেটেলমেণ্ট কোম্পানীর সভাপতি। তিনি নানাবিধ দুর্ভিক্ষ-সাহায্য-ভাণ্ডারে নিঃস্বার্থ ভাবে কাজ করিয়াছেন।

শরচ্চন্দ্র নীরব কর্ম্মী। তিনি কোন প্রকার নাম-প্রতিপত্তি ভাল-বাসেন না। নিজে অতি দরিদ্র অবস্থা হইতে সমৃদ্ধ হইয়াছেন বলিয়া

দরিদ্রের দুঃখ-কষ্ট তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করেন। বিপন্ন আত্মীয়-স্বজনকে সাহায্য করা ও অন্নক্লিষ্ট দরিদ্রের দুঃখ-নিবারণ করাই তাঁহার কার্য্য। এই বৃদ্ধ বয়সেও তিনি যুবার ন্যায় শক্তি লইয়া নীরবে দেশের সেবা করিতেছেন।

বিশ্বনিয়ন্তার প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ও ঐকান্তিক নির্ভরতা। তাঁহার স্ত্রী ১৯১৭ সালের ৩০শে মে তারিখে প্রায় দেড় বৎসর রোগ ভোগ করিয়া স্বর্গ গমন করেন। তাঁহার চিকিৎসার জন্য ও ভারতবর্ষের অনেক স্থানে তাঁহাকে বায়ু-পরিবর্ত্তনার্থ রাখিতে বহু সহস্র টাকা ব্যয় হয়; যতদিন তিনি বাঁচিয়াছিলেন, যদিও তাঁহার চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রূষার জন্য শরচ্চন্দ্র সর্ব্বদা ব্যস্ত ও চিন্তিত থাকিতেন, কিন্তু যে মুহূর্ত্তে তাঁহার দেহাবসান হইল, আর তাঁহাকে কেহ শোকমগ্ন বা বিচলিত দেখে নাই। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব যে কেহ এই সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছেন, তাঁহাকে তিনি বলিয়াছেন, আমার জন্য চিন্তা করিবেন না—আমার মনে কিছুমাত্র চপলতা নাই। বিশ্বনিয়ন্তা যে কয়দিন তাঁহাকে আমার নিকটে রাখিয়াছিলেন, সেই কয়দিন অবসান হইলেই, তিনি নিজের কাছে তাঁহাকে লইয়াছেন। এই বিশ্বাস আমার ছিল, সেই জন্য আমার মন অচঞ্চল। তাঁহার স্ত্রী দেহরক্ষার সময়ে ৭টি পুত্র ও ৫টী কন্যা রাখিয়া যান। এক্ষণে তাহাদের মধ্যে ক্রমে ৩টী পুত্র ও ৩টী কন্যা স্বর্গে চলিয়া গিয়াছে। প্রত্যেকটীর চিকিৎসা, সেবা-শুশ্রূষা, বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য ঐরূপ বহু অর্থ ব্যয় ও বিস্তর চেষ্টা-যত্ন হইয়াছে। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে একটী দেহ ত্যাগ করিয়াছে, তাহার পর এক মুহূর্ত্তের জন্য কেহ শরচ্চন্দ্রকে বিচলিত দেখে নাই। তাঁহার ঐ এক কথা। যাঁহার জিনিষ তিনি, লইয়াছেন; যে কয়দিনের জন্য দিয়াছিলেন, সেই কয়দিন শেষ হইলেই নিজের কাছে লইয়াছেন—এজন্য শোক করিয়া লাভ কি?

শরচ্চন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র শান্তিকুমার সোদপুর-নিবাসী লালমোহন ঘোষ, এম-এ মহাশয়ের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন।

মধ্যম পুত্র প্রীতিকুমারের সহিত ঢাকা-নিবাসী স্বর্গীয় শিবেন্দ্রনাথ বসুর কন্যা ও ময়মনসিংহের সুপ্রসিদ্ধ জননায়ক স্বর্গীয় অনাথবন্ধু গুহের দৌহিত্রীর বিবাহ হইয়াছে।

তৃতীয় পুত্র তৃপ্তিকুমার ফরিদপুর জেলার অংপাতী আবদুল্লাবাদ গ্রাম-নিবাসী পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন।

নিম্নে শরচ্চন্দ্রের বংশ-তালিকা দেওয়া হইল :—

বংশ-তালিকা

(বঙ্গজ গুহ-বংশ)

১। বিবাট গুহ
২। নারায়ণ গুহ
৩। দশরথ গুহ
৪। ভরত গুহ
৫। পীতাম্বর গুহ
৬। সাঁই গুহ
৭। তপন গুহ
৮। শঙ্কর গুহ
৯। অশ্বপতি গুহ
১০। গজপতি গুহ (ইনি মহারাজ প্রতাপাদিত্যের অতি-বৃদ্ধ প্রপিতামহ)
১১। চতুর্ভুজ গুহ
১২। স্বয়ম্বর গুহ

১৩। দুর্লভ গুহ (মজুমদার)

১৪। ভবানীদাস গুহ (ইনি মহিহাটী পরগণা অধিকার করেন)

১৫। যদুনন্দন গুহ (ইনি শ্রীপুরে বাস করেন)

১৬। বাসুদেব রায়

১৭। রাজারাম রায়

১৮। রামকিশোর রায়

১৯। রাজকৃষ্ণ রায়

২০। পীতাম্বর রায় চৌধুরী

২১। কেদারনাথ রায় চৌধুরী

২২। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র রায় চৌধুরী

(স্ত্রী সুবাসিনী শিবহাটী গ্রামের স্বর্গীয় শশধর রায় চৌধুরীর কন্যা; অবসর-প্রাপ্ত ম্যাজিষ্ট্রেট মুরলীধর রায় চৌধুরী ও সুপ্রসিদ্ধ কবি ভুজঙ্গধর রায় চৌধুরীর ভগিনী)।

শান্তিকুমার	প্রীতিকুমার এম-বি	তৃপ্তিকুমার	স্মৃতিকুমার
এম-এ, বি-এল ব্যারিষ্টার	(মেডিকেল প্রাক্‌টিসনার)	(চার্টার্ড একাউণ্ট্যাণ্ট সেক্রেটারী, ক্যাল্‌কাটা ইম্‌প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট)	এম-এসসি, বি-এল্ য়্যাড্‌ভোকেট্, হাইকোর্ট

অঘোরকামিনী দেবী

বাঙ্গালার সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক স্বদেশপ্রাণ নিঃস্বার্থ কর্ম্মবীর ও জননায়ক শ্রীযুক্ত বিধানচন্দ্র রায়, মহাশয়ের জননী অঘোরকামিনী দেবী চব্বিশ পরগণা জিলার অন্তঃপাতী শ্রীপুর গ্রামে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা বিপিনচন্দ্র বসু বনিয়াদী কায়স্থ-বংশসম্ভূত ছিলেন। বিপিনচন্দ্র কণ্ট্রাক্টরের কার্য্য করিতেন এবং অনেককে সাহায্য করিতেন। অঘোরকামিনীর ১০ বৎসর বয়ঃক্রম-কালে প্রকাশচন্দ্র রায়ের সহিত বিবাহ হয়। প্রকাশচন্দ্রের বয়ঃক্রম তখন অষ্টাদশ। তিনি বহরমপুর কলেজে তখন এফ-এ পড়িতেছিলেন।

বিবাহের অব্যবহিত পূর্ব্বে একদিন অঘোরকামিনী দেবী স্বামীকে প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া দেখিবার ইচ্ছা করিয়া পিতৃগৃহের ছাদে উঠেন এবং অন্যমনস্কভাবে চলিতে চলিতে ছাদ হইতে পড়িয়া যান; কিন্তু ভাগ্য-ক্রমে নীচে গাছের উপর পড়ায় বিশেষ আঘাত পান নাই।

অঘোরকামিনীর তিন পুত্র ও দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ৪০ বৎসর বয়সে অঘোরকামিনী মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন। হৃদ্‌যন্ত্রে বাতাশ্রয় করায় তাঁহার মৃত্যু ঘটে। তাঁহার সেবাব্রত ও ধর্ম্ম-জীবন আদর্শস্থানীয়।

স্বামী স্ত্রী উভয়েই ধার্ম্মিক ও ভক্তিপ্রাণ ছিলেন। তাঁহারা উভয়ে সংসারক্ষেত্রকে ধর্ম্মক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছিলেন। স্বামী স্ত্রী উভয়ের সম-সাহচর্য্যের এরূপ দৃষ্টান্ত সাংসারিক জীবনে কচিৎ দৃষ্ট হয়। অঘোরকামিনীর বিনয়-নম্র প্রকৃতি, ভক্তিপ্রবণ হৃদয় ও উৎসাহের গুণে তাঁহার স্বামী সাংসারিক জীবনে অতুল সুখ, কর্ম্মে বিপুল শান্তি ও হৃদয়ে

অপরিমেয় বল পাইয়াছিলেন। ঈদৃশ ধর্ম্মপ্রাণ স্ত্রীর সাহচর্য্যে অনুপ্রাণিত হইয়া প্রকাশচন্দ্র নৈতিক জীবনে, নিষ্ঠায় ও সদাব্রতে বিশেষ উন্নতিগামী হইয়াছিলেন। তিনিও স্ত্রীর ন্যায় মানবসাধারণকে ভালবাসিতে শিখিয়াছিলেন এবং ঈশ্বরোপাসনায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। প্রকাশচন্দ্র কলেজে অধ্যয়ন করিবার কালে ঈশ্বরে অবিশ্বাসী হইয়া উঠিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার ভক্তিমতী স্ত্রীর সংস্পর্শে আসিয়া তিনি আর নাস্তিক থাকিতে পারিলেন না; ক্রমান্বয়ে তিনি ঈশ্বরের একনিষ্ঠ উপাসক হইয়া উঠিলেন।

বিবাহের পর স্বামীর ইচ্ছাক্রমে অঘোরকামিনীকে পারিবারিক আচরিত আচার-ব্যবহারের প্রতিকূলে গমন করিতে হইল। এ বিষয়ে অঘোরকামিনী প্রশংসা না পাইলেও সর্ব্ববিধ গৃহকর্ম্মে নিপুণতার জন্য তিনি সকলের নিকট হইতে সুখ্যাতি পাইয়াছিলেন। গৃহস্থালীর কর্ম্মে তাঁহার ঐকান্তিক নিষ্ঠা হইতেই সেবা ও পরোপকার-ব্রতে ভবিষ্যৎ জীবনে তাঁহার আগ্রহ জন্মে।

প্রকাশচন্দ্র প্রথমে বর্দ্ধমানের পোষ্টমাষ্টাররূপে কর্ম্মজীবনে প্রবেশ লাভ করেন। তৎকালে তাঁহার আয় সামান্য হইলেও অঘোরকামিনীর মিতব্যয়িতার গুণে কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। বর্দ্ধমান হইতে প্রকাশচন্দ্র হরিনাভিতে বদলী হয়েন। এই স্থানে ইঁহারা পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর পরিবারের সহিত পরিচিত হয়েন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ব্রাহ্মসমাজের নেতা ছিলেন। তাঁহার ন্যায় জ্ঞানী ও তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির সংস্রবে আসিয়া প্রকাশচন্দ্র নূতন আলোক পাইলেন। এইরূপেই তিনি সম্মিলিতভাবে ঈশ্বরোপাসনায় যোগদান করিয়া জীবনের সার্থকতা উপলব্ধি করেন এবং সমাজ-সংস্কার-কার্য্যে পারিবারিক শিক্ষার উপযোগিতা হৃদয়ঙ্গম করেন।

অতঃপর প্রকাশচন্দ্র ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ প্রাপ্ত হয়েন এবং

মতিহারীতে বদলী হয়েন। স্বামীর সহিত একত্র বসিয়া উপাসনা করিতে আরম্ভ করিলেন, এইরূপে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। তাঁহার চিত্তে ধর্ম্মপ্রবণতা, স্ত্রীজাতির জীবনের উদ্দেশ্য-বিষয়ে উচ্চভাব এবং স্ত্রীর প্রতি তাঁহার ঐকান্তিক অনুরাগ—এ সকল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি স্বর্গীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন, তাঁহার স্ত্রীও তাঁহার আদর্শে অভিভূত হইয়াছিলেন এবং তাঁহারা উভয়ে এই আদর্শ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন।

মতিহারীতে থাকিবার কালে অঘোরকামিনী তথাকার ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারক অঘোরনাথ গুপ্তের উপদেশে ও দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। এইস্থানে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি গৃহ-উপাসনা প্রবর্ত্তন করেন। প্রতি কর্ম্মের প্রারম্ভে তিনি উপাসনা করিতেন ও ঈশ্বরাশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতেন। প্রকাশচন্দ্র মাসকাবারে বেতন পাইলে তাঁহারা উভয়ে সর্ব্বাগ্রে উপাসনা-গৃহে যাইয়া উপাসনা করিতেন এবং তৎপরে ঐ অর্থ নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে নিয়োজিত করিতেন।

মতিহারী হইতে প্রকাশচন্দ্র বাঁকিপুরে বদলী হয়েন। এখানে আসিয়া আত্মিক উন্নতির জন্য ৬ মাসকাল যাবৎ তাঁহারা পরস্পরে পরস্পরের অঙ্গ স্পর্শ করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করেন। এই প্রতিজ্ঞা ৬ মাসকাল পর্য্যন্ত কেন—তাঁহারা আজীবন পালন করিয়াছিলেন। বেশভূষা প্রভৃতি বিষয়ে তিনি এখন হইতে একবারে সম্পূর্ণ সাদাসিদাভাব অবলম্বন করেন। তিনি বিহারের উৎপন্ন মোটা তাঁতের কাপড় পরিধান করিতেন। তাঁহার অলঙ্কারাদি মূল্যবান জিনিষগুলি তিনি অতঃপর আর ব্যবহার করেন নাই। অধিকন্তু ঐগুলি তিনি দুর্ভিক্ষপীড়িতদিগের সাহায্যার্থ দান করিয়াছিলেন। পার্থিব সুখ-সম্ভোগ তিনি একেবারেই ত্যাগ করিয়াছিলেন। প্রবৃত্তিমার্গ এই সময় হইতে তিনি একেবারেই নিরোধ করেন। তাঁহার স্বামী স্বহস্তে তাঁহার

মস্তকের কেশ কর্ত্তন করিয়া দিয়াছিলেন। বৌদ্ধদিগের তীর্থস্থান রাজগৃহে তাঁহারা গমন করিয়াছিলেন এবং তথায় মস্তক মুণ্ডন করিয়া উপাসনা-সমাপনান্তে কেশবচন্দ্র সেনের নবসংহিতার নির্দ্দেশ-মতে উভয়ের মধ্যে আত্মিক পরিণয় সম্পন্ন করেন। রোম্যান ক্যাথলিকদিগের মতে এই প্রকার উদ্বাহ হইয়া থাকে বটে, কিন্তু উহা দৈহিক উদ্বাহ, আত্মার সহিত আত্মার পরিণয় নহে। ঐ সময়ে অঘোরকামিনীর বয়স ২৬ বৎসর ছিল এবং তাঁহার স্বামীর বয়স ছিল ৩৫ বৎসর। ঈশ্বরোপাসনায় উৎসাহিত জীবন এবং কামনা-বাসনা-হীন হইয়া সংসারক্ষেত্রে বিচরণ করিবার কঠোর শিক্ষা তাঁহাদেব জীবনে কিরূপে প্রকটিত হইয়াছিল অথবা ইহার সার্থকতা কি—জড়বাদীর নিকট তাহা দুজ্ঞেয়। এইরূপ পরিণয়ের অর্থ পুরুষ ও স্ত্রীর আত্মার একীভূত ভাব—ইহাতে একের সত্ত্বা বিলীন হইযা অপরের সত্ত্বার সহিত সম্মিলিত হইয়া যায়, পুরুষ বা স্ত্রী কাহারও আর স্বাতন্ত্র্য থাকে না। এই পরিণয়ের উদ্দেশ্য তাঁহাদের জীবনে উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হইযাছিল। এই আত্মিক পরিণয়ের পর তাঁহারা উভয়ে গীতার উপদেশ অনুযায়ী সম্পূর্ণরূপে কামনা-বাসনা বিসর্জ্জন দিয়া মানবসেবায় আত্মবিয়োগ করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য দার্শনিক কোমৎ এতদপেক্ষা উজ্জ্বলতর আদর্শ কল্পনা করিতে পারেন নাই। এতদ্‌সম্পর্কে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, শ্রীমতী ম্যাঙ্গার ও জন্মনিরোধ লীগ অঘোরকামিনী ও তাঁহার স্বামীর জীবনী হইতে মহান্ দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিতে পারিতেন।

অঘোরকামিনীর স্বামী তাঁহাকে গীতার আদর্শ অনুযায়ী কর্ম্মযোগিনী আখ্যা দিয়াছিলেন। দৈনন্দিন কর্ম্মসম্পাদনে তাঁহাদের উভয়ের দ্বিত্ব-ভাব পরিলক্ষিত হইত না। প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগ করিবার পূর্ব্বে তিনি স্বামীর সহিত সমস্বরে 'মাতৃ'-স্তোত্র পাঠ করিতেন। তৎপরে তিনি ভজনালয় পরিষ্কার করিয়া স্বামীর আগমনের অপেক্ষা করিতেন

এবং স্বামী আসিলে উভয়ে একত্র ঈশ্বরোপাসনায় তন্ময় হইয়া যাই-তেন। যেদিন তিনি প্রাণ খুলিয়া উপাসনা করিতে না পারিতেন, সেদিন তিনি অস্বচ্ছন্দতা বোধ করিতেন এবং স্বীয় দোষাদির পর্য্যালোচনা করিতেন।

এই সময়ে তিনি ব্রাহ্মসমাজের (নববিধান) উৎসবোপলক্ষে কলিকাতায় আইসেন। এই উপলক্ষে তিনি কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা শ্রবণ করেন, সমবেত রমণীগণের উপাসনা শ্রবণ করেন এবং স্বয়ং উপাসনায় যোগ দেন। কেশবচন্দ্র তাঁহাকে দেখিবামাত্র তাঁহার গুণের পরিচয় পাইলেন এবং অন্যান্য রমণীগণকে তাঁহার নিকটে উপাসনা শিক্ষা করিতে বলিলেন। তিনি কেশবচন্দ্রকে এই বলিয়া অনুরোধ করিয়াছিলেন, 'দয়া করিবেন, ভুলিবেন না।' উত্তরে কেশবচন্দ্র বলিয়াছিলেন—'এ কি কখনও ভুলা যায়?'

বিহারবাসী বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানী বালিকাদিগের মধ্যে সুশিক্ষা প্রচারের জন্য তাঁহার হৃদয়ে এক্ষণে বলবতী স্পৃহা জাগরিত হইল, কারণ তৎকালে বাঁকিপুরে উপযুক্ত বালিকা-বিদ্যালয় ছিল না। সুতরাং অঘোরকামিনী ৩৫ বৎসর বয়সে লক্ষ্ণৌ যাইয়া তথাকার থোবার্ণ বালিকা বিদ্যালয়ে থাকিয়া স্কুল ও বোর্ডিং পরিচালন করিবার পদ্ধতি শিক্ষা করিবার অভিলাষ করিলেন। অধিক বয়সে তাহার এই প্রকার উদ্যম যে তাঁহার প্রকৃতির অনুকূল ছিল, তাহা নিম্নকথিত কাহিনী হইতে স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে:—এক সময়ে তাঁহারা স্বামীস্ত্রী উভয়ে কোন দূরবর্ত্তী স্থানে যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে চিত্রকূটপর্ব্বত তাঁহাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয়। কিন্তু ঐ স্থানে পথ অতিবাহন করিবার জন্য অশ্ব ব্যতীত অপর কোন যান বা বাহন ছিল না। অঘোরকামিনীর ন্যায় দুর্ব্বলা মহিলা যিনি কখনও অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করেন নাই, তিনি অবলীলাক্রমে অশ্বে আরোহণ করিয়া গন্তব্য স্থান পর্য্যন্ত গমন করিলেন। সুতরাং এই

উত্থমশীলা মহিলা সংসার ও সন্তান-সন্ততি ছাড়িয়া একাকিনী থোবার্ণ স্কুলে যাইয়া থাকিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করিলেন না। মিস্ থোবার্ণ স্কুলের কঠোর নিয়ম-পালন-বিষয়ে অঘোরকামিনীর সম্বন্ধে কতকটা শৈথিল্য বিধান করিলেও তিনি তাঁহার সে কৃপা গ্রহণ না করিয়া নিয়মগুলি যথাবিধি মানিয়া চলিতেন। বোর্ডিং স্কুলে তিনি নিম্নরূপ সময় রক্ষা করিতেন:—

প্রভাতে ৪।৩০ হইতে ৫টা পর্য্যন্ত উপাসনা; ৫টা হইতে ৬টা ঘর পরিষ্কার, বস্ত্র-পরিবর্ত্তন ও প্রাতরাশ; ৬টা হইতে ১০-৩০টা স্কুলে পড়া; ১০-৩০টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত স্নান, আহার ও বিশ্রাম; ১২টা হইতে ৫-৩০টা পুনরায় স্কুলে পড়া; ৫-৩০টা হইতে ৬টার মধ্যে আহার; সন্ধ্যা ৬টা হইতে ৭টা স্তোত্রপাঠ ও সঙ্গীত, ৭টা হইতে ১০টা পুনরায় স্কুলে পড়া; ১০-৩০টা হইতে ১১টার মধ্যে সঙ্গীত; তৎপরে নিদ্রা। এইরূপ দৈনিক নির্দ্ধারিত কর্ম্মগুলি (routine) তিনি যথাযথ পালন করিতেন। তিনি প্রত্যহ ইংরাজি ও হিন্দী শিখিবার জন্য ১৩ ঘণ্টাকাল পরিশ্রম করিতেন এবং যখন শ্রান্তি অনুভব করিতেন তখনই উপাসনা-গৃহে যাইতেন এবং উপাসনা করিয়া নব-উৎসাহ পাইতেন। কখনও কখনও তিনি একাদিক্রমে ৪ ঘণ্টা পর্য্যন্ত নাম জপ করিতেন। বোর্ডিংএ তিনি কদাচ উৎকৃষ্ট খাদ্য গ্রহণ করিতেন না, তাহার কারণ তাঁহার স্বামী সেইসব খাদ্যের অংশভাগী হইতেন না। একদা কোন ইংরাজ-মহিলা তাঁহাকে এক গুচ্ছ আঙ্গুর খাইতে দিয়াছিলেন, অঘোরকামিনী সেইগুচ্ছ হইতে মাত্র একটী আঙ্গুর লইলেন। তাহাতে মহিলাটী বলিয়াছিলেন—"মিসেস্ রায়, তুমি ঈশ্বরকে পাইয়াছ, দয়া করিয়া আমাকে মনে রাখিও।" এক এক সময়ে অঘোরকামিনীর আচরণে মুগ্ধ হইয়া মিস্ থোবার্ণ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতেন। অঘোর কামিনী এই স্কুলে কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতিও শিক্ষা করিয়াছিলেন। এই সুযোগে কয়েকটী য়ুরোপীয় মহিলার সহিত পরিচয় লাভ করিয়া তিনি বিশেষ কৃতার্থ হইয়াছিলেন।

এই সময়ে তাঁহার পুত্র সুবোধচন্দ্র (এক্ষণে ব্যারিষ্টার মিঃ এস-সি রায়) কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত—এই মর্ম্মে তিনি পত্র পাইলেন। তিনি শুধু ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলেন। এই সময়ে এক মাসকাল পরস্পরকে চিঠি লেখা বন্ধ করিয়া প্রত্যেকে নিজের মনের ভাব একটা খাতাতে লিখিয়া রাখিতেন, পরে দেখা গেল, প্রত্যেক দিনের লেখার উত্তর লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। ইহাতে তাঁহার অন্তরের পবিত্র ভাবধারা এবং স্বামীর জন্য উৎকণ্ঠা প্রকটিত হইয়াছে

মিস্ থোবার্ণের স্কুলে ৯ মাস কাটাইয়া অঘোরকামিনী বাঁকিপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। বাঁকিপুরের প্রসিদ্ধ উকিল গুরুপ্রসাদ সেন কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটী ক্ষুদ্র বালিকা-বিদ্যালয় ব্যতীত বাঁকিপুরে দ্বিতীয় বালিকা-বিদ্যালয় ছিল না। অঘোরকামিনী এই স্কুলের ভার গ্রহণ করিয়া বলিয়াছিলেন, "ধন নাই, ছাত্রী নাই, শিক্ষয়িত্রী নাই। যাহা হউক, আমি গ্রামে গ্রামে ও বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া অর্থ সংগ্রহ করিব এবং এই উদ্যমে কৃতকার্য্য হইব।" স্কুলের বোর্ডিং তাঁহার বাড়ীতেই স্থাপন করিলেন এবং এইটীকে "তাঁহার পরিবার" নাম দিয়াছিলেন; তাঁহার মৃত্যুর পর ইহা "অঘোর-পরিবার" নামে আখ্যাত হইয়াছিল। অর্থ-সংগ্রহ-বিষয়ে তিনি কাহারও উপর জিদ করেন নাই। যিনি স্বেচ্ছায় যাহা দিতেন, তাহাই গৃহীত হইত। সাধারণের দান হইতে ব্যয় সঙ্কুলন হইত না, সুতরাং প্রকাশচন্দ্র প্রতি মাসেই অর্থ যোগাইতেন। ছাত্রীর সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল, অবশেষে স্কুলটী এণ্ট্রান্স ষ্ট্যাণ্ডার্ডে উন্নীত হইল এবং অচিরে উহা বিহারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়ে পরিগণিত হইল।

অঘোরকামিনী স্কুলের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। যথা-সময়ে নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিবার পদ্ধতি তিনি স্পষ্টরূপে পালন করিতেন। তিনি নিত্য বোর্ডিংয়ের বালিকাদিগের তত্ত্বাবধান করিতেন, নিজের

পুত্রগণের পাঠ ও খাস্থ্য-বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন, রোগীর সেবা করিতেন, নীচের ক্লাশের মেয়েদের পড়াইতেন এবং শিশুদিগকে কিণ্ডার-গার্টেন শিক্ষা দিতেন। এতদ্ব্যতীত বালিকাদিগকে রন্ধন-শিক্ষা দেওয়া, হিন্দুস্থানী ভদ্রলোকদিগের বাডী যাইয়া ছাত্রী সংগ্রহ করা ও স্কুলের অন্যান্য খুঁটিনাটি কার্য্য করা তাঁহার একপ্রকার নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্যের মধ্যে গণ্য ছিল। গুরুপ্রসাদ সেন ও প্রকাশচন্দ্র ব্যতীত অপর কাহারও ঐকান্তিক সাহায্য তিনি পান নাই। সর্ব্বদা কার্য্যে নিরত থাকিয়াও অঘোরকামিনী রীতিমত উপাসনা, ধ্যান, নাম-জপ, ধর্ম্মপুস্তক পাঠ প্রভৃতি আধ্যাত্মিক কর্ম্মে কখনও অবহেলা করেন নাই। এই সকল অনুষ্ঠান হইতে তিনি হৃদয়ে বল পাইতেন।

কমিশনার (পরে সেক্রেটারী) মিঃ বোল্টন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,—"স্কুল দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম। লণ্ডনে এই সকল কার্য্য পরি-চারিকারা ও বিধবারা সম্পন্ন করে। আপনার স্বামী ও পুত্র-কন্যা আছে, তথাপি আপনি এত কার্য্য করেন—এরূপ দৃষ্টান্ত প্রকৃতই বিরল।" সরকার হইতে অতঃপর মাসিক সাহায্যের বন্দোবস্ত হইয়াছিল।

বহু লোক নিত্য তাঁহাদের বাটীতে পরামর্শ লইবার জন্য যাইতেন এবং বহু দুঃস্থ ব্যক্তি সাহায্যার্থ তাঁহাদের শরণাপন্ন হইতেন। অঘোর-কামিনী দুঃস্থ ও পীড়িত লোকদিগের দুঃখে সর্ব্বদা বিচলিত হইতেন। পরহিতে দান ও পরের সেবার জন্য তিনি যে সকল উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন, সে সকলের বিবরণ এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে দেওয়া সম্ভব নহে। যখনই তাঁহার কর্ণগোচর হইত যে, কোন বাঙ্গালী বা হিন্দুস্থানী পীড়ায় কষ্ট পাইতেছে এবং সেবা-শুশ্রূষা হইতেছে না, তিনি আর কালবিলম্ব না করিয়া তখনই তথায় গমন করিতেন। গভীর রাত্রিতেও তিনি এরূপ সেবা-কার্য্যে যাইতে কুণ্ঠিত হইতেন না। একবার শীতকালের রাত্রিতে তিনি কোন ব্রাহ্মণীর পুত্রের কঠিন পীড়ায় সংবাদ পাইয়া রাত্রি ১টার

সময় তথায় গমন করেন। পুত্রটী অবশ্য মারা যায়। অঘোরকামিনী সেই রাত্রিতেই মৃতদেহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করাইবার জন্য স্বয়ং লোক সংগ্রহ করিয়া দেন এবং অন্যান্য বন্দোবস্ত করিয়া দেন। বালকের শোকার্ত্ত মাতাকে তিনি সান্তনা দিতে থাকেন এবং পরদিন বেলা ৯টার সময় বাড়ীতে ফিরেন। তৎপরে উপাসনা করিয়া একটু দুগ্ধ পান করেন এবং যথারীতি স্কুলে যান।

এক সময় তাঁহার কোন ভূতপূর্ব্ব ছাত্রী সন্তান প্রসব করিবার পর বিশেষ কষ্ট পাইতেছিল। অঘোরকামিনী সংবাদ পাইয়া তথায় গমন করেন এবং স্বহস্তে আঁতুড়-ঘর পরিষ্কার করিয়া ডাক্তার ডাকেন। রোগিণীর অবস্থা নিতান্ত সঙ্কটজনক ছিল। তিনি উহাকে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে বলেন; সেও প্রার্থনা করিতে করিতে শান্তিতে ইহলোক ত্যাগ করে।

বঙ্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাগ্মী প্রতাপচন্দ্র মজুমদার অঘোরকামিনীর সম্বন্ধে নিম্নরূপ লিখিয়া গিয়াছেন—"তাঁহার জীবন পরসেবায় উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। একবার কোন এক উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীর স্ত্রী প্রসবান্তে কষ্ট পাইতেছিলেন। অঘোরকামিনী তথায় শুশ্রূষা করেন, কিন্তু শিশুটী মারা যায়। প্রতি বৎসর তিনি অনেক যাত্রীসহ রাজগৃহে যাইতেন। পথে কীর্ত্তন হইত এবং পথিকদিগকে সদুপদেশ দেওয়া হইত। রাজগৃহে যাইয়া তাঁহারা দুই তিন দিন যাবৎ উৎসবে মত্ত থাকিতেন। সেবায় তিনি আত্মোৎসর্গ করিতে জানিতেন। সৎকর্ম্মে তাঁহার অদম্য উৎসাহ ছিল। তাঁহার চিত্ত শুদ্ধ ছিল এবং ঈশ্বরের প্রতি তাঁহার অগাধ বিশ্বাস ছিল। প্রকাশ ও অঘোর পরস্পর পরস্পরের সহযোগী ছিলেন।"

"নিত্য কঠোর পরিশ্রম করিয়া অঘোরকামিনীর স্বাস্থ্য অবশেষে ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িল। স্বাস্থ্যের অবস্থা খারাপ হইলেও তিনি দৈনন্দিন কর্ম্মে, সেবাধর্ম্মে ও ধর্ম্মপ্রচারে বিরত হয়েন নাই। তাঁহার ডায়েরীতে তিনি

একস্থানে লিখিয়া গিয়াছেন—"এইস্থানে আমার কর্ম্ম শেষ হইল। এখানে কার্য্যে আর তৃপ্তি পাইতেছি না। আমি অন্য জগতে যাইবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছি এবং তথাকার রীতিনীতি জানিবার জন্য উৎসুক হইয়াছি। মা গো আমাকে ঐ সকল শিক্ষা দাও।"

কয়েক দিন পরেই তাঁহার হৃদ্‌যন্ত্রে বাতরোগ আশ্রয় করিল; চিকিৎসকেরা কোন প্রতীকার করিতে পারিলেন না। পরিশেষে তিনি ইহধাম ত্যাগ করিলেন।

অঘোরকামিনীর বাল্যে বিবাহ হইয়াছিল সত্য, কিন্তু বাল্য বিবাহের কোন কুফল তাঁহাদের জীবনে ফলে নাই। তাঁহাদের দাম্পত্যজীবন আদর্শস্থানীয় ছিল। তাঁহার পুত্রেরা যশস্বী হইয়াছেন। অঘোর-পরিবার সেবাব্রতের যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন তাহা সাধারণতঃ ক্বচিৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত (১১ই পৌষ ১৩৪৪) অধ্যাপক ডাঃ শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার এম-এ-পি-এইচ-ডি, ভাগবতরত্ন-লিখিত "পাটনায় বাঙ্গালী" প্রবন্ধে অঘোরকামিনী দেবী সম্বন্ধে লেখা হইয়াছে :—

"বিহারের নারীজাগরণের মূলেও বাঙ্গালী মহিলার উদ্যম ও অনুপ্রেরণা রহিয়াছে। প্রায় ৫৩ বৎসর পূর্ব্বে, কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের মাতা অঘোরকামিনী দেবী একটি নারী সমিতি গঠন করেন। এই সমিতি এখন "অঘোরকামিনী নারী সমিতি" নামে সুপরিচিত। রোগীর সেবা, দুঃস্থ মেয়েদিগকে স্বাবলম্বী করিবার চেষ্টা ও মেয়েদের মধ্যে জ্ঞানপ্রচারই এই সমিতির উদ্দেশ্য। এখানে নয়াটোলায় অঘোরকামিনী দেবীর বাস-গৃহে সায়েন্স কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টায় একটি 'বালিকা বিদ্যালয়' স্থাপিত হইয়াছে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মহিলাদের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপন করার উদ্দেশ্যে "স্ত্রী-সম্মেলন" নামে আর একটি প্রতিষ্ঠানও এখানে বর্ত্তমান আছে; এতাবৎ কাল বঙ্গমহিলারাই 'তাহার সম্পাদনা করিয়া আসিতেছেন।"

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন চট্টোপাধ্যায়

লিলুয়ার চট্টোপাধ্যায়-বংশ

রায় শ্রীযতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর

বড় বেশী দিনের কথা নয়, বর্ত্তমান হাওড়া সহরের এলেকার পরেই তিনটী উন্নতিশীল গ্রাম ছিল; উহাদের নাম—বেলুড়, বালী ও উত্তরপাড়া। এই তিনটী গ্রামই প্রসিদ্ধ গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড নামক রাজপথের পার্শ্বে অবস্থিত। এই গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরিয়া লোক তখন বারাণসী, এমন কি দিল্লী পর্য্যন্ত যাইত। এই গ্রামগুলির মধ্যে এক শিক্ষিত ব্রাহ্মণ জমিদার পরিবারের আশ্রয়ে থাকিয়া উত্তরপাড়ার খ্যাতি-প্রতিপত্তি খুবই বৃদ্ধি পাইয়াছিল; এই জমিদার-পরিবারের কর্ত্তা ছিলেন স্বর্গীয় জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়। অপর দুইটী গ্রাম খ্যাতি-প্রতিপত্তিতে উত্তরপাড়ার প্রায় সমতুল্য হইয়া উঠিয়াছিল; এমন কি দীর্ঘকাল ধরিয়া বালী ও উত্তরপাড়ার মধ্যে অবাঞ্ছনীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতাও যথেষ্ট ছিল। উত্তরপাড়ার অন্যান্য সুবিধার মধ্যে একটি ছিল এই যে, উহার মাথার উপর এমন কতকগুলি ধনী, প্রভাবশালী ও শিক্ষিত জমীদার-পরিবার ছিলেন যাঁহারা বুঝিতেন যে, প্রজাদের উন্নতি, সন্তোষ, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং স্বেচ্ছামূলক আনুগত্যের উপরই তাঁহাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি নির্ভর করে। বালীগ্রামের এই সুবিধা ছিল না। সেকালে বালীর অধিবাসীরা ভারত-গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারীর দপ্তরখানার বহু যোগ্য কর্ম্মচারী সরবরাহ করিয়াছিলেন। বেলুড়ের অধিবাসীদের মধ্যে অনেকেই নানাবিধ সরকারী কার্য্যে বৈশিষ্ট্য ও প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

প্রায় একশত বৎসর হইল, বেলুড়ের অধঃপতন আরম্ভ হইয়াছে। নগর-বাসের প্রলোভনে লোক যখন পল্লী ত্যাগ করিতে লাগিল, তখন হইতেই পল্লীগ্রামসমূহ নষ্ট হইতে বসিল। বেলুড় গ্রামটিও এই ধ্বংসের

হস্ত হইতে রক্ষা পায় নাই। গ্রামের কৃতী সন্তানগণ বাহিরের কর্ম্মক্ষেত্রে থাকিতেন ; সুতরাং গ্রামের সহিত তাঁহাদের সংশ্রব ক্রমে লোপ পাইতে লাগিল। যাঁহাদের অবস্থা মন্দ তাঁহারই থাকিতেন গ্রামে। কাজেই পল্লীজীবন পূর্ব্বের উচ্চ আদর্শ হইতে হীন হইয়া পড়িতে লাগিল। ক্রমে ইহার ফল হইল—গ্রামের ভাল ভাল বাস্তুভিটা, উৎকৃষ্ট ভদ্রাসন বা বাস-গৃহগুলি পরিত্যক্ত হইয়া জঙ্গলে পূর্ণ হইল। প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের উভয় পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহে এমন ঘন জঙ্গল হইয়াছিল যে, দুষ্ট লোকে তথায় লুকাইয়া থাকিত এবং অসাবধান পথিকদের উপর রাহাজানি করিত। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানী যখন তাঁহাদের রেলপথের উপর লিলুয়া ষ্টেশন খুলিলেন এবং বেলুড়ে একটি কারখানা ও ডিবিসন্যাল বা বিভাগীয় হেড কোয়াটার্স স্থাপন করিলেন, তখন ক্রমে ক্রমে এই অঞ্চলের জঙ্গল ও আবর্জ্জনা দূরীভূত হইল ; এক্ষণে সেই স্থানে একটি সুদৃশ্য উপনিবেশ গড়িয়া উঠিয়াছে।

বেলুড়ের ব্রাহ্মণ অধিবাসিবর্গের মধ্যে রামশঙ্কর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অন্যতম ছিলেন। প্রকাশ,—এক্ষণে লিলুয়া গ্রামে যেখানে "হীরাকুঞ্জ" নামক সৌধাবাস নির্ম্মিত হইয়াছে, সেই স্থানের সন্নিকটে চট্টোপাধ্যায়-পরিবারের আদিনিবাস ছিল। কিন্তু এই অঞ্চলে ডাকাতের উপদ্রব হইত বলিয়া তাঁহারা বর্ত্তমান গার্ডিনার রোড নামক যে রাস্তাটী রেলওয়ে কলনির ভিতর দিয়া গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে আসিয়া পড়িয়াছে, উহার নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে উঠিয়া আসিয়া বসবাস স্থাপন করেন। এই স্থানটিও গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের খুবই সান্নিধ্যে ছিল।

রামশঙ্করের পৌত্র ও রামচন্দ্রের পুত্র রামকুমারের বাটী গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের নিকটেই ছিল। রামকুমারের তিন পুত্র—মহেন্দ্রনাথ, বৈকুণ্ঠ ও শ্যামাচরণ এবং তিন কন্যা। তখনকার কালের কুলীনপরিবারের প্রথা-নুসারে রামকুমার তাঁহার দুইটী জামাতাকে স্বগৃহে রাখিয়াছিলেন।

স্বর্গীয়া গঙ্গামণি দেবী
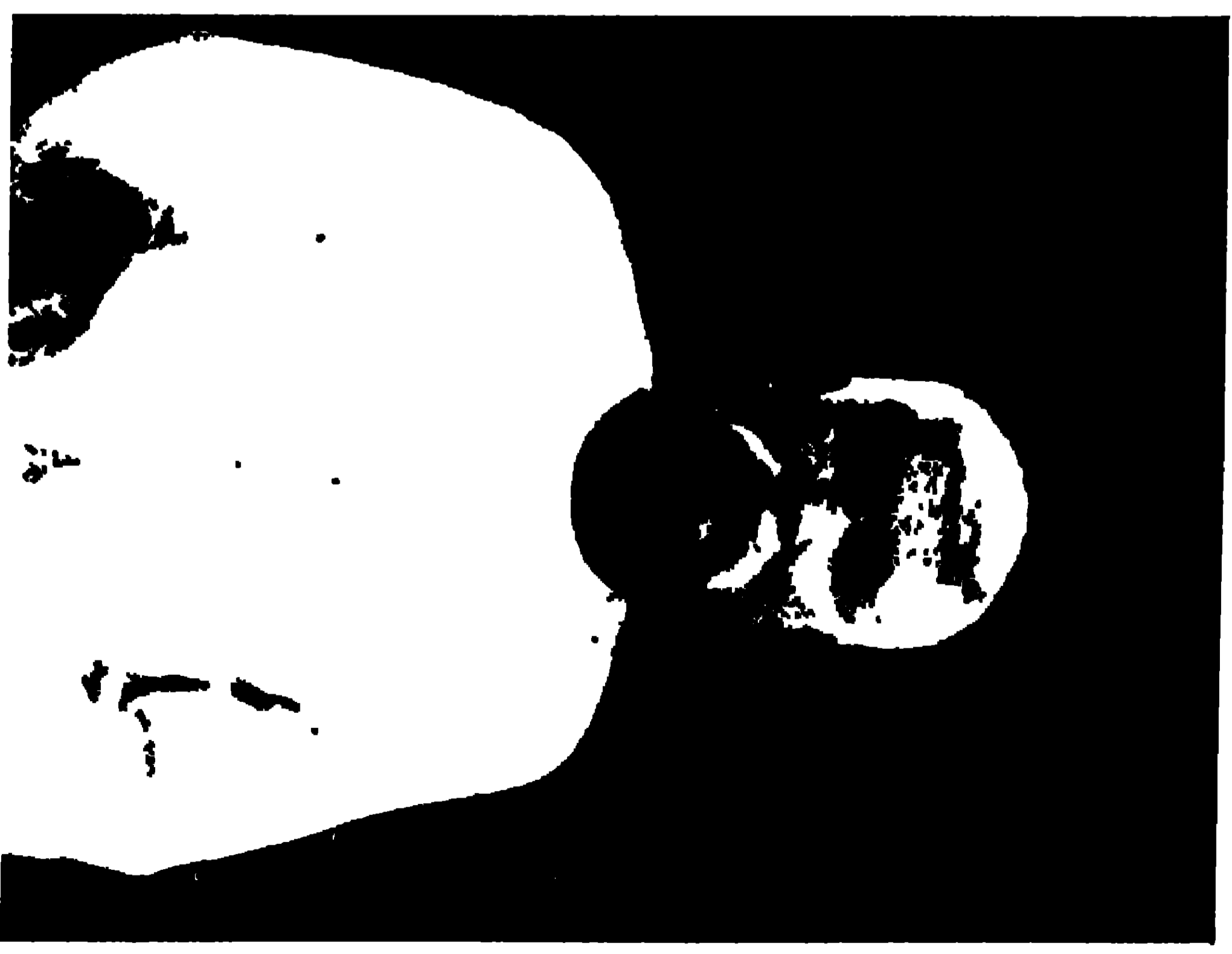
স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

জ্যেষ্ঠা কন্যার সন্তানগণের মধ্যে ছিলেন—অবিনাশ, অঘোর, হরি ও নিবারণ। অবিনাশ ও হরি ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়েতে কর্ম্ম করিতেন। ইঁহারা বেলুড়ে বাড়ী করিয়াছিলেন; পরে রেলওয়ে যখন ভূমিসংগ্রহ করেন, তখন ইঁহাদের এই বাড়ীও উহার ভিতর পড়িয়া যায়। মধ্যমা কন্যা নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করেন। কনিষ্ঠা কন্যার সহিত শিবপুরের গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়। ইঁহার পুত্র চঞ্চল বন্দ্যোপাধ্যায় বিহার গবর্ণমেণ্টের পাবলিক ওয়ার্কস বিভাগের ওভারসিয়ার ছিলেন।

মুখোপাধ্যায়-বংশের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে উত্তরপাড়ার চৌধুরী-বংশের অত্যন্ত প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। ইঁহারা ঢাকা জেলার বিক্রমপুর হইতে মহাদেব বন্দ্যোপাধ্যায় নামক এক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতকে উত্তরপাড়ায় আনয়ন করেন ও তথায় তাঁহার বসবাসের ব্যবস্থা করিয়া দেন। এই জন্য অদ্যাবধি তাঁহার বাড়ীকে উত্তরপাড়ার লোকে 'বাঙ্গালবাড়ী' বলিয়া থাকেন। মহাদেবের পুত্রের নাম নীলকণ্ঠ। নীলকণ্ঠের পুত্র দুর্গাচরণ ও পৌত্র বিশ্বনাথ। বিশ্বনাথের কন্যা গঙ্গামণি দেবীর সহিত মহেন্দ্রনাথের বিবাহ হইয়াছিল।

মহেন্দ্রনাথের যখন বিবাহ হয়, তখন তাঁহার বয়স ১১ বৎসর এবং গঙ্গামণির বয়স ৯ বৎসর। তরুণ বয়সে মহেন্দ্রের স্বাস্থ্য ভাল ছিল না। এইজন্য তাহার পড়াশুনা ভাল হইত না; সুতরাং তিনি নৈরাশ্যগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কালীচরণ গঙ্গোপাধ্যায় তাহার শ্যালীপতি বা ভায়রাভাই। ইঁহার ও মহেন্দ্রনাথের—দুইজনেরই পুরাতন উদরাময় রোগ ছিল। ইঁহারা দুইজনে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, পশ্চিমে বায়ু পরিবর্ত্তন করিয়া আসিলে এই রোগ সারিয়া যাইবে। সিপাহী-বিদ্রোহের পূর্ব্ব বৎসর—১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা বাড়ী হইতে পশ্চিম যাত্রা করিলেন। প্রথমে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে-যোগে রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত যাই-

লেন। কারণ, তখন রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত এই রেলপথের সীমা ছিল, ইহার পরে রেল-লাইন আর নাই। তবে রেলপথ তৈয়ারী হইতেছিল। ট্রেণ হইতে নামিয়া তাঁহারা আহার ও বিশ্রামের জন্য একটি চটিতে আশ্রয় লইলেন। চটিওয়ালা তাঁহাদিগকে মোটা চিড়া ও গুড় খাইতে দিল। ইহা দেখিয়া দুই উদরাময়-পীড়াগ্রস্ত রোগী পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিলেন এবং ইহা উদরস্থ করিলে পরদিন প্রভাত পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকিবেন কি না—তাহাও তাঁহাদের চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিল। আহার করিতে সঙ্কোচ হইতেছে দেখিয়া চটিওয়ালা বলিল, "কিগো ঠাকুরমহাশয়েরা আপনারা এত ভাব্‌ছেন কি? চিড়া-গুড় খেয়ে নিন, তার পর ঐ ইদারার জল বেশ করে এক ঘটি গলায় ঢেলে দিন, দিয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ুন। আমাদের সন্ধ্যার সময়েই চটি বন্ধ কর্‌তে হয়। কারণ সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'লেই ডাকাত এসে পড়্‌তে পারে। এখানে ডাকাতের উপদ্রব বেশী।" তাঁহারা তাঁহাদের রোগের কথা চটিওয়ালাকে জানাইলেন। কিন্তু চটিওয়ালা তাঁহাদের কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিল। তখন ক্ষুধায় কাতর হইয়া তাঁহারা দুইজনে সেই চিড়া-গুড় খাইয়া ইদারার জল পান করিলেন। তাঁহাদের স্পষ্ট ধারণা হইয়াছিল যে, এই আহারই তাঁহাদের শেষ আহার। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পরদিন প্রাতঃকালে এই দুই যুবক যখন শয্যা ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিলেন, তখন দেখিলেন যে, পুরাতন উদরাময় রোগ হইতে তাঁহারা মুক্তি পাইয়াছেন।

দুই দুঃসাহসী বন্ধু কয়েকদিন রাণীগঞ্জে থাকিলেন; তার পর স্থির করিলেন, তাঁহারা পদব্রজে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে যাত্রা করিবেন। লোকমুখে শুনিলেন, পথে অত্যন্ত চোর-ডাকাতের উপদ্রব। ইহা শুনিয়া তাঁহারা ইউরোপীয় পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া যাত্রা আরম্ভ করিলেন। পথে তাঁহারা যে সকল বিপদ-আপদের সম্মুখীন হইয়াছিলেন, সে

৺হীরালাল চট্টোপাধ
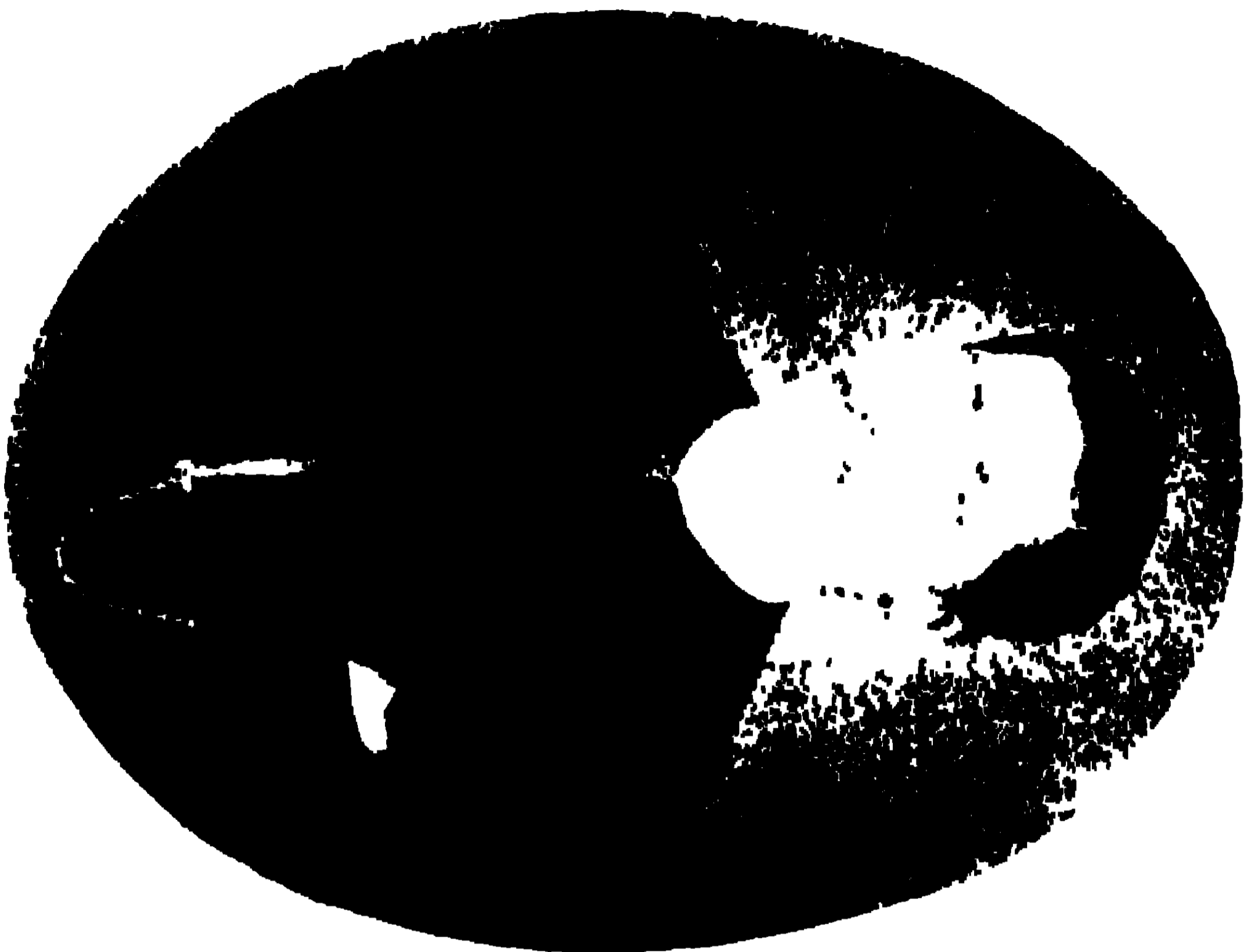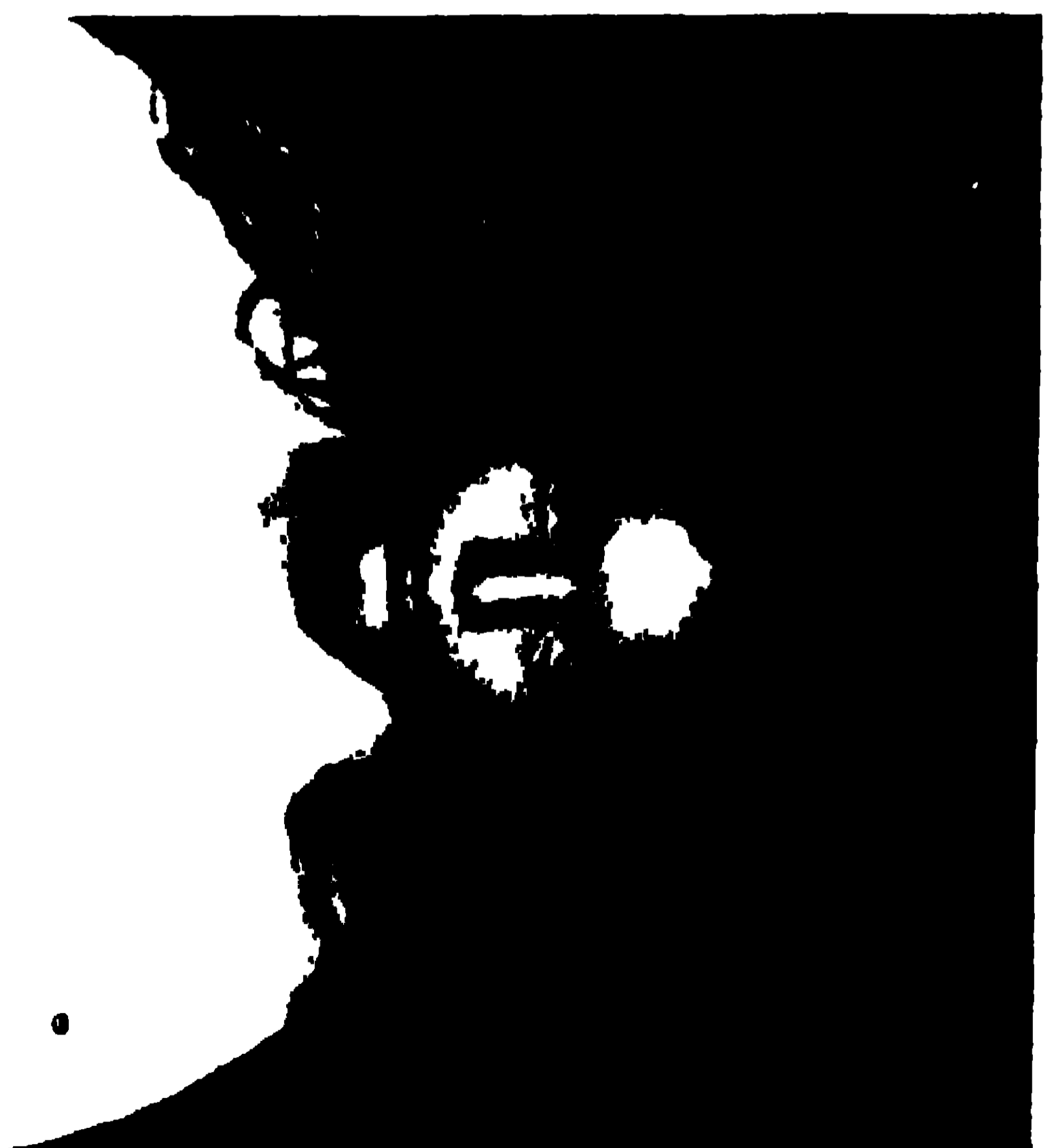
শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবী

সকলের লোমহর্ষণ বিবরণ দেওয়া এখানে সম্ভবপর নহে। যখন তাঁহারা লক্ষ্মীসরাইয়ে উপস্থিত হইলেন, তখন দেখিলেন যে, তথায় নদীর উপর সেতু তৈয়ারী হইতেছে। সেতু-নির্ম্মাণের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারিগণ এই দুই সাহসী বাঙ্গালী যুবকের পরিচয় পাইয়া তাঁহাদিগকে চাকুরী গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহারা তৎক্ষণাৎ সে অনুরোধ রক্ষা করিলেন। ইহাই হইল, মহেন্দ্রনাথের ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের অধীনে কর্ম্মগ্রহণের আরম্ভ; ৪০ বৎসরের উপর কার্য্য করিয়া গত ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে দানাপুর ডিবিশন্যাল অফিসে এক দায়িত্বপূর্ণ পদে কর্ম্ম করিতে করিতে তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

মহেন্দ্রনাথের দুই পুত্র; জ্যেষ্ঠের নাম—হীরালাল। হীরালাল হাবড়া, জামালপুর ও বাঁকিপুরে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। তিনি দৃঢ়কায়, সাহসী, সুরূপ ও সুদর্শন যুবক ছিলেন। দুঃসাহসিক কার্য্যে তাঁহার সবিশেষ অনুরাগ ছিল। বিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্পূর্ণ করিয়া তিনি ডাক্তারী শিখিবার জন্য লাহোরে গমন করেন। তাঁহার মাতা তাঁহাকে এত দূর-বর্ত্তী স্থানে পাঠাইতে অসম্মত ছিলেন। তখনকার দিনে বাঙ্গালা দেশ হইতে লাহোর-যাত্রা এখনকার মত সহজ ছিল না। হীরালাল মাতাকে অনিচ্ছুক দেখিয়া বাড়ী হইতে পলাইয়া যান ও লাহোরে গিয়া তথাকার মেডিক্যাল কলেজে ভর্ত্তি হন। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি লাহোর মেডিক্যাল কলেজের হাউস-সার্জ্জনের পদে নিযুক্ত হয়েন। বলা বাহুল্য, ইহা সরকারী পদ। সেই বৎসর যে চারি বা পাঁচ-জন ছাত্র শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, হীরালাল তাঁহাদের অন্যতম। হীরালাল শল্যবিদ্যায় পারদর্শিতার জন্য রৌপ্যপদক পুরস্কার পাইয়া-ছিলেন। তাঁহার ছোট ভাই মাণিকলাল বাঁকিপুরে বিদ্যা শিক্ষা করেন এবং বাঁকিপুর মেডিক্যাল স্কুল হইতে ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রথম ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের অধীনে ডাক্তারের পদে নিযুক্ত হন।

পরে তিনি এলাহাবাদে ডাক্তারী করিতে আরম্ভ করেন। ইঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র পান্নালাল এলাহাবাদের ডাক্তার। মাণিকলালের চারি কন্যা; সকলেই সুপাত্রে অর্পিত হইয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে একজন বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ও সম্পাদক স্বর্গীয় প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পুত্র-বধূ।

হাওড়া-সালকিয়ার বন্দ্যোপাধ্যায়-বংশ তখনকার কালের সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত ব্রাহ্মণ জমীদারগণের মধ্যে অন্যতম বলিয়া পরিগণিত হইতেন। এই বংশেরই রাধামোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে সালকিয়ার লোকে রাজা রাধামোহন আখ্যায় ভূষিত করিয়াছিল। ইনি বর্দ্ধমানের তদানীন্তন মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের সমসাময়িক ও বন্ধু ছিলেন। শুনা যায়, বাঙ্গালা দেশে তাঁহার বিপুল জমিদারী ছিল এবং উহা হইতে তাঁহার আয় হইত ৪৬ লক্ষ টাকা! তাসের জুয়াখেলায় ইঁহার খুব অনুরাগ ছিল এবং প্রায়ই বর্দ্ধমান-রাজ এই খেলায় তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইতেন। গল্প আছে,—একবার কয়েকটী খেলায় উপরি উপরি রাধামোহনের হার হয় এবং তিনি মহারাজের কাছে তাঁহার অধিকাংশ সম্পত্তি হারিয়া যান। এই সময়ে মহারাজা বলেন, রাধামোহনের আর এমন সম্পত্তি নাই, যাহা দ্বারা তাঁহার সংসারের পান খাওয়ার খরচ চলিবে। এইজন্য তিনি রাধামোহনকে আবার খেলিতে অনুরোধ করেন। রাধামোহন মহারাজার অনুরোধে আবার খেলিতে আরম্ভ করেন এবং সৌভাগ্যবশতঃ নষ্ট সম্পত্তির কিয়দংশ উদ্ধার করিতে সমর্থ হন। দক্ষিণ ভারতের কোন মহারাজার জন্য তিনি গবর্ণমেণ্টের নিকট জামীন হইয়াছিলেন। এই মহারাজা গভর্ণমেণ্টকে রাজস্ব দিতে না পারায় গভর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রতিভূ রাধামোহনের অধিকাংশ জমিদারী সরকারে বাজেয়াপ্ত করিয়া লন।

রাধামোহনের ১১টি পুত্র; কিন্তু তাঁহাদের অধিকাংশেরই তরুণ বয়সে মৃত্যু হয়। রাধামোহনের পরিবার তখন সালকিয়াবাসী ছিলেন

রাধামোহন স্থির করিলেন, পুত্রদিগকে ভাল রকম লেখাপড়া শিখাইতে হইলে কলিকাতায় থাকিতে হইবে; এইজন্য কলিকাতায় একটি বাড়ী খরিদ করিতে হইবে। গল্প আছে, যেদিন রাধামোহন কলিকাতায় বাড়ী ক্রয় করিবার জন্য টাকাকড়ি লইয়া নৌকাযোগে ভাগীরথী পার হইতেছিলেন, সেই সময়ে হঠাৎ একটি টাকা থলি হইতে নদীর জলে পড়িয়া যায়। ইহাতে যে শব্দ হয়, তাহা শুনিয়া রাধামোহনের অত্যন্ত তৃপ্তি হয়। তখন তিনি তাঁহার নায়েবকে জিজ্ঞাসা করেন, "কিসের শব্দ হ'ল হে? বেশ শব্দ ত?" নায়েব জানিত, সত্য কথা বলিলে রাধামোহন দোষীকে ক্ষমা করেন। এই ভরসায় নায়েব বলিল, "থলি থেকে একটি টাকা জলে পড়েছে, তাই শব্দ হয়েছে।" এই কথা শুনিয়া নায়েবকে তিরস্কার করা দূরে থাকুক, তিনি তাহাকে আদেশ করিলেন, "নৌকা থামাও এবং একটার পর একটা করে টাকা গঙ্গার জলে ফেলে ঐ রকম মিষ্টি আওয়াজ আমাকে শুনাও।" নায়েব প্রভুর আদেশ পালন করিল; একটির পর একটি করিয়া একটি থলিয়াস্থিত এক হাজার টাকা ভাগীরথীর গর্ভে নিক্ষিপ্ত হইল। রাধামোহনের খেয়াল পরিতৃপ্ত হইলে তিনি নৌকা চালাইতে বলিলেন। তখন নায়েব বলিল, "বাড়ী কিন্‌বার জন্যে বাড়ীর দর-হিসাবে আমরা যত টাকা নিয়ে যাচ্ছিলাম, তা থেকে এক হাজার টাকা কম পড়্‌ল, আজ আর কলিকাতায় গিয়ে কোন লাভ আছে কি?" রাধামোহন বলিলেন, "ঠিক কথা, নৌকা ফিরাও।" রাধামোহন সেদিন সদলবলে সালকিয়াতে ফিরিয়া আসিলেন; পরে আর একদিন কলিকাতায় গিয়া ১নং চড়কডাঙ্গা ষ্ট্রীট-(এক্ষণে ঠাকুর ক্যাস্‌ল ষ্ট্রীট) স্থিত বাটী ক্রয় করেন। এই বাটীতে পরে তাঁহার অন্যতম পুত্র উমাচরণ বাস করিতেন। এখনও পর্য্যন্ত এই বাড়ীর কিয়দংশে তাঁহার বংশধরগণ বাস করিতেছেন।

রাধামোহনের পুত্রগণ যখন বিদ্যাশিক্ষার জন্য কলিকাতায় অবস্থান করিতেছিল, সেই সময়ে পীতাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায় নামক এক কুলীন ব্রাহ্মণ উহাদিগকে ফার্সী ভাষা শিক্ষা দিবার জন্য গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন। পীতাম্বর ফার্সী ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। বালকদের মধ্যে সকলের অপেক্ষা বয়সে বড় ছিল তারিণীপ্রসাদ। তিনি প্রত্যহ পীতাম্বরের নিকট গল্প শুনিতেন। গল্প বলিতে প্রায় প্রত্যহই রাত্রি ৯টা বাজিয়া যাইত; ছেলেরা মুগ্ধ হইয়া শুনিত। পীতাম্বর তখন ৬৭নং নিমতলা ষ্ট্রীট স্থিত মিশ্রদের বাড়ীতে থাকিতেন। মিশ্র-পরিবার সে সময়ে কলিকাতা-প্রবাসী সম্ভ্রান্ত ধনী ও প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী জমিদারগণের অন্যতম ছিলেন। জমিদার-পরিবারের নিয়মানুসারে রাত্রি ৯টার সময়ে বাড়ীর ফটক বন্ধ হইত। কাজেই অধিকাংশ রাত্রিতে পীতাম্বরের খাওয়া এবং বাড়ীর ভিতরে যাওয়া হইত না। তিনি রাস্তার আলোর নীচে বসিয়া সমস্ত রাত্রি বই পড়িতেন ও অনাহারে জাগিয়া কাটাইতেন। শেষে এই অবস্থা অসহ্য হইয়া উঠিল। একদিন পীতাম্বর তাঁহার ছাত্রদিগকে বলিলেন, "যদি আমি রাত্রি ৯টার পূর্ব্বে যাইতে না পারি, তাঁহা হইলে আমি খাইতেও পাইব না এবং যে বাড়ীতে থাকি সেই বাড়ীতে ঢুকিতেও পাইব না।" ইহাতে তারিণীপ্রসাদ বিস্মিত হইয়া বলিল,—"রাত্রিতে আপনার বাড়ী ফিরিতে দেরী হয় বলিয়া আপনার স্ত্রী দরজা বন্ধ করিয়া দেন, ইহা কি কখনও হইতে পারে?" পীতাম্বর উত্তরে বলিল—"আমি এত দরিদ্র যে, আমার বিবাহ করিবার বা নিজের বাড়ী করিবার মত অর্থ নাই। তারিণীপ্রসাদ ইহা শুনিয়া আরও বিস্মিত হইল; কারণ, সেই বয়সে তাহার স্ত্রীর সংখ্যা হইয়াছে তিন। যাহা হউক, শিক্ষকের দুঃখে তারিণীপ্রসাদের হৃদয় সাড়া দিল। তিনি ২৮নং নয়ানচাঁদ দত্তের ষ্ট্রীট-স্থিত বাটী পীতাম্বরকে কিনিয়া দিলেন এবং মাকড়দার সুবিখ্যাত চৌধুরী-বংশের একটি কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহও দিয়া দিলেন।

স্বর্গীয় ভৈরব চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

পরে পীতাম্বর আরও দুইটী বিবাহ করিয়াছিলেন। পীতাম্বরের বংশ-তালিকা পীতাম্বরের পৌত্র ও শম্ভুচন্দ্রের পুত্র শ্রীযুত কৃষ্ণলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলন করিয়াছেন। শম্ভুচন্দ্র পীতাম্বরের প্রথমা স্ত্রীর গর্ভজাত এবং তাঁহার (পীতাম্বরের) মধ্যম পুত্র। এই বংশ-তালিকার গুরুত্ব আছে। কারণ ইহা ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির (Indian National Congress) প্রথম সভাপতি ব্যারিষ্টার স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (Mr. W. C. Bonnerjee, Bar-at law) মহাশয়ের আদেশে সঙ্কলিত ও ইংলণ্ডের ক্রয়ডনে (Croydon) মুদ্রিত হইয়াছিল। উমেশচন্দ্র পীতাম্বরের দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভজাত জ্যেষ্ঠ পুত্র গিরিশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র। গিরিশচন্দ্র তখনকার কালের একজন বড় এটর্ণী ছিলেন। গিরিশচন্দ্রের আর এক পুত্রের নাম—বলরাম দে ষ্ট্রীট-নিবাসী সত্যধন বন্দ্যোপাধ্যায় ; ইনিও এটর্ণী ছিলেন।

পীতাম্বরের তিন পত্নী, আট পুত্র ও সাত কন্যা। তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে দুই পুত্র—ভৈরবচন্দ্র ও রাজেন্দ্রনাথকে যথাক্রমে সালকিয়ার বন্দ্যোপাধ্যায়-বংশ ও নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীটের মিশ্র-বংশ দত্তক গ্রহণ করেন। আর এক পুত্র শিবচন্দ্র খৃষ্টান ধর্ম্মে দীক্ষালাভ করিয়া পাদরী হন। ইঁহার কতকগুলি সন্তান এক্ষণে ইংলণ্ডে বাস করিতেছেন ; একজন যুক্তপ্রদেশে আছেন এবং কনিষ্ঠ পুত্র অবসরপ্রাপ্ত সাব-ডেপুটী কলেক্টর, ইঁহার নাম ভার্ন্নন্ বনার্জ্জি (Vernon Bonnerji)। পীতাম্বরের বয়স যখন ৭০ বৎসর, সেই সময়ে তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যার জন্ম হয়। বেলুড়ের জয়কৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সহিত ইঁহার বিবাহ হইয়াছিল। জয়কৃষ্ণ এটর্ণী ছিলেন এবং নয়ানচাঁদ দত্তের ষ্ট্রীটে বাস করিতেন। এক সময়ে তাঁহার আর্থিক অবস্থা খুব ভাল ছিল ; তাঁহার পুত্রেরা কিন্তু পরে ব্যবসায়ে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার এক পুত্র ডাক্তার যোগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (জেনু বাবু) এক্ষণে গয়াপ্রবাসী ; ইনি ভাল এসরাজ-

বাদক। জয়কৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্র ত্রৈলোক্য চুঁচুড়ার সরকারী উকীল ছিলেন। ইঁহার পুত্র সুনৎ এক্ষণে বাঙ্গালার একজন জেলা-জজ।

পীতাম্বরের পরিবার-বর্গের পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিচয় দেওয়া এই ক্ষুদ্র পরিসরে অসম্ভব। তাঁহার বংশধরগণের মধ্যে কয়েকজন জীবনে প্রভূত সাফল্য অর্জ্জন করিয়া দশজনের একজন হইয়াছেন। ইঁহাদের অনেকেই কলিকাতার নানাস্থানে এবং কেহ কেহ কলিকাতার বাহিরে ছড়াইয়া পড়িয়াছেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, রাধামোহনের তৃতীয় পুত্র উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় নতুন বাজারের নিকট ঠাকুর ক্যাস্‌ল্ ষ্ট্রীটে বসবাস স্থাপন করিয়াছিলেন। এই উমাচরণই ভৈরবচন্দ্রকে দত্তক পুত্র লইয়াছিলেন।

উমাচরণের কনিষ্ঠভ্রাতা রসিকচন্দ্র সালকিয়া ও চট্টগ্রামের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। অদ্যাবধি সেইসকল সম্পত্তি তাঁহার পৌত্র-গণের অধিকারে রহিয়াছে। রসিকচন্দ্রের পুত্রের নাম শিবগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়; ইনি সালকিয়াতেই থাকিতেন।

ভৈরবচন্দ্র ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'ন এবং অতঃপর বি-এল পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল-শ্রেণীভুক্ত হ'ন। কয়েক বৎসর তিনি সরকারী উকীলের পদে নিযুক্ত হইয়া রামপুর বোয়ালিয়ায় (বর্ত্তমান রাজসাহী) অবস্থান করেন। পারিবারিক কারণে বাড়ীতে তাঁহার উপস্থিত থাকিবার প্রয়োজন হয়। এইজন্য তিনি কলি-কাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন ও কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করিতে থাকেন। আইনে তাঁহার জ্ঞান ছিল সুগভীর; ন্যায় ও সত্যের উপর নিষ্ঠা ছিল অচল; অকপটতা ছিল তাঁহার চরিত্রগত। অল্পদিনের মধ্যে তিনি ওকালতিতে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন এবং প্রধান উকিল-গণের মধ্যে তিনি অন্যতম হইয়া উঠেন। সমাজ-সেবা, আর্থিক উন্নতি-মূলক আন্দোলন, শিক্ষা-বিস্তার প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার—এক কথায় জনহিত-

কর প্রত্যেক অনুষ্ঠানের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ ছিলেন। যে কতিপয় ব্যক্তি ভারতে স্ত্রী-শিক্ষার প্রবর্ত্তনে অগ্রণী হইয়াছিলেন তিনি তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। বেথুন স্কুল-প্রতিষ্ঠায় তিনি সহায়তা করিয়াছিলেন। পারিবারিক সম্পর্ক এবং উদার শিক্ষার ফলে তিনি কলিকাতার তদানীন্তন অভিজাত-সমাজে সম্মানজনক আসন অধিকার করিতেন। সহজাত শিষ্টাচার ও ভদ্রতা এবং সহানুভূতি-প্রবণ উদার হৃদয়ের জন্য তিনি সকল শ্রেণীর ও সম্প্রদায়ের লোকের প্রিয়পাত্র ছিলেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যতার যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ ও গ্রহণীয় তাহা লইয়া সে সকলের সমন্বয়ে তখনকার কালে যে সকল শিক্ষিত ভারতবাসী আদর্শ জীবন গঠন করিয়াছিলেন, ভৈরবচন্দ্র ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার পাঠাগার খৃষ্টীয়-সাহিত্যে পূর্ণ ছিল এবং খৃষ্টান ধর্ম্মের মূলনীতির প্রতি তাঁহার অকপট অনুরাগ ও গভীর শ্রদ্ধা ছিল। খৃষ্টান ধর্ম্মগ্রন্থসকল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পাঠ করিয়া তবে উহার প্রতি তিনি শ্রদ্ধাপরায়ণ হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিও তাঁহার সুদৃঢ় আস্থা ছিল; এমন কি, তিনি উহার অনুরাগী ভক্তও ছিলেন। সে সময়ে খৃষ্টধর্ম্মের প্রবল প্রভাব ও ক্ষয়িষ্ণু হিন্দুধর্ম্মের অন্ধভাবে অনুসৃত আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে পড়িয়া দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় যখন ইতিকর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণে অসমর্থ হইয়াছিলেন সেই সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রবর্ত্তন হয়। ভৈরবচন্দ্র রামপুর-বোয়ালিয়া ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য ছিলেন। সেখানে আচার্য্যরূপে প্রদত্ত তাঁহার বক্তৃতাগুলি মুদ্রিত করিয়া বন্ধু-বান্ধবগণের মধ্যে বিতরিত হইত। এই বক্তৃতাগুলিতে তাঁহার অচল ঈশ্বরভক্তি ও ব্রহ্মজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। সকল ধর্ম্মের সম্মানকারী এবং নবযুগের সংস্কৃত ধর্ম্মে অনুরাগী ও অটল বিশ্বাসী হইলেও হিন্দুধর্ম্মের সকল বিধি-নিষেধ তিনি কঠোর নিষ্ঠার সহিত পালন করিতেন। স্বর্গীয় স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মুখে শুনা গিয়াছে যে, ভৈরবচন্দ্র কর্ত্তব্য-

পালনকে ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছার অনেক উপরে স্থান দিতেন। একবার ব্রাহ্মসমাজের কোনও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি (ইনি ভৈরবচন্দ্রের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন) তাঁহাকে বলেন,—আপনি ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশ্বাসী, অথচ হিন্দুধর্ম্মের আচার-অনুষ্ঠান পালন করিতেছেন। ইহা অত্যন্ত দোষের কথা। ভৈরবচন্দ্র ইহার উত্তরে বলেন—আমার নিজের ধর্ম্ম-বিশ্বাস নিছক ব্যক্তিগত ব্যাপার—ইহার সহিত আমার ভগবানের বুঝা-পড়া হইবে। কিন্তু হিন্দু-ধর্ম্মের আচার-অনুষ্ঠান পালন করিবার ভার পরিবারবর্গ কর্তৃক আমার উপর ন্যস্ত হইয়াছে। একটি হিন্দু পরিবারের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, চিরন্তন সংস্কার যথারীতি পালি- হইতেছে কি না—তাহা দেখিবার ভার আমার উপর। আমি এই পবিত্র দায়িত্ব-ভার স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিতে পারি না। বিদ্যাবুদ্ধিতে, চরিত্রবলে, সমাজ-সেবায় এবং ব্যবহারাজীব সমাজের বিশিষ্ট সদস্যরূপে বিবিধ কর্ত্তব্য-সম্পাদনে তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও অসাধারণত্ব শতদল পদ্মের মত ফুটিয়া উঠিত। তিনি ছিলেন বরেণ্য নাগরিক, প্রীতি ও শ্রদ্ধাভাজন বন্ধু, দরিদ্রের সহায় এবং একটি বৃহৎ পরিবারের সর্ব্বময় কর্ত্তা—কর্ত্তব্যে কঠোর, স্নেহে কোমল। তাঁহার ব্যক্তিত্ব ছিল সকলের উপরে—মনে হইত তিনি যেন গৌরীশঙ্করের মত সর্ব্বোন্নত শির তুলিয়া আপন মহিমায় আপনি দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। তাঁহাতে বহু গুণের সমন্বয় হইয়াছিল; উহাদের ভিতর হইতে যদি দুই একটির বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হয়, তাহা হইলে বলিতে পারা যায় যে, সত্যের উপর ছিল তাঁহার আজীবন-সঞ্চিত বিশ্বাস ও অনুরাগ এবং বিধাতার চিরন্তন ন্যায়বিচারের উপর অটল আস্থা। তাঁহার হৃদয় ছিল বিরাট এবং উহার ভিতর যে করুণার উৎস নিহিত ছিল তাহা জাতিবর্ণ-শ্রেণি-নির্ব্বিশেষে সকলেরই অভাব ও বেদনা দূর করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিত।

ভৈরবচন্দ্র কলিকাতার মদন মিত্র লেনের গঙ্গোপাধ্যায়-বংশে বিবাহ

করিয়াছিলেন। তাঁহার পাঁচ পুত্র ও তিন কন্যা। পুত্রগণ ধনশালী পরিবারে জন্মগ্রহণ করিবার জন্য সচরাচর যে দণ্ড ভোগ করে তাহাই ভোগ করিয়াছিল। তাহারা সকলেই শিক্ষা লাভ করিয়াছিল বটে, কিন্তু জ্যেষ্ঠ দেবেন্দ্রনাথ ব্যতীত আর কেহই জীবনে স্থিরভাবে কোনও ভাল বাঁধাধরা কার্য্য করে নাই। দেবেন্দ্রনাথ কবিবর ডক্টর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বন্ধু ও সমসাময়িক। দেবেন্দ্রনাথের তিন পুত্র; জ্যেষ্ঠ নরেন্দ্রনাথ এক্ষণে বিহার প্রদেশের পোষ্টমাষ্টার-জেনারেল। ইহার কনিষ্ঠা ভগিনীর সহিত স্বর্গীয় স্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ হইয়াছে।

ভৈরবচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা কন্যার নাম শরৎকুমারী; পরিবার-পরিজনে ইহার-ডাক নাম রাণী। ইনি তাঁহার দ্বিতীয় সন্তান। ভৈরবচন্দ্র স্ত্রী-শিক্ষা-প্রবর্ত্তনের অন্যতম সহায়ক ছিলেন বলিয়া তখনকার দিনে যতদূর সম্ভব শিক্ষা তাঁহার কন্যাগণকে দিয়াছিলেন। রাণী বেথুন কলেজের অন্যতম উৎকৃষ্ট ছাত্রী ছিলেন। সেই সময়ে বিদ্যালয় হইতে তিনি যে সকল পুরস্কার পাইয়াছিলেন তাঁহার পুত্র সেগুলি স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ পরম যত্ন ও শ্রদ্ধার সহিত অদ্যাবধি রক্ষা করিতেছেন। শরৎকুমারী যখন প্রবেশিকা শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেছিলেন সেই সময়ে তাঁহার সহিত হীরালালের বিবাহ হয়। বিবাহ-উৎসব কন্যার পিতার পদমর্য্যাদা ও সম্ভ্রমের অনুরূপ আড়ম্বর ও ঘটার সহিত সুসম্পন্ন হয়। বিবাহের রাত্রিতে সামান্য একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল; ইহাতে ভৈরবচন্দ্রের হৃদয়ের বিশালতার পরিচয় প্রস্ফুট। ব্যাপারটী এই:—নিমন্ত্রণ-বাড়ীতে নিমন্ত্রিত ভিন্ন অনিমন্ত্রিত ও রবাহূত বহু ব্যক্তি নিমন্ত্রণ খাইতে আসিয়া থাকে। কলিকাতা সহরে ইহা সচরাচর ঘটিয়াও থাকে। ভৈরবচন্দ্রের কন্যার বিবাহের সময়েও এইরূপ বহুলোক আসিয়াছিল। ইহা দেখিয়া হাই-কোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল অম্বিকাচরণ বসু মহাশয় (এক্ষণে স্বর্গগত)

স্তর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলেন—"আপনি ভৈরবকে বলুন সকলের আগে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগকে আহারে বসাইয়া দিতে। নহিলে এই সব বাজে লোকে আগে খাইতে বসিলে অনেক রকম জিনিস ফুরাইয়া যাইবে, তখন নিমন্ত্রিতদিগের পাতে সকল রকম খাবার জিনিস দেওয়া সম্ভব হইবে না।" অম্বিকাবাবু ভৈরবচন্দ্রের পরম বন্ধু ও সহোদরাধিক ছিলেন। গুরুদাসবাবু তাঁহার কথার যৌক্তিকতা বুঝিলেন। কিন্তু নিজে ভৈরব-বাবুকে একথা বলিতে ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন,—"অম্বিকা বাবু! আপনি আমায় যাহা বলিলেন তাহা ভৈরববাবুকে বলুন, আমি বরং আপনাকে সমর্থন করিব।" যখন অম্বিকাবাবু ভৈরববাবুকে বলিলেন,—"আপনার বাড়ী হইল নতুন বাজারের ধারে, এখানে একটা পিরাণ গায়ে দিয়া আসিলেই অনায়াসে ভদ্রলোক সাজিয়া নিমন্ত্রণ-বাড়ীতে ঢুকিয়া পড়া যায় ও পংক্তি-ভোজনে বসা যায়। কিন্তু এরূপ হইলে নিমন্ত্রিত ভদ্র-লোকদিগকে খাওয়াইবার পূর্ব্বেই উহারা সব জিনিস খাইয়া যাইবে।" ভৈরবচন্দ্র ইহার উত্তরে বলিলেন,—"আমার বাড়ী বাজারের ধারে বলিয়া যেমন বহু অনিমন্ত্রিত ব্যক্তি আসিয়াছে, তেমনই ইহার একটা বিশেষ সুবিধাও আছে। দরকার হইলে আমি যদি বলি—উহারা সমস্ত রাত্রি বাজার খোলা রাখিয়া আমাকে জিনিসপত্র দিবে। তাহাতে সকল লোককেই খাওয়াইবার সুবিধা হইবে।" স্তর গুরুদাস পরে এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন—এই ক্ষুদ্র ব্যাপারটী যে তখন তাঁহাকে বলিবার ভার তাঁহার উপর পড়ে নাই সে জন্য তাঁহার প্রকৃত আনন্দ হইয়াছিল; কারণ, তাঁহার হৃদয় ছিল অত্যন্ত উদার ও বিশাল। উহার বিশালতার নিকট এরূপ ক্ষুদ্র প্রসঙ্গের উত্থাপনে তাঁহাকে লজ্জিত হইতে হইত।

এই বিবাহের দুই তিন বৎসর পরে হীরালাল লাহোর মেডিক্যাল কলেজ হইতে ডাক্তারীর শেষ পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইয়া বাহির হইলেন

এবং শীঘ্রই পঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের অধীনে লাহোর মেডিক্যাল কলেজের হাউস-সার্জ্জনের পদ গ্রহণ করিলেন। তিনি কৃতী ছাত্র ছিলেন এবং শস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শিতার জন্য পদক উপহার পাইয়াছিলেন। কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ তাঁহাকে ভালবাসিতেন। লাহোরে তাঁহার সমসাময়িক বন্ধুগণের মধ্যে স্বর্গীয় হৃষীকেশ শাস্ত্রী ও স্যর প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (এক্ষণে স্বর্গত) নাম উল্লেখ কবিতে পারা যায়।

১৮৮২ সালের ২৯শে অক্টোবর কলিকাতায় ভৈরবচন্দ্রের বাড়ীতে হীরালালের একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। নভেম্বর মাসের শেষাশেষি হীরালাল পুত্র লাভ করিয়াছেন বলিয়া লাহোরের বন্ধু-বান্ধবকে ভোজ দেন। ভোজের রাত্রিতে তাঁহার ঠাণ্ডা লাগে। তাহার ফলে তাঁহার নিউমোনিয়া হয়। তাঁহাকে মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষের বাড়ীতে চিকিৎসার্থ লইয়া যাওয়া হয়। তিনি হীরালালকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। মাত্র কয়দিন রোগ ভোগ করিয়া তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। মৃত্যুর সময়ে আত্মীয়-স্বজন হইতে বহুদূরে তিনি অবস্থিত ছিলেন। তাঁহার পীড়ার সংবাদ পাইযা কয়েকজন আত্মীয় লাহোর-অভিমুখে যাত্রা করেন, কিন্তু লাহোরে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই পথে তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া তাঁহারা লাহোরে না গিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন।

বিধাতার বিধান রহস্যময়। তিনি এক আঘাতে ভবিষ্যতের আশায় উৎফুল্লা এক কুলবধূর জীবন-তরণীকে আশ্রয়শূন্য করিয়া স্রোতের মুখে ভাসাইয়া দিলেন! এক শিশুকে বিপদের মুখে নিক্ষেপ করিয়া জনকের স্নেহ, যত্ন ও জীবন-গঠনের সহায়তা হইতে বঞ্চিত করিলেন!

ভগবানের এই আঘাতের ফল শিশুপুত্রের পক্ষে শঙ্কাপ্রদ বটে, কিন্তু ইহাতে সদ্য প্রসবাগার হইতে নিষ্ক্রান্ত জননীর দেহ ও মন বিকল হইয়া গেল। এই সময়ে পরিবারে প্রথম পৌত্রের জন্মোপলক্ষে কোথায় আনন্দোৎসব হইবে, না, সেখানে শোকের ছায়া নিবিড় হইয়া উঠিল।

ভৈরবচন্দ্রের ভয় হইল—তরুণী কন্যা সদ্য-বিধবা হইয়া পাছে চিন্তার জ্বালায় পাগলিনী হইয়া যায়—এইজন্য তিনি নিজ কর্ম্মের হ্রাস করিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন; কিন্তু জামাতার শোকে ভৈরবচন্দ্রের স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িল। শরৎকুমারী তাঁহার পিতার প্রতি অত্যন্ত ভক্তি পোষণ করিতেন। তিনি পিতার স্বাস্থ্যভঙ্গহেতু একান্ত নিষ্ঠার সহিত তাঁহার সেবায় রত হইলেন। ইহার ফলে বৈধব্যের বেদনা কতকটা লঘু হইয়া গেল। পরিবারের কর্ত্তার জীবন বিপন্ন; সেইজন্য শিশু-পুত্রটীর প্রতি কেহ বড় একটা দৃষ্টি দিত না। তাহার বয়স তিন বৎসর হইলেও তখনও পর্য্যন্ত তাহার অন্নপ্রাশন ও নামকরণ হয় নাই। শিশুর জন্মের কিঞ্চিদধিক দুই বৎসর পরে ভৈরবচন্দ্রের পীড়া কঠিনাকার ধারণ করে। ডাক্তারেরা বলেন,—ইঁহার আর ২৪ ঘণ্টা মাত্র আয়ু আছে। আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবেরা তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে মিঃ ডব্লিউ সি বনার্জ্জি ও মিঃ তারকনাথ পালিত (পরে স্যর) ছিলেন। ইহারা পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন—এই সময়ে একটা উইল করা উচিত। কিন্তু কেহই সাহস করিয়া এই কথা তুলিতে পারিতেছেন না। কারণ, সকলেরই ভয় হইতেছিল যে, ইহাতে মৃত্যু আরও শীঘ্র হইতে পারে। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। জীবন-স্রোতে ধীরে ধীরে ভাঁটা পড়িতেছে। হাত-পায়ের আঙ্গুলগুলি ঠাণ্ডা হইয়া আসিতেছে। মনে হইতেছে,—আত্মা এই জীর্ণ পিঞ্জর ত্যাগ করিয়া অনন্তের পথে যাত্রা করিবার উদ্যোগ করিতেছে। এমন সময়ে হঠাৎ রোগী তাহার পুত্রকে বলিল,—বাহিরে যে লোক আমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছে তাহাকে বলিয়া দাও, আমার কাজ এখনও শেষ হয় নাই; পাঁচ বৎসর পরে আমি যাইব। তাঁহার পুত্র ফিরিয়া আসিয়া বলিল,—বাহিরে নূতন কোনও সাক্ষাৎপ্রার্থীকে দেখিলাম না। রোগী তখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল এবং ক্রমে ক্রমে তাঁহার জীবনীশক্তি আবার ফিরিয়া আসিল।

এই স্মরণীয় সন্ধ্যার পাঁচ মাস পরে—পাঁচ বৎসর পরে নহে—১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে দেওঘরে ভৈরবচন্দ্রের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর তিনদিন পূর্ব্বে তিনি তাঁহার তখনকার নিত্যসঙ্গী তিন বৎসর বয়সের দৌহিত্রকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমার নাম কি হইবে? কি নাম তুমি চাও? শিশু দৌহিত্র বলিল—আমার নাম যতীন্দ্রনাথ। মাতামহ ইহা সংশোধন করিয়া বলিলেন—যতীন্দ্রমোহন; তুমি যতীন্দ্রকে মুগ্ধ করিবে, তাই তোমার নাম যতীন্দ্রমোহন হউক। তিনি উইলে শিশু দৌহিত্রের নাম যতীন্দ্রমোহন বলিয়াই লিখিয়াছিলেন। তার পর বলিলেন, আমার কাজ এইবার শেষ হইল। এখন যখন ভগবান ডাকিবেন, তখনই যাইতে পারি। রায় দেবেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর (এক্ষণে স্বর্গগত; ইনি স্বর্গীয় স্যর চারুচন্দ্র ঘোষের পিতা) তাঁহার উইলের সাক্ষী ছিলেন।

শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনের কঠোমো গড়িবার মালমসলা ছিল তাহার মাতামহের সত্যপ্রিয়, ন্যায়পর ও সুবিচার-নিষ্ঠ জীবনের প্রভাব। ইহাই যে সম্ভবতঃ তাহার ভবিষ্যৎজীবনের ভিত্তি হইয়াছিল, তাহা অবিশ্বাস করা যায় না। উত্তরকালে পারিবারিক জীবনেও শিশু যে প্রভাব বিস্তার করিবে, তাহারও সূচনা করা ছিল তাহার মাতামহের জীবনের আদর্শকে অজ্ঞাতসারে গ্রহণ করিয়া। জীবনের প্রথম ও প্রধান বন্ধু, সহায় ও পথপ্রদর্শক হইলেন পিতা; সেই পিতাকে শৈশবে হারাইয়া শিশুকে বুদ্ধিবিদ্যার উন্মেষ ও অর্থসাহায্যের জন্য তাহার মাতারই মুখাপেক্ষী হইতে হইয়াছিল। শিশুর ক্ষুদ্র জগৎ তাহার মাতাকে কেন্দ্র করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছিল। মাতারও বিপুল শোকের ভিতর এই শিশুই ছিল সান্ত্বনা ও আশা। তিনি সর্ব্বদাই শোকে অভিভূত থাকিতেন, কিন্তু যখন সংসারের কর্ম্মক্ষেত্রের কঠোরতার ভিতরে ফিরিয়া আসিতে হইত, তখন দেখিতেন—তাঁহার সকল চিন্তা—সকল স্নেহ

কেন্দ্রীভূত হইয়াছে—এই শিশুটীতে। তিনি তখনই চমকিয়া উঠিতেন, সত্যই ত এই শিশুকে মানুষ করিবার ভার যে তাঁহার উপর। তিনি মনে করিতেন, বিধাতার সৃষ্টিতে মাতার ও পুত্রের—তাঁহাদের দুইজনের জীবন বুঝি ব্যর্থ হইয়াছে। কিন্তু শিশুসন্তানটীর যখন ক্রমে ক্রমে বয়োবৃদ্ধি হইতে লাগিল, তখন ধীরে ধীরে তাঁহারও শোক প্রশমিত হইল এবং তিনি বুঝিতে পারিলেন—তাঁহাদের দুইজনকে—মাতাকে ও শিশুকে অতঃপর পরস্পর পরস্পরের সাহায্য-নির্ভর হইয়া থাকিতে হইবে।

যতীন্দ্রমোহনের শৈশব ও বাল্যজীবনের বিশদ পবিচয় দিতে হইলে এই জীবনী অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া পড়িবে। তবে এই সম্বন্ধে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, অত্যন্ত শৈশব হইতে যতীন্দ্রমোহন বুঝিয়াছিলেন যে, মাতাকে সুখী করিবার জন্যই তাঁহাকে বাঁচিতে হইবে। তিনি যেমনভাবে তাঁহাকে গড়িয়া তুলিতে চান, সেইরূপ ভাবেই তিনি নিজেকে গড়িয়া তুলিবেন। কারণ মাতা সুখী হইয়াছেন—ইহা জানিতে পারিলে তাঁহার এত আনন্দ হয় যে, তিনি তাহা বলিতে পারেন না। যে কার্য্য করিলে মাতা দুঃখ বোধ করেন, তাঁহার কষ্ট হয়, এমন কার্য্য বা আচরণ তিনি কখনও করিবেন না; শৈশব ও বাল্যকাল হইতেই ইহা তাঁহার প্রতিজ্ঞা ছিল।

ভৈরবচন্দ্রের মৃত্যুতে যতীন্দ্রমোহন ও তাঁহার মাতা যে আঘাত প্রাপ্ত হইলেন, তাহা হীরালালের অকালমৃত্যু-জনিত আঘাতের মতই নিদারুণ। ইহার কঠোরতা কেবল যে শিশু ও তাহার মাতা অনুভব করিলেন—তাহা নহে, ভৈরবচন্দ্রের পরিবারবর্গও তদ্রূপ অনুভব করিলেন। পরিবার-পরিচালনায় কিছু বিশৃঙ্খলাও ঘটিল। তখনও অনেক মূল্যবান সম্পত্তি পরিবারবর্গের হস্তে ছিল। কিন্তু ভৈরবচন্দ্র দীর্ঘকাল রোগশয্যায় শায়িত ছিলেন; সেই সময়ে রীতিমত পরিদর্শন ও পরিচালন-অভাবে সেগুলি

উপেক্ষিত হইয়াছিল। কিছু ঋণ ছিল; উহার সুদ যথাসময়ে দেওয়া হয় নাই বলিয়া জমিয়া গিয়াছিল। আয় সমানই রহিল, কেবল যে কিছু ঋণ ছিল তাহা সুদে বাড়িতে লাগিল।

প্রথম কয়েক বৎসর যতীন্দ্র তাহার মাতার আত্মীয়াদের রক্ষণাধীন ছিল। কারণ, তখনও পর্য্যন্ত তাঁহার মাতা শোকের বেগ সামলাইয়া উঠিতে পারেন নাই এবং নিজের ভাল-মন্দের দিকে দৃষ্টি দিবার শক্তি তাঁহার শরীর ও মনের ছিল না। আকস্মিক আঘাতে তিনি এরূপ বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তাঁহার জীবন-ধারণের কোনও উদ্দেশ্য আছে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করিতে চাহিতেন না। এইরূপ মানসিক অবস্থা যখন তাঁহার, তখন কেবল স্নেহশীল পিতার যত্ন ও সান্ত্বনা-বাক্যের জন্যই তিনিই মস্তিষ্ক-বিকৃতির হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। এখন সেই করুণাময় পিতার স্নেহ হইতেও তিনি বঞ্চিত হইলেন। যতীন্দ্রের বয়স ক্রমে বাড়িতে লাগিল। ইহা দেখিয়া তাঁগার মাতার চমক ভাঙ্গিল। তিনি তখন বুঝিতে পারিলেন, 'এখন একাধারে আমাকেই উহার পিতা-মাতার কার্য্য করিতে হইবে। কাজেই একটু একটু করিয়া তিনি যতীন্দ্রের বিদ্যাশিক্ষার দিকে লক্ষ্য রাখিতে লাগিলেন। বিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু শোকে তাপে তাহা ভুলিবার মত হইয়াছিল। তাই সন্তানের শিক্ষা ঠিকমত হইতেছে কি না, তাহা দেখিবার জন্য তিনি অধীত বিদ্যা নূতন করিয়া অনুশীলন করিতে আরম্ভ করিলেন।

যতীন্দ্রের প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ হয় গৃহে তাঁহার মাতার পরিচালনায়। ১০ বৎসর বয়সে তাহাকে কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হয়। ইহা তখন নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট ও গৌর লাহা ষ্ট্রীটের মোড়ের উপর অবস্থিত ছিল। এই বিদ্যালয়ের শিক্ষক হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাকে ইংরেজী শিক্ষা দিতেন; তিনিই বালকের মনে ইংরেজী

ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগের উদ্রেক করিয়া দেন। এই বিদ্যালয়ের মাইনর বা মধ্য ইংরেজী ও ছাত্রবৃত্তি শ্রেণী পর্য্যন্ত তিনি অধ্যয়ন করেন। পরে তাঁহাকে 'ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারী'তে ভর্ত্তি করাইয়া দেওয়া হয়। এই স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক চন্দ্রভূষণ মৈত্র মহাশয় ইংরেজীতে কিরূপ জ্ঞান হইয়াছে, সে বিষয়ে যতীন্দ্রকে পরীক্ষা করেন এবং বলেন, ইহাকে তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্ত্তি করা যাইতে পারে। যতীন্দ্রের ইংরেজীতে অনুরাগ ছিল, সুতরাং ইংরেজী সে ভালই পড়িত। যাঁহারা ইহাকে পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহারা দেখেন নাই যে, এই বালক অঙ্কে অত্যন্ত কাঁচা এবং সংস্কৃত কিছুই জানে না। সুতরাং তাহাকে তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইয়া অত্যন্ত বিপদে পড়িতে হইয়াছিল। এই দুইটী বিষয়ে এরূপ কাঁচা ও অজ্ঞ থাকায় প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার আশা পর্য্যন্ত ত্যাগ করিবার মত অবস্থা তাহার হইয়াছিল। অন্যান্য শিক্ষকগণের মধ্যে ছিলেন, 'রামকৃষ্ণ-কথামৃত'-রচয়িতা শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও শ্রীযুত ক্ষেত্রনাথ শোভাকর। ক্ষেত্রবাবু ইতিহাস খুব ভালই পড়াইতেন এবং এইজন্য ছাত্রগণ তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সম্মান করিত। উত্তরকালে কলেজ-জীবনে যতীন্দ্রমোহনের মনে ইতিহাসের প্রতি যে তীব্র অনুরাগের সঞ্চার হইয়াছিল ক্ষেত্রবাবুই স্কুলে তাহার বীজ বপন করিয়াছিলেন। হেড পণ্ডিত ছিলেন অভয়চরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। তিনি স্কুলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টও ছিলেন। তিনি বালকগণকে কঠিন শাসন ও সংযমের মধ্যে রাখিতেন। কিন্তু এইজন্য যতীন্দ্র তাঁহার নিকট হইতে সরিয়া থাকিতেন না; ক্লাসে তিনি যখন সংস্কৃত ব্যাকরণ শিক্ষা দিতেন, তাহা যতীন্দ্রের নিকট দুর্ব্বোধ্য ছিল বলিয়াই সে তফাতে তফাতে থাকিত। গণিত-শিক্ষক কোন কারণে যেদিন স্কুলে অনুপস্থিত হইতেন সেদিন যতীন্দ্রের পক্ষে অত্যন্ত প্রীতিকর মনে হইত। বাড়ীতে যে গৃহশিক্ষকের নিকট যতীন্দ্র পাঠাভ্যাস করিতেন তাঁহার নাম ছিল শ্রীযুত গোকুলবিহারী

হালদার। ইনি আজীবন তাহার ও তাহার পরিবারের বন্ধু ছিলেন। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়। ইঁহার মৃত্যুতে যতীন্দ্র ও তাঁহার পরিবার এক স্বার্থলেশশূন্য অকপটহিতৈষী বন্ধুর সাহায্য ও উপদেশ হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন।

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে যতীন্দ্রমোহন প্রবেশিকা শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেছিল। এই সময়ে পরিবারে কতকগুলি অমঙ্গলকর ঘটনা ও বিপদ ঘটে। সালকিয়া হরগঞ্জের বাজারটী বিক্রয় হইয়া যায়; বলা বাহুল্য, ইহা একটি মূল্যবান সম্পত্তি ছিল। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ভৈরবচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়; তৎপূর্ব্বেই তাঁহার দুই ভ্রাতার মৃত্যু হইয়াছিল। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় পুত্র উপেন্দ্রনাথের মৃত্যু ঘটে। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে ভৈরবচন্দ্রের স্ত্রী পরলোক গমন করেন, রাখিয়া যান তাঁহার চতুর্থ পুত্র জ্ঞানেন্দ্রনাথকে। উপর্য্যুপরি মৃত্যুতে এই পরিবার নৈরাশ্যে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে। ভৈরবচন্দ্রের সম্পত্তির একজিকিউটর বা অছিদ্বয়—ডব্লিউ সি বনার্জ্জি ও অম্বিকাচরণ বসু মহাশয় এবং মাতামহী এই তিনজনের মতামতের ভেদে বিষয়ের আয় সকলকে ভাগ করিয়া দিতেন, কিন্তু ঋণ কতকটা ফেলিয়া রাখায় সুদে সুদে তাহা অনেক বাড়িয়া গেল; অবশেষে সব ঋণ শোধ দিয়া সকলকে বক্রী টাকা ও বিষয় ভাগ করিয়া দেওয়া হইল। পরে যখন একমাত্র পুত্র রাখিয়া মাতামহী দেবীও স্বর্গারোহণ করিলেন, তখন শরৎকুমারীর উপর সংসার-পরিচালনার ভার পড়ে, কারণ তখন সকলেই নাবালক। নাবালকের সংসারে আয়বৃদ্ধির জন্য নিজের টাকাও ধার দিয়া সে টাকাও লাভে মূলে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইল, যাহারা ধার লইল প্রায় সকলেই তাহারা আর ঋণ শোধ করিতে পারিল না। এই সকল বিপদপাতে স্কুলে যতীন্দ্রের শিক্ষায় অত্যন্ত ব্যাঘাত লাগে। এই জন্য তিনি ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় কৃতকার্য্য

হইতে পারেন নাই এবং তৎপরবৎসর পরীক্ষোত্তীর্ণ হন। ইহার পর তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হন ; এখান হইতে ফার্ষ্ট আর্টস পরীক্ষা তিনি দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতেও তিনি উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে মেট্রোপলিট্যান ইন্‌ষ্টিউসন হইতে তিনি ফার্ষ্ট আর্টস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার পর যতীন্দ্রমোহন মেডিক্যাল কলেজে ভর্ত্তি হন ; কিন্তু ইহাতে তাঁহার মাতার তেমন আগ্রহ ছিল না। কারণ, তাঁহার পিতা বলিতেন, আমার ছেলেকে ডাক্তার করিব না। ইহার এক মাস পরে ধর্ম্মদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত যতীন্দ্র একদিন ডাফ কলেজে যায়। ধর্ম্মদাস তাঁহার বন্ধু ও কুটুম্ব। ধর্ম্মদাস ডাফ কলেজে ভর্ত্তি হইতেছিল ; সে যতীন্দ্রকে না বলিয়া তাহাকেও ডাফ কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দেয়। বাড়ী ফিরিয়া যতীন্দ্রের মাতাকে বলে যে, তাহারা দুইজনেই ডাফ কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছে। তাঁহার মাতা এই সংবাদে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

এই কলেজে অধ্যয়ন করিবার সময়ে যতীন্দ্র ও তাঁহার বন্ধু ধর্ম্মদাস তদানীন্তন প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ডক্টর হেক্টর, এইচ ষ্টিফেন, এ টমরী, স্ক্রিমজার এবং শ্রীযুত বিপিনবিহারী সেনের প্রভাবে পড়েন। বিপিনবাবু ইতিহাস ও অর্থনীতির অধ্যাপক ছিলেন। ডাফ কলেজ তখন পর্য্যন্ত স্কটিশ চার্চ্চ কলেজের সহিত সম্মিলিত হয় নাই। ইহা নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীটে একটি প্রকাণ্ড বাটীতে অবস্থিত ছিল। পরে এখানে জোড়াবাগান থানা বসে ও পুলিস-আদালতও কিছুদিন এখানে বসিত। যে ঠাকুর ক্যাস্‌ল ষ্ট্রীটে যতীন্দ্রমোহনের বাড়ী—ইহা ডাফ কলেজের খুব কাছে ছিল। এই সময়ে যতীন্দ্র এই বাড়ীতে থাকিতেন। কলেজের পাঠ্যবিষয় তাহার খুবই অনুকূল ও জলের মত হইয়াছিল। তিনি আর্টস কোর্স লইয়াছিলেন এবং ইতিহাস ও অর্থনীতিতে অনার্সের পাঠ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বরাবরই তিনি খেলাধুলায় অধিক মনোযোগী ছিলেন।

অধ্যয়ন উপেক্ষা করিয়াও তিনি খেলাধূলায় মাতিয়া যাইতেন। তাঁহার সৌভাগ্যক্রমে অধ্যাপক বিপিনচন্দ্র তাঁহার দিকে খরদৃষ্টি রাখিতেন; সেইজন্য খেলাধূলার নেশায় মসগুল হইয়াও তিনি পাঠ্য বিষয়কে উপেক্ষা করিতে পারিতেন না। অধ্যাপকমহাশয় একাধারে তাঁহার গুরু, বন্ধু ও পথপ্রদর্শক ছিলেন। একবার একটি ঘটনা ঘটে। বি-এ পরীক্ষা দিবার আর অল্পদিন বিলম্ব আছে, সেই সময়ে অধ্যাপক বিপিনচন্দ্র গৃহে অনুশীলন করিয়া উত্তর করিবার জন্য কতকগুলি প্রশ্ন দেন। যতীন্দ্র উত্তর লিখিয়া উঠিতে পারেন নাই। কলেজ হইতে বাড়ীতে ফিরিবার সময়ে অধ্যাপক বিপিনচন্দ্র যতীন্দ্রদের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন—যতীন্দ্র বাড়ীতে নাই। সেখানে তিনি শুনিলেন, যতীন্দ্র গড়ের মাঠে ক্রিকেট খেলিতে গিয়াছে। অধ্যাপক সেন তখনই গড়ের মাঠে চলিলেন। সেখানে গিয়া দেখেন—যতীন্দ্র ক্রিকেট-ম্যাচে অবতীর্ণ হইয়াছে। অধ্যাপককে দেখিয়া যতীন্দ্র লজ্জায় অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলেন এবং নিজেকে অত্যন্ত ক্ষুদ্র মনে করিতে লাগিলেন। তিনি অধ্যাপকমহাশয়কে বলিলেন, আগামী কল্য উত্তরগুলি লিখিয়া আপনাকে দিব। অধ্যাপক বিপিনচন্দ্র যদি এইরূপ যত্ন যতীন্দ্রের উপর না লইতেন এবং তাহার দিকে তীব্র দৃষ্টি না রাখিতেন, তাহা হইলে তাহার ভবিষ্যৎ যে নিশ্চিতই ভিন্নরূপ হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। ছাত্রের শুভার্থ কয়জন অধ্যাপক তাঁহাদের অবসরকাল বিপিনচন্দ্রের মত এইভাবে ব্যয় করিতে পারেন! চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর শেষাশেষি তিনি অজীর্ণ রোগে (dyspepsia) আক্রান্ত হন। এইজন্য অধ্যয়নে যথেষ্ট বাধা উপস্থিত হয়। তাই ইতিহাসে অনার্স পাইলেও তিনি উচ্চ স্থান অধিকার করিতে পারেন নাই।

যতীন্দ্রমোহন পর্য্যটনপ্রিয়। ট্রেণে আরোহণ করিয়া দীর্ঘ ভ্রমণ তাঁহার নিকট প্রীতিকর। তাঁহার পিতৃদেবের মনে যেরূপ দুঃসাহসিক-

তার ভাব ছিব, তাঁহার মনে তত দূর ছিল না। তবে তাঁহার অন্তরের গভীর প্রদেশে সাধু-সন্ন্যাসী-দর্শন ও তাঁহাদের জীবন ও কার্য্য-পদ্ধতি পর্য্যবেক্ষণ করিবার প্রভূত আকাঙ্ক্ষা ছিল। যতীন্দ্রের বয়স যখন ১২ বৎসর, তখন তিনি কাহাকেও সঙ্গে না লইয়া তাঁহার পিতামহের নিকটে দানাপুরে গিয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার বাড়ী হইতে প্রথম বাহির হওয়া। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে তিনি একাকী মর্ম্মর-শৈল দেখিবার জন্য জব্বল-পুরে গিয়াছিলেন। সেখানে গিয়া তিনি শুনেন যে, এক সাধু কখনও জলপ্রপাতের পাদমূলে অথবা উহার উৎপত্তি-স্থানে বসিয়া অবিরত ঈশ্বর-ধ্যানে মগ্ন থাকেন। ঘোর বিপদ মাথায় করিয়া তিনি একটি নৌকায় আরোহণ করিয়া নর্ম্মদা নদীর উৎপত্তি-স্থানে গমন এবং সেই সাধুর দর্শন লাভ করেন। তিনি দুই ঘণ্টা সাধুর নিকটে উপস্থিত ছিলেন; কিন্তু তাহার মধ্যে সাধু চক্ষু উন্মীলন করেন নাই বা মধ্যে মধ্যে ওঙ্কার-ধ্বনি ব্যতীত অন্য কোনও শব্দও উচ্চারণ করেন নাই। এখান হইতে তিনি অবিলম্বে এলাহাবাদ গমন করেন। উত্তরপাড়ায় তাহার প্রতিভা নাম্নী এক মাসতুতো ভগিনীর বিবাহের উদ্যোগ-আয়োজন হইতেছিল। যতীন্দ্র ইহাকে নিজের সহোদরার অধিক স্নেহ করিতেন। এই সময়ে কলিকাতায় প্লেগ-রোগের প্রাদুর্ভাব হয় এবং কলিকাতা সহরের স্বাভা-বিক অবস্থার বিপর্য্যয় ঘটে। কলিকাতা হইতে তাঁহাকে সতর্ক করিয়া পত্র লেখা হয় যে, তিনি যেন সে সময়ে কলিকাতায় না ফিরেন। এই বিবাহে কলিকাতায় থাকিতে না পাইয়া তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হয়েন। কলেজও তখন কেমন একঘেয়ে রকমের ছিল। সেজন্য কিছুদিন এলাহাবাদেই তিনি থাকিয়া যাইলেন। এই সময়ে তিনি ৺ রায় রামলাল চক্রবর্ত্তী বাহাদুরের অনুরোধে প্রায়ই লক্ষ্ণৌ নগরীতে বেড়াইতে যাইতেন। যে সকল বাঙ্গালী পঞ্জাব ও যুক্ত প্রদেশের প্রাথমিক সমুত্থানের ইতিহাসে তাঁহাদের নাম রাখিয়া গিয়াছেন, চক্রবর্ত্তী

মহাশয় তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠতা আরও বাড়িল। একে তিনি ধর্ম্মদাসের শ্বশুর; তাহার উপর তাঁহার পুত্র শরৎচন্দ্রের সহিত প্রতিভার বিবাহ হইল। কলেজের পরিশ্রান্ত জীবন এবং গৃহের বিমর্ষতার মধ্যে যে কয়দিন লক্ষ্ণৌতে অবস্থান করিয়াছিলেন সেই কয়দিনের অভিজ্ঞতা ও আনন্দ যতীন্দ্রমোহন কখনও ভুলিতে পারিবেন না। সেই সময়ে তিনি রায় বাহাদুর রামলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের যে কর্ম্মনৈপুণ্য ও শ্রমশীলতার পরিচয় পাইয়াছিলেন তাহাতে বুঝা যায়, তখনকার প্রবাসী বাঙ্গালী-সমাজে কেন তাঁহার স্থান এরূপ সম্মানজনক ছিল।

বি-এ পরীক্ষা দিবার পর যতীন্দ্রমোহন কটক ও পুরী-ভ্রমণে গমন করেন। এইবার লইয়া এই অঞ্চল তিনি চতুর্থ বার পরিভ্রমণ করিলেন। কটকের প্রসিদ্ধ ফৌজদারী উকীল প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার কুটুম্ব ছিলেন। তিনি কলানুরাগী ও অধ্যয়নশীল এবং জ্ঞানলিপ্সু ছিলেন। সুতরাং যতীন্দ্রমোহন তাঁহার বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া অত্যন্ত তৃপ্তি লাভ করিতেন। এইবার তিনি চিল্কাহ্রদ পরিদর্শন করেন এবং কোনও কৌতুককর কারণে গঞ্জাম্ পর্য্যন্ত বেড়াইয়া আসেন। ইহার পূর্ব্বে কটক-পরিভ্রমণের সময়ে একটি স্মরণীয় ঘটনা ঘটিয়াছিল। ফার্ষ্ট আর্টস্ পরীক্ষা দিবার প্রায় ১৫ দিন পূর্ব্বে যতীন্দ্র তাঁহার কোনও মহিলা-কুটুম্বকে সঙ্গে লইয়া কটকে রাখিতে গিয়াছিলেন। প্রিয়বাবু সেই সময়ে কটকে ছিলেন না। তিনি ভুবনেশ্বর মন্দির কমিটির সেক্রেটারী ছিলেন। সেই সময়ে তদানীন্তন বড়লাট লর্ড কার্জ্জন ও তদীয় মহিষী লেডী কার্জ্জন ভুবনেশ্বর মন্দির দেখিতে আসিবেন বলিয়া সংবাদ প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু গোল উঠিয়াছিল, বড়লাট ও বড়লাট-পত্নীকে ভুবনেশ্বর-মন্দিরে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে কি না। এই কঠিন সমস্যার সমাধানের জন্য প্রিয়বাবু

ভুবনেশ্বরে গিয়াছিলেন। যতীন্দ্রমোহন মনে করিল, এই সময়ে ভুবনেশ্বরে যাওয়া যাউক, তাহা হইলে প্রিয়বাবুর সহিত দেখা হইবে এবং ভুবনেশ্বর-মন্দিরও দেখিতে পাওয়া যাইবে। যতীন্দ্র একটী ভৃত্য লইয়া ভুবনেশ্বর যাত্রা করিল। একজন সমবয়সী সঙ্গীও জুটিল। সে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়া পুরীতে—তাহার বাড়ীতে যাইতেছিল। রাত্রিতে স্পেশ্যাল ট্রেণে তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় তাহারা সকলে ভুবনেশ্বরে যাইবে। ভৃত্যটী কটক ষ্টেশন হইতে ট্রেণের টিকিট ক্রয় করিয়া আনিল। তাহারা ট্রেণে উঠিল। যথাসময়ে উহা ভুবনেশ্বরে পৌঁছিল কিন্তু ট্রেণের পিছনের দিকটা প্লাটফরমের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। যতীন্দ্র ও তাহার ছাত্র-সঙ্গী প্লাট-ফরমের ভিতর দিয়া যাইয়াই বাহিরে যাইবার ফটকের কাছে আসিলে, টিকিট-কলেক্টর তাহার লণ্ঠনের আলোতে ভাল করিয়া টিকিট পরীক্ষা করিয়া বলিল, তোমরা একটু অপেক্ষা কর। যখন সমস্ত আরোহী প্লাটফরম হইতে বাহির হইয়া গেল, তখন যতীন্দ্র ও তাহার সঙ্গীরা বাহিরে যাইবার অনুমতি চাহিল। টিকিট-কলেক্টর তাহাদিগকে বলিল, তোমরা ষ্টেশন মাষ্টারের সঙ্গে দেখা কর। তাহারা টিকিট-কলেক্টরের সহিত ষ্টেশন মাষ্টারের নিকট যাইল। উহারা দুইজনেই মাদ্রাজী। টিকিট-কলেক্টর তাহার নিজের ভাষায় ঘটনার বিষয় বুঝাইয়া দিল এবং ষ্টেশন মাষ্টার বলিল—একটু অপেক্ষা কর। এই বলিয়া ষ্টেশন মাষ্টার ট্রেণে তাহার যে কাজ ছিল তাহা করিতে গেল। ট্রেণ চলিয়া যাইবার পর ষ্টেশন মাষ্টার তাহার ঘরে ফিরিয়া আসিল এবং তাহাদিগকে বলিল—তোমাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, কারণ তোমরা পুরাতন টিকিট লইয়া ট্রেণে চড়িয়াছ। টিকিট-কলেক্টর যখন টিকিট তাহাদের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিল, তখন তাহারা কেহই টিকিটগুলি দেখে নাই। যখন টিকিট তিনখানি তাহাদিগকে দেখানো হয়, তখন দেখা গেল যে, টিকিটগুলিতে জানুয়ারী মাসের একটা তারিখ দেওয়া রহিয়াছে; অথচ

তাঁহারা মার্চ্চ মাসে ট্রেণে ভ্রমণ করিয়াছেন। এই পুরাতন টিকিটগুলি যে তাহাদেরই, তাহা তাহারা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিল না। কাজেই ষ্টেশন মাষ্টার যাহা বলিল, তাহাই তাহাদিগকে মানিয়া লইতে হইল। ষ্টেশন মাষ্টারের ঘরের সুম্মুখে একজন রেলওয়ে কনষ্টেবলকে মোতায়েন থাকিতে দেখা গেল। ষ্টেশন মাষ্টার তাহার টেবিলে বসিয়া কাজ করিতে লাগিল। যতীন্দ্র ও তাহার সঙ্গীরা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিল। অবশেষে তাহারা ষ্টেশন মাষ্টারকে বলিল—এই ভৃত্যকে আমাদের লোকের নিকট এই ঘটনা জানাইবার জন্য পাঠাইতে চাই; সেজন্য হুকুম দেওয়া হইবে কি? কতকটা অনিচ্ছাসত্ত্বেও ষ্টেশন মাষ্টার ইহাতে সম্মত হইলেন। ভৃত্যটি চলিয়া গেল এবং একটু পরেই এক ভদ্রলোক সঙ্গে করিয়া আনিল। ইহাকে দেখিয়া মনে হইল—ইনি কোনও উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী। ভদ্রলোক আসিয়াই ষ্টেশন মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি ব্যাপার? ষ্টেশন মাষ্টার উত্তর দিল—ইহারা পুরাতন টিকিট লইয়া ট্রেণে আরোহণ করিয়াছিল। ভদ্রলোককে বলিলেন, আমি উহা-দের জামিন হইতেছি, উহাদিগকে ছাড়িয়া দাও। মাদ্রাজী ষ্টেশন মাষ্টার গোঁ ধরিয়া বসিল এবং বলিল, জামিনে ছাড়িব না। তখন এই ভদ্রলোক কিছু রুষ্টহইয়া বলিলেন—ইহার ফল তোমার পক্ষে ভাল হইবে না। ষ্টেশন মাষ্টার উত্তর দিল—আমি আপনাকে চিনি না, তাই আপনার জামিন লইতে পারি না। ভদ্রলোক বলিলেন—আমার নাম রাসবিহারী নাগ—আমি খুর্দা রোডের মহকুমা-হাকিম। যদি ইহাদের বিরুদ্ধে কিছু অভি-যোগ থাকে, তবে আমারই কাছে তাহার বিচার হইবে। তখন ষ্টেশন মাষ্টার তাঁহার আপাদ-মস্তক ভাল করিয়া দেখিতে লাগিল। তাহার তখনও সন্দেহ হইতেছিল—ইনি প্রকৃত মহকুমা-হাকিম কি না। শেষে কি ভাবিয়া বলিল,—না, জামিনে ছাড়িব না। তখন ভদ্রলোক ক্রোধভরে ষ্টেশন হইতে চলিয়া যাইলেন এবং ইহার ফল যে ষ্টেশন-মাষ্টারের পক্ষে

মন্দ হইবে—ইহাও বিশেষ করিয়া জানাইয়া গেলেন। যতীন্দ্র ইহা বড়ই সঙ্কটজনক মনে করিল। যতীন্দ্রের ধারণা হইল—এই ঘটনায় হয় ত তাহার পরীক্ষা দেওয়াই হইবে না—পরীক্ষার ত মাত্র ১৫ দিন বিলম্ব আছে। যতীন্দ্র ষ্টেশন-মাষ্টারকে বলিল,—যাহা প্রকৃত ভাড়া তাহা আমাদের নিকট হইতে লওয়া হউক এবং এজন্য যে অর্থ দণ্ডস্বরূপ দিতে হইবে তাহাও আমরা দিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু ইহা লইয়া আমাদিগকে ছাড়িয়া দিতে হইবে। ষ্টেশন-মাষ্টার ভাড়া চাহিল এবং দণ্ডস্বরূপ যে অর্থ চাহিল তাহা আইন-সঙ্গত অপেক্ষা অধিক। কিন্তু পুরাতন টিকিট ফেরত দিতে এবং এই টাকার জন্য রসিদ দিতে অসম্মত হইল। যুবকেরা ষ্টেশন-মাষ্টারকে ঘুষ দিতে সম্মত হইল না; কারণ, তাহারা জানিত যে, ইহার মীমাংসা এখানেই হইবে না। অতঃপর তাহারা ষ্টেশনের সেই ঘরেই পুলিশ-প্রহরীর নজরবন্দী হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। তখন রাত্রি প্রায় ৩টা। সকলেই নিদ্রালু ও ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। তখন ষ্টেশন-মাষ্টারকে বলা হইল,—আমাদের মধ্যে একজন আইন-অধ্যয়ন করিতেছে। আইন-কানুন সে বুঝে। তুমি যখন একজন বড়দরের সরকারী কর্ম্মচারীর জামিন অগ্রাহ্য করিয়াছ তখন তোমার ত দণ্ড হইবেই এবং তোমার বিরুদ্ধে অবৈধ ভাবে আটক করার অভিযোগও রুজু হইতে পারে। ইহাতে ষ্টেশন-মাষ্টার খুবই চঞ্চল হইয়া উঠিল। এই সময়ে তাহাকে বলা হইল,—আমাদিগকে আটক করিবার তোমার ক্ষমতা আছে বটে, কিন্তু সে ক্ষমতারও তুমি অপপ্রয়োগ করিয়াছ কি না সে বিষয় যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তবে এখনও পর্য্যন্ত আমাদিগকে অনাহারে রাখিবার তোমার কোনও ক্ষমতা নাই। আমাদিগকে খাবার আনিয়া দাও। রাত্রি ৩ টার সময়ে খাবার সংগ্রহ করা দুর্ঘট। ষ্টেশন-মাষ্টার তখন মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল—তোমরা যদি তোমাদের ঠিকানা আমাকে দিয়া যাও, তাহা হইলে

তোমাদিগকে ছাড়িয়া দিতে পারি। যতীন্দ্র তাহাই করিল; ঠিকানা দিয়া সঙ্গী ও ভৃত্য-সহ রাত্রি ৩॥০টার সময়ে বাহিরে আসিল। ভোর ৫॥০ টার সময়ে তাহারা প্রিয়বাবুর শিবিরে উপস্থিত হইল। পথে প্রিয়বাবুর সঙ্গে দেখা হইল; এই ঘটনার কথা শুনিয়া তিনি পাল্‌কীতে চড়িয়া ষ্টেশনে আসিতেছিলেন। প্রভাতেই তাহারা খণ্ডগিরি ও উদয়-গিরি দর্শন করিল এবং ভুবনেশ্বরের মন্দিরও দেখিল। শুনা গেল,—বড়লাটের মন্দির-প্রবেশ সম্বন্ধে সভা হইয়াছিল, তাহাতে খুব বাক্‌বিতণ্ডা হইয়াছিল। পাণ্ডারা কিছুতেই বড়লাটকে মন্দিরের হাতার ভিতরে প্রবেশ করিতে দিবে না বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছিল। যখন যতীন্দ্রনাথ ও তাহার সঙ্গীরা ষ্টেশনে ফিরিয়া আসিল, তখন মন্দির-কমিটির কয়েক-জন সদস্যও স্ব স্ব কর্ম্মস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন। ইহারাও ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন। ইঁহাদের মধ্যে কটক ও পুরীর জেলা-ম্যাজি-ষ্ট্রেটদ্বয়ও ছিলেন। প্রিয়বাবু ইঁহাদিগের নিকট গতকল্যকার রাত্রির ঘটনার বিষয় বলিলেন। তাঁহারা ষ্টেশন-মাষ্টারকে ডাকিয়া আনাইলেন এবং এমন তীব্রভাবে তিরস্কার করিলেন যে, তাহা বহুদিন সে ভুলে নাই। প্রিয়বাবু তখন বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের ঐ অংশের উকীল ছিলেন। তিনি ষ্টেশন-মাষ্টারের বিরুদ্ধে মামলা চালাইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু যতীন্দ্র ও তাহার সঙ্গী মামলার ঝঞ্ঝাটের জন্য উহাতে সম্মত হয় নাই। কাজেই রেলওয়ে-কর্ত্তৃপক্ষ বিভাগীয়ভাবে এই বিষয়টীর বিচার করেন ও শেষে ষ্টেশন-মাষ্টার পদচ্যুত হয়। সময়ে সময়ে সম্ভ্রান্ত আরোহীরা রেলের দায়িত্বজ্ঞানহীন কর্ম্মচারীদের হস্তে কিরূপ নিগ্রহ ভোগ করেন, এই ঘটনা হইতে তাহা বুঝা যায়।

ভুবনেশ্বরে তীর্থ-দর্শনে গতায়াতে যতীন্দ্রমোহন নানা অদ্ভুত ঘটনার সম্মুখীন হইয়াছেন। আর একবার ভুবনেশ্বর দর্শন করিয়া তিনি কটকে ফিরিতেছেন, কিন্তু ট্রেণযোগে তিনি ঢেঙ্কানলে নীত হয়েন।

তাঁহার নিকট একটি পয়সাও ছিল না; কোনও রূপে আবার কটকে ফিরিয়া আসেন।

বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের-পার্শ্ববর্ত্তী যে সকল স্থান যতীন্দ্রমোহন পরিদর্শন করিয়াছিলেন, সে সকলের স্মৃতি তাঁহার নিকট অতীব প্রীতিকর হইয়া রহিয়াছে। এই আনন্দ ও প্রীতির কারণ এই যে, তিনি যেখানেই গিয়াছেন, সেখানেই তাঁহার কোনও কোনও আত্মীয়-কুটুম্ব তাঁহাকে অত্যন্ত আদর-যত্ন করিতেন এবং তাঁহাদের পরিচর্য্যায় মনে হইত যে, তিনি নিজের বাড়ীতেই রহিয়াছেন।

১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে যতীন্দ্র অজীর্ণ-রোগাক্রান্ত হয়েন। তাঁহাদের পারিবারিক চিকিৎসক ছিলেন কবিরাজ নীলমাধব রায়: ইনি সে সময়ে সুচিকিৎসার জন্য কালকাতায় সবিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। এই সময়ে কবিরাজমহাশয় যতীন্দ্রমোহনকে বলিল, তুমি কোনও দূরবর্ত্তী স্বাস্থ্যকর স্থানে বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য যাও; ঠিকানা সকলকে জানাইয়া যাইও না; তাহা হইলে বিশ্রামও হইবে, স্বাস্থ্যসঞ্চয়ও হইবে। তিনি কবিরাজমহাশয়ের পরামর্শে এবং মাতার আদেশে দার্জ্জিলিং গমন করেন ও তথায় তিন মাস অবস্থান করেন।

শোক-দুঃখের এক টানা জীবনে যতীন্দ্রমোহনেব দার্জ্জিলিং-প্রবাসকে ইহার ব্যতিক্রম বলা যাইতে পারে; কারণ, এই অল্প সময়টুকু তাঁহার পক্ষে প্রীতিকর হইয়াছিল। বিশেষতঃ সেই বৎসর লুইস জুবিলী স্যানিটেরিয়াম্ বা স্বাস্থ্যাবাসে স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য বহু যুবকের আগমন হইয়াছিল। যতীন্দ্রমোহন খেলাধূলায় খুব অনুরাগী ছিলেন বলিয়া যুবকেরা তাঁহাকে তাঁহাদের দলের নেতা করিয়াছিলেন। স্বাস্থ্যাবাসে অবস্থানকারী ব্যক্তিগণের সম্মিলিত প্রভাব এরূপ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে, স্বাস্থ্যাবাসের প্রভূত সংস্কার সাধিত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, এইসকল অবস্থানকারীর অধিকাংশই নবাগত যুবক। দুই বেলার জলযোগ এবং মধ্যাহ্ন ও

রাত্রির ভোজনের খাদ্য-তালিকা সম্পূর্ণরূপে নূতন করিয়া তৈয়ারী হইল। স্বাস্থ্যাবাসের অবস্থানকারীদিগের প্রতি যথাযোগ্য মনোযোগ না দিলে যুবকগণ কিছুতেই পরিচালকবৃন্দকে নিশ্চিন্ত থাকিতে দিবেন না, ইহা তাঁহারা ভাল রকমই বুঝিয়াছিলেন। স্বাস্থ্যাবাসে টেনিস খেলিবার একটি স্থান ছিল; উহা এতদিন উপেক্ষায় ও অ-ব্যবহারে 'পতিত' অবস্থায় ছিল। উহার সংস্কার সাধিত হইল এবং পূর্ণ উদ্যমে সারাদিন টেনিস খেলা চলিতে লাগিল। ইহাতে যে সকল স্বাস্থ্যাবাস-বাসী খেলা-ধূলার গোলমাল ভালবাসিতেন না, তাঁহারা অবশ্য মনে মনে বিরক্ত হই-লেন। ডাঃ শিশির পাল ছিলেন স্বাস্থ্যাবাসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বা অধ্যক্ষ; সম্ভবতঃ এখনও তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত আছেন। স্বাস্থ্যা-বাসের পরিচালনা-পদ্ধতি যুবকেরা পাছে ওলট-পালট করিয়া দেন, এই জন্য তাঁহাকে অনেক বুদ্ধি-কৌশল অবলম্বন করিতে হইত।

দার্জ্জিলিংয়ে যাইবার সময়ে যতীন্দ্র এক বাক্স বই লইয়া গিয়াছিলেন। বাক্স খুলিয়া বইগুলি টেবিলের উপর সাজানো হইল। কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত! অবশেষে তিনি যেদিন দার্জ্জিলিং হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন সেইদিন ঐ বইগুলিকে আবার বাক্সবন্দী করা হয়। কোনও বই স্পর্শ করা পর্য্যন্ত হয় নাই। স্বাস্থ্যাবাসে আগন্তুকগণের মধ্যে এমন একজন ছিলেন—যিনি স্বাস্থ্যাবাসের অবস্থানকারীদিগকে প্রীতি ও আনন্দ-দানে প্রভূত সহায়তা করিতেন এবং যিনি এইজন্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। ইনি আসিয়াছিলেন গৌহাটী হইতে। ইঁহার নাম মিঃ এন-আর ফুকান। ইঁহার প্রধান সখ ছিল—শিকার। ইনি স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য প্রতি বৎসরই দার্জ্জিলিংয়ে আসিতেন। ইনি যতীন্দ্রকে নিজ কনিষ্ঠ সহোদরের মত দেখিতেন। কোনও প্রবাস-বন্ধুর প্রত্যা-বর্ত্তনকালে বড়ই করুণ দৃশ্য দেখা যাইত। রেলওয়ে ষ্টেশনে উপস্থিত বিদায়-ব্যথিত সজল-নয়ন যুবকগণের সমাগম-চিত্র স্মরণ করিলে

বিস্মিত হইতে হইত যে, নানাস্থান হইতে সমাগত বিভিন্ন দেশবাসী এক শৈল-শিখরবর্ত্তী স্বাস্থ্যাবাসে মাত্র দুই চারিমাস অবস্থানের ফলে কেমন করিয়া আজীবন বন্ধুত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ হইতেন! যতীন্দ্রমোহনের সহিত মিঃ ফুকানের জীবিত কালে আর দেখা হয় নাই। কিন্তু তিনি রোগ-শয্যায় পড়িয়া মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যতীন্দ্রকে মনে রাখিয়াছিলেন। যতীন্দ্র দার্জ্জিলিংয়ে মিঃ ফুকানের নিকট বলিয়াছিলেন যে, তিনি গৌহাটীতে মিঃ ফুকানের বাটীতে যাইবেন। যতীন্দ্রমোহন যে তাঁহার এই প্রতি-শ্রুতি রক্ষা করিতে পারেন নাই, এবং তিনিও যতীন্দ্রমোহনকে অতিথি-রূপে পান নাই, এই দুঃখ শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার মনে ছিল।

জুলাই মাসে যতীন্দ্রমোহন দার্জ্জিলিং হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। ১৯০৪ সালের নভেম্বর মাসে এম-এ পরীক্ষা। যতীন্দ্র-মোহন ইতিহাসে এম-এ পরীক্ষা দিবেন। কিন্তু তাঁহার মনে হইল,—ইহা অসম্ভব। পাঠ্য-পুস্তকের ৪৯ হাজার পৃষ্ঠা পাঠ করিতে হইবে; একটি পৃষ্ঠাও স্পর্শ করা হয় নাই। অধ্যাপক সেনের সহিত তাঁহার দুই প্রিয় ছাত্রের—ধর্ম্মদাস ও যতীন্দ্রের পরামর্শ হইল। অধ্যাপক সেন ইতিমধ্যে ডাফ কলেজ ত্যাগ করিয়া গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা-বিভাগে প্রবেশ করিয়াছেন। তিনি তখন হুগলী কলেজের অধ্যাপক। চুঁচুড়ায় তখন তাঁহার বাসা। স্থির হইল,—তাঁহার এই দুই ছাত্র চুঁচুড়ায় গুরু-গৃহে অবস্থান করিবে। আগষ্ট মাসে—বর্ষাপ্লুত এক অপরাহ্নে যতীন্দ্র ও ধর্ম্মদাস অল্পস্বল্প জিনিসপত্র লইয়া চুঁচুড়ায় গুরু-গৃহে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় বাস করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তাঁহারা দুইজনে গভীর মনোনিবেশ-সহকারে অধ্যয়নে মগ্ন থাকিতেন। পুরাকালে শিষ্যগণ যে ভাবে গুরুগৃহে অবস্থান করিয়া কঠোর ব্রহ্মচর্য্যসহ অধ্যয়নে রত থাকিতেন, ইঁহারাও কিয়দংশে তদ্রূপ আদর্শ-অনুসারেই চলিতেন। বাসা বাড়ী, মহিলাগণ ত নাই; কাজেই ভৃত্য ও পাচকের উপর

নির্ভর করিতে হইত। এক এক সময় এমন হইত, পাচক ও ভৃত্য দুইজনই অনুপস্থিত; গুরু ইহা জানেন না। কিন্তু শিষ্যদ্বয় বাসার কাজ চালাইয়া দিয়াছেন। একবার গুরু ধরিয়া ফেলিলেন। ভৃত্য ও পাচক তিন দিন অনুপস্থিত। এই তিন দিন ধর্ম্মদাস ও যতীন্দ্র তাঁহার আহারের জন্য রন্ধন করিয়াছে, গৃহ-কর্ম্ম করিয়াছে। তিনি শিষ্যদ্বয়কে তিরস্কার করিলেন। কিন্তু তাহারা গুরুর আশীর্ব্বাদ হইতে বঞ্চিত হইল না। অধ্যাপক সেন যে ভাবে তাঁহার ছাত্রগণের চরিত্র গঠন করিতেন, সেইরূপ ভাবে ছাত্রদের চরিত্র গঠন অতি অল্প অধ্যাপকই করিয়া থাকেন।

এই সময়ে অপরাহ্নে কিছু খেলা-ধূলা করিবার প্রয়োজন শিষ্যদ্বয় অনুভব করিল। চুঁচুড়ার "ডিউক ক্লাব" নামক একটি ক্রীড়া-সমিতি ছিল, সেখানকার ভারতীয় সরকারী কর্ম্মচারীগণ ইহার সদস্য ছিলেন। জেলা-জজের আস্তাবলের একাংশে ইহা অবস্থিত ছিল; টেনিস খেলিবার একটি স্থানও ক্লাবের ছিল; কিন্তু তাহা কখনও সদস্যগণ ব্যবহার করিতেন না। যতীন্দ্র ও ধর্ম্মদাস এই ক্লাবে ভর্ত্তি হইবার জন্য আবেদন করিলেন। ক্লাবের তখনকার সেক্রেটারী ছিলেন শ্রীযুত সারদা-প্রসাদ বক্সী; ইনি পরে জেলা ও দায়রা-জজের পদে উন্নীত হইয়া-ছিলেন। ইনি এত অল্পবয়স্ক যুবকদ্বয়ের আবেদন অগ্রাহ্য করিলেন। যতীন্দ্র ও ধর্ম্মদাস তখন আবার এই বলিয়া আবেদন করিলেন যে, তাঁহারা নিজেদের ব্যয়ে টেনিস খেলিবার জায়গাটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া লইবেন। কিন্তু এই আবেদনও অগ্রাহ্য হইয়াছিল। ইহার ১০ বৎসর পরে যতীন্দ্রমোহন যখন বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনারের পার্শ্বন্যাল এসিষ্ট্যান্ট-রূপে চুঁচুড়ার বদলি হইয়া আসেন সেই সময়ে তিনি ডিউক ক্লাবটিকে নবজীবন দান করেন। তাঁহারই চেষ্টায় ডিউক ক্লাবের নিজস্ব সুন্দর বাটী হয় এবং ইহা একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।

ইহার নাম প্রতিশোধ বটে, কিন্তু এই প্রতিশোধ মহত্ত্বব্যঞ্জক, সঙ্কীর্ণতা-প্রণোদক নহে।

১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ধর্ম্মদাসের জ্বর হইল। অধ্যাপক সেন তাহার জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন এবং বলিলেন, তুমি এখনই বাড়ী যাও, কারণ পরীক্ষা ঘনাইয়া আসিতেছে। অক্টোবর মাসের গোড়াগুড়ি ধর্ম্মদাস চুঁচুড়া হইতে চলিয়া গেল। যতীন্দ্র আরও এক পক্ষকাল ছিল; কিন্তু ম্যালেরিয়ার সময় আসিতেছে বলিয়া অধ্যাপক সেন তাঁহাকেও বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলেন। নভেম্বর মাসের গোড়ার দিকেই এম-এ পরীক্ষা বসিল। ধর্ম্মদাস মেধাবী ও কৃতী ছাত্র ছিল; কঠোর পরিশ্রম করিয়া সে অধ্যয়ন করিত। পাঠে তাহার প্রভূত নিষ্ঠা ও একাগ্রতা ছিল। সে যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে, ইহাতে তাহার সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাস ছিল। সে সময়ে প্রেসিডেন্সী ও ডাফ কলেজে ইতিহাস ও অর্থনীতি-বিষয়ে এম-এ পরীক্ষার্থীদের মধ্যে কতকটা প্রতি-দ্বন্দ্বিতা বিদ্যমান ছিল। উভয় কলেজের অধ্যাপকগণ যাহাতে তাঁহাদের নিজ নিজ কলেজের ছাত্রগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদক লাভ করিতে পারে, এই জন্য বিশেষ করিয়া ছাত্রদিগকে তৈয়ারী করিলেন। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে একটি উৎকৃষ্ট ছাত্র এম-এ পরীক্ষা দিতেছিল; সে প্রেসিডেন্সি কলেজের তদানীন্তন ইতিহাসাধ্যাপকের ভ্রাতা। তাহার ধারণা হইল, একটি প্রশ্ন-পত্রের উত্তর তাহার ভাল হয় নাই, এজন্য স্বর্ণপদক সে পাইবে না। সেই কারণে, সেই ছাত্রটি ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে বাকী পরীক্ষা আর দেয় নাই। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে এই ছাত্রটি ইতিহাস ও অর্থনীতিতে এম-এ পরীক্ষা দিতেছিল। সুতরাং সে ছিল অধ্যাপক সেনের ছাত্রদের প্রতিদ্বন্দ্বী। অধ্যাপক সেন তাঁহার ছাত্রদ্বয়কে বলিলেন, প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র-দিগকে পরাজিত করা চাই। বেচারী ধর্ম্মদাস এইজন্য তাহাকে বিপন্ন মনে করিল। কারণ ধর্ম্মদাস স্বর্ণপদক পাইবে—এই আশা অধ্যাপক সেন

পোষণ করিতেন। যতীন্দ্রের এই বিষয়ে কোনও ভাবনা-চিন্তা ছিল না। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে ক্রিকেট-খেলার মরসুমে অন্যান্য বারের মত স্ফূর্ত্তি করিয়া তত বেশী যোগ দিতে পারে নাই; তাহার ক্রিকেট-খেলার স্রোতে কিছু ভাঁটা পড়িয়াছিল, এইমাত্র। তবে অধ্যাপক সেনের দাবীর পূরণের জন্য যতীন্দ্রও কতকটা দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। সে মনে করিত, তাহার চেয়ে ধর্ম্মদাসের দায়িত্ব অধিক। এই বৎসর কলিকাতায় ক্রিকেটের মরসুমে এক বিরাট সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। রণজির নেতৃত্বে মহারাজা পাতিয়ালার ক্রিকেট-দল কলিকাতায় খেলিতে আসিয়াছিলেন এবং ক্রীড়া-রসিক ব্যক্তিগণ নিজ নিজ কর্ম্মক্ষেত্র হইতে ক্রিকেট-ময়দানে সমবেত হইয়াছিলেন। কিন্তু পরীক্ষার পূর্ব্ববর্ত্তী মাসে গুরুর উপদেশ ও অনুজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিবার জন্য যতীন্দ্র চেষ্টার ত্রুটি করে নাই। এই সময়ে গুরুর আশা পূর্ণ করিবার জন্য তাহার মত খারাপ ছাত্রও ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১৬ ঘণ্টা পড়িত। পরীক্ষার সময়ে যতীন্দ্র তাহার বন্ধুবান্ধবকে বলিত, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিব বলিয়া মনে হয়। অর্থনীতির পরীক্ষার দিন প্রাতঃকালে তিনি গুরুর নিকট হইতে একখানি পত্র পান; উহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন, আজ যদি ভাল করিয়া উত্তর লিখিতে পার, তাহা হইলে আর কোনও বাধা পাইবে না। পরীক্ষার সময়েও যতীন্দ্র প্রত্যহ বিডন উদ্যানে কলিকাতা নর্থ ক্লাবে এক ঘণ্টা টেনিস খেলিত। ঐ দিন সন্ধ্যার সময়ে যখন তাঁহার নর্থ ক্লাবের বন্ধুগণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন আশা করিতেছ ?, তখন যতীন্দ্র উত্তর করিয়াছিল, যদি আজকার উত্তর যাহা লিখিয়াছি তাহা ভাল হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমি তৃতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইতে পারি। ২৬শে ডিসেম্বর ইডেন গার্ডেনে পাতিয়ালা-দলের সহিত একটা বড় রকমের ক্রিকেট ম্যাচ হইতেছিল। ধর্ম্মদাসও যতীন্দ্রের সঙ্গে ছিল; কিন্তু সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া গেল। বলিল, আজ পরীক্ষার ফল বাহির হইবার কথা আছে, তাহাই

জানিতে যাইতেছি। দুই ঘণ্টা পরে ধর্ম্মদাস যতীন্দ্রের কাছে ছুটিয়া আসিয়া বলিল, যতীন্দ্র তুমি ইতিহাসে প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছ। যতীন্দ্র মনে করিয়াছিল, ধর্ম্মদাস বিদ্রূপ করিতেছে। কিন্তু ধর্ম্মদাস সত্যসত্যই নম্বর পর্য্যন্ত আনিয়াছিল। ধর্ম্মদাস যতীন্দ্র অপেক্ষা ৩ নম্বর বেশী পাইয়াছিল। সুবর্ণ পদক লাভ করিয়া ধর্ম্মদাস তাঁহার গুরুকে সন্তুষ্ট করিয়াছিল, আর যতীন্দ্র রৌপ্যপদক ও কবডেন পদক পাইয়াছিল। এই ছাত্রদ্বয়ই ডাফ কলেজে তাঁহার শেস ছাত্র। সুতরাং ইঁহাদের সাফল্যে তিনি অত্যন্ত তৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন।

তখনকার দিনে আর্টস ছাত্রদের পক্ষে জীবিকার্জ্জনের জন্য কর্ম্মপ্রাপ্তি সহজ না হইলেও এখনকার মত প্রতিযোগিতা খুব তীব্র ছিল না। এম-এ পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইলে যতীন্দ্রমোহন আইন-অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। মেট্রোপলিট্যান কলেজে সুযোগ্য অধ্যাপকগণের নিকট আইন অধ্যয়ন করিতেন। এই সময়ে জীবিকার্জ্জনের জন্য কিছু করিবার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। তিনি বেশ জানিতেন যে, বিধবা মাতা তাঁহার সঞ্চিত অর্থ দ্বারা শৈশব হইতে যৌবন পর্য্যন্ত তাঁহার শিক্ষার জন্য প্রচুর ব্যয় করিয়া আসিতেছেন। যতীন্দ্রমোহন মাতার নিকট হইতে কখনই কোনও অধিক মূল্যের দ্রব্য-সামগ্রী চাহিতেন না। কিন্তু তাঁহার জননীর নিকট তাঁহার মনের ইচ্ছা অবিদিত থাকিত না। পুত্র না চাহিলেও তিনি পুত্রের ঈপ্সিত দ্রব্যই পুত্রকে দিতেন—যত মূল্যেরই তাহা হউক। পুত্র সময়ে সময়ে বিস্মিত হইয়া ভাবিতেন, মা কেমন করিয়া তাঁহার মনের ইচ্ছা জানিতে পারিলেন এবং কেমন করিয়াই বা এত টাকার জিনিস সংগ্রহ করিয়া দিলেন! যতীন্দ্রের জননী যতীন্দ্রকে প্রায়ই বলিতেন, জগদীশ্বর সকলই দেখিতে পান ও জানিতে পারেন। মানুষ কোথায় কি করিতেছে, ইহা তিনি দেখিতে পান এবং তাহার মনের অভিপ্রায় জানিতে পারেন।

যতীন্দ্র তাঁহার মাতাকে এই পৃথিবীতে ভগবানেরই প্রতিনিধিস্বরূপ মনে করিতেন। এই সময়ে যতীন্দ্রদের বৃহৎ যৌথ পরিবারের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল হইয়া উঠিয়াছিল। এই পরিবারভুক্ত অনেকেই এমন অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিতেন না, যাহাতে যেরূপ পারিবারিক মর্য্যাদা তাঁহাদের ছিল তদনুরূপ থাকিতে পারেন। এইজন্য যতীন্দ্রের মাতার নিজস্ব অর্থে হাত পড়িতেছিল। এরূপ হইতে থাকিলে কলসীর জল আর কতদিন টিকিবে? এইজন্য যতীন্দ্র উপার্জ্জন করিয়া সংসারে অর্থ-সাহায্য করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন। আইন পড়িবার সময়ে একদিন তিনি দেখিতে পাইলেন যে, যশোহরের কালিয়া উচ্চ ইংরাজী স্কুলের জন্য একজন হেড মাষ্টার আবশ্যক বলিয়া একটি বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে। কাহাকেও কিছু না জানাইয়া যতীন্দ্র এই পদের জন্য একটি দরখাস্ত পাঠাইয়া দিলেন। ইহার যে উত্তর আসিল, তাহা নৈরাশ্যজনক। কারণ, এই স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষ একজন অভিজ্ঞ হেড মাষ্টার চাহিতেছিলেন, ইউনিভারসিটি হইতে সদ্য-পরীক্ষোত্তীর্ণ অভিজ্ঞতা-হীন নব্য যুবকের প্রয়োজন তাঁহাদের ছিল না।

আইনের টেষ্ট-পরীক্ষার সামান্য কিছুদিন পূর্ব্বে প্রাদেশিক শাসন-বিভাগে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কলেক্টর গ্রহণের যে নিয়ম ছিল, বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট উহার কিছু কিছু সংস্কার করিয়া এক ইস্তাহার প্রচার করেন। ইহাতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে ছয়জন প্রার্থী মনোনীত করিবার ক্ষমতা দেওয়া হয়; এবং উহাদের মধ্যে তিনজনকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা হয়। অধ্যাপক সেন তাঁহার ছাত্রদ্বয়কে ডাকিয়া পাঠাইলেন ও তাঁহাদের সহিত এই বিষয়ে পরামর্শ করিলেন। তিনি বলিলেন, আমার মত এই যে, তোমাদের মধ্যে একজনের সরকারী কর্ম্ম লওয়া উচিত। ইউনিভার্সিটি হইতে যে সকল উৎকৃষ্ট ছাত্র বাহির হয়, তাহাদের কতকগুলিকে গভর্ণমেণ্ট যদি নিযুক্ত করেন, তাহা হইলে

ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট-দলের মধ্যে বিস্তর যোগ্য লোক প্রবেশ করিতে পারিবে এবং ইহার ফলে সরকারী কার্য্যের মর্য্যাদা বাড়িবে। ধর্ম্মদাস গভর্ণমেণ্টের অধীনে কর্ম্ম লওয়া সুবিধাজনক মনে করিলেন না; এই জন্য তিনি ইউনিভার্সিটীতে আবেদন করিতে অসম্মত হইলেন। পিতামাতার দ্বিতীয় পুত্র হইলেও ধর্ম্মদাসই ছিলেন তখন তাঁহাদের পরিবারের কর্ত্তা। সেই জন্য অর্থোপার্জ্জনার্থ কলিকাতা হইতে অন্যত্র যাওয়া তাঁহার পক্ষে অসুবিধাজনক ও অসম্ভব ছিল। ধর্ম্মদাস পূর্ব্ব হইতেই স্থির করিয়াছিলেন যে, তিনি আইন-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ওকালতি করিবেন। আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি আলিপুরে ওকালতি আরম্ভ করেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই স্বীয় যোগ্যতায় তিনি প্রসিদ্ধ উকীলগণের অন্যতম হইয়া উঠেন। মামলা-কারীদের তাঁহার উপর গভীর বিশ্বাস ছিল। উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তাঁহার ছিল; কিন্তু দুঃখের বিষয়, অকালে তাঁহার মৃত্যু হয়। যতীন্দ্রমোহনেরও আবেদন করিবার ইচ্ছা ছিল না। তাঁহাদের পরিবারে গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীর সংখ্যাও অতি অল্প ছিল; এজন্য পারিবারিক কোনও সংস্কারও ছিল না। যদিও যতীন্দ্রের পিতা ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গভর্ণমেণ্টের অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাও এত অল্পকালস্থায়ী যে, তাহার ভিত্তির উপর সরকারী কর্ম্মের উপর কোন দাবী করা যায় না। ছেলেবেলায় তিনি যে সকল আত্মীয়স্বজনের মধ্যে মানুষ হইয়াছিলেন এবং যাঁহাদের প্রভাব তাঁহার উপর পতিত হইয়াছিল, তাঁহারা প্রায় সকলেই আইন-ব্যবসায়ী ছিলেন ও স্বাধীনভাবে জীবিকার্জ্জন করিতেন। ইঁহারা সকলেই কোনও না কোনও প্রকার দেশহিতকর কার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সুতরাং যতীন্দ্রের মনে স্বভাবতঃ এই আকাঙ্ক্ষাই হইত যে, এমন ভাবে তিনি জীবিকার্জ্জন করিবেন, যাহাতে কার্য্যে ও চিন্তায় তিনি স্বাধীন হইবেন এবং স্বদেশ ও স্বজাতির সেবা করিবার সুযোগ-সুবিধা পাইবেন। কিন্তু তাঁহার ব্যক্তিগত ইচ্ছা থাকিলে কি

হয়, এক অজ্ঞাত হস্ত তখন তাঁহার জীবনের ভবিষ্যৎ-গঠনে প্রবৃত্ত হইয়াছে। অধ্যাপক সেনের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির হইল যে, যতীন্দ্র প্রথমে তাহ:র মাতার অনুমতি গ্রহণ করিবে এবং তদনুসারে কার্য্য করিবে। মাতার বাক্য যতীন্দ্রের নিকট আদেশ অপেক্ষাও অধিক ছিল। তাঁহার মাতা প্রথমে যতীন্দ্র আবেদন করিবেন কি না—সে বিষয়ে কোনও কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। আত্মীয়-কুটুম্বদের মধ্যে মিঃ ডাব্লিউ সি বনার্জ্জি তখনও জীবিত ছিলেন, কিন্তু বার্দ্ধক্যে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। সেই সময়ে তিনি সুইজারল্যাণ্ডের কোনও স্বাস্থ্যাবাসে অবস্থান করিতেছিলেন। মিঃ বনার্জ্জি যতীন্দ্রের মাতার জ্যেঠতুতো ভ্রাতাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন। পরিবারের বন্ধুগণের মধ্যে স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যতম ছিলেন। তিনি তখন হাইকোর্টের বিচারপতির পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। যতীন্দ্রের মাতা ও মাসীমা যখন বেথুন স্কুলে পড়িতেন, সেই সময়ে তাঁহাদের পরীক্ষার কাগজ দেখিবার ভার পড়িয়াছিল ভৈরবচন্দ্রের উপরে। কিন্তু তিনি বলেন, উহাদের ক্লাসের কাগজ আমি দেখিব না। এই জন্য উকীল ও পরে বিচারপতি সারদাচরণ ঐগুলি দেখিতেন। যতীন্দ্রের মাতা যতীন্দ্রকে বলিলেন, ইতিকর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণের জন্য তুমি স্যর গুরুদাসের অভিমত গ্রহণ করিতে পার। অতঃপর এই সম্বন্ধে মিঃ ডব্লিউ সি বনার্জ্জিরও নিকট সুইজারল্যাণ্ডে চিঠি লেখা হইল এবং এই বিষয়ে স্যর গুরুদাসের অভিমত কি তাহা জানিবার জন্য তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিয়া যতীন্দ্র পত্র লিখিল।

ফেরত-ডাকে স্যর গুরুদাসের নিকট হইতে চিঠির উত্তর আসিল যে, যে কোনও দিন বেলা ৯টা হইতে ১০টার মধ্যে দেখা করিতে পার; কেবল বৃহস্পতিবারে হইবে না, কারণ ঐ দিন তিনি গঙ্গাস্নানে যাইয়া থাকেন। যতীন্দ্র বাইসাইকেলে চড়িয়া একদিন সকালে নারিকেল-

ডাঙ্গায় স্তর গুরুদাসের সহিত দেখা করিবার জন্য উপস্থিত হইলেন। যতীন্দ্র কার্ড পাঠাইবামাত্র শ্রীযুত হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আসিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিলেন এবং বলিলেন—আপনার কি খুব জরুরী কোনও প্রয়োজন আছে? যতীন্দ্র দেখা করিবার অনুমতি লইয়া তবে দেখা করিতে গিয়াছিলেন। কাজেই এই প্রশ্নে তিনি বিস্মিত হইলেন। সেই জন্য তিনি হারাণবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—আজ সকালে স্তর গুরু-দাসের সহিত সাক্ষাতের কি কোনও অসুবিধা আছে? হারাণবাবু উত্তর করিলেন,—অসুস্থ ছিলেন বলিয়া আমার পিতৃদেব আজ প্রায় ১ সপ্তাহ উপবাস করিতেছিলেন; আজ তিনি অন্ন-পথ্য করিবেন। এই সময়ে যদি তিনি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করেন, তাহা হইলে এক সপ্তাহ উপবাসের পর প্রথম দিনের অন্নগ্রহণে তাঁহার বিলম্ব হইবে। সেইজন্য আমি জানিতে চাহিতেছিলাম যে, আজকার সাক্ষাৎকার স্থগিত রাখিতে পারা যায় কি না? যতীন্দ্র উত্তর করিলেন,—অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, এই বিষয় আমি জানিতাম না। আমি অন্যদিন আসিয়া উঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে বিশেষ কিছুই ক্ষতি-বৃদ্ধি হইবে না! অতঃপর যতীন্দ্র চলিয়া যাইবার জন্য বাইসাইকেলে চড়িবার উপক্রম করিতেছিলেন, এমন সময়ে হারাণবাবু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনি কোথা হইতে আসিয়াছেন? যতীন্দ্র উত্তরে বলিলেন,—নতুন বাজারে ভৈরববাবুর বাড়ী হইতে। হারাণবাবু যেমন শুনিলেন যে, যুবক ভৈরববাবুর বাড়ী হইতে আসিয়াছে, অমনই তিনি বলিলেন,—আমি আপনাকে ছাড়িতে পারি না। যদি আমার পিতা শুনেন যে, আমি আপনাকে দেখা করিতে দিই নাই, তাহা হইলে তিনি আমাকে অত্যন্ত তিরস্কার করিবেন। কিন্তু যতীন্দ্রমোহন তাঁহার কথা শুনিবেন না, তিনিও সেদিন সকালে স্তর গুরুদাসের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া চলিয়া আসিতে চান। কারণ, এইরূপ অবস্থায় স্তর গুরুদাসকে বিন্দুমাত্র

কষ্ট দিতে যতীন্দ্রের ইচ্ছা ছিল না। অবশেষে হারাণবাবু বলিলেন,—আমি পিতার নিকট আপনার আগমন-সংবাদ দিই, তার পর তিনি কি বলেন তাহা আসিয়া আপনাকে জানাইতেছি। যতক্ষণ আমি না ফিরি, ততক্ষণ আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক অপেক্ষা করুন। হারাণবাবু তাঁহার পিতার নিকট যাইলেন এবং যতীন্দ্রমোহন অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। অবিলম্বে হারাণবাবু যতীন্দ্রের নিকট আসিয়াই বলিলেন—আপনি চলুন, বাবা আপনাকে তাঁহার নিকট লইয়া যাইতে বলিয়াছেন। যতীন্দ্র-মোহনের সহিত স্যর গুরুদাসের কথাবার্ত্তা যখন শেষ হইল তখন বেলা প্রায় ১১॥০ টা। যতীন্দ্রমোহন বলিল,—আহারে বিলম্ব হইল—এজন্য আমি দুঃখিত। সাক্ষাতের সময়ে একটি বিষয় যতীন্দ্র লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে কাহারও এমন সাহস হইতেছিল না যে, তাঁহার নিকটে আসিয়া বলেন যে, আহারের সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাইতেছে। একটি বালিকার কণ্ঠস্বরে বৃদ্ধের চমক ভাঙ্গিল; বালিকা বলিতেছিল,—বড় দেরী হইয়া যাইতেছে, আপনি আহার না করিলে আমরা আহার করিতে পারিতেছি না। ইহার ফলে অনিচ্ছাসত্ত্বেও কথোপকথন তাঁহাকে বন্ধ করিতে হইল; কিন্তু বৈঠকখানা হইতে বাহির হইয়াও যতীন্দ্রের সহিত আধঘণ্টা কথাবার্ত্তা কহিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি যতীন্দ্রের নিকট যতীন্দ্রের মাতার বিবাহের সময়কার সেই ঘটনার বিষয় বর্ণনা করেন। প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে স্যর গুরুদাস যতীন্দ্রের মাতার নিকট প্রস্তাব পাঠাইয়াছিলেন যে, তাঁহার দ্বিতীয় কন্যার সহিত যতীন্দ্রের বিবাহ দিবেন কি না? যতীন্দ্রের মাতা ইহার উত্তরে বলিয়াছিলেন,—যতীন্দ্র উপার্জ্জনে সমর্থ না হইলে তাহার বিবাহ দিব না—সংকল্প করিয়াছি। পাঁচ বৎসর পরে স্যর গুরুদাস যতীন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'বিবাহ' সম্বন্ধে তোমার মত কি? আমাদের সমাজের যেরূপ অবস্থা তাহাতে যুবকেরা বিবাহ করিলে তবে তাহাদের

জীবনের ভবিষ্যৎ-গঠনের পথ খুলে। যতীন্দ্র উত্তর করেন,—বিবাহ সম্বন্ধে এখনও আমি কিছুই ভাবিয়া-চিন্তিয়া দেখি নাই। আমি কেবল জানি যে, উপার্জ্জন করিতে না পারিলে বিবাহ না করাই উচিত। তার পর বিবাহের দ্বারা আমার জীবনের ভবিষ্যৎ-গঠনের পথ খুলিবে—ইহা আমার জীবনে অসম্ভব মনে হয়। কারণ, আমার মাতা চাহেন—কেবল উৎকৃষ্ট বধূ; তাহার সহিত বিপুল যৌতুক ও পণের টাকা চাহেন না। স্যর গুরুদাস যতীন্দ্রমোহনকে পরামর্শ দিলেন,—তুমি ইউনিভার্সিটীতে মনোনয়ন পাইবার জন্য আবেদন কর। ইহাতে তোমার আইন পড়ায় কোনও বাধা উপস্থিত হইবে না। এই ঘটনার কিছুদিন পরে মিঃ বনার্জ্জির নিকট হইতেও পত্র আসিল; তাহাতে তিনি মনোনয়ন পাইবার জন্য ইউনিভার্সিটীতে আবেদন করিতে বলেন। যখন অধ্যাপক, আত্মীয় ও পরিবারের জনৈক অকপট বন্ধু সকলেই একমত হইয়া এই পথ গ্রহণ করিবার পরামর্শ দিলেন, তখন মাতার অনুমতি লইয়া যতীন্দ্র মনোনয়নের জন্য কলিকাতা ইউনিভার্সিটীর রেজিষ্ট্রারের নিকট আবেদন করিলেন। এই সময়ে যতীন্দ্র হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীযুত সারদাচরণ মিত্রের ভ্রাতা, কলিকাতা হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুত ষোড়শীচরণ মিত্রের নিকট শিক্ষানবীশ ছিলেন। আইনের শেষ পরীক্ষার তখন প্রায় একমাস কাল বিলম্ব আছে, এই সময়ে ১৯০৫ সালের ১৩ই অক্টোবর যতীন্দ্রমোহন দার্জ্জিলিং হইতে বাঙ্গালা সরকারের এক টেলিগ্রাম পাইলেন,—উহাতে গবর্ণমেণ্ট জানাইয়াছিলেন যে, তাঁহাকে শিক্ষাধীন ডেপুটি কলেক্টরের পদে নিযুক্ত করা হইল; তাঁহাকে ২৪ পরগণায় কর্ম্ম করিতে হইবে। ২৩শে নভেম্বর আলিপুরে তিনি নূতন কর্ম্মে যোগ দিলেন। স্থির হইল,—তাঁহাকে তদানীন্তন ট্রেজারি-অফিসার শ্রীযুত রামনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট ট্রেজারি-সংক্রান্ত কাজ-কর্ম্ম শিখিতে হইবে। স্যর নৃপেন্দ্রনাথ সরকারের পিতা নগেন্দ্র

নাথ সরকার মহাশয় খাসমহলের তদানীন্তন ভারপ্রাপ্ত অফিসার ছিলেন; ইঁহার নিকটে তিনি খাসমহলের কাজ-কর্ম্ম শিখিবেন। অন্যান্য যে সকল অফিসারের নিকট তিনি কর্ম্ম শিখিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুত ভূপতিচরণ চক্রবর্ত্তী ও রায় বংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর অন্যতম।

সরকারী কর্ম্ম-জীবনের প্রথমে যতীন্দ্রমোহন ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে কোনও ধারণাই করিতে পারেন নাই। উকীল হইয়া স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করিবার এবং দেশ-সেবার স্বপ্ন তাঁহাকে তৃপ্তি দিত; সে সুখ-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। সরকারী কাজের ভিতরে তিনি আপনাকে ডুবাইয়া দিলেন। একদিন যতীন্দ্র ও তাঁহার অন্যান্য শিক্ষা-নবীশ সহকর্ম্মীগণ ২৪ পরগণার ট্রেজারী-অফিসারকে যখন দিনের হিসাব মিটাইতে সাহায্য করিতেছিলেন, তখন ট্রেজারী-অফিসার যতীন্দ্রকে বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন,—আফিমের সিন্দুকের মধ্যে আফিমের পরিমাণ কত তাহা নির্দ্ধারণ করিবার কার্য্য এখানে কেমনে লাগিতেছে? এত করিয়া দর্শনশাস্ত্র, অর্থনীতি, আন্তর্জ্জাতিক ব্যবহারশাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার ফল কি এই হইল? যুবক যতীন্দ্র ইহাতে যেন মরমে মরিয়া গেলেন; কিন্তু তিনি সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিলেন,—আমার এ কাজ বেশ লাগিতেছে, কারণ, ইহা আমার কর্ত্তব্যের অংশ বলিয়া আমি মনে করি। সুবৃহৎ কালেক্টরীর বিভিন্ন বিভাগে কার্য্য শিখিতে শিখিতে শিক্ষানবীশী অবস্থায় প্রায় ৯ মাস কাটিয়া গেল। যেদিন যতীন্দ্রমোহনের স্থায়ী চাকুরী হয়, সেইদিন তদানীন্তন কলেক্টর মিঃ জে-এইচ বার্ণার্ড তাঁহাকে ও তাঁহার সহকর্ম্মী মিঃ এস-সি সেনকে (ইনি এক্ষণে কলিকাতার কলেক্টর) ডাকিয়া পাঠান। তাঁহারা দুইজনে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলে তিনি বলেন, আমি আপনাদের চাকুরী স্থায়ী হইবার সংবাদের প্রতীক্ষায় ছিলাম। এখন আমি আপনাদিগকে ২৪ পরগণা জেলার

দুর্ভিক্ষগ্রস্ত নরনারীকে সাহায্য করিবার কার্য্যভার দিতে চাই। ২৪ পরগণার সদর মহকুমায় সরকারী সাহায্য ও দান পাইবার উপযুক্ত নরনারীর তালিকা প্রস্তুত করা ও অন্যান্য প্রাথমিক কার্য্য আরম্ভ করিবার জন্য আমি আপনাদের দুইজনকে বাছিয়া লইয়াছি। এই কার্য্য কঠোর-শ্রমসাপেক্ষ হইলেও ইহা সুষ্ঠুভাবে নির্ব্বাহ করিতে পারিলে ইহাতে আত্মপ্রসাদ জন্মিবে। সময়ে সময়ে এই কার্য্যে ১৮ হইতে ২০ ঘণ্টা পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিতে হইত। যতীন্দ্র ও তাঁহার সতীর্থ পল্লী অঞ্চলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া ইউনিয়ন বোর্ডের প্রত্যেক প্রেসিডেণ্টের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। তাঁহারা সাহায্য-দানের পাত্র বলিয়া যে তালিকা তৈয়ারী করিয়াছিলেন তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিতেন; কত যোগ্য ও অযোগ্য ব্যক্তিকে সাহায্য-তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে তাহা নির্দ্ধারণ করিতেন। অতঃপর শেষ রাত্রিতে তাঁহারা তাঁহাদের বাসগৃহে ফিরিয়া আসিতেন। এই অবিশ্রান্ত কঠোর পরিশ্রমমূলক কার্য্যের সময়ে কলেক্টর সাহেবের মহৎ দৃষ্টান্তে তাঁহারা অনুপ্রেরণা লাভ করিতেন। সেই সময়ে তিনি নিজের বাড়ীতে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টগণের এক সভা আহ্বান করিয়াছিলেন। সেই সভায় তিনি যাহা বলিয়াছেন, আজও তাহা গভীর সম্ভ্রমের সহিত তাঁহাদের স্মৃতি-পটে রক্ষিত আছে। লোকের দুর্দ্দশা ও ক্লেশমোচনের জন্য ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টগণকে কি করিতে হইবে, তাহা তিনি তাঁহাদিগকে প্রথমে বেশ করিয়া বুঝাইয়া দেন। অতঃপর তিনি বলেন, "মানুষের দুঃখ-কষ্ট বিমোচন করা একটি সুমহৎ ব্রত। ইহা উদ্‌যাপনের ভার আপনাদের উপর ন্যস্ত হইয়াছে। আমার বিশ্বাস, আপনারা যথাসাধ্য পরিশ্রম ও সাধুতার সহিত ইহা নির্ব্বাহ করিবেন। আমি এখনও জানি না যে, যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি, গভর্ণমেণ্ট তাহায় অনুমোদন করিবেন কি না। কিন্তু লোক যখন সত্য সত্যই বিপন্ন ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত, তখন তাহাদিগকে

সাহায্য করা আমার কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করে। যদি গভর্ণমেণ্ট আরব্ধ সাহায্যদানের কার্য্যে অনুমোদন না দেন, তাহা হইলে খুব সম্ভব ইহা আমার বেতন হইতে তাঁহারা কাটিয়া লইবেন। তাহাতে আমার কোন দুঃখ থাকিবে না। তবে বিপন্ন নরনারীর দুঃখমোচনের জন্য আপনাদের সৎকার্য্যের পুরস্কার দিবার ক্ষমতা আমার নাই। সে পুরস্কার মানুষ দিতে পারে না। একমাত্র উপর হইতে বিধাতাই সে কর্ম্মের পুরস্কার আপনাদের উপর বর্ষণ করিবেন।” তাঁহার এই মহৎ উপদেশ যতীন্দ্র ও তাহার সতীর্থের হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল।

মিঃ বার্ণার্ড ছিলেন পরলোকগত স্যর জেমস্ বার্ণার্ডের পুত্র। ভারত গভর্ণমেণ্টের সহিত মতভেদ হইয়াছিল বলিয়া তিনি ব্রহ্মদেশের চীফ কমিশনারের পদ ত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি যোগ্য পিতার যোগ্য পুত্র। তিনি একজন ভাল কলেক্টর ছিলেন। কোনও নূতন অফিসার চাকুরীর প্রারম্ভে যেরূপ কলেক্টরের অধীনে কার্য্য করিবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন এবং যাঁহার আদর্শে তিনি তাঁহার সরকারী কর্ম্ম-জীবন গঠিত করিতে চান, মিঃ বার্ণার্ড ছিলেন সেইরূপ ব্যক্তি। ইনি যখন বর্দ্ধমান বিভাগের অস্থায়ী কমিশনার ছিলেন সেই সময়ে ওলাউঠা-রোগে ইঁহার পরিবারভুক্ত কয়েক ব্যক্তির সহিত ইনিও মৃত্যুমুখে পতিত হন। আরও যে সকল প্রসিদ্ধ কলেক্টারের অধীনে যতীন্দ্রকে আলিপুরে কর্ম্ম করিতে হইয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে স্যর চার্লস এলেন, স্যর জন কামিং এবং মিঃ সি-এইচ বম্পাস সসম্মানে স্মরণীয়।

ডেপুটি কলেক্টরের পদে স্থায়িভাবে নিযুক্ত হইবার তিন মাস পরে, ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে যতীন্দ্রমোহনের সহিত স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌত্রী ও শ্রীযুত উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা শ্রীমতী সুমতি দেবীর বিবাহ হয়।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারী তাঁহাকে ২৪ পরগণা হইতে সাঁওতাল

পরগণায় বদলী করা হয়। এই প্রথম তাঁহাকে বাড়ী ছাড়িয়া বাহির হইতে হইল। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব এবং শৈশব হইতে অদ্যাবধি যে আবেষ্টনীর মধ্যে তিনি মানুষ হইয়াছিলেন, তাহা হইতে তাঁহাকে যেন ছিনাইয়া লওয়া হইল। ইহাতে যতীন্দ্র অত্যন্ত দুঃখ অনুভব করিলেন। তিনি কলিকাতা নর্থ ক্লাবের জয়েণ্ট সেক্রেটারী ছিলেন; এইজন্য নর্থ ক্লাব তাঁহার বিদায়-সম্বর্দ্ধনার অনুষ্ঠান করিলেন। ইহাতে বুঝা যায়, যতীন্দ্র-মোহন এই ক্লাবের সদস্যগণের হৃদয়ের কতখানি অধিকার করিয়াছিলেন। ক্লাবের প্রেসিডেণ্ট মিঃ জে-এইচ হিক্‌ল প্রবীণ টেনিস-খেলোয়াড় ছিলেন। তিনি যতীন্দ্রমোহনকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, আপনি যেখানেই বদলি হইবেন, টেনিস খেলার ব্যবস্থা না থাকিলে তথায় টেনিস খেলিবার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন, এই ভার আমি আপনার উপর দিলাম। যতীন্দ্রমোহন ইহা তাঁহার সরকারী কর্ম্ম-জীবনে বিশেষভাবে মনে করিয়া রাখিয়াছেন। যেখানে তাঁহাকে বদলি করা হইয়াছে, সেই স্থান ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে তিনি সেখানে টেনিস খেলিবার ব্যবস্থা করিয়া দিতেন।

জানুয়ারী মাসের এক অপরাহ্ণে যুবক যতীন্দ্রমোহন ইষ্ট-ইণ্ডিয়া রেলওয়ের লুপ লাইনে রামপুরহাটের ট্রেণে আরোহণ করিলেন। জীবিকা-র্জ্জনে তাঁহাকে গৃহ ছাড়িয়া বাহিরে যাইতে হইতেছে, মন বিষণ্ণ। তিনি তখন জানিতেন না যে, সাঁওতাল পরগণায় যাহাদের মধ্যে তিনি যাইতেছেন, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার আজীবনের বন্ধু হইবেন। সে সময়ে রামপুরহাট হইতে সাঁওতাল পরগণা যাওয়া খুবই কষ্টকর ছিল। বর্ষাকালে ৫০ মাইল রাস্তা যাইতে ঠিকা গাড়ীতে প্রায় ২৪ ঘণ্টা লাগিত। শীতকালে অবশ্য পথ কিছু সুগম হইত। ৩০শে জানুয়ারী যতীন্দ্র দুমকায় পৌছেন। সেখানে নূতন বাড়ী তিনি বেশ সাজাইয়া গুছাইয়া লইলেন। চারিদিকে দৃশ্যও সুন্দর। অনেক সহৃদ্ধ যতীন্দ্র

সেখানে পাইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে সাঁওতাল পরগণার তদানীন্তন সিনিয়র ডেপুটি কলেক্টর শ্রীযুত মনোমোহন চট্টোপাধ্যায় অন্যতম। ১৯০৮ হইতে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাস পর্য্যন্ত দুমকায় বেশ আনন্দেই কাটিয়াছিল। যতীন্দ্রের বিবাহের পূর্ব্বে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে যতীন্দ্রের মাতার স্বাস্থ্য অত্যন্ত মন্দ ছিল। ডাক্তারেরা তাঁহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়াছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর হইতে জীবনের প্রতি তেমন যত্ন লইতেন না, তাহার উপর কঠোরভাবে জীবনযাপন করিতেন; ইহার ফলে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে। তিনি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়াছিলেন এবং তিনি যে বেশী দিন বাঁচিবেন না, ইহা সকলেরই ধারণা ছিল। কিন্তু কিসে কি হইল, তাহা বলা বড় কঠিন; তবে যতীন্দ্রের বধূ যেদিন সংসারে প্রবেশ করিলেন, সেইদিন হইতে যতীন্দ্রের মাতার স্বাস্থ্যের উন্নতি হইতে আরম্ভ হইল। ডাক্তারও আবশ্যক হইল না, ঔষধেরও প্রয়োজন হইল না, অথচ তিনি রোগমুক্ত হইয়া উঠিতে লাগিলেন। দুমকায় যাওয়ার পর তিনি সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হইলেন ও নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইলেন। ইহাতে যতীন্দ্রের পরিবারে খুবই আনন্দ হইল। কিন্তু এই আনন্দ ও প্রীতির অন্তরালে এমন একটি ব্যাপার ঘটিল, যাহাতে সকলেই বিমর্ষ হইলেন। যতীন্দ্রমোহনের স্ত্রী মাঝে মাঝে বলিতেন, "আমি একটি সন্তান প্রসব করিয়া চলিয়া যাইব। সে সন্তানকে আমি দেখিতে পাইব না। যাঁহারা থাকিবেন তাঁহারাই উহাকে লালনপালন করিবেন।" প্রথমে তাঁহার এই কথা কেহ গ্রাহ্য করেন নাই, কিন্তু তিনি আগ্রহের সহিত ভবিষ্যতের কর্ত্তব্য-পন্থা-নির্দ্ধারণের যে পরিকল্পনা করিতেন, তাহাতে তাঁহার এই ভবিষ্যদ্বাণীতে গুরুত্ব অর্পণ না করিয়া থাকা যাইত না। ইহার ফলে পরিবারে একটা দুঃখের ছায়া পড়িয়াছিল।

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে একটি শোচনীয় ঘটনা ঘটিল। বাড়ীরই একটি পোষা কুকুর যতীন্দ্রের স্ত্রীর পায়ে কামড়াইয়াছিল। কুকুরটাকে

রাত্রিতে চোরেরা ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল। শেষ রাত্রিতে সে বাড়ীতে চলিয়া আসে, কিন্তু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ অবস্থায়। যতীন্দ্রের গৃহিণী যখন কুকুরটাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করেন, সেই সময়ে সে তাঁহার পায়ে কামড়াইয়া দেয়। কুকুরটাকে পরীক্ষাধীন রাখা হইয়াছিল; কিন্তু সাত দিনের দিন উহার মৃত্যু হয়। ইতিমধ্যে যতীন্দ্রের স্ত্রীকে কশৌলীতে পাঠাইবার জন্য ব্যবস্থা করা হয়। তখন তাঁহার জীবন নৈরাশ্যের রজ্জুতে ঝুলিতেছে। মানুষের চেষ্টায় ও অর্থে যাহা করা যায় তাহা করা হইয়াছিল। রোগিণীকে কশৌলীতে লইয়া যাওয়া হয়; সেখানে তাঁহার চিকিৎসাও হয় এবং সেখানকার চিকিৎসকেরা আশ্বাস দেন যে, আর কিছু হইবে না। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে যতীন্দ্র যখন তাঁহার স্ত্রীকে পিতৃ-গৃহে রাখিয়া দুমকা যান, তখন তাঁহার স্ত্রীর স্বাস্থ্য খুবই ভাল। তাঁহাকে পূজার ছুটীতে কলিকাতায় আসিতে বলেন। দুই মাস ছুটীর পরে কর্ম্মস্থলে যাইয়া পুনরায় দুই মাসের মধ্যে পূজার সময়ে বাড়ী আসা সম্ভব হইবে না, ইহা জানাইলে তাঁহার পত্নী তাঁহাকে বলেন যে, তাহা হইলে নবেম্বর মাসে তাঁহার পিতৃগৃহে জগদ্ধাত্রীপূজার সময়ে নিশ্চয়ই সাক্ষাৎ হইবে। তখনকার দিনে দুই দিনের ছুটী লইয়া সাঁওতাল পরগণা হইতে কলিকাতায় যাওয়া-আসা করা একপ্রকার অসম্ভব ছিল। যতীন্দ্র তখন ভাবিতে পারেন নাই যে, তাঁহার স্ত্রীর ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হইবে। জগদ্ধাত্রীপূজার প্রায় এক সপ্তাহ পূর্ব্বে তিনি ডেপুটী কমিশনারের মারফতে একটি টেলিগ্রাম পাইলেন যে, তাঁহাকে হুগলীতে বদলি করা হইল। সত্য সত্যই যতীন্দ্রমোহনকে জগদ্ধাত্রীপূজার দুই দিন পূর্ব্বে বাড়ী পৌঁছিতে হইয়াছিল।

চুঁচুড়ায় যে দুই মাস যতীন্দ্রমোহন ছিলেন, তাহা তাঁহার পক্ষে তৃপ্তিকর হয় নাই। একে ত তাঁহার পরিবার কলিকাতায় রাখিয়া আসিতে হইয়াছে এবং কর্ম্মস্থলে তিনি একাকী। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের বড়দিনের ছুটী

শ্রীমতী নলিনীবালা দেবী

স্বর্গীয়া সুমতী দেবী

কলিকাতায় অতিবাহিত হইয়াছিল। যতীন্দ্রমোহন ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা জানুয়ারী চুঁচুড়ায় ফিরিয়া আসিলেন। ৭ই জানুয়ারী প্রাতঃকালে তিনি একটি বড় ডাকাতী মামলার নথিপত্র দেখিতেছিলেন; প্রায় তিন ঘণ্টাকাল নথিপত্রগুলি তাঁহার সম্মুখে টেবিলের উপর পড়িয়াছিল। তাঁহার ইচ্ছা—এইগুলির পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করেন। কিন্তু মন তাঁহার কিছুতেই এই কার্য্যে বসিতেছিল না; অন্য চিন্তায় বিক্ষিপ্ত হইতেছিল। প্রায় বেলা ৯টার সময় দুইজন সাধু তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিলেন। একজনের বয়স অনুমান ৩৫, অপরের বয়স প্রায় ১৬ বৎসর। দুইজনেরই আকৃতি সুন্দর। কোনও কিছু না বলিয়া, কাহাকেও না জানাইয়া, এই ভাবে হঠাৎ ঘরের ভিতরে প্রবেশ করাতে যতীন্দ্র তাঁহাদের উপর কতকটা বিরক্ত হইলেন। সকাল হইতে যে কাজ লইয়া বসিয়াছিলেন, তাহাতে মনের অবস্থাও ভাল ছিল না। কাজেই তিনি মনে করিলেন, এরূপ হঠাৎ আগমন সাধুদের পক্ষে কতকটা অনধিকার-প্রবেশের মত হইয়াছে। সাধুরা বলিলেন, আমরা গঙ্গাসাগর-তীর্থে যাইতেছি, যদি কিছু সাহায্য করেন, তাই আপনার কাছে আসিয়াছি। যতীন্দ্রমোহন ইহার উত্তরে বলিলেন, ইহাই যদি তোমাদের প্রয়োজন ছিল, তাহা হইলে আমার কাছে কাহাকেও দিয়া চাহিয়া পাঠাইলে না কেন? একেবারে আমার ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া পড়া তোমাদের পক্ষে কি ঠিক হইয়াছে?

বয়োজ্যেষ্ঠ সাধুটী উত্তর করিলেন, আমাদের প্রার্থনা খুব সামান্য; ইহাতে যদি আপনার বিরক্তির কারণ হইয়া থাকি, তবে আমরা চলিয়া যাইতেছি। তৎক্ষণাৎ সাধুদ্বয় চলিয়া যাইলেন। যতীন্দ্র ভাবিতে লাগিলেন, আমি ত উঁহাদিগকে সাহায্য দিব না বলি নাই, তবে উঁহারা চলিয়া গেল কেন? তখনই তিনি মনে করিলেন, সাধুরা হয় ত বিরক্ত হইয়াছে; তাই তিনি তাঁহার ভৃত্যদিগকে বলিলেন, সাধুদিগকে ডাকিয়া আন। ভৃত্যেরা তখনই চারিদিকে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখিল, কিন্তু তাঁহা-

দিগকে আর দেখিতে পাওয়া গেল না। বাড়ীর সম্মুখে মাত্র একটি রাস্তা ছিল, তাহা দিয়া নদীর ধারে যাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত অন্য রাস্তা ছিল না। সুতরাং সাধুদ্বয়কে সেই পথ দিয়াই বাহির হইতে হইত, কিন্তু সে পথে সাধুরা বাহির হইলে তাহাদিগকে পাওয়া যাইত। সাধুদের এই অন্তর্দ্ধানে যতীন্দ্রমোহনের মন বিমর্ষ হইয়া গেল। তিনি কতকটা বিষণ্নমনেই আদালতে যাইলেন। ডাকাতী মামলার সওয়াল যখন তিনি শুনিতেছিলেন, সেই সময়ে তিনি একখানি টেলিগ্রাম পাইলেন। তখনই কেমন যেন তাঁহার মনে হইল,—ইহাতে মৃত্যুশয্যা-পার্শ্বে যাইবার জন্য আহ্বান আসিয়াছে। তিনি টেলিগ্রামখানি রাখিয়াছিলেন। আদালতের কার্য্য শেষ হইলে তিনি কলেক্টরের কক্ষে প্রবেশ করিলেন, প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে তাঁহার মনে হইল, কৈ টেলিগ্রামখানি ত খুলিয়া পড়া হয় নাই। যদিও তিনি ছুটী চাহিতে যাইতেছেন, কিন্তু তিনি প্রকৃত পক্ষে জানেন না যে, ছুটীর সত্য সত্যই দরকার আছে কি না। তিনি টেলিগ্রামখানি খুলিয়া দেখিলেন যে, স্যর গুরুদাস এই টেলিগ্রাম করিয়াছেন; তিনি লিখিতেছেন—তোমার স্ত্রীর সঙ্কটাপন্ন পীড়া, যদি অসুবিধা না হয়, তাহা হইলে এখানে আসিবে। যতীন্দ্র দুইদিনের ছুটী লইয়া নারিকেলডাঙ্গায় তাঁহার শ্বশুরবাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। স্যর গুরুদাস যতীন্দ্রের আগমনের আশা করিতেছিলেন। তিনি কলিকাতার তিনজন সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তারকে বাড়ীতে আটকাইয়া রাখিয়াছিলেন; তাঁহারা হইলেন—স্যর নীলরতন সরকার, ডাঃ কেদারনাথ দাস (পরে স্যর) এবং ডাঃ প্রাণধন বসু। যতীন্দ্র আসিলে ইঁহাদের মুখে তাহার স্ত্রীর অবস্থার কথা শুনিবে। স্যর নীলরতন যতীন্দ্রমোহনকে বলেন, এখন যতদূর দেখিতেছি, তাহাতে আমার মনে হয়—প্রসূতির বিপদ নাই, তবে নবজাত শিশুর জীবন-সম্বন্ধে আমরা কিছু বলিতে পারি না। বলপূর্ব্বক প্রসব করানো হইয়াছিল; শিশুটি বেলা ৫টা হইতে রাত্রি প্রায় ১১টা

পর্য্যন্ত নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ফেলে নাই। শিশুটীকে দোতালায় প্রসূতির পার্শ্বের ঘরে নার্স বা সেবাকারিণীগণ অক্সিজেন প্রয়োগ করিয়া এবং গরম ঠাণ্ডা জলে স্নান করাইয়া উহার শ্বাস-প্রশ্বাস আনাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। ডাক্তারেরা শিশুর জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া উহার চিকিৎসা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু নার্সগণ তখনও শিশুর জীবনরক্ষার আশা ত্যাগ করে নাই বলিয়া তাহার জীবন-রক্ষাব চেষ্টা করিতেছিল। রাত্রি ১০টার সময়ে পরিবারের প্রায় সকলেই শয়ন করিতে যাইলেন, তাঁহাদের আশা—পরদিন প্রভাতে প্রসূতির অবস্থা আরও ভাল দেখিবেন। ইহার অল্পক্ষণ পরে যে ডাক্তার প্রসূতিব অবস্থা পর্য্যবেক্ষণের জন্য নিযুক্ত ছিলেন—তিনি বলিলেন, এখনই স্যর নীলরতন সরকারকে খবর পাঠানো হউক যে, রোগিণীর শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট হইতেছে। যতীন্দ্র নিজেই স্যর নীলরতনের বাড়ীতে এই খবর দিবার জন্য যাইলেন, কিন্তু সেদিন রাত্রিতে তিনি স্যর উইলিয়াম ওয়েডারবরণের অভ্যর্থনা-সভায় যোগ দিতে গিয়াছিলেন, রাত্রি আন্দাজ ১১টার সময়ে যতীন্দ্র স্যব নীলরতনকে লইয়া আসিলেন। রোগিণীকে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন; তার পর স্যর গুরুদাসের সহিত ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন। যখন স্যর গুরুদাস ও স্যর নীলরতন সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিতেছিলেন, তখন একজন নার্স ছুটিয়া আসিয়া স্যর নীলরতনকে বলিল—আপনি একবার দেখিবেন চলুন, ছেলেটী নিঃশ্বাস ফেলিতেছে। স্যর নীলরতন ইহাতে যেন বিস্মিত ও চমকিত হইয়া উঠিলেন, কারণ তাঁহার ধারণা ছিল—অনেক পূর্ব্বেই সদ্যোজাত শিশুর মৃত্যু হইয়াছে। তিনি শিশুটীকে পরীক্ষা করিলেন এবং বলিলেন, তোমরা যে ভাবে উহার সেবা করিতেছ, সেই ভাবেই কর। এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। যাঁহারা প্রসূতির সেবা করিতেছিল, তাঁহারা প্রসূতির দেহে উত্তাপ ছিল বলিয়া তাঁহার যে মৃত্যু হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারেন নাই। যে সময়ে শিশুপুত্র শ্বাসপ্রশ্বাস ফেলিতে আরম্ভ করিয়াছিল ঠিক

সেই সময়েই তাহার মাতা দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাকে দেখাশুনা যাঁহারা করিতেছিলেন, তাঁহারা শেষ-রাত্রির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই ঘটনার বিষয় জানিতে পারেন নাই। স্যর গুরুদাস তখন তাঁহাদিগকে ইহা জানাইয়া দিলে তবে তাঁহারা ইহা জানিতে পারিয়াছিলেন। শিশুটীর নাম রাখা হয়, সতীজীবন।

যতীন্দ্রের জীবনে ইহা স্মরণীয় রাত্রি। রাত্রি ৩টা; চারিদিক নিস্তব্ধ। যতীন্দ্র মৃতা সহধর্ম্মিণীর কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। স্যর গুরুদাস জাগিয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন, সেই দারুণ শীতে যতীন্দ্র গরম জামা, আলোয়ান ইত্যাদি খুলিয়া রাখিয়া শ্মশান-যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। তিনি বলিলেন, যতীন্দ্র তুমি গরম কাপড়-চোপড় আবার পরিধান কর। তোমার ক্ষতি যত সাংঘাতিকই হউক না কেন, তুমি তোমার স্বাস্থ্যকে উপেক্ষা করিতে পার না। তোমার উপর তোমার মাতার এবং এই ক্ষুদ্র শিশু—যে এই মাত্র বাঁচিয়া উঠিয়াছে তাহার জীবন নির্ভর করিতেছে। যতীন্দ্রের স্ত্রীর মৃতদেহ তখন প্রাঙ্গণে রাখা হইয়াছে। উহারই সম্মুখে দাঁড়াইয়া স্যর গুরুদাস প্রায় এক ঘণ্টাকাল যতীন্দ্রকে নানাবিধ উপদেশ দিয়াছিলেন। এই আকস্মিক আঘাতে যতীন্দ্র একেবারে বাহ্য-জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি কোনও প্রকার ভাব-চাঞ্চল্য প্রদর্শন করেন নাই। স্যর গুরুদাসের ইহা সুলক্ষণ মনে হইতেছিল না। যতক্ষণ যতীন্দ্রমোহন অধীরতা প্রদর্শন না করিবেন, চোখের জল না ফেলিবেন, ততক্ষণ তিনি তাঁহাকে ছাড়িবেন না। যখন তিনি দেখিলেন, যতীন্দ্র শোকাবেগ কতকটা দমন করিতে পারিয়াছে, কথা কহিয়াছে, কাঁদিয়া কতকটা শান্তি পাইয়াছে, ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে সমর্থ হইয়াছে, তখন তাঁহার বিশ্বাস হইল—অতঃপর যতীন্দ্রকে শ্মশান-যাত্রা করিতে দেওয়া যাইতে পারে। তিনি তথাপি সন্তুষ্ট না হইয়া যতীন্দ্রকে উপদেশ দিতে লাগিলেন; বলিলেন, ইহাই

সংসারের গতি। স্বামী স্ত্রী পার্থিব জীবন একত্র শেষ করিতে পারে, ইহা ক্বচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। ভাল কোন্‌টা বল দেখি? স্বামীর মৃত্যু হইল পূর্ব্বে, স্ত্রী রহিল সংসারে পড়িয়া; অসহায়া, অবলম্বনশূন্যা; স্বামীর শক্তি ও সাহায্য লইয়া সে জীবন যুদ্ধ পরিচালনে অসমর্থা। অপর দিকে পত্নীর মৃত্যু হইল পূর্ব্বে, স্বামী রহিল বাঁচিয়া। সংসারে ঝড়-ঝাপ্টা সে সবই সহ্য করিতে পারে; জীবনের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারে। স্বামী যদি সত্য সত্যই স্ত্রীর মঙ্গলেচ্ছু হয়, তাহা হইলে স্ত্রীর মৃত্যু তাহার পূর্ব্বে হউক—ইহাই তাহার কামনা করা উচিত। তোমার পত্নী আজ বিজয়িনী হইয়া অনন্তের পথে যাত্রা করিয়াছে, তোমাদের উপর তাহার সদ্যোজাত শিশুপুত্রের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত মনে নিরুদ্বেগে জয়-যাত্রা করিতেছে, এ সময়ে তুমি যদি তোমার স্ত্রীর অনন্ত সুখে কাতর হও, ধৈর্য্যের সহিত তাহার যাত্রাপথ সুখকর করিবার চেষ্টা না কর, তাহা হইলে তাহার পরলোকগামী আত্মা ক্ষুণ্ণ ও ক্লিষ্ট হইবে না কি? বিবেচনা করিয়া দেখ। যতীন্দ্র কাঁদিয়া ফেলিল; অশ্রুর বন্যা নামিল; হৃদয়ের সমস্ত সঞ্চিত শোক বাহির হইয়া পড়িল। তখন বৃদ্ধ স্যর গুরুদাস নিশ্চিন্ত হইয়া যতীন্দ্রকে তাঁহার স্ত্রীর মৃতদেহের সহিত শ্মশানে যাইবার অনুমতি দিলেন।

পরদিন যখন শ্মশানযাত্রীরা মৃতদেহের সৎকার করিয়া ফিরিয়া আসিল, তখন তাহারা দেখিল—প্রতিদিন যেমন সাধারণভাবে কাজকর্ম্ম করিয়া থাকেন, স্যর গুরুদাস তাহাই করিতেছেন; কোনও বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই। বেলা প্রায় ২টার সময়ে রায় বাহাদুর ডাক্তার চুণীলাল বসু ও রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। প্রায় এক ঘণ্টা ধরিয়া তাঁহাদের সহিত নানা বিষয়ে স্যর গুরুদাসের কথোপকথন হইল। যখন তাঁহারা বিদায় লইয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন, তখন তাঁহারা বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, বাড়ীর খবর ভাল? সকলে ভাল আছেন ত? তখনই তাঁহারা জানিতে পারিলেন যে, বাড়ীতে

এই শোকাবহ ঘটনা ঘটিয়াছে। দীর্ঘকাল কথোপকথনের মধ্যে তাঁহারা ইহা বুঝিতেও পারেন নাই যে, গত কল্য রাত্রিতে এই বাড়ীতে এক শোকাবহ ঘটনা ঘটিয়াছে। যুবক যতীন্দ্রমোহন ভাবিতেছিলেন, জীবনের আর কোনও আকর্ষণ নাই। দুই দিন পরে যতীন্দ্রমোহন তাঁহার নবজাত সন্তানকে দেখিলেন। স্যর গুরুদাস তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কর্ম্মস্থলে যাইলে না কেন? তোমার ত মাত্র দুই দিনের ছুটী ছিল। তুমি যদি আরও ছুটী লইয়া থাক, তাহা বাতিল করিয়া কাজে যোগ দাও। তুমি পীড়িতা পত্নীকে দেখিবার জন্য ছুটী লইয়া আসিয়াছিলে, ইহা তোমার কর্ত্তব্য ছিল, সে কর্ত্তব্য পালিত হইয়াছে। এখন যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, তোমার আর কিছু করিবার নাই। এখন তোমার কর্ত্তব্য ছিল-- কাজে যোগ দেওয়া; কারণ, তোমার অনুপস্থিতির জন্য অন্যান্য লোকের অসুবিধা ঘটিতেছে। তোমার ব্যক্তিগত দুঃখ-ক্লেশ বা শোকের জন্য অপর দশজন ক্লেশ ভোগ করিবে কেন? তাঁহার এই মন্তব্য সেই সময়ে অত্যন্ত রূঢ় মনে হইয়াছিল, কিন্তু পরে যখনই এই উপদেশ-বাণী যতীন্দ্র-মোহনের স্মৃতি-পথে আসিয়াছে, তখনই তিনি সেই ঋষিকল্প মহামানবের সেবা-নিরত মহৎ চরিত্রের প্রভাব অনুভব করিয়াছেন। তাঁহার আদর্শ ও নীতি-অনুসারে চলিলে সাধারণ মানুষ চরম মহত্ত্বে উন্নীত হইতে পারে। আরও অনেকবার যতীন্দ্র দেখিয়াছিলেন যে, স্যর গুরুদাসের জীবন-বীণা অত্যন্ত উচ্চ সুরেই বাঁধা ছিল। কর্ত্তব্যের উপরে তিনি আর কিছুরই ঠাঁই দিতেন না। জীবনের প্রত্যেক খুঁটিনাটিতে এবং দৈনন্দিন কার্য্যে দেশ-মাতৃকার এই সুসন্তানের কর্ত্তব্যবুদ্ধি যে কিরূপ পরিস্ফুট হইত, এবং তিনি কর্ত্তব্যের কোন্ উচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত থাকিয়া জীবনের কর্ম্মপদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত করিতেন, তাহার একটি বিরাট বিবরণ লিপিবদ্ধ করা যাইতে পারে।

চুঁচুড়ায় যতীন্দ্রমোহনের উপর যে কর্ত্তব্যভার ন্যস্ত হইয়াছিল, তাহাতে সফর বা পরিভ্রমণের অংশই ছিল অধিক এবং তাহাও ছিল অত্যন্ত ক্লেশ-

কর। এই সময়ে যতীন্দ্রের মাতা চুঁচুড়ায় থাকিতেন। যতীন্দ্রকে ঘন ঘন সফরে যাইতে হইত বলিয়া অধিকাংশ সময়ে তাঁহাকে একাকিনী থাকিতে হইত। যে সময় যতীন্দ্র অবসর পাইতেন, সে সময়টা তিনি মাতার নিকটেই থাকিতেন। ইহা পবিত্র ভাগীরথী-তীরে আশ্রম-বাসের মত হইয়াছিল। লোকের সংস্পর্শ হইতে দূরে তাঁহারা থাকিতেন। একদিন সন্ধ্যার সময়ে যতীন্দ্রমোহন দেখিলেন, সামান্য একটু উত্তেজনায় তাঁহার মাতা একবার হাসিতেছেন, আবার পরক্ষণেই কাঁদিতেছেন। এই ভাবের হাসি-কান্না, কান্না-হাসি দেখিয়া যতীন্দ্রের অত্যন্ত শঙ্কা হইল। তিনি তখনই এই বিষয় স্যর গুরুদাসকে জানাইলেন। স্যর গুরুদাস তখনই স্থির করিলেন যে, নবজাত পৌত্রকে যতীন্দ্রের মাতার নিকটে অবিলম্বে পাঠাইয়া দেওয়া হউক। কারণ তাঁহার ধারণা হইল, ইহাকে পাইলে তিনি একটি কাজ পাইবেন, সময়ও কাটিবে, আকস্মিক কঠিন শোকাঘাত-জনিত মনের এই শোচনীয় অবস্থা হইতে তিনি পরিত্রাণ পাইবেন। এই শোচনীয় ঘটনার কথা শুনিয়া অধ্যাপক সেন বলিয়াছিলেন, ইহাকে তোমার মাতার দ্বিতীয় বৈধব্য বলিয়া আমি মনে করি। তখন হইতে যতীন্দ্রের শিশুপুত্র চুঁচুড়ায় তাহার পিতামহীর নিকটই রহিল। প্রায় ৮ মাস পরে যতীন্দ্রের মাতা আমাশয়-রোগে আক্রান্ত হইলেন। প্রত্যহ ভোর রাত্রি ৪টার সময়ে শিশুটী জাগিয়া উঠিত; সেই সময়ে তাহার সেবা-শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইতে হইত। যতীন্দ্রের মাতা এই কার্য্য করিতেন। কিন্তু তিনি অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়ায় এই কার্য্য করা তাঁহার পক্ষে দুষ্কর হইয়া পড়িল। একদিন রাত্রিতে মাতা-পুত্রে স্থির হইল, এই অবস্থায় শিশুকে উহার মাতামহ ও মাতামহীর নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হউক। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পরদিন হইতে রাত্রি ৩টার সময় শিশু আর জাগিয়া উঠিত না। প্রভাতে তাহার ভৃত্যেরা উঠিবার পর সে জাগিত ও তাহাদের সেবা-শুশ্রূষাই সে গ্রহণ করিত। তাহাকে আর

তাহার মাতামহের বাড়ীতে পাঠাইয়া দেওয়া হইল না এবং এদিকে সৌভাগ্যক্রমে যতীন্দ্রমোহনের মাতাও সুস্থ হইয়া উঠিলেন। এই সময়ে যতীন্দ্রের মনের অবস্থা এইরূপ হইয়াছিল যে, তিনি চাকুরীঘটিত এরূপ নির্ব্বাসনের জীবন আর যাপন করিবেন না, বাড়ীতে ফিরিয়া যাইয়া আর কোনও বৃত্তি অবলম্বন করিবেন, এইরূপ সঙ্কল্প করিতেন। কিন্তু স্তর গুরুদাস তাঁহাকে উপদেশ দিলেন, তুমি তোমার বর্ত্তমান কর্ম্মেই লাগিয়া থাক। তাঁহার এই উপদেশই তাঁহাকে আজ পর্য্যন্ত এই কর্ম্মে প্রবৃত্ত রাখিয়াছে।

চুঁচুড়া হইতে বদলি হইবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে যতীন্দ্রের এক বন্ধুবিয়োগ হইল; তাঁহার নাম ৺গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি হুগলীর ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন এবং থাকিতেন চুঁচুড়ায়। ওলাউঠা-রোগে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার জীবন ছিল অদ্ভুত রকমের। বিবাহের পর হইতে তিনি পত্নী হইতে স্বতন্ত্র থাকিতেন। তাঁহার মৃত্যু-শয্যায়—বিবাহের প্রায় ৪০ বৎসর পরে তাঁহার পত্নী স্বামীর সেবা করিতে আসিয়াছিলেন। এই বন্ধুর মৃত্যুতে শোকাচ্ছন্ন অবস্থায় যতীন্দ্রের চুঁচুড়া হইতে বদলি হইল। তিনি আরামবাগ মহকুমার ভার লইয়া তথাকার মহকুমা-হাকিম (Sub-divisional Officer) হইয়া চলিয়া যাইলেন। আরামবাগে থাকিবার অধিকাংশ সময় তাঁহার শিশু-পুত্রের স্বাস্থ্য ভাল ছিল না, সেইজন্য তাহাকে তাহার পিতামহীর সহিত কলিকাতায় পাঠাইয়া দেওয়া হয়। আরামবাগেও তাঁহাকে একাকীই থাকিতে হইয়াছিল; তবে এখানে কাজ করিতে হইত অনেক, অবসর ছিল না বলিলেই হয়। দামোদরের ভীষণ বন্যায় ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে এই মহকুমার অধিকাংশ স্থান জলপ্লাবিত হইয়াছিল। ইহার ফলে আরামবাগের সহিত হুগলীর জেলা-সদরের সংযোগ পর্য্যন্ত ছিন্ন হইয়াছিল। স্থানীয় অধিবাসীদের নিকট হইতে চাঁদা তুলিয়া বন্যা-বিপন্ন নরনারীকে সাহায্য-দানের চেষ্টা করিতে

হইয়াছিল। এই মহকুমার অধিবাসীদের পক্ষে অত্যন্ত প্রশংসার বিষয় এই যে, মহকুমা-হাকিম যতীন্দ্রমোহনের আহ্বানে তাঁহারা তৎক্ষণাৎ সাড়া দিয়াছিলেন। পরে কলেক্টর মহাশয় ইহা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন যে, এই মহকুমায় যে পরিমাণ সাহায্যদান আবশ্যক ছিল, তাহা এইখানকার অধিবাসীদের প্রদত্ত চাঁদা হইতেই দেওয়া হইয়াছে। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই আগষ্ট হইতে ২১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত যতীন্দ্রমোহনকে সাহায্য-দান-ব্যবস্থা পরিদর্শন করিবার জন্য মহকুমার প্রায় সর্ব্বত্র সফর করিতে হইয়াছিল। এইজন্য তাঁহার যথেষ্ট পরিশ্রম হইয়াছিল। তিনি ভাবিতেছিলেন, এমন কোনও কাজ এখন পাই, যাহাতে কিছুদিন সফর করিতে না হয়। ভগবান তাঁহার এই নীরব প্রার্থনা স্বর্গ হইতে শুনিয়াছিলেন। নভেম্বর মাসে তাঁহার উপর আদেশ হইল যে, তাঁহাকে বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনারের পার্শন্যাল এসিষ্ট্যাণ্ট করা হইয়াছে। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি চুঁচুড়ায় ছিলেন। এই সময়ে তিনি ডিউক ক্লাবকে পুনরুজ্জীবিত করেন ও উহাকে স্থায়ী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিয়া দেন। সরকারী ও সামাজিক কর্ত্তব্য পালন ব্যতীত তাঁহাকে আর বিশেষ কিছুই করিতে হইত না। মোটের উপর এই সময়টাতে তেমন কোনও উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই। আরামবাগে অবস্থান করিবার সময়ে তাঁহার সৌভাগ্যক্রমে তিনি মিঃ প্রেণ্টিসকে (পরে স্যার উইলিয়ম প্রেণ্টিস্) কলেক্টররূপে পাইয়াছিলেন। ইনি একজন কর্ম্মপটু রাজকর্ম্মচারী ছিলেন এবং ইঁহার অধীন কর্ম্মচারিবৃন্দের কর্ম্মপদ্ধতি ও চরিত্র-গঠনে বিপুল প্রভাব বিস্তার করিতে ইঁহার ন্যায় আর কোনও উর্দ্ধতন অফিসার ছিলেন কি না সন্দেহ। বহুকাল পরে বাঙ্গালা সরকারের শাসন-পরিষদের সদস্য-পদে অধিষ্ঠিত থাকিবার সময়ে ইনি অন্ত্রপ্রদাহরোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। বাঙ্গালায় তদপেক্ষা কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ও পূর্ণ কর্ম্মদক্ষ রাজপুরুষ আর আশা করা যায় না। কর্ম্মজীবনে স্যার উইলিয়ম

প্রেন্টিস ছিলেন যতীন্দ্রের আদর্শ। চুঁচুড়ায় প্রথমে তিনি যে কমিশনারের নিকটে কর্ম্ম করেন তাঁহার নাম হ্যালিফাক্স; ইঁহার মৃত্যু শোচনীয়। পরে তিনি মিঃ ডি-এইচ লীজ, সি আই-ই মহাশয়ের অধীনে কার্য্য করেন; সিভিলিয়ান-সম্প্রদায়ে ইঁহার ন্যায় সহানুভূতি-সম্পন্ন ব্যক্তি অত্যন্ত বিরল। কর্ম্ম হইতে অবসর-গ্রহণের পর বহু বর্ষ ধরিয়া তিনি যতীন্দ্রমোহনের সহিত পত্রালাপ করিতেন। অবসর গ্রহণের প্রায় ৬ বৎসর পরে তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়াছিলেন। তিনি বিলাতে ইন্‌ভার্ণিশায়ার, বিউলি টমিক হাউসে তাঁহার সুন্দর বাটীতে স্ব-পরিবারে বাস করিতেন। এখানে অবসরকাল কি ভাবে কাটাইতেছেন, তাহার বিষয় পত্রে উৎসাহপূর্ণ ভাষায় লিখিতেন।

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের শেষাশেষি মিঃ লীজ যতীন্দ্রকে রাম-পুরহাটে বদলি করিবার বন্দোবস্ত করেন। কিন্তু ডিসেম্বর মাস শেষ না হইলে তিনি তাঁহাকে যাইতে দিবেন না। কারণ, ইতিপূর্ব্বে ডিউক ক্লাব ষ্টেশন ক্লাবকে খেলিবার জন্য আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, ষ্টেশন ক্লাব এখন তাহার প্রতিদান করিতে চান। যতীন্দ্র ডিউক ক্লাবের সেক্রেটারী ছিলেন। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষে যতীন্দ্রমোহন যখন চুঁচুড়া ছাড়িয়া রামপুরহাটে যাত্রা করেন, সেই সময়ে ভারতীয় ও ইউরোপীয়, সরকারী ও বেসরকারী ভদ্রলোকগণের মধ্যে সম্প্রীতির ভাব যতদূর সম্ভব বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

রামপুরহাটে তাঁহার কর্ত্তব্য ছিল গুরু, নানাবিধ এবং অনুরাগজনক। অধিবাসীগণ সংগঠন-কার্য্যে উৎসাহশীল। অন্যান্য পরিকল্পনার মধ্যে যতীন্দ্রমোহন এইগুলির সূচনা করেন। টাউন হল নির্ম্মাণ, পার্ক বা অধিবাসীদের বিশ্রাম ও বায়ু-সেবনের জন্য পুরোদ্যান, খেলিবার স্থান এবং অনাথ আশ্রম। দুঃখের বিষয়, ভুল বুঝিবার ফলে তিনি রামপুরহাট ত্যাগ করিবার বহুকাল পরে এইগুলি কার্য্যে পরিণত হয়। ১৯২৮

খ্রীষ্টাব্দে টাউন হল নির্ম্মিত হয়। ইহার উদ্বোধনকালে তদানীন্তন মহকুমা-হাকিম মিঃ এস ব্যানার্জ্জি আই-সি-এস বিশেষভাবে যতীন্দ্রমোহনকে নিমন্ত্রণ করেন বলিয়া তিনি উদ্বোধন-উৎসবে উপস্থিত হইয়াছিলেন। পরবর্ত্তী মহকুমা-হাকিম মিঃ বি-আর-সেন টাউন হলটীর নির্ম্মাণকার্য্য সম্পূর্ণ করিবার জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করেন। কৃতজ্ঞতা ও সম্মানের চিহ্ন-স্বরূপ এই দুইজন অফিসারের প্রতিকৃতি টাউন হলে রক্ষিত হইয়াছে।

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে যতীন্দ্র রামপুরহাট হইতে ডায়মণ্ডহারবারে বদলি হন। বদলি হইবার সময়ে রামপুরহাটের অধিবাসীবৃন্দ তাঁহাকে যে বিদায়-সম্বর্দ্ধনা করেন তাহা অত্যন্ত মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল। যেদিন তিনি রামপুরহাট হইতে চলিয়া যাইবেন, সেইদিন সমস্ত মহকুমা-সদরটি মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিল। সত্য সত্যই এই মহকুমা হইতে তাঁহাকে বিদায় লইতে হইতেছিল বলিয়া তাঁহারও আন্তরিক দুঃখ হইয়াছিল। একটি বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ এতদুপলক্ষে দুইটী গীত রচনা করিয়াছিল ও সুর-তান-লয়ে গান করিয়াছিল। এই দুইটী গীত নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

সবডিভিসনাল অফিসার শ্রীযুক্ত বাবু যতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের

বিদায়-উপলক্ষে

হে অতিথি চির-বন্দ্য !
বংশীর সুরে বেজে উঠে এ কি
ব্যথিত করুণ ছন্দ !
বক্ষের সীমা ছাপি
তন্ত্রী উঠেছে কাঁপি,

গুঞ্জরি ওঠে মর্ম্মের ব্যথা
অশ্রুতে আঁখি অন্ধ।
বিদায়ের ম্লান সন্ধ্যার হাওয়া
মন্থর মৃদু মন্দ।
হে পূজ রি, পূজা শেষ ?
আরতির দীপ নিবায়ে চলেছ
কোন দূর পরদেশ ?
হেথা পিঙ্গল হোমানলে
এখনো যে হবি জ্বলে,
এখনো যে উড়ে মঙ্গল-পূত
ধূপের গন্ধ লেশ।
প্রসাদের তরে ভক্তের দল
চেয়ে আছে অনিমেষ।
আন পুণ্য-প্রদীপ-শিখা
ভালে আঁকি দাও আশীর্ব্বাদের
উজ্জল ললাটিকা।
নাও অশ্রুর গাঁথা মালা
দুঃখের ফুল-ডালা,
চরণ-চিহ্ন রেখে দাও দেব
অন্তরে চির-লেখা
চিত্তের পরে আঁকা রবে তব
সুন্দর স্মৃতি-রেখা

রামপুরহাট এইচ-ই স্কুল

সবডিভিসনাল অফিসার শ্রীযুক্ত বাবু যতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের

বিদায়-উপলক্ষে

পূরবীর গীতি বেজে ওঠে ওগো,
বেলা পড়ে এল ধীরে
আরতির দীপ নিবে এল প্রায়,
পূজা কলরব থেমে গেল হায়,
ওগো পুরোহিত ! সন্ধ্যা বেলায়,
তুমি চলে যাবে ফিরে !
কি দিয়ে তোমায় দিব দক্ষিণা ?
শুধু বিদায়ের ব্যাকুলতা বিনা ?
পাদ্য সলিল করিব রচনা
আকুল অশ্রুনীরে ।
দাও অঞ্জন আঁকিয়া চক্ষে;
যাও পদাঙ্ক রাখিয়া বক্ষে
ওগো বরণীয় ! আশিষের ধারা
দাও গো ঢালিয়া শিরে ।
যশঃ-সৌরভ-নন্দিত পথে
যাও গৌরব-মণ্ডিত রথে
পুষ্প বৃষ্টি হউক তোমার
যাত্রার পথ ঘিরে ।

রামপুরহাট ইউনিয়ন এইচ-ই স্কুল ।

এই দুইটী গান গীত হইবার পর বিদায়-সভায় সমবেত ব্যক্তিগণ নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিয়াছিলেন। এই সভার সভাপতি ছিলেন শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ; ইনি পরে জেলা-জজ হইয়াছিলেন এবং সেই পদে থাকিবার সময়ে অবসর গ্রহণ করেন।

ডায়মণ্ডহারবার রামপুরহাটের বিপরীত ছিল। অধিবাসীদের মনে বন্ধুভাব ছিল না। ভ্রান্ত ধারণার জন্য যতীন্দ্রমোহনের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী মহকুমা-হাকিমের সহিত লোকের মতানৈক্য ঘটিয়াছিল এবং সেইজন্য বনিবনাও হইতেছিল না, ইহার ফলে একটি দেওয়ানী মামলাও আদালতে রুজু হইযাছিল। কার্য্য যেমন কঠিন, তেমনই শ্রমজনক। সফর উপলক্ষে ভাগীরথীর মোহনায় ঘন ঘন যাতায়াত করা অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল ছিল। ২৪ পরগণার তদানীন্তন কলেক্টর মিঃ প্রেণ্টিস খুব কাজ আদায় করিযা লইতেন। কাজের জন্য যতীন্দ্র মোটেই ভাবিতেন না; কারণ, তিনি সারাদিন কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকাই ভাল মনে করিতেন। যে সময়টা তাঁহার মাতার নিকট তাঁহার কাটিত, সেই সময়টা ব্যতীত আর যত সময় অবশিষ্ট থাকিত, তাহাব সবটাই তিনি কর্ম্ম দ্বারা অতিবাহিত করিতে চাহিতেন। পুত্রটীকে সবেমাত্র স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। তিনি কেবল ভাবিতেন, যখন তিনি সফর-উপলক্ষে সুন্দরবনে ঘুরিবেন এবং তাঁহার পুত্রও স্কুলে চলিয়া যাইবে, তখন তাঁহার মাতা কিরূপে একাকিনী অবস্থান করিবেন? এইজন্য তাঁহার মনে কষ্ট হইলেও ভবিষ্যৎ সমস্যার সমাধানের ভার তিনি ভগবানের হাতে অর্পণ করিয়াছিলেন। ভাগ্যের গতি কিন্তু অন্যরূপ।

সুন্দরবন হইতে দীর্ঘ এক সফরের পর ডায়মণ্ডহারবারে ফিরিয়া তিনি বাসায় আসিয়া দেখিলেন যে, হোঁচট খাইবার ফলে তাঁহার মাতার পায়ের বুড়ো আঙ্গুলে আঘাত লাগিয়াছে এবং তিনি নিজে উহাতে ঔষধ দিতেছেন। ইহাতে তিনি অত্যন্ত বেদনা বোধ করিলেন; কিন্তু উপায়

যে কি করিবেন, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। যতীন্দ্রের কয়জন আত্মীয় গঙ্গাসাগরে তীর্থ করিতে গিয়াছিলেন, তাঁহারা ডায়মণ্ডহারবারে পৌছিলে তিনি তাঁহাদিগকে কলিকাতায় লইয়া যান। সেই সময়ে তাঁহার মাতাও দিনকতক কলিকাতায় থাকিয়া আসিবেন—বলিলেন। একদিন শনিবার অপরাহ্নে যতীন্দ্র তাঁহাদিগকে কলিকাতায় দিয়া ;আসি-লেন। সেইদিনই রাত্রিতে তাঁহার মাতা বলিলেন, যতীন ডায়মণ্ড-হারবারে ফিরিবার আগেই তোমাকে বিবাহ করিতে হইবে। মাতার এই প্রস্তাবে যতীন্দ্রমোহন বিচলিত হইলেন এবং তাঁহার সহিত ইহা লইয়া আলোচনা হইতে লাগিল। গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত এই আলোচনা চলিয়াছিল। ৯ বৎসর কঠোর বিপত্নীক জীবন যাপন করিবার পর আবার নূতন করিয়া বিবাহিত জীবনের পত্তন করা তাঁহার নিকট অসম্ভব মনে হইল। যখন তিনি শুনিলেন যে, ইহা তাঁহার মাতার আকস্মিক প্রস্তাব নয়, সুচিন্তিত প্রস্তাব, তখন তিনি তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। গত ৯ বৎসরের ভিতরে স্যর গুরুদাস অনেকবার যতীন্দ্রের মাতাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন তাহার বিবাহ দিতে। কিন্তু তিনি তাহাতে সম্মত হন নাই। এক্ষণে ৯ বৎসর পরে যতীন্দ্রের মাতাই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পুত্রকে পুনরায় বিবাহ করিতে আদেশ করিলেন। পুত্রের পক্ষে সে আদেশ অলঙ্ঘনীয়। সেইদিন অধিক রাত্রিতে যতীন্দ্র শয়ন করিলেন। কিছুক্ষণ নিদ্রা যাইবার পর তিনি স্বপ্ন দেখিলেন, একজন সন্ন্যাসী তাঁহার নিকট আসিয়াছেন। ইঁহাকে তিনি ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে শিগৌলিতে দেখিয়াছিলেন। তিনি যতীন্দ্রকে খুব তিরস্কার করিলেন, এবং বলিলেন, "এত বেশীক্ষণ ধরিয়া তুমি মাতার সহিত তর্ক করিয়াছ কেন? তুমি না বল, তোমার মা একবার ইঙ্গিত করিলে তাহা তুমি পালন করিবে? আর তুমি কি না তোমার মাতার প্রস্তাব শুনিয়াও তাঁহার সহিত তর্কবিতর্ক করিলে! যাহা হউক, তোমার মাতা যাহা বলিয়াছেন, তাহাই কর; তাহাই

তোমার পক্ষে ঠিক পথ।" এই বলিয়া স্বপ্নদৃষ্ট সাধু অন্তর্হিত হইলেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে যতীন্দ্রের সহিত যেরূপে এই সাধুর পরিচয় হয়, তাহা অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। ফার্ষ্ট আর্টস পরীক্ষা দিয়া যতীন্দ্র বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলেন এবং সেইবারে মজঃফরপুরে তাঁহার এক আত্মীয়ের বাড়ীতে অবস্থান করিতেছিলেন। ইঁহার পিতামহের মুখে এই সাধুর কথা যতীন্দ্র শুনিয়াছিলেন। একদিন বিকালবেলায় ফুটবল খেলিতে খেলিতে হঠাৎ এই সাধুর কথা যতীন্দ্রমোহনের মনে পড়িল। 'শিগোলী মজঃফরপুর হইতে বেশী দূরেও নহে; এইজন্য তিনি মনে করিলেন, সাধুকে দর্শন করিতে যাইবেন। গৃহকর্ত্রী ব্যতীত আর কাহাকেও কিছু না জানাইয়া রাত্রি ১২টার সময়ে যতীন্দ্রমোহন সাধুদর্শনে শিগোলী যাত্রা করিলেন। সকালে ভারী এক পশলা বৃষ্টি হইল। এইজন্য তাঁহাকে পথে প্রায় দুই ঘণ্টা আটক পড়িতে হইয়াছিল। কর্দ্দমাক্ত মাটী ভাঙ্গিয়া তাঁহাকে দুই ঘণ্টাকাল চলিতে হইয়াছিল। শেষে বেলা প্রায় ১২টার সময়ে তিনি সাধুর আশ্রমে পৌছিলেন। সাধুর আবাসস্থলের নিকট যখন তিনি যাইতেছিলেন, সেই সময়ে তিনি একটী কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলেন। তখনই তিনি সেইদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং করিবামাত্র শ্বেতশ্মশ্রুসমন্বিত এক সাধু তাঁহার নয়নগোচর হইলেন। সাধু শান্তদৃষ্টিতে যতীন্দ্রকে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। যতীন্দ্র তাঁহাকে প্রণাম করিলেন; সাধুও তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। সাধু যতীন্দ্রকে জানিতেন এবং তাঁহার আগমন-প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তিনি আতিথ্য-সৎকারের জন্য সমস্তই প্রস্তুত রাখিয়াছিলেন—স্নানের জল, আহার্য্য এবং বিশ্রামের ব্যবস্থা। যতীন্দ্র মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। তিনি যে সাধুদর্শনে আসিতেছেন, ইহা ২৪ ঘণ্টা পূর্ব্বে একজন ব্যতীত অপর কেহ জানিত না; সাধু কিরূপে ইহা জানিতে পারিলেন? ইহা কিছুতেই যতীন্দ্রের বোধগম্য হইতেছিল না। মধ্যাহ্নে বিশ্রামের পর সাধুর সহিত

যতীন্দ্রের বহুক্ষণ কথোপকথন হইয়াছিল। আশ্রম হইতে চলিয়া আসিবার সময়ে সাধু যতীন্দ্রকে আশীর্ব্বাদ করেন এবং আশ্বাস দেন যে, যখনই তুমি আমাকে স্মরণ করিবে, আমি তোমার সাহায্যার্থ তোমার নিকট উপস্থিত হইব। যেদিন রাত্রিতে যতীন্দ্র তাঁহার মাতার সহিত তর্কবিতর্ক করিয়াছিলেন, সেদিন তিনি এই সাধুকে স্মরণ করেন নাই। তবুও তিনি যে স্বপ্নে তাঁহাকে দেখা দিয়াছিলেন, তাহা কেবল তাঁহাকে কর্ত্তব্য-পথ দেখাইয়া দিবার জন্য। যতীন্দ্র কলেক্টর সাহেবের নিকটে দুই দিন ছুটী লইবার জন্য উপস্থিত হইলেন। কলেক্টর মিঃ প্রেন্টিস জানিতেন যে, যতীন্দ্র বহু দিন পূর্ব্বে বিপত্নীক হইয়াছেন এবং তাঁহার বয়সও হইয়াছে। ইহার উপর তিনি যখন শুনিলেন যে, তাঁহার মাতার আদেশে তিনি বিবাহ করিতেছেন, তখন তিনি বিস্মিত হইলেন এবং দুইদিনের ছুটী মঞ্জুর করিলেন। দুই দিন পরে তাঁহার বর্ত্তমান জীবন-ধারার পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইবে। বিবাহ করিয়া তিনি ডায়মণ্ডহারবারে তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্রে ফিরিয়া আসিবেন। পরে জানা গিয়াছিল যে, যতীন্দ্রের মাতা তাঁহার এক আত্মীয়া দ্বারা একটী পাত্রী মনোনীত করিয়া রাখিয়াছিলেন। পাত্রী অমর জাতীয় সঙ্গীত 'বন্দে মাতরম্'-রচয়িতা সাহিত্য-গুরু বঙ্কিমচন্দ্রের প্রদৌহিত্রী।

বিপদ-সঙ্কুল দেশী নৌকায় চড়িয়া সুন্দরবনে প্রায় অনবরত সফর করিতে হইত। লাঞ্চের ব্যবস্থা ছিল না। এই জন্য স্নায়বিক অবসাদ ঘটিল। কাজেই ১৯২১ খৃষ্টাব্দে যতীন্দ্রকে অল্প সময়ের জন্য ছুটী লইতে হইল। এই সময়ে তাঁহার পত্নী প্রথম সন্তান প্রসব করেন। কিন্তু ইহাতে উঁহার জীবন বিপন্ন হইয়াছিল। এই সঙ্কটকালে ডাক্তার অমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তার ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ডাক্তার বামনদাস মুখোপাধ্যায়ের সাহায্য যতীন্দ্রমোহনকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করে।

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বুঝিলেন যে, তাঁহার কিছু দীর্ঘ বিশ্রাম আবশ্যক। এই জন্য প্রায় ৬ মাসের ছুটী তিনি লইয়াছিলেন। এই ছুটী তিনি দার্জ্জিলিং ও পুরীতে অতিবাহিত করেন। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে যতীন্দ্রমোহনকে প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিশনারের পার্শন্যাল এসিষ্ট্যাণ্ট-পদে নিযুক্ত করা হয়। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি এই পদে কার্য্য করিয়াছিলেন। এই সময়ে তাঁহার কার্য্যকাল বেশ আনন্দে কাটিয়াছিল, কারণ তখন মিঃ কে-সি দে ও মিঃ জে-এন গুপ্তের মত যোগ্য, দয়ালু ও সহানুভূতিশীল রাজপুরুষের অধীনে তাঁহার কর্ম্ম করিবার সুযোগ হইয়াছিল।

১৯২৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯২৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাঁহার কর্ম্মজীবন কাটিয়াছিল ভাল। এই সময়ে তিনি তাঁহার বাড়ীতেই ছিলেন, আত্মীয়-স্বজনের সহিত দেখা-শুনা করিতে পারিতেন। এদিকে কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহার কর্ত্তাব তাঁহার যোগ্যতার উপর প্রভূত বিশ্বাস ছিল। যতীন্দ্রমোহন তাঁহাব কর্ত্তার পরিবারভুক্ত আত্মীয়ের মতই ছিলেন; কর্ত্তা ছিলেন তাঁহার বন্ধুব মত—শত বিপদেও তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যাইবেন না; সংসারে এইরূপ সম্পর্ক অত্যন্ত বিরল। কর্ম্ম-জীবনের এই স্মৃতি কিছুতেই যতীন্দ্রমোহনের চিত্তপট হইতে মুছিয়া যাইবে না। এই সময়কার জীবনের আনন্দ কল্পনাতীত।

১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে নিয়তি যেন জোর করিয়া তাঁহাকে কলিকাতা হইতে ছিনাইয়া লইয়া গেল। তিনি জলপাইগুড়িতে বদলি হইলেন। সেখানে যে সকল ঊর্দ্ধতন অফিসারের অধীনে তাঁহাকে কর্ম্ম করিতে হইয়াছিল, তাঁহারাও সহানুভূতিশীল ও দয়ালু ছিলেন। সে সময়ে জলপাইগুড়িতে ডেপুটি কমিশনার ছিলেন মিঃ এইচ-পি-ভি টাউনএণ্ড এবং কমিশনার ছিলেন মিঃ জে-এন রায়। তবে তিনি জলপাইগুড়িতে অল্পকালই ছিলেন। তিনি তথায় অজীর্ণরোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। সিভিল সার্জ্জন মেজর আলেকজাণ্ডার তাঁহাকে ছুটী লইতে বলেন, কিন্তু তিনি

ছুটী চাহেন নাই। ডিসেম্বর মাসে মিঃ রায় বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনার হইয়া চুঁচুড়ায় বদলি হইলেন। তিনি যতীন্দ্রকে ছুটী লওয়াইয়া তাঁহার সঙ্গেই জলপাইগুড়ি হইতে বাড়ী ফিরাইয়া আনিলেন। ৮ মাসের ছুটী শেষ হইবার পর তাঁহাকে মুর্শিদাবাদের জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর নিযুক্ত করা হয়।

১৯২৯ হইতে ১৯৩২ পর্য্যন্ত তাঁহার মুর্শিদাবাদের কর্ম্মজীবন অত্যন্ত উৎকণ্ঠার মধ্যেই কাটিয়াছে। এই সময়ে আইন-অমান্য ও অসহযোগ আন্দোলন চলিতেছিল। বহু স্পেশ্যাল জেল বা নূতন নূতন কারাগার এবং বন্দি-শিবির (detention camp) তাঁহাকে পরিদর্শন করিতে হইত ; উহাদের পরিচালন-ব্যবস্থার উপর লক্ষ্য তাঁহাকে রাখিতে হইত। এইগুলি অত্যন্ত বেগ দিত। কিন্তু অন্য সকল জেলা অপেক্ষা মুর্শিদাবাদে উত্তেজনা কম ছিল, অর্থাৎ ইহা ঠাণ্ডা ছিল। ইহার কারণ আর কিছুই নহে, সকল বিভাগের সরকারী কর্ম্মচারীগণ—বিশেষতঃ পুলিশের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টগণ পরস্পর সহযোগিতাবদ্ধ হইয়া কার্য্য করিতেন। ইহা অবশ্য যতীন্দ্রমোহনের সৌভাগ্য বলিতে হইবে। এই সময়কার দুইজন পুলিশ-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নাম উল্লেখযোগ্য.: ইঁহাদের একজনের নাম রায় সাহেব নৃপেন্দ্রকুমার ঘোষ চৌধুরী এবং অপরজনের নাম মিঃ এইচ-ই স্যাবাইন।

১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রাজসাহীতে বদলি হন। এই সময়ে এই জেলায় রাজনীতিক উত্তেজনা যথেষ্টই ছিল। এই অবস্থা প্রশমনের জন্য কঠোর পরিশ্রম ও চেষ্টা করিতে হইয়াছিল। ৩রা ডিসেম্বর হইতে যতীন্দ্রমোহন ছুটী লন। দুর্ভাগ্যবশতঃ বাড়ীতে আসিবার ৩ দিন পরে তিনি পীড়িত হন এবং প্রায় ৪ মাসকাল তাঁহাকে শয্যাশায়ী থাকিতে হয় ছুটী শেষ হইলে তাঁহাকে বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে তাঁহাদের প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া প্রেরণ করেন। যতীন্দ্রমোহন সিমলা-

শৈলে ব্যবস্থা-পরিষদের শরৎকালীন অধিবেশনে ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে উপস্থিত ছিলেন।

১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি ব্যবস্থা-পরিষদের অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন এবং যে সময়ে অধিবেশন থাকিত না, তখন তিনি ছুটীতে থাকিতেন। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের শীতকালে তিনি সমগ্র পঞ্জাব ও ক্যাংড়া উপত্যকা পরিদর্শন করেন এবং তাঁহার মাতৃদেবীকে সঙ্গে লইয়া নানা তীর্থ ভ্রমণ করেন। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দিনাজপুরে বদলি হন এবং এখানে দুই মাস থাকিবার পরে তাঁহার পরিবারের প্রায় সকলেই ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়াছিলেন। এই সময়ে তাঁহাকে ব্যবস্থা-পরিষদের ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের বজেট-অধিবেশনে উপস্থিত থাকিবার জন্য তথায় যাইতে হয়।

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে তাঁহাকে বাঁকুড়ার জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টরের পদে নিযুক্ত করিয়া তথায় বদলি করা হয়। এই সময়ে এই জেলার অধিবাসীরা অত্যন্ত বিপন্ন; জেলার একদিকে অনাবৃষ্টি, অপর দিকে বন্যা। এইজন্য অজন্মা ও শস্যনাশ হইয়াছে। লোকের দুর্দ্দশার সীমা নাই। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের দামোদরের বন্যায় এই দুরবস্থা ঘটিয়াছিল। বন্যা-ঘটিত দুরবস্থার কতকটা লাঘব হইলে তিনি ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ব্যবস্থা-পরিষদের সিমলা-অধিবেশনে যোগ দেন এবং তথাকার কার্য্য শেষ করিয়া বাঁকুড়ায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তখন সমগ্র জেলায় দুর্ভিক্ষ আসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। লোকের দারুণ অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত লোকের এই কষ্ট-নিবারণের জন্য সাহায্য-ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন জন্য কঠোর পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। বাঁকুড়ার কর্ম্মক্ষেত্র হইতে এই সময়ে অনুপস্থিত থাকিতে পারা যায় না; এইজন্য যতীন্দ্রমোহনকে ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য-পদ পরিত্যাগ করিতে হইল। যাহা হউক, সকল উচ্চপদস্থ সরকারী

কর্ম্মচারীগণের সহযোগিতায় এবং সাহায্য-ব্যবস্থার ভারপ্রাপ্ত অতিরিক্ত কমিশনার মিঃ ও-এম মার্টিনের সহানুভূতিপূর্ণ অধিনায়কতায় সাহায্য-দানের কার্য্য সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল এবং সৌভাগ্যবশতঃ ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের শেষে এই জেলায় শস্য উৎপন্ন হইয়াছিল; ইহার ফলে লোকের মুখে আবার হাসি ফুটিয়াছিল। এই জেলার আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত মন্দ হইলেও জনসাধারণের প্রতিনিধি, সরকারী কর্ম্মচারী এবং জেলা-বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটী, লোক্যাল বোর্ড ও ইউনিয়ন বোর্ডের সহায়তায় বহু গঠনমূলক কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছিল। আশা করা যায়, এই জেলার বেসরকারী ও সরকারী সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলে এমন কর্ম্মপদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইবে যে, ১৯৩৫-৩৬ খৃষ্টাব্দে এখানে যে দুরবস্থা ঘটিয়াছিল এবং অতীতে যে কয়েকটী দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল, সে রূপ আর ভবিষ্যতে ঘটিবে না। এই সময়ে যতীন্দ্রমোহন পল্লীর উন্নতিমূলক সংগঠন-কার্য্যের এক পরিকল্পনা করিয়াছিলেন; উহা তাঁহার বিপুল অভিজ্ঞতার পরিচায়ক।

যতীন্দ্রমোহন নাগরিক জীবনের চাকচিক্য ও প্রলোভন ত্যাগ করিয়া কলিকাতার পরপারে হাওড়ার উপকণ্ঠে—নগরের কোলাহল হইতে দূরে লিলুয়ায় বাটী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে এই বাটী নির্ম্মিত হয় এবং তাঁহার স্বর্গীয় পিতৃদেবের নাম-অনুসারে এই বাটীর নাম তিনি "হীরাকুঞ্জ" দিয়াছেন।

বাঁকুড়ার অন্নকষ্ট-প্রপীড়িত বন্যা-বিপন্ন নরনারীর দুর্দ্দশা মোচন ও তাহাদিগকে সাহায্য-দানকল্পে যতীন্দ্রমোহন যাহা করিয়াছিলেন সে কার্য্যের বিচারক বর্ত্তমান নহে—ভবিষ্যৎ। সাহায্যদান-কার্য্যের বিরুদ্ধে যে তীব্র সমালোচনা এবং স্বার্থ-বিজড়িত প্রচারকার্য্য চলিয়াছিল, তাহার ফলে সাহায্য-দানকার্য্য কেবল যে অত্যন্ত দুরূহ ও কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল তাহা নহে, কর্ম্মীদের মন পর্য্যন্ত ইহার ফলে তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। যাঁহারা সাহায্যদানকার্য্যের সহিত

সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাঁহাদের প্রশংসাস্বরূপ ইহা বলা যাইতে পারে যে, তাঁহারা সম্মিলিতভাবে ক্রীড়ক-দলের মত আন্তরিকতার সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন এবং প্রাণপণ চেষ্টার সহিত কর্ত্তব্য পালন করিতে বিরত হন নাই। এই দুষ্কর কার্য্য-সম্পাদনের সময়টা কতকটা অগ্নিপরীক্ষার মতই গিয়াছে। সুখের বিষয়, এই অগ্নিপরীক্ষার সময়ে কোনও অপ্রীতিকর বা প্রতিকূল ঘটনা ঘটে নাই। এই সাহায্য-দানকার্য্যের সময়ে সদর মহকুমা-হাকিম রায় সাহেব (এক্ষণে রায় বাহাদুর) ফণীভূষণ মিত্র এবং শ্রীযুত তারাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়—এই দুইজন যতীন্দ্রমোহনের দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন; ইহাদের জন্যই এই কার্য্য বহুল-পরিমাণে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল।

যতীন্দ্রমোহনের সরকারী কর্ম্ম-জীবনের বিবরণ প্রায় শেষ হইয়া আসিতেছে। বাঁকুড়ায় থাকিতে থাকিতেই তিনি ছুটী লইয়াছেন; তাঁহার ইচ্ছা এই ছুটীর শেষে তিনি অবসর গ্রহণ করিবেন।

যতীন্দ্রমোহনের ৪ পুত্র ও ৪ কন্যা। জ্যেষ্ঠ ডাক্তার সতীজীবন চট্টোপাধ্যায় এক্ষণে মেডিক্যাল কলেজের কর্ণ, নাসিকা ও কণ্ঠনালী বিভাগের সিনিয়ার হাউস সার্জ্জন। পিতার ন্যায় ইনিও নানাপ্রকার কর্ম্মের সহিত সংশ্লিষ্ট। কর্ম্মক্ষেত্রে তিনি সকলের প্রিয়; কলেজ হইতে বাহির হইবার অল্পদিন পরেই তাঁহাকে 'ডকটর্স ইউনিয়নে'র সেক্রেটারী নির্ব্বাচিত করা হইয়াছে। এই পদটি প্রায়ই ডাক্তারদের মধ্যে যিনি প্রবীণ হইয়া উঠিতেছেন, তাঁহাকেই দেওয়া হইত। জ্যেষ্ঠা কন্যার নাম পূর্ণিমা; ইহার পরই আর এক কন্যা—প্রতিমা। ইহার অনুজ ভ্রাতার নাম জ্যোৎস্না। ইহার পর দুইটী কন্যা—অনিমা ও অসীমা। এবং এক পুত্র জ্যোতির্ম্ময় তাহার পর একটি শিশু পুত্র—নাম হিরণ। ইহার বয়স মাত্র ২ বৎসর। যতীন্দ্রমোহনের মাতা পৌত্র-পৌত্রীগণকে লইয়া এক্ষণে সুখে দিন অতিবাহিত করিতেছেন। তাঁহার ইচ্ছা এখন তাঁহার জ্যেষ্ঠ পৌত্র ও

জ্যেষ্ঠা পৌত্রী সংসার জীবনে নিরাপদে প্রবেশ করুক এবং তাহাদের জীবন সুখময় হউক। তাঁহার আশীর্ব্বাদ সকল পৌত্র-পৌত্রীর শিরেই বর্ষিত হউক।

প্রতিকূল ঝঞ্ঝা-তরঙ্গের মধ্যে যে জীবনের আরম্ভ হইয়াছিল তাহার সংক্ষিপ্ত কাহিনী শেষ হইল। যদি এই জীবন কঠোর প্রতিকূলতার সহিত সংগ্রাম করিয়া কিয়ৎ পরিমাণ সাফল্যও অর্জ্জন করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা উহার মাতৃদেবীর কৃপাতেই হইয়াছে। বিধাতার অপার করুণায় মাতৃদেবীই যতীন্দ্রমোহনের ইহজীবনের একমাত্র সম্পদ। ইহলোক হইতে পরলোকের তীর্থপথে এই সম্পদ হইতেই তিনি পাথেয় সঞ্চয় করিয়াছেন।

পীতাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বংশলতা

ভট্টনারায়ণের পূর্ব্বপুরুষ

ভট্টনারায়ণ বাঙ্গালার তদানীন্তন নৃপতি আদিশূরের আহ্বানে কান্যকুব্জ হইতে বঙ্গদেশে আগমন করেন। ঐতিহাসিক মার্শম্যানের মতে ইহা অনুমান ১০৬৫ খৃষ্টাব্দের ঘটনা।

ভট্টনারায়ণ

(ইঁহার ১৬টি পুত্র)

হারাকুঞ্জ

RURAL UPLIFT.*

For some time past various questions intimately connected with life in villages have been discussed by representatives of the people with local officers of Government and local bodies at Thana Co-operation meetings. Re-orientation of agricultural methods in the district, establishment of seed stores and non-official demonstration farms, improvement of agriculture by substituting suitable crops for high lands, facilities for irrigation and improvement of drinking water supply, improvement of cattle, better co-ordination between officers and people for improvement of sanitation, health and hygiene, measures for preservation of forests as an important factor in the economic resources of the people, more extensive cultivation of 'Rabi' and subsidiary crops, growth of orchards, closer co-operation among villagers for preservation of law and order and prevention of crime and measures for substituting harmonious co-operation based on sympathy, love and fellow feeling in place of petty jealousies and village cliques, have been among the subjects discussed at such meetings. The result has been a keener interest among the people in problems affecting their daily life

* ইহা রায় বাহাদুর যতীন্দ্রনাথ পল্লী-উন্নয়নের কৃত পরিকল্পনা।

and readier response to calls for active solid work for improvement of the countryside.

2. Two public spirited gentlemen of the district have come forward to assist in the efforts of the people for improvement of the villages. Dr. S. M. Siddique of Role has contributed Rs. 100/- towards a fund opened in furtherance of rural uplift activites. Babu Dhirendra Kumar Mukherjee of Sonamukhi has offered a silver challenge shield for competition among the Union Boards in the district.

3. On the suggesion of the District Magistrate, the District Board has consented to administer through a Rural Uplift Committee, the fund started for the purpose and to run the Challenge Shield on the terms and conditions suggested by the District Magistrate. The Rural Uplift Committee will in due course announce the terms and conditions for the competition for a prize to be awarded for the best constructive scheme of rural uplift which can be carried out without a large expenditure mainly by the voluntary efforts and co-operation of the people. The Committee will also announce the conditions under which the Rural Uplift Challenge Shield will be run.

4. The Rural Uplift Committee of the Bankura District will consist of,

(1) The Subdivisonal Officer, Sadar (Ex-Officio)

(2) The Subdivisional Officer, Vishnupur (Ex-Officio)

(3) 5 members elected by the District Board at a meeting

(4) 2 originai donors or their representatives or 2 gentlemen unconnected with the Board elected by the District Board at the meeting.

(5) 2 gentlemen nominated by the District Magistrate.

5. The thesis on the rural uplift scheme will be judged by the possibility of immediate and easy execution of constructive work 'inter alia' in respect of the following matters affecting normal life in the villages.

(i) Communication & lighting.

(ii) Water supply

(a) for drinking and household purposes.

(b) for agricultural purposes by aforestation, excavation and re-excavation of bundhs and tanks and harnessing local streams and rivulets.

(iii) Economic farming, including

(a) provisions for village seed stores,

(b) consolidation of holdings,

(c) establishment of demonstration farms

(d) utilization of waste land by growing suitable crops on them,

(e) production of vegetables, fruits, and flowers,

(f) proper storage of manure and of farm produce and seeds,

(g) cultivatiou of drought resisting varieties of crops,

(h) cultivation of subsidiary crops,

(i) promotion of marketing facilities for agricultural and for industrial products.

(iv) Improvement of cattle by

(a) better breeding,

(b) weeding out of useless bulls,

(c) provision of good pasturage,

(d) cultivation of fodder crops,

(e) provision of sources of supply of water for cattle,

(f) good stabling,

(g) measures for prevention of cattle epidemics.

(v) Improvement of poultry and culture of fish.

(vi) Development of home industries to provide subsidiary occupation and add to normal resources.

(vii) Methods for devising employment of surplus or idle labour in all occupations and for putting employees in touch with possible employers.

(viii) Sanitation, including better housings, child welfare and maternity work, women's welfare work, provision of nutritous food for children, first aid and prevention and cure of diseases.

(ix) Education with special reference to vocational training and establishment of night schools for spread of knowledge among backward communites.

(x) Provision of facilities for physical culture, recreation and relaxation of the young and the old by organised games and community dances and entertainments and provision for dissemination of interesting and useful konwledge by means of libraries or radio sets.

(xi) Measures for creating a healthy public opinion specially in regard to social functions and curtailment of expenditure on social and quasi religious ceremonies.

(xii) Measures for settlement of petty disputes and differences, for promotion of mutual good will and co-operative effort in all spheres of village life.

(xiii) Organisation of watch and ward for prevention of crime.

(xiv) Organisation of social services and for rendering help on the occasion of natural calamities.

(xv) Establishment of a general system of intelligence so as to present authenticated needs of villages before authorities competent to provide for them with constructive suggestions for stimulating local support in supplying local wants.

(xvi) Creation of a machinery to bring officers of Government and local authorities in closer touch with the representatives of the people.

The above list is merely indicative but not exhaustive of the many points that should be covered by the thesis which must present in concrete details—

(a) what should be done for each village in all spheres of activity mentioned above, to make it a model one, and,

(b) how such work of uplift can be done at a minimum of expense with mutual good

will and co-operative effort of the villagers and with any help that may be available from outside.

6. It is hoped that residents of the district will extend their sympathy and co-operation to the Committee in making the competitions the success they deserve to be.

J. M. Chatterjee,

Collector, Bankura.

২। বরাহ
৩। বৈনতেয়
৪। বিবুধায়
৫। সুবুধি
৬। সুভক্ষ্য
৭। ভয়পহ
৮। ধবল
৯। মহাদেব
১০। চক্রপাণি
মকরন্দ
১১। দাশো
বিনায়ক
১২। আপি
বাপি
বা
১৩। ঈশান
অর্কো
টিকো
তিলো
নীলো
বিকো
পীতাম্বরের বংশলতা
১৩। ঈশান
রাম
লক্ষ্মণ
১৫। হরি
১৬। ব্যাস
বশিষ্ঠ

১৭। পরমেশ্বর
সর্ব্বানন্দ
[ইনি মহাপণ্ডিত ও ভবিষ্যদ্বক্তা ছিলেন এবং
প্রসিদ্ধ সর্ব্বানন্দী মেলের প্রতিষ্ঠাতা]
১৮। ভুবন
বলভদ্র
১৯। সুধাকর
অনন্ত
গোপীনাথ
কাশীনাথ
নিবাশ
জানকীনাথ
কমলাকান্ত
গুণানন্দ
ওরফে ছোট ঠাকুর
[ইনি হুগলী জেলার বাগণ্ডায়
বসবাস স্থাপন করেন]
২০। রামানন্দ
রতিনাথ
দুর্গাদাস
নারায়ণ
২১। রাম
রাজেন্দ্র
মথুর
মথুরেশ
২২। রঘুনাথ
রামজীবন
কৃষ্ণদেব
প্রাণবল্লভ
অনিরুদ্ধ
ঘনশ্যাম
২৩। সদাশিব
নিমাই
গণেশ
দুকড়ি
২৪। দুলাল
রামলোচন
রামনিধি
ওরফে
নিধিরাম
রামশঙ্কর
গোবর্দ্ধন
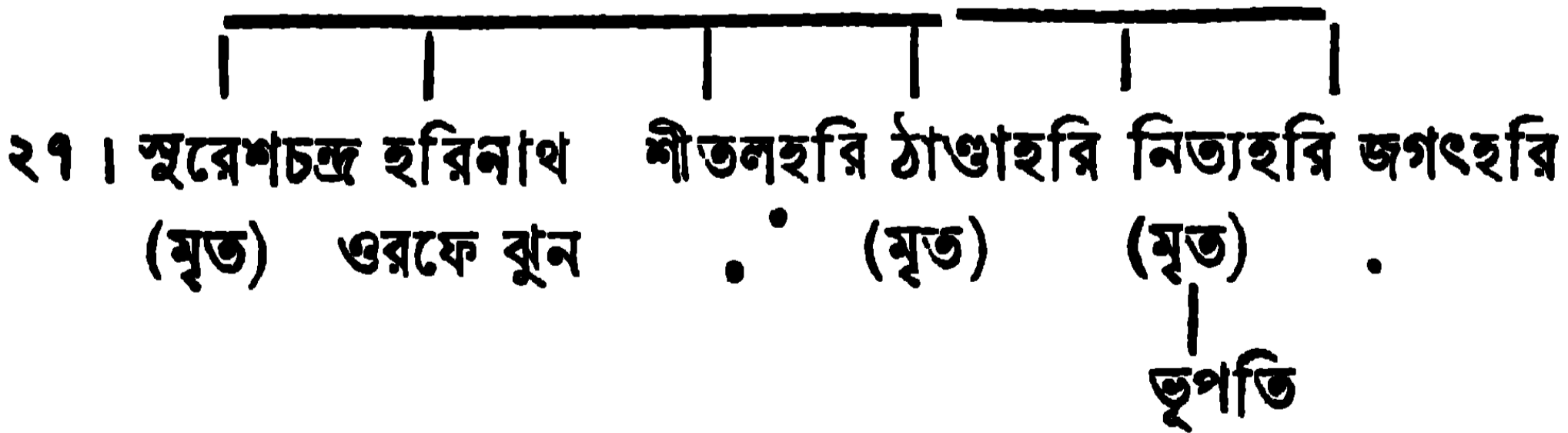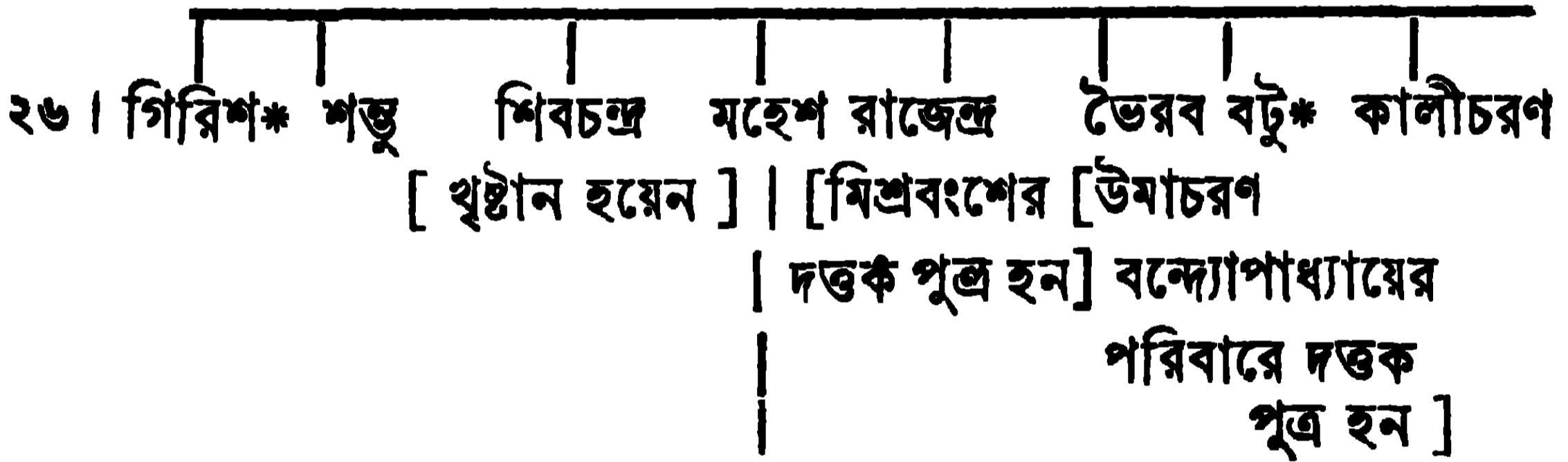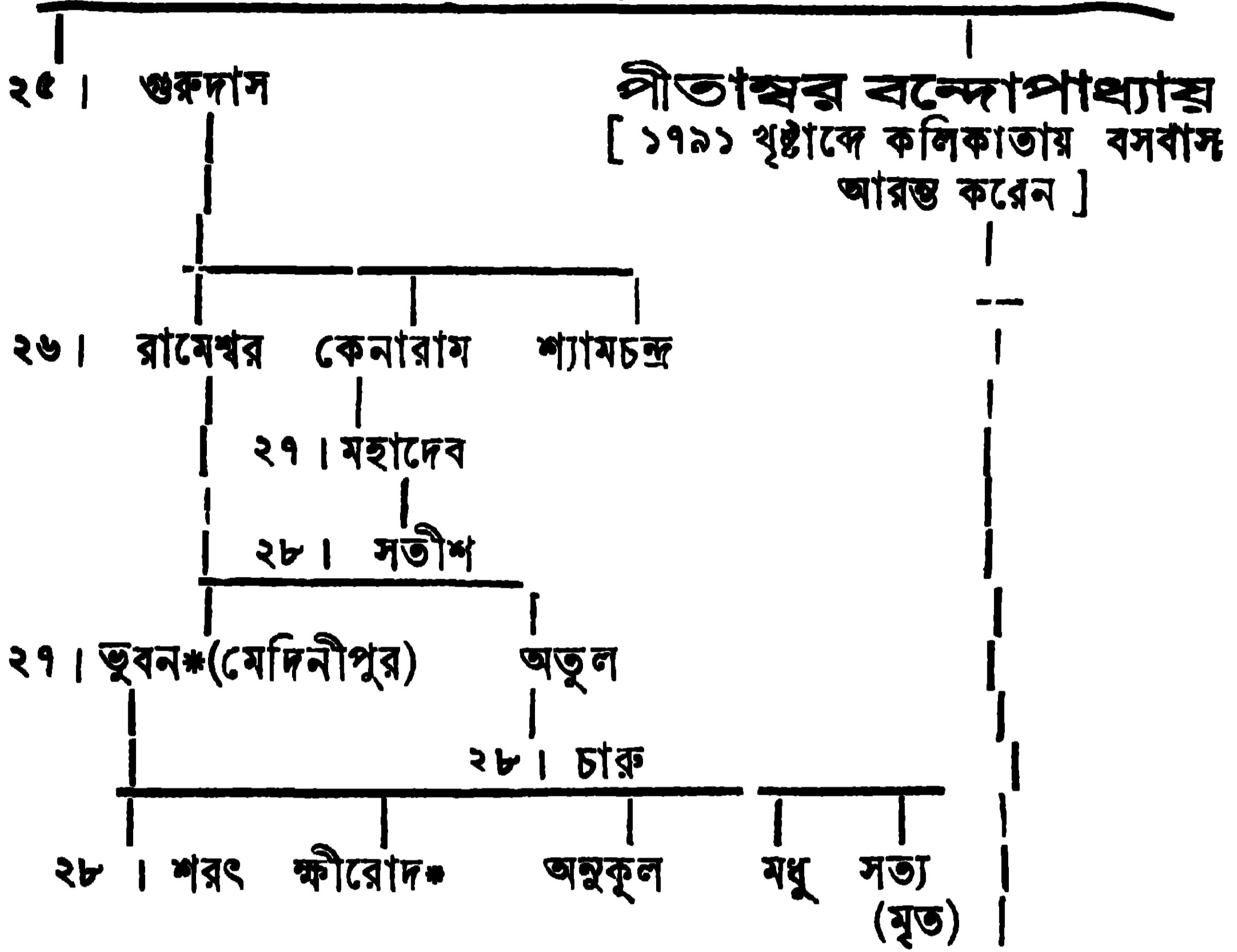
২৪। রামশঙ্কর
২৫। গুরুদাস
পীতাম্বর বন্দোপাধ্যায়
[১৭৯১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় বসবাস আরম্ভ করেন]
২৬। রামেশ্বর কেনারাম শ্যামচন্দ্র
২৭। মহাদেব
২৮। সতীশ
২৭। ভুবন*(মেদিনীপুর) অতুল
২৮। চারু
২৮। শরৎ ক্ষীরোদ* অনুকূল মধু সত্য (মৃত)
২৬। গিরিশ* শম্ভু শিবচন্দ্র মহেশ রাজেন্দ্র ভৈরব বটু* কালীচরণ
[খৃষ্টান হয়েন]
[মিশ্রবংশের দত্তক পুত্র হন]
[উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবারে দত্তক পুত্র হন]
২৭। সুরেশচন্দ্র (মৃত) হরিনাথ ওরফে ঝুন শীতলহরি ঠাণ্ডাহরি (মৃত) নিত্যহরি (মৃত) জগৎহরি
ভূপতি
২৭। চন্দ্রকান্ত ওরফে গোবী
হরিহর ওরফে গুল
* চিহ্নিতগণ আইন-ব্যবসায়ী (Lawyers)

২৬। ভৈরবচন্দ্র
২৭। দেবেন্দ্র
উপেন্দ্র ওরফে নান্নু(মৃত)
সত্যেন্দ্র (মৃত)
জ্ঞানেন্দ্র
ফণীন্দ্র (মৃত)
শরৎকুমারী
যতীন্দ্র
২৮ নরেন্দ্র
সুরেন্দ্র
মণীন্দ্র
রবীন্দ্র
সোমেন্দ্র
যোগীন্দ্র
শরৎসুন্দরী
শরৎসরোজিনী
২৬। বটুবিহারী
২৭। বিনোদবিহারী (মৃত)
বনবিহারী
ব্রজবিহারী
২৮। সুধা
২৬। গিরিশচন্দ্র
২৭। কৈলাশচন্দ্র (মৃত)
উমেশচন্দ্র
Mr. W.C. Bonnerji
(Croydon, England
ব্যারিষ্টার ছিলেন)
সত্যধন (মৃত)
২৮। কমলকৃষ্ণ (ব্যারিষ্টার)
কালীকৃষ্ণ উড
সরলকৃষ্ণ কীট্‌স (মৃত)
রত্নকৃষ্ণ কুর‍্যান (ব্যারিষ্টার)
২৯। কৃষ্ণকুমার এডউইন
নীলকুমার চার্লস
২৬। শম্ভুচন্দ্র
২৭। মহেন্দ্র
মণীন্দ্র
মন্মথ
নটবিহারী
শান্তিহরি
ননীমোহন
কৃষ্ণলাল*
* আইন ব্যবসায়ী

মহেন্দ্র ওরফে পণ্ডিত
মণীন্দ্র ওরফে নাইন
মন্মথ ওরফে পুতুল
নটবিহারী
শান্তহরি
ননীমোহন
কৃষ্ণলাল
অমূল্যধন
তারকদাস
বৈদ্যনাথ
২৮। যতীন্দ্রনাথ
পূর্ণচন্দ্র
প্রবোধচন্দ্র
২৮ গোবর্দ্ধন
নীলু
২৯। বাদল
নীলরতন
২৯ দীননাথ
বোঁচা
গোরা
নীলরতন
২৪। রামনিধি ওরফে নিধিরাম
২৫। রামজয়
রামচাঁদ
রূপনারায়ণ
শিবু
ঠাকুরদাস
২৬। হরিশ
তারক
২৬। নীলকমল
রামগতি
গিরিশ
২৭। প্রসন্ন
২৭। বদন
২৬। আনন্দ
গোবিন্দ
ভগবান
রামকুমার
২৭। ফকির
রামকৃষ্ণ
অক্ষয় ওরফে ক্ষীরোদ

ধলভূম-রাজবংশ

সিংহভূম জেলার পূর্ব্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব্বাংশ এবং মেদিনীপুর জেলার পশ্চিমাংশ লইয়া ধলভূম পরগণা গঠিত। ইহার উত্তরে মানভূম, দক্ষিণে ময়ূরভঞ্জ ষ্টেট, পূর্ব্বে মেদিনীপুর জেলা এবং পশ্চিমে সেরাইকেলা ষ্টেট। ইহার পরিমাণ ১২০০ বর্গ মাইল। তন্মধ্যে সিংহভূম জেলার অন্তর্গত ১১৮৭ বর্গ মাইল ও মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ১৩ বর্গ মাইল। ধলভূম স্বর্ণ, লৌহ, তাম্র, মেঙ্গেনিস প্রভৃতি নানাপ্রকার ধাতুর খনিতে পরিপূর্ণ। বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে যতগুলি তাম্রখনি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে ধলভূমের তাম্রখনি সর্ব্বাপেক্ষা বিস্তৃত ও সমৃদ্ধ। এতদ্ব্যতীত লাইমষ্টোন, বাসন প্রস্তুতের উপযোগী প্রস্তর, ইমারতের প্রস্তর, শ্লেট প্রস্তর, কেওনাইথ, অভ্র এবং উচ্চাঙ্গের উত্তাপসহ প্রস্তর ধলভূমে বর্ত্তমান আছে এবং তাহা যথেষ্ট পরিমাণে যথোপযুক্ত কার্য্যে ব্যবহৃত হইতেছে। সুবর্ণরেখাবিধৌত ধলভূম দক্ষিণ-পূর্ব্বাংশে অপেক্ষাকৃত সমতল ও পলিমাটীপূর্ণ। পূর্ব্বাংশ হইতে পশ্চিমাংশ ক্রমে অধিকতর বন্ধুর। তাহার দক্ষিণ ও উত্তর পার্শ্বদ্বয় উচ্চশৃঙ্গ গিরিমালা দ্বারা সুরক্ষিত এবং উক্ত উভয় গিরিশ্রেণীর মধ্যদেশে গভীর খাতে পার্ব্বত্য নদী সুবর্ণরেখা প্রবাহিতা।

সাঁওতাল, ভূমিজ, খেড়িয়া প্রভৃতি ধলভূমের আদিম অধিবাসী; প্রমার রাজগণ ধলভূমে আধিপত্য বিস্তার করিয়া নানা স্থান হইতে নানা শ্রেণীর সুশিক্ষিত লোকসকলকে আনয়ন করিয়া তাঁহাদিগকে যথোপযুক্ত ভূসম্পত্তি দান করতঃ ধলভূমে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতার সময় হইতে রাজা শত্রুঘ্ন পর্য্যন্ত বহু পরিমাণ ভূমি, দেবোত্তর,

শ্রীজগদীশচন্দ্র দেউ ধবলদেব

ব্রহ্মোত্তর, লাখেরাজ, মহাত্রাণ, বাবুয়ান ইত্যাদি স্বত্বে ভোগদখল করার অধিকার দিয়াছেন।

টড সাহেবের সুপ্রামাণ্য রাজস্থান-গ্রন্থে ধলভূম-রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ প্রমারকুল সম্বন্ধে এইরূপ লিপিবদ্ধ আছে—"সূর্য্য ও চন্দ্র হইতে যেমন সূর্য্যবংশ ও চন্দ্রবংশের উৎপত্তি, অগ্নিকুলতিলকগণও সেইরূপ অগ্নি হইতে সমুৎপন্ন। অগ্নি হইতে চারিটী বংশের উদ্ভব হইয়াছে। ঐ চারিটী শাখা—(১) প্রমার, (২) পুরীহর, (৩) চালুক্য বা শোলাঙ্কি, (৪) চৌহান নামে অভিহিত। অগ্নিকুল মধ্যে প্রমারগণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইঁহাদের বংশ-ধরেরা পঞ্চত্রিংশ শাখায় বিভক্ত। এক সময়ে ভারতের অধিকাংশ স্থান ইঁহাদের অধিকারভুক্ত ছিল"।

প্রাচীন মহেশ্বর নগরই প্রমার-রাজগণের প্রথম রাজধানী ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। অল্পকাল পরেই প্রমার-রাজগণ ঐ নগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিন্ধ্যগিরিশিখরে ধারা ও মান্দু নামক দুইটী নগরীর প্রতিষ্ঠা করেন। প্রমার-নৃপতিগণের কীর্ত্তি ও প্রতাপ নর্ম্মদা অতিক্রমপূর্ব্বক সুদুর দাক্ষিণাত্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল।

সুবিখ্যাত প্রমার ভোজরাজ মাহম্মুদ গজনীর সমসাময়িক। ইনি ১০৬২ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। তদীয় পৌত্রের রাজত্বকালে (ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে) আল্‌তামাস্ মালব ধ্বংস করেন। ইহাতে প্রমার-বংশ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়েন এবং ভারতের নানা স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করেন। এই সময়ে ধারাধিপতির দ্বিতীয় পুত্র জগদ্দেও ভাগ্যান্বেষণে বহির্গত হইয়া বহু তীর্থ পর্য্যটন করেন। অবশেষে শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথ দর্শন করিয়া উত্তরাভিমুখে গমন করেন। পথে আসিতে আসিতে ধলভূমে উপস্থিত হন এবং ধলভূমের বিস্তীর্ণ আকার ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখিয়া তদানীন্তন অধিপতিকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন। ইনি ধলভূম-রাজবংশের আদিপুরুষ। এই ধর্ম্মপ্রাণ মহাবীর স্বভুজার্জ্জিত

রাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া 'ধবলদেব' এই পবিত্রতাসূচক উপাধি গ্রহণ করেন। তাহার পর ইনি ধলভূমকে নিজ জন্মভূমির যথাসম্ভব অনুরূপ করার উদ্দেশ্যে ধলভূম পর্ব্বতমালার প্রাকৃতিক দৃশ্যসমন্বিত সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গটী নিজ জন্মস্থান বিন্ধ্যগিরিশিখরে অবস্থিত ধারা-নগরীর নামানুসারে 'ধারা-গিরি' নামকরণ করতঃ তদুপরি একটী শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার চির-অভীষ্ট মান্দুস্থিত নীলকণ্ঠেশ্বরের নামানুসারে নামকরণ করিলেন। শক্তি-উপাসক জগদ্দেও মহুলিয়া, গ্রামে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের চির-উপাস্তা কঙ্কালীদেবীর প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করেন। কঙ্কালীদেবীর স্বপ্না-দেশে ঐ দেবীমূর্ত্তি 'রঙ্কিণী' নামে বিখ্যাতা হইলেন। তদবধি রঙ্কিণী দেবী ধলভূম-রাজবংশের কুলদেবীরূপে অদ্যাবধি পূজিতা হইতেছেন। প্রতি বৎসর ইন্দ্রাভিষেকের পর জিতাষ্টমী ও তৎপর দিবস মহাসমারোহে দেবীর মহাপূজা হয়। এই পূজা 'বিন্ধ্যা' নামে খ্যাত।

প্রমার-রাজগণের প্রথানুসারে ধলভূম-রাজবংশেও নামগ্রহণের প্রথা আছে। জগদ্দেও 'জগন্নাথ' নাম গ্রহণ করেন। এই সময় হইতে জগন্নাথ, রামচন্দ্র ও বৈকুণ্ঠনাথ এই তিনটী নাম পর পর মহারাজগণ গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন। ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে বৃটিশ অধিকার স্থাপন পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত মহারাজগণ রাজ্যশাসন করেন :—

১। জগন্নাথ, ২। রামচন্দ্র, ৩। বৈকুণ্ঠনাথ, ৪। চিত্রেশ্বর, ৫। জগন্নাথ, ৬। রামচন্দ্র, ৭। বৈকুণ্ঠনাথ, ৮। জগন্নাথ, ৯। রামচন্দ্র, ১০। বৈকুণ্ঠনাথ, ১১। জগন্নাথ, ১২। রামচন্দ্র, ১৩। বৈকুণ্ঠনাথ, ১৪। জগন্নাথ, ১৫। রামচন্দ্র, ১৬। বৈকুণ্ঠনাথ, ১৭। জগন্নাথ, ১৮। রামচন্দ্র, ১৯ বৈকুণ্ঠনাথ।

ইংরাজ-রাজত্বের প্রারম্ভে স্বাধীন ধলভূমরাজ্য পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্য-গুলি অপেক্ষা শক্তিশালী ছিল। ফার্গুসন সাহেব অন্য রাজ্যগুলির সহিত বন্দোবস্ত করিলেন এবং ধলভূম বশ্যতা স্বীকার না করায় অন্য

অন্য জমিদারীর ফৌজের সহিত নিজ বাহিনী লইয়া ধলভূম আক্রমণ করিতে যান। বৃদ্ধ রাজা বৈকুণ্ঠনাথ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। ঘাটশিলা দুর্গের এগার ক্রোশ দূরবর্ত্তী স্থানে আসিয়া ফার্গুসন সাহেব জানিতে পারিলেন যে, পরিখা খনন করিয়া দুই হাজার সৈন্যসহ সপুত্র বৈকুণ্ঠনাথ তাঁহার অপেক্ষা করিতেছেন। কোম্পানীর সৈন্য অগ্রসর হইলেই ধলভূম-বাহিনী নিজ স্থান ত্যাগ করতঃ শত্রু সৈন্যকে বেষ্টন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু বহু আগ্নেয়াস্ত্র-সুসজ্জিত ইংরাজ সৈন্যকে সম্পূর্ণ-ভাবে পরাজিত করা ধলভূমবাহিনীর পক্ষে সম্ভবপর হইল না। ধলভূমের ধানুকী সৈন্যগণ বনমধ্য হইতে অজস্র বাণ নিক্ষেপ করতঃ ইংরাজ-বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ ও বিব্রত করিয়া দিল। ফার্গুসন সাহেব প্রতি পদক্ষেপেই বাধা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি ঘাটশিলা দুর্গ অধিকার করেন। রাজা বৈকুণ্ঠনাথ দুর্গে অগ্নি সংযোগ করিয়া পাহাড়ে আশ্রয় লইলেন। এই সময় রাজার মৃত্যু হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রবল-প্রতাপ জগন্নাথ পিতৃ-সিংহাসন প্রাপ্ত হন এবং অধিকতর উদ্যমে যুদ্ধ করিতে থাকেন। তিনি সম্মুখ-যুদ্ধ না করিয়া 'চোরা-গোপ্তা' লড়াই আরম্ভ করিলেন। ফার্গুসন সাহেব অনুগত জমিদারমণ্ডলীকে ধলভূম পরগণার মালিক হইবার জন্য বলিলেন, কিন্তু রাজা জগন্নাথের ভয়ে কেহই স্বীকৃত হইলেন না। ফার্গুসন সাহেব ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট প্রস্তাব করিলেন যে, রাজা জগন্নাথের খুল্লতাতকে গদীতে বসাইয়া কর আদায়ের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। কোম্পানীর অনুমত্যনুসারে রাজা জগন্নাথের খুল্লতাত নিমাইচরণকে সিংহাসনে বসান হইল। তাহাতে রাজা জগন্নাথ পুনঃ পুনঃ এরূপ উৎপাত আরম্ভ করিলেন যে, কোম্পানীর পক্ষে কর সংগ্রহ ত দূরের কথা, খাদ্য সংগ্রহ করাও সুকঠিন হইয়া উঠিল। অবশেষে ক্যাপ্‌টেন মর্গেনের প্রস্তাবে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী রাজা জগন্নাথকে ধলভূমের রাজা স্বীকার করিলেন। ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে

রাজা জগন্নাথ কোম্পানীর সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন ও "তস্‌লীনামা" প্রাপ্ত হন।

রাজা জগন্নাথের ছয় পুত্র। প্রথম পুত্রের বংশ রাজা রামচন্দ্রের সঙ্গেই শেষ হয়। দ্বিতীয় পুত্রের বংশ রাজা শত্রুঘ্নের সহিত শেষ হয়। তৃতীয় পুত্রের বংশধর বত্তমান রহিয়াছেন। চতুর্থ পুত্র কমলাকান্ত জাম্বনীর রাজা হন। জাম্বনীর রাজা গোপীনাথ সিংহ মত্তগজ অপুত্রক অবস্থায় মানবলীলা সম্বরণ করিলে এবং তাঁহার বংশের কোন উত্তরাধিকারী না থাকায় তাঁহার দৌহিত্র কমলাকান্ত জাম্বনীতে আসিয়া রাজ্যভার গ্রহণ করেন। রাজা কমলাকান্ত বর্ত্তমান জাম্বনী ও ধলভূম-অধিপতি রাজা জগদীশচন্দ্রের বৃদ্ধ প্রপিতামহ। রাজা শত্রুঘ্ন অপুত্রক ছিলেন। তিনি বর্ত্তমান রাজা জগদীশচন্দ্রকে উইলসূত্রে ধলভূমরাজ্য দিয়া যান। তাহাতে রাজা জগন্নাথের তৃতীয় পুত্রের বংশধরগণের সহিত রাজা জগদীশচন্দ্রের এগার বৎসরব্যাপী মোকদ্দমা হয়। অবশেষে প্রিভি কাউন্সিলে শেষ নিষ্পত্তি হইয়া রাজা জগদীশচন্দ্র ধলভূমের অধিপতি সাব্যস্ত হন।

ধলভূমের তুলনায় জাম্বনী ক্ষুদ্র। ইহার পরিমাণ ১০০ বর্গ মাইল। ইহার পূর্ব্বে ঝাড়গ্রাম পরগণা, পশ্চিমে ধলভূম পরগণা, উত্তরে ধলভূম ও সিলদা পরগণা, দক্ষিণে ধলভূম ও ময়ূরভঞ্জ। জাম্বনী সমতল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী ও খালে পরিপূর্ণ। পাহাড় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। চাষের জমি অপেক্ষা মূল্যবান শাল জঙ্গলই অধিক। জাম্বনীর সদব চিল্কীগড়ে কনকদুর্গার মন্দির দ্রষ্টব্য। বর্ত্তমান রাজবংশের কত পূর্ব্বে এই দেবীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিতা তাহা বহু সন্ধানেও জানিতে পারা যায় নাই। স্বচ্ছতোয়া ডুলুং নদীর তীরবর্ত্তী ঘনবনরাজি-পরিবেষ্টিত এই মাতৃমন্দির সাধকগণের চিত্তশান্তিপ্রদ ও সাধনার উপযুক্ত ক্ষেত্র। প্রত্যহ তান্ত্রিকবিধানে মায়ের অর্চনা ও প্রতি বৎসর শারদীয় মহাপূজার সময় মহাসমারোহে পক্ষব্যাপী মহাপূজা এবং চণ্ডীহোম হইয়া থাকে। মায়ের

একনিষ্ঠ সেবক বর্ত্তমান রাজা বাহাদুর সপরিবার মাতৃমন্দিরে উপস্থিত থাকিয়া মায়ের পূজা আদ্যোপান্ত পর্য্যবেক্ষণ করেন। এই সুবর্ণময়ী জাগ্রত দেবীমূর্ত্তি-অধিষ্ঠিত তপঃক্ষেত্রে বহু সাধুসন্ত সময়ে সময়ে সমাগত হইয়া থাকেন।

জাম্বনী পরগণা সাধারণতঃ কৃষিপ্রধান হইলেও এই পরগণার কাংস্য ও পিত্তল-শিল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই পরগণাব বহু গ্রামে শিল্পীগণের বাস আছে; তন্মধ্যে রেলষ্টেশন হইতে প্রায় ১১ মাইল দূরবর্ত্তী চিচড়া গ্রাম এই শিল্পের প্রধান কেন্দ্র। উক্ত গ্রামের প্রায় প্রত্যেকটী গৃহ এক একটী কারখানা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

বর্ত্তমান জাম্বনী ও ধলভূমাধিপতি রাজা জগদীশচন্দ্র দেও ধবল দেব, বি-এ, জ্যোতিষাচার্য্য বাহাদুর জাম্বনী পরগণার সদর চিল্কীগড়ে একটী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। জাম্বনী এষ্টেটের পৃষ্ঠ-পোষকতায় এই বিদ্যালয় এবং দুইটী মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় ও বহু-সংখ্যক প্রাথমিক বিদ্যালয় চলিতেছে। উচ্চশিক্ষিত রাজা বাহাদুর তাঁহার প্রজাগণ মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের প্রবল আকাঙ্ক্ষায় নিজ বিশ্রাম-সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পরিত্যাগ করিয়া নিয়মিতভাবে প্রত্যহ চিল্কীগড় বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিয়া থাকেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত চিল্কীগড় বিদ্যাপীঠে দুই-জন অধ্যাপক ব্যতীত তিনি নিজেও অধ্যাপনা করেন। এই বিদ্যাপীঠে কাব্য, ব্যাকরণ, স্মৃতি ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের অধ্যাপনা হইয়া থাকে।

ধলভূমের কৃষিজীবী আদিম অধিবাসীগণ অদ্যাপি বিশেষভাবে শিক্ষার দিকে আকৃষ্ট না হইলেও জামসেদপুর ব্যতীত ধলভূমে একটী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় এবং পাঁচটী মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয় ধলভূম-রাজ-সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় ও মাসিক বৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত বহুসংখ্যক উচ্চ ও নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় এষ্টেট হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হইতেছে। সিংহভূম জেলা-বোর্ড ধলভূমের একপ্রান্ত

হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত যে সকল সুরম্য পাকা ও কাঁচা রাস্তা প্রস্তুত করিয়াছেন ও করিতেছেন ধলভূম রাজসরকার তাহা প্রস্তুত করার প্রস্তরাদি উপকরণ বিনামূল্যে দান করিতেছেন। এইসকল রাস্তা প্রস্তুত হওয়ায় ধলভূমের প্রজাগণ সুদূর পল্লীগ্রাম হইতেও নিজ নিজ কৃষিজাত দ্রব্যসম্ভার লইয়া অনায়াসে যে কোন বাণিজ্যকেন্দ্রে উপস্থিত হইতে পারে। প্রজাগণের সুখ-সুবিধা ও সর্ব্বপ্রকার উন্নতি সাধন করা ধলভূম-রাজবংশের চিরাচরিত ব্রতবিশেষ। ধলভূমের প্রাকৃতিক অবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সুবৃষ্টির অভাবে প্রজাগণের যাহাতে শস্যহানি না হয় ও পানীয় জলের অভাব না হয় সে জন্য 'রাজবাঁধ' প্রভৃতি বহুসংখ্যক বাঁধ প্রস্তুত করতঃ জলসেচনের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন এবং প্রায় প্রত্যেক গ্রামে এক বা তদধিক পুষ্করিণী খনন করাইয়া দিয়াছেন। ধলভূম পরগণায় চারিটী দাতব্য চিকিৎসালয় প্রধানতঃ ধলভূম রাজসরকারের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত। ইহা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না যে, সিংহভূম জেলার যে কোন জনহিতকর কার্য্যে ধলভূম রাজসরকার অগ্রণী থাকেন।

ধলভূম সাধারণতঃ কৃষিপ্রধান হইলেও স্মরণাতীত কাল হইতে স্বর্ণ, তাম্র, লৌহ, অভ্র, মেঙ্গেনিস্, লাইম্‌ষ্টোন্ প্রভৃতি খনিজ পদার্থ উত্তোলন ও তাহা কার্য্যোপযোগী করার প্রচেষ্টা ধলভূমে বিদ্যমান আছে। এতদ্ব্যতীত লাক্ষা, তসর, কাংস্য ও বস্ত্রশিল্পাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ধলভূমের প্রস্তর-বাসন সর্ব্বত্র সমাদর লাভ করিয়াছে। পৃথিবী-বিশ্রুত টাটা কোম্পানীর লৌহ কারখানা ও ইণ্ডিয়ান্ কপার কর্পোরেশনের তামা ও পিত্তল প্রস্তুতের কারখানা ধলভূমান্তর্গত জামসেদপুর ও ঘাটশিলায় অবস্থিত। ধলভূমের অন্তর্গত যুগসেলাই, হলুদপুকুর, চাকুলিয়া, বহড়াগুড়া, পড়িহাটি, গালুডি, ঘাটশিলা প্রভৃতি স্থানগুলি বাণিজ্যকেন্দ্র। তন্মধ্যে চাকুলিয়ায় সাতটী চালের কল সুন্দরভাবে পরিচালিত হইতেছে।

ধলভূমের দ্রষ্টব্য স্থান :—

১। চিত্রেশ্বর মহাদেব—বহড়াগুড়া তরফের চিত্রেশ্বর গ্রামে অবস্থিত। ইহা ঘাটশিলা হইতে ৩৪ মাইল দূরবর্ত্তী। প্রতি বৎসর শিব চতুর্দ্দশী ও মাঘী পূর্ণিমাতে বহু যাত্রীর সমাগম হয় ও মেলা বসে। এতদ্ভিন্ন প্রত্যহ বহুলোক মনোঽভীষ্ট সিদ্ধির জন্য ধন্না দেয়। নিত্য পূজাদির ব্যবস্থা রাজ-সরকার করেন।

২। কালভৈরব—দামপাড়া তরফের অন্তর্গত। স্থানটী কলকল-নাদিনী খরস্রোতা নদীর তীরবর্ত্তী বনবিহগ-কূজিত ও ব্যাঘ্র-ভল্লুকাদি শ্বাপদ-সঙ্কুল ঘনবনরাজি-সমাচ্ছন্ন দুর্ল্লঙ্ঘ্য গিরিমালা-পরিশোভিত। এই স্থানটী পূর্ব্বে মালীগড়ের জমিদারী ছিল। রাজা ৬ষ্ঠ বৈকুণ্ঠনাথ বাহুবলে স্থানটী অধিকার করেন।

৩। কানাইনাথ—ঘাটশিলা হইতে ১৪ মাইল দূরে ঈশান কোণে পর্ব্বতোপরি গহ্বর-মধ্যে অবস্থিত। দেবমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। গহ্বর-দ্বার বৃহৎ প্রস্তর দ্বারা অবরুদ্ধ। প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে পূজার সময় এখানে বহুলোক-সমাগম হয়। ইহার বিপরীত ভাগে 'খাঁদারাণী' নাম্নী দেবীমূর্ত্তি অবস্থিতা। পর্ব্বতোপরি কানাইনাথের নাতিদূরে স্থিত স্বল্প-পরিসর নির্ম্মল-সলিল-হ্রদ দ্রষ্টব্য।

৪। ধারাগিরি—রমণীয় পার্ব্বত্যকুঞ্জরাজি-বিরাজিত-অভ্রভেদী শৈলমালা উজ্জ্বল ভীষণ দৃশ্যাবলী-সমন্বিত হইয়া স্রষ্টার সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের সাক্ষীস্বরূপ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। পর্ব্বতগাত্র হইতে জলপ্রপাত ও সন্নিহিত নির্ঝরিণীচয় দর্শকগণের নেত্রতৃপ্তিকর।

৫। সাতবাখরা—আটকোশী তরফে অবস্থিত, সপ্তর্ষি আশ্রম নামে বিখ্যাত। পর্ব্বতগাত্রে শ্রেণীবদ্ধ কুটীরাকৃতি সাতটী গহ্বর অবস্থিত। প্রবাদ সাতজন তপস্বী এইস্থানে তপস্যা করিয়াছিলেন।

৬। নারায়ণগড়—বহড়াগুড়া তরফে সুবর্ণরেখা নদীর ঘাটদহের

উপর অবস্থিত দুর্গের চিহ্নমাত্র রহিয়াছে। সীমান্ত-রক্ষার জন্য এই দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল। এখনও মাটি খুঁড়িলে প্রাচীন মুদ্রাদি পাওয়া যায়। ইহার ২।৩ মাইল দূরে দূরে আরও দুইটী দুর্গের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়।

৭। রোয়ামগড়—ঘাটশিলা হইতে ১০ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। মরিচার চিহ্ন এখনও বিদ্যমান আছে। এই স্থানটী ধলভূম-রাজ গভর্ণমেণ্টের পুরাতত্ত্ব-বিভাগের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন।

৮। কাপড়গাদীর ঘাট—বন্ধুর পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যে প্রায় দুই-মাইল-ব্যাপী সঙ্কীর্ণ পার্ব্বত্য পথ। বর্গীরা এই পথ দিয়া আসিয়া বঙ্গদেশে লুণ্ঠনাদি করিত।

৯। নরসিংহগড়—হিকিম নরসিংহ এই দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। এখনও গড়খাই এবং মরিচা বর্ত্তমান আছে। রাজা শত্রুঘ্ন এইস্থানে প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিয়াছিলেন। নরসিংহগড়ের দশভুজা দেবীর প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি দ্রষ্টব্য।

ধলভূমের রাজবংশ অতি প্রাচীন। বিন্ধ্যগিরি-শিখরস্থ ধারানগরী হইতে ১২৩২ খ্রীষ্টাব্দে প্রমার ক্ষত্রিয়রাজ প্রথম জগন্নাথ ধলভূমে আসিয়া আধিপত্য লাভ করার পর এই সুদীর্ঘ সাতশত পাঁচ বৎসর কাল ধলভূম তাঁহার বংশধরগণের করতলগত রহিয়াছে। ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ধলভূমাধিপতিগণ স্বাধীন ছিলেন। এই সুদীর্ঘকাল বঙ্গদেশে বাস করিয়া তাঁহারা তদ্দেশীয় ভাবাপন্ন হইলেও তাঁহাদের সামাজিক ও পারিবারিক আচার-ব্যবহার পূর্ব্ববৎ অক্ষুন্ন রাখিয়াছেন। ধলভূম, জাম্বনী, ঝাড়গ্রাম, শ্যামসুন্দরপুর, খাতড়া, অম্বিকানগর, বরাহভূম, মানভূম ও রাইপুর—এইগুলিকে 'নয় মহাল বলে'। এই নয়টী মহাল লইয়াই তাঁহাদের সমাজ গঠিত। বিগত শতাব্দী হইতে তাঁহাদের এই সমাজ স্বাধীন ত্রিপুরা, ময়ুরভঞ্জ, বিষ্ণুপুর, বামণ্ডা প্রভৃতি স্থানের রাজ-

বংশের সহিত আত্মীয়তা-স্থাপনে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। মিতাক্ষরা মতাবলম্বী ধলভূম-রাজগণের একমাত্র জ্যেষ্ঠ পুত্রই সিংহাসনের অধিকারী হইয়া থাকেন। অন্যান্য পুত্রগণ বৃত্তিভোগীমাত্র হন। রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র যুবরাজ, দ্বিতীয় পুত্র হিকিম, তৃতীয় পুত্র বড়ঠাকুর, চতুর্থ পুত্র কুঙর, পঞ্চম পুত্র মুসিব এবং অন্যান্য পুত্রগণ 'বাবু' নামে অভিহিত হন। শাস্ত্রোক্ত বিধান-অনুসারে প্রত্যেক নূতন রাজার অভিষেক-ক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত এই রাজ-বংশের বার্ষিক অনুষ্ঠেয় 'শত্রোত্থান' দিবসে যথারীতি রাজা ও রাজ্ঞীর শুভ অভিষেক-ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। এই রাজবংশ চিরকাল ধার্ম্মিক, বিদ্যানুরাগী, দানশীল ও প্রজারঞ্জক।

ধলভুম-রাজগণ কর্ত্তৃক ভূমিদান

ব্রহ্মোত্তর

গুহিয়াপাল সম্পূর্ণ মৌজা	কুকুরমুড়ি সম্পূর্ণ মৌজা	পারুল্যা ১১ হাল জমি
নেকড়া খোন্দর ,,	জামারিয়া ,,	মন্দা ২ ,,
রামচন্দ্রপুর ,,	সোনাহারা ,,	ডাহিগ্রাম ২ ,,
জাম্বনী ,,	কুকড়া পাহাড়ি ,,	জুরি ১ ,,
কেন্দুয়াপাল ,,	বড়শোল ,,	পটকা ১ ,,
মুড়াকাটি ,,	কদমবেড়া ,,	ডুমুরিয়া ১ ,,
গেড্‌গেড়িয়া ,,	হাতিয়াশোল ,,	
পারুলিয়া ,,	বেলা ½ মৌজা	
মাটিহানা ,,	তালিয়া ,,	
ডুমুরিয়া ,,	ইটামারুয়া ,,	

* ১ হাল = ১১/০ বিঘা

বৃন্দাবনপুর	,,	১ম লুয়াবাঁধি		,,
টিটিহা	,,	কুণ্ডরদা		,,
ডাঙ্গরা	,,	২য় লুয়াবাঁধি		,,
ফুলকুসমা	,,	জারুল্যা		,,
গোপীনাথপুব	,,	ইটামাড়ো		,,
আঙ্গারপাড়া	,,	মালঘাঁদা		,,
পাথর চাংড়ি	,,			
একতাল ১ম	,,	বড় শাল ও হাল জমি *		
শালুক্যা	,,	প্রতাপপুর	২	,,
লাটকাটা	,,	মুনিয়া	২	,,
বৈষ্ণব শোল	,,	জামরিয়া	২	,,
পুতরু	,,	অর্জ্জুনা	২	,,
ভুরসান	,,	নেগুড়সাই	১	,,
চাকশোল	,,	বামনিয়া	১	,,
ধরমপুর	,,	ছোটঅর্জ্জুনা	১	,,
মুরুনিয়া	,,	মুড়াকাটি	১	,,
কোকরো	,,	জারুল্যা	২½	,,
একতাল ২য়	,,	পড়.শ্যা	,,	,,
পিবরাবাদ	,,	খাড়দৌলি	৩	,,
কেন্দাডাঙ্গরী	,,	মাকড়ি	২	,,
মহেশপুর	,,	বাঘআবরা	২	,,
দেহুরি শোল	,,	জগন্নাথপুর	২	,,
চাকসেসু	,,	কোকপাড়া	২	,,
পুন্নাপাণি	,,	কোকপাড়া	২	,,
আসনবনি ১ম	,,	দিঘিমুড়া	১	,,

খেড়েজড়া „ জামবনি ১ „
কদমা „ আনন্দপুর ২ „
কালিমাটি „ বাকড়া ৫ „
তলপাথরি „ করণ সাই ২ „
নারায়ণপুর „ বালিয়াশোল ১ „
সিংপুরা „ সোণাগাড়া ৭ „
উপর বাঁধ „ বাদিয়া ১½ „
আসনবণি ২য় „ পারুধুয়া ৩ „
বড়তলিয়া „ গুহালডাঙ্গরা ৫ „
চেমাইজুড়ি „ ঝাড়াগাড্যা ২ „
লুকাড়ি „ গামারিয়া ৩ „
কাশিডি „ বাঁধগোড়া ১ „
দা বাঁকি „ কাশীপুর ২ „
সগুাসাস্থ „ আমডিহা ৩ „
ভেলাই জোড় „ গেড়াগ্রাম ২ „
পিঠাড়ি „ ধাকৃক্যা ৪ „
ঝাঁপড়িশোল „ ধডাঙ্গরি ১ „
চিয়াবাঁধি „ নিশিন্তপুর ১ „
লুয়াসা „ পিচকাবানি ৩ „
ছইরা „ কেন্দরাপাল ৫ „
কালিদাসপুর „ ১
বনকাটা „
বিজরা বাঁধি „

মহাত্রাণ ও লাখেরাজ খরপোষ মৌকররা

জয়পুরা সম্পূর্ণ মৌজা	ষাড়পুরা সম্পূর্ণ মৌজা	পাথর চাংড়ি সম্পূর্ণ মৌজা
মানপুর ,,	পিপলা	চাকুলিয়া
বল্লাম ,,	সোনাড়ি	কুশতাড়া
মাৎকমডি ,,	তিলাবনি	জগন্নাথপুর
চান্দুয়া ,,	গঙ্গা	চাহিরা
হাকাই	যমুনা	মহুলিয়া
শিলিং	যুবরাজপুর	ভুরসান
গুড়াজোড়	হিদোলগেড়্যা	মাকড়ি
গিটিলাটা	পুখর্য়া	জুরিপাহাড়ী

মহাত্রাণ ও লাখেরাজ	খরপোষ	মোকরার
পড়া	পলাশবণি	মুড়া ঠাকুরা
ডুলুডিহা	ঘটিডুবা	কালাপাথর
টিকসিরিং	লেকা	কন্থালুকা
মোহনপুর	হুলুং	ঘান্টি
পাড়ুয়াবেড়া	সিদ্ধেশ্বর শোল	টেং রাং
রাঙা মেট্যা	রঘুনাথপুর	১ম শালবনি
গাজিড়ি	বারুণ্যা	শিরিষবনি
সরালডি	গহলা	বৈতালপুর
খরসতী	পলাশবনি	২য় শালবনি
ঢিরুগেড়্যা	কিয়াহকাম	রোলাড়ি
		রসুনচপা

লুরদা	কুমড়ি শোল	গৌরাঙ্গপুর
ছৈরাং	তুলসীবনী	বড়বেড়া
মেরুডুবা	রসপাল	কেন্দাপাল
বিহিন্দা	ভালুকা পাহাড়ী	গোপালপুর
কেন্দুয়া	লাউকেশব	হরিণ ধুকড়ি
খড়ক্যাশোলি	রাউতাড়া	তামুক পাল
মহাকুড়্যা	রাঙ্গ	চান্দুয়া
বিশাকুড়্যা	ধানঘরি	কাধাকালা
ব্রাহ্মণকুণ্ডি	মহিষধরা	দামডি
শাসপুর	রাঙ্গামেট্যা	বোং রো
দেউরি	একতাল	খৎপাল
কোকদা	পাউলা	মৌধরা
হিরকু	ষাড়পুরা	স্বর্গছিঁড়া
হলুদপুকুর ২ হাল জমি	দোলকি	পুন্নাপাণি
ডাহিগ্রাম ২	মুটুরখাম	বাহাদুরপুর
জুরি ১	বাঙ্গাবেড়া	কাকড়ি শোল
পটকা ১	জামশোল	মাতাপুর
কেশর পুর ১	চারচাকা	ফালধুয়া
লুয়া গ্রাম ২	বেলডাঙ্গরী	গঙ্গানিয়া
কোকপাড়া ১২৪ বিঘা	আখুয়াপাড়া	বেহারা
গেন্দাড়ি ৫৪ বিঘা	চাকদ	বাসাবাড়
হলুদপুকুর ২৬ বিঘা	তেড়েঙ্গা	কাড়ুয়াকাটা
কোয়ালি ২০ বিঘা	বালিয়াগুড়ি	দেবতানালা
দুখুরিয়া ২৫ বিঘা	ঢুকারপাড়া	কেন্দবনি
বুরুহাতু ২০ বিঘা	মেছুয়া	বাড়িয়া

পড়া হাতু	২০	বিঘা	মামুরদা	পারোবনালা
পোড়া ডিহা	২০০	বিঘা	গামারিয়া	তলপাল
পোশিডি	২০০	বিঘা	দক্ষিণশোল	যুগিশোল

জাম্বনী এষ্টেট— আমাডোলা গোগানিয়া·

ব্রহ্মোত্তর প্রভৃতি ২০০০ বিঘা আচরা বাদ রমাশোলি

ময়ূরবেড়া	শুন্ শুন্যা
নাকদহা	সুডগী
কটাশমারা	ঘাসিডি
মাচাডিহা	বাঘাডুবা
কুড়ালুকা	চিংড়া
কালিমাটী	জয়নগর
ভিতর আমদা	জামর্যা
কাচাবনি	চড়িন্দা
রাজাবসা	দাড়িসাই
চাঁডরি	একতাল
শিরকা	চতরো
ডুরমাঘুটু	জামদা ৬২ বিঘা
	হলুদ পুকুর ৩৫ ঐ
	বনকাটি ১৮ ঐ

রাজবংশলতা
১ জগন্নাথ
২ রামচন্দ্র
নরসিংহ
বৈকুণ্ঠনাথ
৪ চিত্রেশ্বর
৫ জগন্নাথ
৬ রামচন্দ্র
৭ বৈকুণ্ঠ
৮ জগন্নাথ
৯ রামচন্দ্র
১০ বৈকুণ্ঠ
১১ জগন্নাথ
১২ রামচন্দ্র
১৩, বৈকুণ্ঠ
১৪, জগন্নাথ
১৫ রামচন্দ্র
নরসিংহ
১৬ বৈকুণ্ঠ
১৭ জগন্নাথ

১৮ রামচন্দ্র
১৯ বৈকুণ্ঠ
নিমাই
(বহড়াগুড়াশাখা)
২০ জগন্নাথ
বীরচন্দ্র
রাধাগোবিন্দ
গৌরমোহন
কৃষ্ণ
গিরি
মদন
নিমাই
অভয়
গোবিন্দ
শ্যাম
হারাধন
হৃদয়নাথ
মধুসূদন
কিনু
গণেশ
বৈকুণ্ঠ
জগন্নাথ
কালীচরণ
রণেন্দ্র
সমরেন্দ্র
২১ রামচন্দ্র
নরসিংহ
যুগলকিশোর
কমলাকান্ত
(জাম্বনীশাখা)
নিমাই
রঘুনাথ
গোপীনাথ
কিনু
২৬ শত্রুঘ্ন
মধুসূদন
মানগোবিন্দ
নিত্যানন্দ
২২ বৈকুণ্ঠ
২৩ চিত্রেশ্বর
জগজীবন
২৪ জগন্নাথ
মহেন্দ্র
২৫ রামচন্দ্র

মধুসূদন মানগোবিন্দ মহেশ

হরিহর মধুসূদন

জ্যোতিষ ক্ষিতীশ পৃথ্বীশ

পূর্ণচন্দ্র ঈশ্বরচন্দ্র

২৭ জগদীশচন্দ্র

নারায়ণ কমলেশ বিমলেশ অমলেশ নির্ম্মলেশ সরোজেশ

প্রতাপ সুরেশ রামচন্দ্র রাধাকৃষ্ণ পূর্ণ হারাধন ঈশ্বর হরিহর সতীশ

বৈদ্যনাথ

ধর্ম্মভূষণ রায় বাহাদুর কালীচরণ সেন, বি-এল

(গৌহাটীর ভূতপূর্ব্ব সরকারী উকীল)

ধর্ম্মভূষণ রায় বাহাদুর কালীচরণ সেন মহাশয় প্রতিষ্ঠা ও মর্য্যাদা-সম্পন্ন প্রাচীন রাজবংশ-সম্ভূত। ইতিহাস-খ্যাত স্বনামধন্য মহারাজা রাজবল্লভের তিনি অধঃস্তন ষষ্ঠ বংশধর। যে বিরাট বিপ্লবের ফলে বাঙ্গালার নবাব সিরাজ-উদ্-দৌল্লার পতন এবং বাঙ্গালায় ব্রিটিশ শাসনের প্রবর্ত্তন হয়—মহারাজা রাজবল্লভ ছিলেন সেই বিপ্লবের অন্যতম প্রধান নায়ক। আমাদের দেশে প্রবাদ এই যে, সুখ-সমৃদ্ধি ক্ষণস্থায়ী। সেই জন্য রায় বাহাদুর কালীচরণ সেন মহাশয়ের পিতৃদেব স্বর্গীয় চন্দ্রকান্ত সেন মহাশয়কে (ওরফে শ্রীমন্ত সেন—এই নামেই কামরূপে তিনি পরিচিত ছিলেন) ভাগ্যান্বেষণে গৌহাটীতে আসিতে হইয়াছিল। কারণ, তাঁহার জন্মগ্রহণের সময় হইতেই তাঁহাদের পরিবারের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। শ্রীমন্ত বাবু যোগ্য পিতার যোগ্য পুত্র ছিলেন। অধ্যবসায় এবং বিশেষতঃ সচ্চরিত্রতা-বলে তিনি কামরূপ-প্রবাসী বাঙ্গালীগণের নেতৃপদ অধিকার করিয়াছিলেন। ঐকান্তিক ধর্ম্মনিষ্ঠার জন্য তাঁহাকে সকলেই শ্রদ্ধা-ভক্তি করিত। কেবল যে কামাখ্যা-শৈলে অবস্থিত মন্দিরগুলির সংস্কার-সাধন করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে তাহা নহে, কামরূপের অন্যান্য অংশে অবস্থিত মন্দিরসমূহ—যথা, হাজো-স্থিত শ্রীমাধব-মন্দির, গৌহাটীর নিকটবর্ত্তী ব্রহ্মপুত্রনদ-মধ্যবর্ত্তী উমানন্দ-মন্দির এবং গৌহাটী সহরের উগ্রতারা-মন্দিরের সংস্কারও তিনি করিয়াছিলেন। এমন কি, দ্বারবঙ্গের ধর্ম্মপ্রাণ মহারাজাধিরাজ বাহাদুর, কামরূপের কয়েকটী মন্দিরের

সংস্কারের জন্য তাঁহার হস্তে প্রভূত অর্থ ন্যস্ত করিয়াছিলেন। কামাখ্যা-দেবীর পুরাতন প্রতিমা মূল্যবান ধাতুনির্ম্মিত ছিল বলিয়া চোরে উহা চুরি করে। শ্রীমন্ত বাবু বহু অর্থ ব্যয় করিয়া বর্ত্তমান প্রতিমা নির্ম্মিত করাইয়া দেন। প্রত্যেক যাত্রীকে এই প্রতিমা দর্শন ও পূজা করিয়া তাহার পর পীঠস্থানে যাইতে হয়।

ধর্ম্মভূষণ রায় বাহাদুর কালীচরণ সেন মহাশয় উত্তরাধিকার-সূত্রে তাঁহার পিতৃদেবের সকল সদ্‌গুণেরই অধিকারী হইয়াছেন। উকীল-হিসাবে তাঁহার দ্বিতীয় নাই। তাঁহার ন্যায় আধ্যাত্মিক গুণসম্পন্ন ব্যক্তি এতদঞ্চলে দেখা যায় না। আসাম প্রদেশে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ও হিন্দুধর্ম্মের প্রচারকগণ যদি আসেন, তাহা হইলে তাঁহারা ধর্ম্মভূষণ মহোদয়ের বাটীতেই সচরাচর অবস্থান করিয়া থাকেন। যখন গৌহাটীর বাঙ্গালী অধিবাসীরা একটি সাহিত্য-পরিষৎ স্থাপন করেন, তখন রায় বাহাদুর কালীচরণকে তাঁহারা উহার ভাইস-প্রেসিডেণ্ট বা সহকারী সভাপতি মনোনীত করেন। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে যখন কামাখ্যায় সাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশন হয়, তখন ইঁহাকে উহার অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত করা হইয়াছিল। যখন গৌহাটীতে কামরূপ অনুসন্ধান সমিতি (ঐতিহাসিক গবেষণার জন্য) স্থাপিত হয়, তখন রায় বাহাদুর কালীচরণ সেন ইহার সেক্রেটারী বা কর্ম্মসচিবের পদ গ্রহণ করিয়া এই সদনুষ্ঠানের সহায়ক হইয়াছিলেন। রায় বাহাদুর 'আসাম ভ্যালি ট্রেডিং কোম্পানী'র প্রতিষ্ঠাতৃগণের অন্যতম, এই প্রতিষ্ঠানটী ক্রমেই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। ইনি "পানবাড়ী টি এষ্টেট" নামক চা-বাগানের এবং তেজপুরস্থিত "ইন্‌ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্কে"র ডিরেক্টর। ইনি গৌহাটী মিউনিসিপ্যালিটীর প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী কমিশনার ছিলেন এবং ৩০ বৎসরকাল ইনি ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সংক্ষেপে বলিতে হইলে বলিতে হয়, লোকহিতকর

প্রত্যেক অনুষ্ঠান ও আন্দোলনের তিনি প্রাণস্বরূপ এবং প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন।

গৌহাটীর "সনাতন ধর্ম্মসভা" রায় বাহাদুর কালীচরণ সেনের প্রধান কীর্ত্তি। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ইহা স্থাপিত হয়। একটি বে-সরকারী বিদ্যালয়-গৃহে ইহার অধিবেশন হইত। প্রথম প্রথম ইহার স্থায়িত্বের সম্ভাবনা ছিল খুবই সামান্য। কালীচরণবাবু প্রারম্ভ হইতেই ইহার সেক্রেটারী ছিলেন। তিনি শীঘ্রই বুঝিতে পারিলেন যে, যতদিন 'সনাতন ধর্ম্মসভা'র নিজস্ব বাটী না হয় এবং যতদিন না লোকে বুঝিতে পারে যে, সভা তাহাদের প্রত্যেকেরই, ততদিন ইহা কিছুতেই জনপ্রিয় হইতে পারিবে না। সুতরাং তিনি অর্থসংগ্রহে উদ্যোগী হইলেন। আসাম-ভ্যালির কমিশনারের তদানীন্তন পার্শন্যাল এসিষ্ট্যাণ্ট ৺হেমচন্দ্র গোস্বামী এবং আসামের প্রসিদ্ধ ও প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী অধিবাসী রায় ভুবনরাম দাস বাহাদুর (এক্ষণে স্বর্গগত), এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ, অবসরপ্রাপ্ত কটন কলেজের সুযোগ্য সংস্কৃত-অধ্যাপক, এই তিন জনের সাহায্যে, গৌহাটীর জনসাধারণ ও তথাকার মাড়োয়ারী ব্যবসায়িবৃন্দ, বাঙ্গালা ও বিহার হইতে সমাগত কামাখ্যা-তীর্থ-দর্শনার্থী যাত্রিবর্গ এবং দ্বারবঙ্গের মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের নিকট হইতে তিনি বহু অর্থ চাঁদাস্বরূপ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এমন কি, কামরূপ জেলার সুদূর অভ্যন্তর ভাগ হইতেও তথাকার অধিবাসিগণ পর্য্যন্ত অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন। গৌহাটী সহরের উপর সরভোগের মৌজাদার রায় বাহাদুর রজনীকান্ত চৌধুরী এক খণ্ড ভূমি দান করেন। শীঘ্রই এই ভূমিখণ্ডের উপর দেবদেবীর পূজার জন্য একটি মন্দিরসহ একটি সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মিত হয়। সমগ্র আসাম প্রদেশে এরূপ সুন্দর অট্টালিকা বিরল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অতঃপর রায় বাহাদুর কালীচরণ 'সনাতন ধর্ম্মসভা' ও ইহার নবনির্ম্মিত গৃহ ও মন্দির রক্ষার জন্য চাঁদার খাতা খুলেন।

প্রথম বৎসরের মাসিক চাঁদার পরিমাণ হয় ৫০৲ টাকা (এক্ষণে হইয়াছে মাসিক প্রায় ৭০৲ টাকা)। এক্ষণে ধর্ম্মসভাকে যত দূর সম্ভব সাধারণের প্রয়োজনীয় ও উপকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিবার আকাঙ্ক্ষা রায় বাহাদুরের হইযাছে। এই আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তির জন্য তিনি কটন কলেজের অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়কে দিয়া প্রতি সপ্তাহে ধর্ম্মোপদেশ দানের ব্যবস্থা ত করিলেনই, তাহার উপর 'বাল্যাশ্রম' প্রতিষ্ঠা করিয়া গৌহাটীর স্কুল-কলেজের ছাত্রগণকে প্রতি সপ্তাহে স্বয়ং ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা দান করিতে লাগিলেন। যে সকল ছাত্র 'বাল্যাশ্রমে' নিয়মিতভাবে উপস্থিত হয়, তাহাদিগকে পারিতোষিক দেওয়া হয় এবং তাহারা যে যে বিষয়ে উপদেশ লাভ করিয়া থাকে সেই সেই বিষয়ে মাতৃভাষায় প্রবন্ধ রচনা করিতে তাহাদিগকে বলা হয়। যাহারা উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচনা করিতে পারে তাহারা পুরস্কৃত হইয়া থাকে। আসাম-প্রবাসী বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা দেশের সাময়িক পূজাগুলি দেখিতে পাইতেন না, এই জন্য ধর্ম্মসভা কেবল যে দুর্গাপূজা করিয়া থাকেন তাহা নহে ; লক্ষ্মীপূজা, কালীপূজা, জগদ্ধাত্রীপূজা, রাসযাত্রা, সরস্বতীপূজা, দোলযাত্রা, অন্নপূর্ণাপূজা, রথযাত্রা ও জন্মাষ্টমীরও অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে জন্মাষ্টমীর দিন "সনাতন ধর্ম্মসভা"-ভবনের উদ্বোধন-ক্রিয়া সুসম্পন্ন হয়। এই জন্য সভার বার্ষিক উৎসব প্রতি বৎসর জন্মাষ্টমীর দিনই হইয়া থাকে। প্রায় এতদুপলক্ষে ধর্ম্মপ্রচারকগণকে নিমন্ত্রিত করিয়া গৌহাটীতে আনা হয়। গৌহাটী সহর আসাম-প্রদেশে প্রবেশ-নির্গমের দ্বারস্বরূপ। কথক, প্রচারক ও কীর্ত্তন-গায়কগণ—যাঁহারাই আসাম উপত্যকায় আগমন করুন অথবা কামাখ্যা-তীর্থ দর্শনের জন্য সমাগত হউন, তাঁহাদিগকে সনাতন ধর্ম্মসভা-ভবনে কথকতা, বক্তৃতা বা কীর্ত্তন গান করিতে গৌহাটীর হিন্দু জনসাধারণ আমন্ত্রিত করিয়া থাকেন।

ধর্ম্মসভায় এরূপ জনসমাগম হইতে লাগিল যে, ধর্ম্মসভার বিস্তৃত দালানেও স্থানাভাব ঘটিল। ইহা দেখিয়া ধর্ম্মভূষণ কালীচরণ ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন এবং সত্বর ধর্ম্মসভার পার্শ্বে অবস্থিত এক খণ্ড ভূমি সংগ্রহ করিয়া উহার উপর একটি সুপ্রশস্ত মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিলেন। এই মণ্ডপে পূজার সময়ে যাত্রাভিনয়াদি হইলে অথবা সভা হইলে যাহাতে ৩ হাজার লোক স্বচ্ছন্দে উহাতে বসিতে পারে তেমন ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

যদিও এইসকল ইমারত তৈয়ারী করিতে প্রায় ১২ হাজার টাকা ব্যয়িত হইয়াছে, কিন্তু ইহাতেও রায় বাহাদুরের আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি হইতেছে না। তিনি "সনাতন ধর্ম্মসভা"র অবস্থা আরও উন্নত দেখিতে চা'ন। তাঁহার আকাঙ্ক্ষা এই—ধর্ম্মসভার স্থায়িত্ব-সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বেগ হওয়া যায় এরূপ ব্যবস্থা করা। ভবিষ্যতে মাসিক চাঁদার পরিমাণ যদি এরূপ হ্রাস পায়, যাহাতে সভার পরিরক্ষণ-কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত না হয়, এবং গৃহাদির সংস্কার-কার্য্যে ও পূজানুষ্ঠান ইত্যাদিব ব্যয়নির্ব্বাহ-কার্য্যে অর্থাভাব ঘটে, তাহা হইলে সভার ধ্বংস অনিবার্য্য। এই আশঙ্কা নিবারণের জন্য অর্থাৎ সভাকে স্থায়ী করিবার জন্য তিনি আরও ২০ হাজার টাকা চাদা সংগ্রহ করিয়া একটি স্থায়ী অর্থভাণ্ডারের সৃষ্টি করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন এবং এই শুভকার্য্য তিনি আরম্ভও করিয়াছেন। এই অর্থভাণ্ডারের সৃষ্টি হইলে উহার আয় হইতে ধর্ম্মসভার গৃহ-সংস্কারাদিও হইবে এবং পূজানুষ্ঠান-কার্য্যও অবাধে সুসম্পন্ন হইবে। আশা করা যায় যে, ধর্ম্মপ্রাণ রায় বাহাদুরের অন্তরের এই সাধু অভিলাষ সত্বরই কার্য্যে পরিণত হইবে।

'বাল্যাশ্রম' ব্যতীত সনাতন ধর্ম্মসভার 'ধর্ম্মসঙ্গীত সমাজ' নামক আর একটি বিভাগও আছে। ইহার সদস্যগণকে ধর্ম্মসভা-ভবনে প্রত্যহ সন্ধ্যায় সম্মিলিত হইতে হয় এবং সপ্তাহে একবার ইহার সভাধিবেশন ইহারই কোনও সদস্যের বাটীতে হওয়া চাই। সভায় কিছুক্ষণ ধর্ম্মবিষয়ক

বক্তৃতা ও আলোচনাদির পর এক বা দুইঘণ্টাকাল সঙ্কীর্ত্তন হয় ও শেষে 'হরির লুট' হইয়া থাকে।

গৌহাটীর ধর্ম্মসভা ক্রমে ক্রমে হিন্দু-সমাজের কল্যাণকর একটী শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইতেছে; ক্রমেই ইহার শক্তি বৃদ্ধি পাইতেছে। পরশুরাম কুণ্ডে যাইবার পথ-সংস্কারের সংকল্প গবর্ণমেণ্ট পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; কিন্তু ধর্ম্মসভার আবেদনে এই পথ সুসংস্কৃত হইয়াছে। কেবল যে এতখানি করিয়াই গবর্ণমেণ্ট নিবৃত্ত হইয়াছেন তাহা নহে, প্রতি বৎসর কুণ্ডের নিকট পর্য্যন্ত একটি ক্ষুদ্র পথ নির্ম্মাণ করিবার এবং সরকারী ব্যয়ে কুণ্ডের নিকটে একটি সরাই রাখিবার বন্দোবস্ত গবর্ণমেণ্ট করিয়াছেন। হিন্দুর ধর্ম্ম ও সমাজ-ব্যবস্থার প্রতিকূল কোনও আইন প্রভৃতি প্রবর্ত্তনের উদ্যোগ হইলে গৌহাটীর সনাতন ধর্ম্মসভা সর্ব্বাগ্রে ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া থাকেন। একবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার দিন শিবরাত্রি বা দোলযাত্রার দিনে পড়িয়াছিল; সভা তখন দিন পরিবর্ত্তনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেন, সে অনুরোধ রক্ষিত হইয়াছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত ছাত্র-পাঠ্য সংগ্রহ-পুস্তকে (Selection) বাইবেল হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া মুদ্রিত হইয়াছিল। সনাতন ধর্ম্মসভার পক্ষ হইতে ইহার তীব্র প্রতিবাদ করা হয়। তখন স্বর্গীয় স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর ছিলেন। তিনি রায় বাহাদুর কালীচরণের সহপাঠী এবং বন্ধু ছিলেন। স্যর আশুতোষকে অনেক কষ্টে সনাতন ধর্ম্মসভার অক্লান্তকর্ম্মা সেক্রেটারীর হস্ত হইতে এ যাত্রায় পরিত্রাণ পাইতে হইয়াছিল।

হিন্দু ধর্ম্ম ও হিন্দু আচার-ব্যবহারের সমর্থন এবং প্রচলিত ধর্ম্মমতের বিরোধী নব্যপন্থীগণের সংস্কারের নামে সংহার-চেষ্টার প্রতিবাদকল্পে 'সনাতন ধর্ম্মসভা' কর্ত্তৃক কতকগুলি পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে।

এইরূপ দুইখানি পুস্তকের রচয়িতা স্বয়ং রায় বাহাদুর কালীচরণ সেন ; পুস্তক দুইখানির নাম—(১) "ঈশ্বরের স্বরূপ" ; (২) "ঈশ্বরের উপাসনা"। বহু পণ্ডিত ব্যক্তি এই পুস্তকদ্বয়ের প্রশংসা করিয়াছেন। শুনা যাইতেছে, 'বাল্যাশ্রমে'র বালকগণকে তিনি যে সকল ধর্ম্মোপদেশ দান করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত উপদেশ একত্র করিয়া তিনি হিন্দুধর্ম্মবিষয়ক আরও কয়েকখানি পুস্তক-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

এক্ষণে তিনি সনাতন হিন্দু-পদ্ধতিতে বালিকাগণকে শিক্ষা দিবার জন্য উপায়-নির্দ্ধারণে ব্রতী হইয়াছেন। তাঁহার ধ্যান-জ্ঞান তিনি এখন এইদিকে নিয়োজিত করিয়াছেন। তিনি স্বীয় পরিবারভুক্ত বালিকাগণকে সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বালিকা-বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভার্থ এ যাবৎ প্রেরণ করেন নাই ; তাহাদের শিক্ষার ভার তিনি স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি একটি বালিকা-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন ; যদিও এই বিদ্যালয়টি ধর্ম্মসভা-ভবনেই বসিতেছে, কিন্তু ইহা ধর্ম্ম-সভার অন্তর্ভুক্ত নহে। এই বিদ্যালয়-পরিচালনার জন্য তাঁহাকে বার্ষিক প্রায় ৬০০৲ টাকা সাহায্য-দান করিতে হইতেছে। তিনি তাঁহার কয়েকজন সনাতন মতাবলম্বী হিন্দু বন্ধুর সহায়তায় অনেকটা 'মহাকালী পাঠশালা'র পদ্ধতির অনুকরণে এই বালিকা-বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠনের বিধি-ব্যবস্থা করিয়াছেন।

রায় বাহাদুর কালীচরণ সেনের বয়স এক্ষণে ৭৬ বৎসর ; কিন্তু এই বয়সেও তাঁহার ন্যায় অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিতে অত্যন্ত অল্প যুবকই সমর্থ। ইহার কারণ আর কিছুই নহে—তিনি শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট জীবন-যাপন-পদ্ধতি অক্ষরে অক্ষরে নিষ্ঠার সহিত পালন করিয়া থাকেন। তিনি শিষ্টাচারের প্রতিমূর্ত্তি ; উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র, বৃদ্ধ-যুবক সকলেরই জন্য তাঁহার দ্বার উন্মুক্ত, সকলেই অবাধে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন। তিনি আদর্শ হিন্দু গৃহী ; তিনি তাঁহার তিন কনিষ্ঠ ভ্রাতা,

তাঁহাদের সন্তান-সন্ততি ও তাঁহাদের উপর নির্ভরশীল স্বজনবর্গকে লইয়া একান্নবর্ত্তী পরিবারভুক্ত হইয়া পরম শান্তিতে, মনের মিলে বাস করিতেছেন। এরূপ দৃশ্য এখনকার দিনে বিরল।

রায় বাহাদুরের পিতার আমল হইতেই তাঁহাদের পরিবারবর্গ কামরূপে বসবাস করিতেছেন। আরও অসংখ্য বাঙ্গালী এইরূপ বসবাস স্থাপন করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে অত্যন্ত অল্প লোকই রায় বাহাদুরের পিতৃদেব ও রায় বাহাদুরের মত আসামবাসীগণের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস অর্জ্জন করিতে পারিয়াছেন। ইহার কারণ আর কিছুই নহে, রায় বাহাদুর শ্রেণী-নির্ব্বিশেষে লোক-সমাজের উপকার-কল্পে আন্তরিকভাবে চেষ্টা করিয়া থাকেন। রায় বাহাদুর কালীচরণ সেনের অপর একটী কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থানীয় বাঙ্গালী ছাত্রদিগের জন্য স্থাপিত উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় (Silver Jubilee Anglo-Bengali High School) এই বিদ্যালয়-প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের একটী অত্যাবশ্যকীয় সমস্যা পূরণ করিয়াছে। বৃদ্ধ বয়সে রায় বাহাদুরের অক্লান্ত পরিশ্রমের চেষ্টায় ১৯৩৬ সনের মার্চ্চ মাসে ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আসামের মাননীয় গভর্ণর বাহাদুর ১৯৩৬ সনের ২৯শে এপ্রিল তারিখে এই বিদ্যালয় উদ্ঘাটন করিয়াছেন। রায় বাহাদুরের চেষ্টা ব্যতিরেকে এই বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়া সুদূরপরাহত ছিল। এতদুপলক্ষে বিদ্যালয়ের গৃহ-নির্ম্মাণের জন্য তিনি স্থানীয় বাঙ্গালী সমাজ হইতে প্রায় বিশ হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন। সমগ্র প্রবাসী বাঙ্গালী ইহার জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। উক্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ রায় বাহাদুরের একখানি সুবৃহৎ তৈলচিত্র বিদ্যালয় গৃহে স্থাপন করিয়াছেন। তৈলচিত্র-উদ্বোধন-দিবসে সভাপতি আসাম ভ্যালি বিভাগের মাননীয় কমিশনর বাহাদুর মিঃ জে-সি হিগিন্‌স, সি-আই-ই, আই-সি-এস (Mr. H. C. Higgins, C. I. E., I. C. S.) রায় বাহাদুরের গুণাবলি বর্ণনা-প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত বক্তৃতা করেন :—

"We have come here to-day with the object,—an object which gives us no less pleasure than I hope it will give him—of doing honour to one of our oldest and most prominent fellow-citizens. And I would like to take the opportunity of thanking the administration of this School for giving the chance of paying my humble tribute to a man whom I have not had the privilege of knowing very long, as we older men count time, but whom I have known long enough to admire and respect and to deem myself fortunate that I can claim him as a friend.

Rai Bahadur Kali Charan Sen may well be called the father of the School in which we are met together this morning. Others can claim to have their shares in this institution. Without their valuable assistance and co-operation the Rai Bahadur's efforts must have come to nothing, as he would be first to admit. But it was his foresight, his initiative, his energy which gave birth to the idea of this Bengali School and fostered the idea until it took definite shape and matured into strong and healthy being. Generation of Bengalis in Gauhati will remember the name of the founder of the School and the sons of the race will pay reverence to his portrait which I have the privilege to unveil to-day.

To the rising generation, not only of Bengalis, but of every race and creed, I would emphasise that Kali

Charan is a man whose example should be followed, a man on whose life the young may with advantage model their own. He occupies an eminent position in his profession. Through his own efforts, his own ability he is a successful man, as the world judges patriot, a lover of his country, of India, of Bengal, of his adopted country Assam. He is deeply religious and has taken a prominent part, as did his ancestors, in fostering and maintaining the Hindu religion. He is, as this building stands to testify, deeply interested in Educations. He is also a man with the courage of his opinions. As every man who is worth anything must have, he has his critics, even his enemies. But his severest critic, his bitterest enemy could never taunt Kali Charan Sen with slave mentality. If he agrees with you, you could wish for no stauncher ally. But if he does not you cannot shake him, although my personal experience of him has been that disagreement carries with it no rancour and ill-feeling. I hope that the succeeding generations of this School will continue to look on this portrait and will ever say—"This is our father, our very worthy father. He was an honourable man".

15th October, 1936.

(Sd) J. C. Higgins,
Commissioner, A. V. Dts.

ইহার বঙ্গার্থ আজ আমাদের একজন প্রাচীনতম এবং সুপ্রসিদ্ধ নাগরিককে সম্মান প্রদর্শন করিবার উদ্দেশ্যে আমরা এখানে সমবেত হইয়াছি। এই ব্যাপার তাঁহাকে যতটা আনন্দ দান করিবে আমাদিগকে তদপেক্ষা কম আনন্দিত করিবে না। তাঁহাকে আমি অনেক দিন হইতে প্রশংসা ও শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিয়া আসিতেছি। তাঁহাকে বন্ধু বলিয়া দাবী করিতে পাইয়া আমি নিজকে ভাগ্যবান্ মনে করি। এরূপ লোককে আন্তরিক প্রশংসা জানাইবার জন্য সুযোগ দেওয়ায় আমি এই বিদ্যালয়েব কর্ত্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আমরা অদ্য প্রাতঃকালে যে বিদ্যালয়ে মিলিত হইয়াছি রায় বাহাদুর কালীচরণ সেনকে তাহার জনক বলা যাইতে পারে। রায় বাহাদুব নিজেই স্বীকার করিবেন, যে সকল লোক এই কার্য্যে তাঁহার সহায়ক তাঁহাদের সহযোগিতা না থাকিলে তাঁহার চেষ্টা বিফল হইত। কিন্তু তাঁহার দূরদৃষ্টি, অনুপ্রেরণা, উদ্যমই বাঙ্গালী বিদ্যালয়-স্থাপনের পরিকল্পনার জন্মদাতা। গৌহাটীর বাঙ্গালীরা পুরুষানুক্রমে বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতার নাম স্মরণ রাখিবে এবং যে প্রতিকৃতি উন্মোচনের সৌভাগ্য আমার ঘটিয়াছে তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবে।

কেবল বাঙ্গালী নহে প্রত্যেক জাতি ও ধর্ম্মের উদীয়মান যুবকদের প্রতি আমি জোরের সহিত বলিতে পারি যে, কালীচরণ সেনের আদর্শ অনুসরণ করিয়া তাঁহাদের জীবন গঠিত করিবেন। তিনি নিজ ব্যবসায়ে (ওকালতীতে) লব্ধপ্রতিষ্ঠ। তাঁহার যত্নে ও কর্ম্মকুশলতায় তিনি একজন কৃতী পুরুষ। পার্থিব দৃষ্টিতে তিনি একজন স্বদেশপ্রেমিক। তিনি ভারতবর্ষ, বাঙ্গলা দেশ এবং প্রবাসভূমি আসামকে ভালবাসেন। তিনি প্রগাঢ় ধার্ম্মিক এবং তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের ন্যায় হিন্দুধর্ম্মকে পোষণ ও প্রতিপালন করিতে সবিশেষ যত্নবান্। তিনি শিক্ষানীতিবিদ্। যে বিদ্যালয়ে আমরা দণ্ডায়মান আছি তাহাই ইহার সাক্ষ্য দিতেছে।

নিজের মত প্রকাশ করিবার সাহস তাঁহার আছে। প্রত্যেক কৃতী পুরুষের ন্যায় তাঁহার সমালোচক, এমন কি, শত্রু পর্য্যন্ত আছে। কিন্তু তাঁহার কঠোর সমালোচক ও শত্রুও তাঁহার দাসসুলভ মনোভাব আছে বলিয়া নিন্দাবাদ করিতে পারে না। তাঁহার সহিত তোমার মতের মিল হইলে তুমি তাহার প্রবল বন্ধু আর যদি তাঁহার সহিত তোমার মতের ঐক্য না হয়, তাহা হইলে তুমি তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিবে না। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে বলিতেছি মতভেদ হইলেও তাঁহার মধ্যে কোন অসদ্ভাব বা বিদ্বেষ থাকে না। আমি আশা করি, এই বিদ্যালয়ের ছেলেরা পুরুষপরম্পরায় এই প্রতিকৃতিকে সম্মান করিবে এবং সর্ব্বদাই বলিবে, তিনি আমাদের পিতা, অতি গুণবান্ পিতা তিনি প্রকৃতই একজন সম্মানার্হ ব্যক্তি ছিলেন।

রায় বাহাদুর কালীচরণের পূর্ব্বপুরুষগণের আদিনিবাস বিক্রমপুর পরগণার পালং গ্রাম (এক্ষণে ফরিদপুর জেলায় অবস্থিত)। এই গ্রামের অধিবাসীরা তাঁহার নিকটে নানারূপে উপকৃত। তথাকার উচ্চ ইংরাজী স্কুলের বর্ত্তমান উন্নত অবস্থার মূলে রহিয়াছে রায় বাহাদুরের দানশীলতা। তিনি "দক্ষিণ বিক্রমপুর সম্মিলনী"র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ; ইহার উদ্দেশ্য—পরগণার আর্থিক ও সামাজিক উন্নতি-সাধন"।

ধর্ম্মভূষণ কালীচরণের ন্যায় ধার্ম্মিক ও সদনুষ্ঠানে উৎসর্গীকৃত-জীবন সৎকার্য্য-সমূহের গুণোপলব্ধি বা পুরস্কার যে এ সংসারে হইবে না, ইহা বলা চলে না। উকীল-হিসাবে তিনি গবর্ণমেণ্টের কার্য্য যেরূপ নিষ্ঠার সহিত করিয়াছেন, সেজন্য গবর্ণমেণ্ট 'রায় বাহাদুর' উপাধি দিয়া তাঁহাকে সম্মানিত না করিয়া পারেন নাই। কেবল তাহাই নহে, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে একটি দরবার পদক ও সার্টিফিকেট অফ অনার বা মানপত্র দান করিয়া তাঁহার জনসেবামূলক কার্য্য পুরস্কৃত করিয়াছেন। "শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডল" তাঁহাকে "ধর্ম্মভূষণ" আখ্যা দিয়া যোগ্য ব্যক্তিকেই সম্মানিত করিয়াছেন।

পূর্ণানন্দ নামক যে সুপরিচিত সাধু চট্টগ্রামে জগৎপুর আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা, তিনি রায় বাহাদুরের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য তাঁহার নামে কামাখ্যা পাহাড়ের সানুদেশে "কালীপুর আশ্রম" নামে একটি আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। "বিক্রমপুর বিবরণ" নামক পুস্তকের রচয়িতা রায় বাহাদুরের একটি সংক্ষিপ্ত জীবন-বৃত্তান্ত তাঁহার এই গ্রন্থে প্রকাশিত করিয়াছেন। এই জীবন-বৃত্তান্তের উপসংহারে তিনি এই মর্ম্মে লিখিয়াছেন :—

কালীচরণবাবু আসামের প্রবাসী বাঙ্গালীগণের অগ্রণী এবং আমরা বিক্রমপুরের অধিবাসীগণ তাঁহার খ্যাতি-প্রতিপত্তিতে গৌরব অনুভব করিয়া থাকি। এই পরিণত বয়সে স্বীয় ধর্ম্মবিশ্বাসে অটল ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি অন্যত্র কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করি যে, এই স্থানে এবং দেশের অন্যান্য অংশে তাঁহার গৌরব বিস্তার ও বৃদ্ধির জন্য তিনি যেন তাঁহাকে অধিকতর দীর্ঘায়ু করেন।

রাজানো যং প্রশংসন্তি যং প্রশংসন্তি পণ্ডিতাঃ।
সাধবো যং প্রশংসন্তি স নরঃ প্রকৃতো মহান্॥

ইহার অর্থ রাজা যাঁহার প্রশংসা করেন, পণ্ডিতগণ যাঁহার গুণকীর্ত্তন করেন, সাধু ব্যক্তিগণ যাঁহার প্রশস্তিবাদ করেন, তিনিই প্রকৃতমহৎব্যক্তি।

ধর্ম্মভূষণ রায় কালীচরণ সেন বাহাদুর এইরূপ একজন মহৎ ব্যক্তি; আসামের সনাতন ধর্ম্ম ও সমাজের কল্যাণের জন্য যাহাতে তাঁহার কর্ম্মশক্তি অটুট থাকে এবং যাহাতে সমগ্র দেশবাসী তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া কর্ত্তব্যপালন করিতে পারেন, এইজন্য তিনি যেন সুস্থ শরীরে আরও দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকেন—ইহাই জগৎপতির শ্রীচরণে আমাদের নিবেদন।

রায় কালীচরণ সেন বাহাদুর যখন কামরূপ জেলার সরকারী উকীলের

পদ ত্যাগ করেন, সেই সময়ে আসাম উপত্যকা বিভাগের (Assam Valley Division) কমিশনারের নিকট আসামের তদানীন্তন রিমেম-ব্র্যান্সার অফ লিগ্যাল এফেয়ারস্ (Remembrancer of Legal Affairs) সিভিলিয়ান মিঃ বি-এন রাও এই মর্ম্মে ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই মার্চ্চ তারিখে লিখেন :—

রায় বাহাদুর কালীচরণ সেনেব পদত্যাগ-সম্পর্কে আসামের লাট কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া আমি জানাইতেছি যে, লাট বাহাদুর তাঁহার পদত্যাগ-পত্র গ্রহণ করিয়াছেন এবং গবর্ণমেণ্টের পক্ষে এতদিন দক্ষতার সহিত কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন বলিয়া আপনি রায় বাহাদুরের যে প্রশংসাবাদ করিয়াছেন, গবর্ণরও সে বিষয়ে আপনার সহিত সম্পূর্ণ একমত। এতৎসহ তিনি আপনাকে এই অনুরোধ করিয়াছেন যে, রায় বাহাদুর বিগত ৩০ বৎসরের উপর কাল ব্যাপিয়া নিষ্ঠা ও আনুগত্যের সহিত গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কার্য্য করিয়াছেন, সেই জন্য আসাম গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন।

আসাম উপত্যকা বিভাগের কমিশনাব ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে মার্চ্চ এই মর্ম্মে এক পত্র কামরূপ ডেপুটী কমিশনারের নিকটে লিখেন :—

গৌহাটী, ২৭শে মার্চ্চ, ১৯৩৮।

উদ্ধৃত পত্র রায় বাহাদুর কে-সি সেনের অবগতির জন্য তাঁহার নিকট প্রেরিত হইল।

মূল ইংরেজী পত্র দুইখানি নিম্নে মুদ্রিত হইল :—

১০২ পত্র

Letter No. 897 dated the 14th March 1928 from B. N. Rau Esqr. I. C. S. Superintendent and Remembrancer of Legal Affairs, Assam to the Commissioner A, V. Divsion.

With reference to your Memo No. 8439, dated the 7th March' 1928, regarding the resignation of Rai Bahadur Kali Charan Sen, I am directed to state that in accepting his resignation, His Excelleney the Governor in Council fully endorses the high appreciation of the Rai Bahadur's services mentioned by you and to request that you will be so good as to convey to Rai Bahadur Kali Charan Sen the thanks of the Government of Assam for his loyal services extending over a period of 30 years.

২নং পত্র

Memo No. 993-G, dated the 19th March 1928 from the Commissioner A. V. Dn. to the Deputy Commissioner Kamrup.

Memo No. 3795 J

Gauhati the 27th March, 1928.

Extract forwarded to Rai Bahadur K. C. Sen for information.

বংশ-লতা

মহারাজ রাজবল্লভ

- দেওয়ান রামদাস
- রাজা কৃষ্ণদাস
- রাজা গঙ্গাদাস
  - রামকানাই
    - দুর্গাদাস
      - প্রসন্নকুমার (নিঃসন্তান)
      - শ্যামাচরণ (নিঃসন্তান)
  - কালীশঙ্কর
    - নিত্যানন্দ
      - আনন্দচন্দ্র (নিঃ সঃ)
      - কিশোরচন্দ্র (নিঃ সঃ)
    - স্বরূপ (নিঃ সঃ)
    - ঈশানচন্দ্র
      - গোলোক (নিঃসঃ)
      - চন্দ্রনাথ (নিঃসঃ)
      - জগবন্ধু
        - দক্ষিণারঞ্জন
        - সুরেন্দ্রকুমার
        - মহেন্দ্রনাথ
        - মনোরঞ্জন
    - অভয়চন্দ্র (নিঃ সঃ)
    - নবকুমার
- রাজা রতনকৃষ্ণ
- (অজ্ঞাত)
  - রায় গোপালকৃষ্ণ
  - রায় রাধামোহন
  - কেবলরাম

নবকুমার
চন্দ্রকান্ত সেন
ওরফে শ্রীমন্ত সেন
কালীচরণ
উমাচরণ
বরদাচরণ
তারিণীচরণ
দুর্গাচরণ
(নিঃসঃ)
অন্নদাচরণ
(নিঃসঃ)
কবিরাজ রমেশচন্দ্র
সারদাচরণ
(নিঃসঃ)
আশুতোষ
শম্ভুনাথ
যোগেশচন্দ্র
M. A. B. L.
দীনেশচন্দ্র
কেশবচন্দ্র
M.B.
সরোজচন্দ্র
অরুণ
বরুণ
নরেশচন্দ্র
B.Sc.,M.B.
মহেশচন্দ্র
B.A.
অতুলচন্দ্র
দ্বিজেশচন্দ্র
উমেশচন্দ্র
ক্ষিতীশচন্দ্র
শিবনাথ
তারিণীচরণ
শৈলেশচন্দ্র B.Sc. (Eng).
কৈলাশচন্দ্র
গণেশচন্দ্র
বিশ্বনাথ

শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন রায়, বি-এল
Ex-M.L.C.

ত্রিপুরা জিলার দাউদকান্দি থানার অধীন মজিতপুর গ্রামের সুবিখ্যাত রায়-পরিবারে ১২৭৭ সালের ২৮শে পৌষ তারিখে শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন রায় জন্মগ্রহণ করেন। ঊর্দ্ধতন সাত পুরুষ হইতেই এই পরিবার ধনী ও দানশীল বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়া আসিতেছে। ইঁহার পিতামহ ৺রামলোচন রায় বুদ্ধিমান ও ক্ষণজন্মা পুরুষ ছিলেন। তিনি ত্রিপুরা, ঢাকা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, কলিকাতা, পাটনা, মির্জ্জাপুর ইত্যাদি স্থানে ২২টী ব্যবসায়-ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়া নানাস্থানে উহাকে বিপুল আকারে বর্দ্ধিত করতঃ প্রভূত ধনসম্পত্তি ও জমিদারি আদি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। রামলোচন রায়ের ভ্রাতা ৺সর্ব্বেশ্বর রায়ও কৃতকর্ম্মা পুরুষ ছিলেন। উভয় ভ্রাতা একত্র হইয়াই তাঁহাদের পিতৃপুরুষেব কারবার রামলোচন সর্ব্বেশ্বর রায় নামে প্রবর্ত্তিত করেন।

৺রামলোচন রায় ৫ পুত্র রাখিয়া ১২৭৭ সালে স্বর্গধামে গমন করেন। তাঁহার ৫ পুত্রের নাম—দুর্গাচরণ, কালীচরণ, শিবচন্দ্র, অক্ষয়কুমার ও ব্রজেন্দ্রকুমার। তন্মধ্যে ৪র্থ পুত্র অক্ষয়কুমার ১২৮৪ সালের ৩রা শ্রাবণ তারিখে আত্মহত্যা করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। জ্যেষ্ঠ দুর্গাচরণ ভ্রাতৃগণ-মধ্যে অতিশয় কর্ম্মনিপুণ ও নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। তিনি তদানীন্তন রীত্যনুসারে পার্শী ভাষা শিক্ষা করিয়া এই ভাষায় পারদর্শী হয়েন। তিনি তাঁহার জীবন-কাল পর্য্যন্ত ঐ বিপুল সম্পত্তি সুচারুরূপে শাসন ও সংরক্ষণ করিয়াছিলেন। ৺রামলোচন রায় ও তাঁহার পুত্র দুর্গাচরণ রায় প্রজার ও অন্যান্য লোকের হিতার্থে বহু পুষ্করিণী খনন, রাস্তাঘাট

ইত্যাদি নানারূপ জনহিতকর কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত অতিথিশালা অদ্যাবধি বর্ত্তমান আছে। তিনি বহু বিগ্রহ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

মজিতপুরের রায-পরিবার অতীব প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত। তাঁহাদের সুনাম ও সুযশঃ পূর্ব্ববঙ্গের অনেক স্থানেই প্রচারিত আছে। এই পরিবার বৈশ্য সাহা-সম্ভূত এবং স্বজাতীয় সমাজে ইহাঁদের বিশেষ প্রতিপত্তি আছে।

৺দুর্গাচরণ রায়ের মধ্যম পুত্র শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন রায় দশ বৎসর বয়সে ঢাকায় যাইয়া ইংরাজী স্কুলে ভর্ত্তী হন এবং ঢাকা কলেজ হইতে ১৮৯১ সালে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তৎপর ১৮৯৪ সালে বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৯৫ সালের জুন মাসে কুমিল্লায় ওকালতি করিতে আরম্ভ করেন। অল্পদিন ওকালতি করিয়াই ইনি বিশেষ কৃতিত্ব লাভ করেন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে মুন্সেফ নিযুক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু কিছুকাল বিচার-বিভাগে কাজ করিয়া ঐ কার্য্য পরিত্যাগ করতঃ পুনরায় ওকালতি-কার্য্যে যোগদান করেন। তিনি ওকালতিতে যোগদান করিয়া নানাপ্রকার জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংস্পৃষ্ট হন। তিনি কুমিল্লা সদর লোকাল বোর্ডের ক্রমাগত ২৮ বৎসর কাল সভ্য ছিলেন এবং ৯ বৎসর যাবৎ ভাইস-চেয়ারম্যান ছিলেন, ২৬।২৭ বৎসর ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সভ্য ছিলেন এবং ম্যাজিষ্ট্রেট চেয়ারম্যান থাকা কালীন তিনি অনেক সময় ভাইস-চেয়ারম্যানের কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি ৩ বার কুমিল্লা মিউনি-সিপালিটীর কমিসনার নির্ব্বাচিত ও মনোনীত হইয়াছিলেন এবং তৎপর কিছুকাল চেয়ারম্যানও ছিলেন। কুমিল্লার দাতব্য চিকিৎসা-লয়ের কমিটির ৩৫ বৎসর যাবৎ সভ্য ছিলেন। এতদ্ভিন্ন কুমিল্লা জেলের ২ বার Non-official Visitor ছিলেন। ভেটিনিউদের Visitor ৭।৮ বৎসর যাবৎ আছেন। এতদ্ভিন্ন তিনি অন্যান্য বে-সরকারি প্রতিষ্ঠানাদি ও স্কুল-কমিটীর মেম্বার ছিলেন এবং এখনও কোনও কোনও প্রতিষ্ঠানের মেম্বার আছেন। তিনি যে কেবল ওকালতি করিয়াই

ক্ষান্ত ছিলেন এমন নহে, তিনি অনেক যৌথ কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশের ও দশের প্রভূত উপকার করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমানে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত ইষ্ট বেঙ্গল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের Managing Director এবং অন্যান্য ব্যাঙ্কের ও Tea Garden Co.র ডিরেক্টর আছেন। যে সকল ব্যক্তির কর্ম্মতৎপরতায় ও উদ্যোগে কুমিল্লা ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে ইঁনি তাঁহাদের অন্যতম। ইনিই চট্টগ্রাম বিভাগে বৈশ্য সাহাদের মধ্যে প্রথম Graduate। বৈশ্য সাহা সম্প্রদায় ধন ও সম্পত্তির বিপুল অধিকারী হইয়াও শিক্ষাক্ষেত্রে নিতান্ত পশ্চাৎপদ ছিলেন। তিনি ওকালতি আরম্ভ করিয়াই স্বজাতীয়গণের মধ্যে যাহাতে শিক্ষার বিস্তার হয় এবং সামাজিক দুর্নীতি ও কুনীতি দূরীভূত হয় তাহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে আরম্ভ করেন। স্থানে স্থানে সভাসমিতি ও কন্‌ফারেন্স করিয়া বৈশ্যসাহাদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে স্বজাতিকে উদ্বুদ্ধ করেন।

বৈশ্য সাহা সমাজের মধ্যে অনেকগুলি গণ্ডী ছিল এবং আছে; তাহাদের মধ্যে পরস্পর বৈবাহিক আদান-প্রদান হইত না। ইহাতে বৈশ্য সাহা সমাজ নিজ গণ্ডীতে পাত্র-পাত্রীর সুবিধা করিতে পারিত না এবং সমাজ ক্রমশঃ ক্ষয় পাইতেছিল। সে জন্য সময় সময় অধিক পণ দিয়া কায়স্থ, বৈদ্য কিম্বা অন্য জাতি হইতে পাত্রী আনিয়া পুত্রগণের বিবাহ দিতেন। এখনও ঐ রীতি শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম ও পূর্ব্ব ময়মনসিংহে বিদ্যমান আছে। ইহাতে বৈশ্য সাহা সমাজের বিশেষ কোনও উপকার হইত না। সে জন্য তিনি ঢাকা, ত্রিপুরা, ফরিদপুর প্রভৃতি স্থানের বৈদ্য সাহাগণকে আহ্বান করিয়া কুমিল্লাতে অনেকবার কন্‌-ফারেন্স করেন এবং তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া অন্যান্য জিলায়ও বৈদ্য সাহাগণ সম্মিলন আহ্বান করিয়া সামাজিক গণ্ডী দূর করিতে চেষ্টা করিতেছেন। সুখের বিষয়, এই যে, এখন বৈশ্য সাহা সমাজে নানা

শ্রেণীর সাহাগণের মধ্যে বৈবাহিক আদান-প্রদান হইতে কোনও বাধা নাই। ইহাই ইনি তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠতম কার্য্য বলিয়া মনে করেন।

তিনি ৭ বৎসর বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন এবং তাহাতে তিনি তাঁহার বুদ্ধিমত্তা ও আইন-জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার তিন পুত্র :—পবিত্রমোহন, শচীন্দ্রমোহন ও জিতেন্দ্রমোহন। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র পবিত্র-মোহন B Sc. ও M.B. পাশ করিয়া অল্পদিন হইল কুমিল্লাতে ডাক্তারি করিতেছেন। দ্বিতীয় পুত্র ইষ্ট বেঙ্গল ব্যাঙ্কে কার্য্য করেন। তৃতীয় পুত্র জিতেন্দ্রমোহনকে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জগৎচন্দ্র রায় দত্তক লইয়াছেন। জিতেন এখন কলিকাতায় বি-কম পড়িতেছেন। ক্ষেত্র বাবুর দুই কন্যা—সুশীলাবালা ও রেণুবালা; দুইটাই সৎপাত্রে অর্পিত হইয়াছে। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুঞ্জমোহন রায় পৈত্রিক বসত-বাটীতে থাকিয়া বিষয়াদি সংরক্ষণ করিতেছেন; তাঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীমান্ মণীন্দ্রমোহন রায় কুমিল্লায় ওকালতি করেন।

শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন রায় ১২৯৯ সালের ৬ই আষাঢ় তারিখে ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত কামাল্লা গ্রামের বিখ্যাত ধনী ৺রামরাজা রায়ের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী বসন্তকুমারীকে বিবাহ করেন।

বংশলতা

সন্তোষ
রতিরাম
সৃষ্টিধর
হারাধন

সর্ব্বেশ্বর
রামলোচন
দুর্গাচরণ
কালীচরণ
শিবচন্দ্র
অক্ষয়কুমার
ব্রজেন্দ্র
জগৎচন্দ্র
ক্ষেত্রমোহন
কুঞ্জমোহন
পবিত্র
শচীন্দ্র
জিতেন্দ্র
সুশীলা
রেণু
মণীন্দ্র
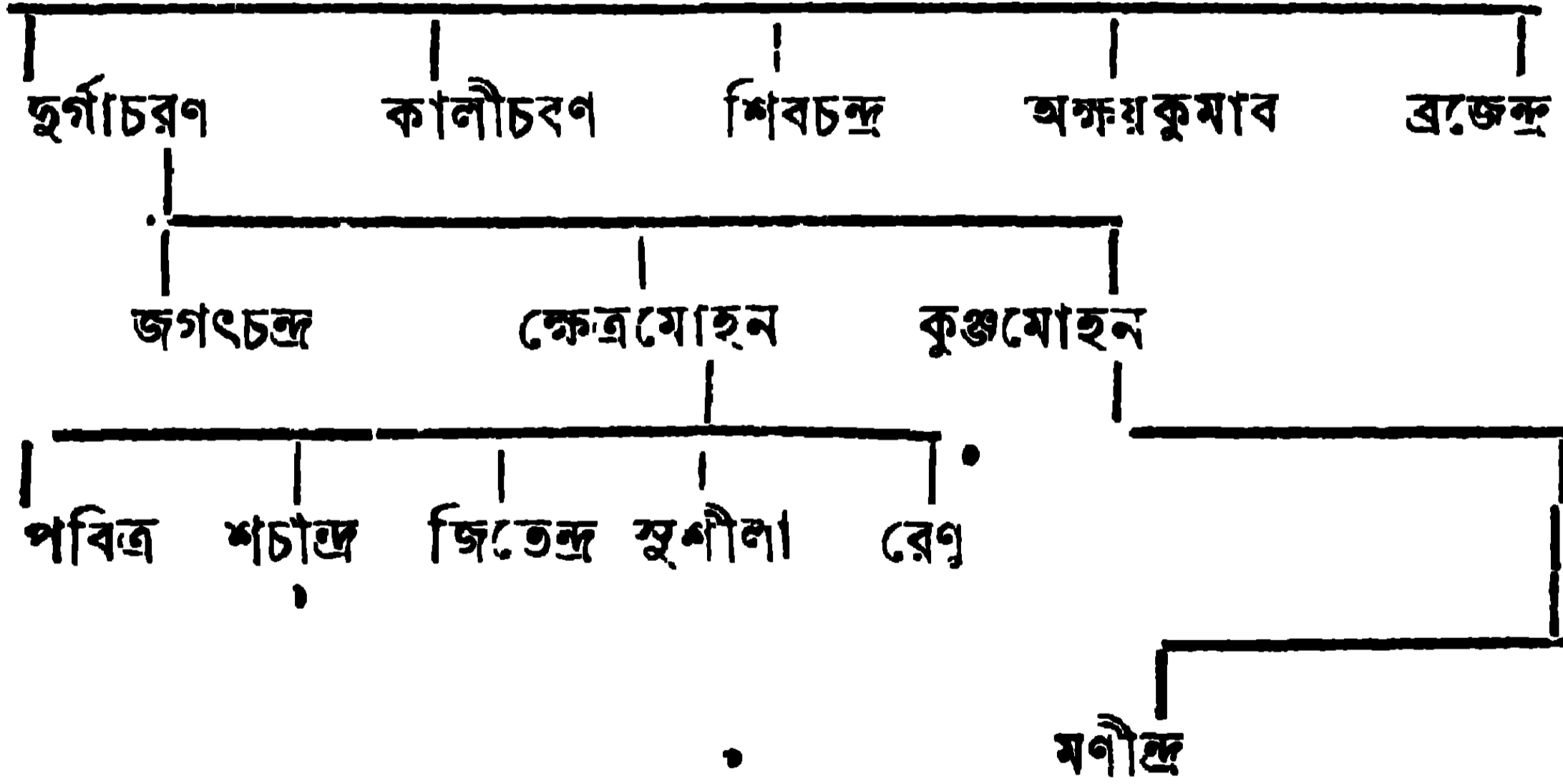
ডাক্তার যতীন্দ্রনাথ বসু

খ্যাতনামা চিকিৎসক ডাক্তার যতীন্দ্রনাথ বসু ২৬শে জ্যৈষ্ঠ ১২৮৫ সালে (ইং ১৮৭৮ খৃঃ অব্দে ৮ই জুন) জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহাদের পূর্ব্ব-নিবাস ২৪ পরগণার অন্তঃপাতী চিংড়িপোতা গ্রামে। ইঁহারা মাহিনগরের বসু-বংশ-সম্ভূত। কর্ম্মব্যপদেশে ইঁহার পিতা দীননাথ বসু জোড়াবাগান কলিকাতায় উপনিবিষ্ট হন। দীননাথ পঞ্চপাণ্ডবের ন্যায় পঞ্চ পুত্র-রত্নের জনক। তাঁহার তিনটি কন্যা ছিল। জ্যেষ্ঠ পুত্র অমৃতলাল (রায় সাহেব), মধ্যম ডাঃ চুণীলাল (রায় বাহাদুর, এম. বি., এফ্. সি. এস., আই. এস. ও., সি. আই. ই., রসায়নাচার্য্য), তদনুজ জ্ঞানেন্দ্রনাথ (মতিহারীর অবসরপ্রাপ্ত সরকারী উকিল), তৎকনিষ্ঠ গিরীন্দ্র নাথ (এটর্ণী) ও সর্ব্বকনিষ্ঠ যতীন্দ্রনাথ।

ডাঃ যতীন্দ্রনাথ শ্যামবাজার বিদ্যাসাগর স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় এবং জেনারেল এসেম্‌ব্লিজ্ ইন্‌ষ্টিটিউসন (বর্ত্তমান স্কটিস্ চার্চ্চ কলেজ) হইতে ফার্ষ্ট আর্টস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৯০২ খৃঃ অব্দে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হইতে এল.এম.এস্ পরীক্ষায় অতি সুখ্যাতির সহিত কৃতকার্য্য হন। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার অব্যবহিত পরে, মেডিক্যাল কলেজে স্বনামখ্যাত অস্ত্র-চিকিৎসক লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেল বার্ড সাহেবের অধীনে চাকরী গ্রহণ করেন। তৎপরে ডায়মণ্ড হারবার, আরামবাগ বা জাহানাবাদ, রাঁচি, টিকারি, সমস্তিপুর প্রভৃতি স্থানে সরকারী ডাক্তাররূপে কার্য্য করেন। ইহার মধ্যে কখনও কখনও তাঁহাকে মেডিক্যাল কলেজের কার্য্যে প্রত্যাবৃত্ত হইতে হইয়াছিল। সর্ব্বত্রই তিনি তাঁহার কর্ম্মদক্ষতা অক্ষুণ্ণ রাখেন। বিশেষতঃ, রাঁচিতে তাঁহার প্রতিভা প্রোজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হয়। রাঁচিও তাঁহার বড়

প্রিয়স্থান ছিল। ১৯১২ খৃঃ অব্দে বিহার প্রদেশ বাঙ্গালা হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে, তিনি বিহারেই থাকিতে পারিবেন বলিয়া গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মনোনীত হন। কিন্তু স্বাস্থ্যভঙ্গের জন্য ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে তিনি সরকারী চাকরী পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন এবং কলিকাতায় বর্ত্তমান বাটী ২৪ নং মহেন্দ্র বসু লেন, শ্যামবাজারে আসিয়া স্বাধীনভাবে চিকিৎসা-কার্য্য আরম্ভ করেন। কলিকাতায় চিকিৎসা-ব্যবসায়ে তিনি সমধিক প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করেন এবং সহরের তৎকালীন বিচক্ষণ চিকিৎসকগণের মধ্যে অন্যতম বলিয়া পরিগণিত হন। গত ইউরোপ মহাযুদ্ধের সময় সরকার বাহাদুর কর্ত্তৃক তাঁহার আহ্বান আসে,—কিন্তু তিনি স্বাধীন ব্যবসা পরিত্যাগ করিতে স্বীকৃত হন নাই।

ডাক্তার যতীন্দ্রনাথ যে শুধু একনিষ্ঠ চিকিৎসা-ব্রতী ছিলেন, তাহা নহে; তিনি একজন সামাজিক ব্যক্তি ছিলেন। নানাবিধ শিক্ষা-নৈতিক ও জনহিতকর প্রতিষ্ঠানেব সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। এইসকল ব্যাপারে তিনি তাঁহার মধ্যমাগ্রজ ডাঃ চুণীলালের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেন। গোপন দান তাঁহাব যথেষ্ট ছিল,—বিশেষতঃ, দুঃস্থ ছাত্রগণকে তিনি নানা প্রকারে সাহায্য করিতেন। Tuberculosis Association of Bengalএর প্রতিষ্ঠার সময় হইতে তিনি উক্ত প্রতিষ্ঠা-নের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সদস্য ছিলেন এবং ইহার উৎকর্ষসাধনের জন্য নানা চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। Indian Red Cross Society ও Indian Life Savings Societyর সহিত তাঁহার সংযোগ ছিল। বাঙ্গালার Boy Scouts Associationএর শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকগণের তিনি অন্যতম ছিলেন। বহুদিন যাবৎ তিনি কলিকাতা Medical Club ও Doctor's Amusement Clubএর সভ্যশ্রেণীভুক্ত ছিলেন। এতদ্ভিন্ন তিনি কলিকাতা অনাথ আশ্রম (Calcutta Orphanage) ও শ্যাম-বাজার দরিদ্র-ভাণ্ডারের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। উত্তর

কলিকাতার শ্যামবাজার বালিকা বিদ্যালয়ের স্থাপনা হইতেই তিনি ইহার একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ও বহু বৎসর যাবৎ উহার ভাইস্-প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের ১নং ওয়ার্ডের Rate-payers' Association ও Health Associationএর সহিত বহুকাল ধরিয়া সংশ্লিষ্ট ছিলেন ও পল্লীবাসীদের উপকারের জন্য অক্লান্ত-ভাবে কার্য্য করিতেন। বিশ্ববিশ্রুত মোহন বাগান এথলেটিক ক্লাবের তিনি আজীবন সভ্য এবং অন্যতম প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। Indian Medical Association (Bengal Branch) এর তিনি একজন প্রধান কর্ম্মী ছিলেন। বহুদিন ধরিয়া তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সহকারী সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৩৬ খৃঃ অব্দে তিনি ইহার সভা-পতির আসন অলঙ্কৃত করেন। বস্তুতঃ, উক্ত কোনও প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার সংস্রব আদৌ বাহ্যাড়ম্বর-পূর্ণ ছিল না, তিনি প্রত্যেকটির সহিত তাঁহার অন্তরের সম্বন্ধ স্থাপিত করিয়াছিলেন। তাঁহার আকস্মিক অকাল মৃত্যুতে উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলি সত্যই একজন নীরবকর্ম্মী বন্ধুকে হারাইয়াছে। ঠিক সময়ে উপস্থিত হইয়া কাজ করা তাঁহার জীবনের একটা প্রধান লক্ষ্য ছিল। কোনও কাজে কখনও তাঁহার নিয়মানুবর্ত্তিতার ব্যতিক্রম হইত না। সময়ের মূল্য তিনি বিশেষভাবে বুঝিতেন।

৯ই কার্ত্তিক, ১৩৪৪ সাল (ইং ২৬শে অক্টোবর ১৯৩৭) মধ্যরাত্রে সহসা হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া, যতীন্দ্রনাথের জীবনলীলার অবসান হয়। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম মাত্র ৫৯ বৎসর হইয়াছিল। তিনি সুদর্শন, বিচক্ষণ, স্বাস্থ্যবান্ পুরুষ ছিলেন। সহসা এইভাবে তাঁহার লোকান্তর হইবে, কেহই তাহা প্রত্যাশা করেন নাই। বিশেষতঃ, তিনি যেরূপ সুনিয়মী ও সংযমী ছিলেন, তাহাতে অনেকেই তাঁহার তৎকালীন যুবজনোচিত বলিষ্ঠ ও কর্ম্মঠ দেহ দেখিয়া, তাঁহার দীর্ঘায়ু কল্পনা করিতেন। মৃত্যুর পক্ষাধিক পূর্ব্বে তিনি তাঁহার তৃতীয়াগ্রজ জ্ঞানেন্দ্রনাথের সহিত দেখাশুনা

করিবার জন্য ৺কাশীধামে যান। জ্ঞানেন্দ্রনাথ সেখানে সস্ত্রীক পীড়িত ছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্ব দিবস যতীন্দ্রনাথ কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন এবং অকস্মাৎ তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

যতীন্দ্রনাথ গৌরবান্বিত বসু-বংশের সন্তান, এ পরিচয় পূর্ব্বে দিয়াছি। ১৯০০ খৃঃ অব্দে তিনি কলিকাতা বরাহনগরের সুপ্রসিদ্ধ ও সম্ভ্রান্ত দত্ত-পরিবারে (৺ কাশীনাথ দত্তের পৌত্রী ও ৺ গঙ্গানারায়ণ দত্তের কনিষ্ঠা কন্যাকে) বিবাহ করেন। তাঁহার পত্নী ভগবৎপরায়ণা আদর্শ হিন্দু নারী। যতীন্দ্রনাথ একমাত্র পুত্র, দুইটি কন্যা, পুত্রবধূ, দুইটি জামাতা, একটি দৌহিত্র, দুইটি দৌহিত্রী ও বিধবা পত্নী রাখিয়া গিয়াছেন এবং কন্যা দুইটিকে সুপাত্রস্থ করিয়াছেন। যতীন্দ্রনাথের পুত্র প্রদ্যোৎ-কুমার ৪ঠা জ্যেষ্ঠ ১৩০৯ সালে (১৯০৩ খৃঃ অব্দে ১৮ই মে) জন্মগ্রহণ করেন। যতীন্দ্রনাথের প্রথমা কন্যা ১৯০৪ খৃঃ অব্দে ও কনিষ্ঠা কন্যা ১৯০৯ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯১৯ খৃঃ অব্দে মে মাসে কলিকাতা শ্যামবাজার-নিবাসী ৺আশুতোষ মিত্রের (অবসরপ্রাপ্ত সরকারী ইঞ্জিনিয়ার) তৃতীয় পুত্র স্বনামধন্য ডাক্তার ৺ গণেন্দ্রনাথ মিত্রের একমাত্র পুত্র সলিলকুমারের সহিত যতীন্দ্রনাথের প্রথমা কন্যার বিবাহ হয়। সলিলকুমার ব্যবসায়ী। তাঁহার দুই পুত্রের প্রথমটি (সুনীল-কুমার) এখন বর্ত্তমান। ডাক্তার গণেন্দ্রনাথ যতীন্দ্রনাথের অতি নিকট বাল্যবন্ধু ছিলেন। ১৯২৪ খৃঃ অব্দে জুলাই মাসে কলিকাতা পটলডাঙ্গা-নিবাসী ৺ শ্যামাচরণ বিশ্বাসের (কলিকাতা কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব্ব ভাইস-চেয়ারম্যান্) কনিষ্ঠ পুত্র ৺ নরেশচন্দ্র বিশ্বাসের প্রথম পুত্র সুকুমারের সহিত তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহ হয়। সুকুমার কলিকাতা হাইকোর্টের উদীয়মান উকিল। যতীন্দ্রনাথের দুই কন্যাই বর্ত্তমান।

পুত্র প্রদ্যোৎকুমার মহামান্য কলিকাতা হাইকোর্টের এটর্ণী। তিনি

বহু পুরাতন জি. সি. চন্দ্র এণ্ড কোম্পানীর প্রধান অংশীদার বিজয়কুমার বসুর নিকট আর্টিকেল ক্লার্ক ছিলেন। তিনি এটর্ণী পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করেন ও কিছুদিন ঐ অফিসেই খুব সুখ্যাতির সহিত কাজ করেন। এখন তিনি স্বাধীনভাবে নিজ নামে অফিস খুলিয়া কাজ করিতেছেন.। ১৯২৯ খৃঃ অব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি গয়ার অবসরপ্রাপ্ত সরকারী উকিল ৺উপেন্দ্রনাথ মিত্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ মিত্রের তৃতীয়া কন্যাকে বিবাহ করেন।

ডাঃ যতীন্দ্রনাথ অতি দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, স্থিরমস্তিষ্ক, যশস্বী চিকিৎসক ছিলেন। তাঁহার পর্য্যবেক্ষণের ফলে বহু কঠিন রোগ-নির্ণয়ে কোনও সন্দেহ থাকিত না। এ জন্য বহু জটিল ব্যাধি তাঁহার সুচিকিৎসায় অতি অল্প সময়েই নিরাময় হইত। লেফ্‌টেন্যাণ্ট কর্ণেল কে. কে. চ্যাটার্জ্জী, আই. টি. এফ.,- ডাঃ এল. এম. ব্যানার্জ্জী, ডাঃ লালমোহন ঘোষাল, ডাঃ সি. সি. বসু, ডাঃ এম. এম. দত্ত, ডাঃ পি. এন্, নন্দী, কবিরাজ যামিনীভূষণ রায, ডাঃ গণেন্দ্রনাথ মিত্র প্রভৃতি মনীষসাম্পন্ন চিকিৎসকগণ তাঁহার সমসাময়িক, অন্তরঙ্গ বন্ধুস্থানীয় ছিলেন। যতীন্দ্র-নাথের তিরোধানে চিকিৎসা-জগতের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

চিকিৎসা-শাস্ত্রে পারদর্শিতা ও সাধাসিধা ভাবে থাকা এবং গোপনদান —এই বসু-বংশের বৈশিষ্ট্য। চুণীলাল ও যতীন্দ্রনাথের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। যতীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অমৃতলালের কনিষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্র ক্যাপ্টেন আই. এম্. এস , এম. বি.। চুণীলালের কনিষ্ঠ পুত্র জ্যোতিঃ-প্রকাশ এম. বি., এফ্. সি. এস্ বহুমূত্র রোগের বিশিষ্ট চিকিৎসক। জ্ঞানেন্দ্রনাথের পুত্র রমেন্দ্রনাথ ক্যাপ্টেন্ আই এম.এস., এল. এম. এস.। সম্প্রতি চুণীলালের জ্যেষ্ঠ পৌত্র অজিতকুমার এম. বি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। আবার ব্যবহার-শাস্ত্রেও এ বংশের কৃতিত্ব উপেক্ষণীয় নহে। অমৃতলালের জ্যেষ্ঠ পুত্র অক্ষয়কুমার এস. ডি. ও।

চুণীলালের জ্যেষ্ঠ পুত্র অনিলপ্রকাশ ব্যারিষ্টার, কলিকাতা স্মল কজ, কোর্টের জজ। যতীন্দ্রনাথের একমাত্র পুত্র প্রদ্যোৎকুমারের পরিচয় পূর্ব্বে দিয়াছি। এই বসু-বংশ পাশ্চাত্য শিক্ষাসম্পন্ন বর্ত্তমান যুগের আদর্শ বাঙ্গালী হিন্দু পবিবার বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। যতীন্দ্র-নাথের পঞ্চ ভ্রাতার মধ্যে এক্ষণে একমাত্র জ্ঞানেন্দ্রনাথ বর্ত্তমান আছেন।

এই বিশিষ্ট বসু-বংশের বংশলতিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

বংশ-লতিকা

১। দশরথ বসু

[কান্যকুব্জ হইতে আনীত]

২। কৃষ্ণ

৩। ভবনাথ

৪। হংস

৫। মুক্তিরাম

ইনিই প্রথমে মাহিনগরে আসিয়া বাস করেন ; ইঁহার অধস্তন পুরুষ সকলেই "মাহিনগরের বসু" নামে খ্যাত]

৬। দামোদর

৭। অনন্তরাম

৮। গুণাকর

৯। মাধব

১০। লক্ষ্মণ

১১। মহীপতি

[ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সুবুদ্ধি রায়]

১২। ঈশান

[শ্রীমন্ত রায় নামেও পরিচিত]

১৩। গোপীনাথ

[পুরন্দর খাঁ (প্রভাকর ?) নামে ইতিহাসে খ্যাত]

১৪। হরিহর খাঁ
[ঐ মন্ত্রণাসভার সদস্য—মন্ত্রী]

১৫। বাসুদেব

১৬। রমানাথ

১৭। নয়ান চাঁদ (চাঁদ বসু)

১৮। ভবানীদাস

১৯। শ্রীমুখ

২০। ২য় শিবরাম

২১। রামগোপাল

২২। **রামকানাই**
[ইনিই মাহিনগর হইতে কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন]

২৩। বিশ্বনাথ

২৪। ভোলানাথ

২৫। **দীননাথ**
পত্নী ভগবতী
[৺কাশীনাথ পাল মহাশয়ের একমাত্র কন্যা]
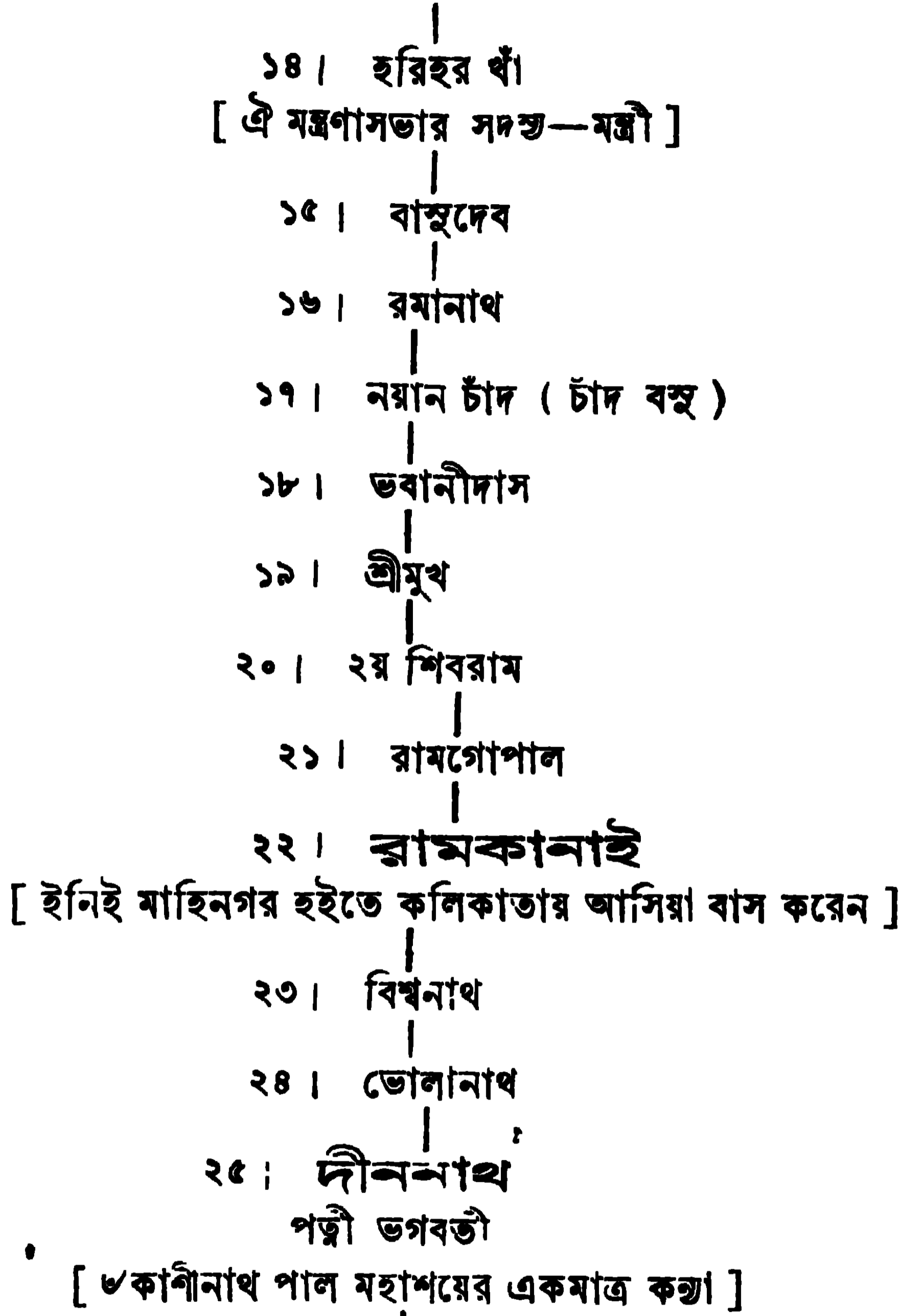
২৬। **অমৃতলাল** (রায় সাহেব)

ডাঃ চুণীলাল (রায় বাহাদুর, এম. বি. এফ. সি. এস. আই. এস. ও. সি. আই ই.)

২৭। অক্ষয়কুমার (এস. ডি. ও.)

রামচন্দ্র (ক্যাপ্টেন, আই. এম. এস. এম. বি.)

২৭। অক্ষয়কুমার
রামচন্দ্র
ডাঃ চুণীলাল
দীননাথ
২৮। অমলকুমার
২৮। বিমলকুমার
কমলকুমার
শতদলকুমার
২৭। অমিলপ্রকাশ
(এম. এ. বি. এল. বার-এট্-ল
কলিকাতা স্মলকজ কোর্টের জজ)
জ্যোতিঃপ্রকাশ
(এম. বি. এফ. সি. এস.)
২৮। অমিয়প্রকাশ
২৮। অজিতকুমার
(এম. বি.)
অশোককুমার
অলোককুমার
২৬। জ্ঞানেন্দ্রনাথ
(উকিল)
গিরীন্দ্রনাথ
(এটর্ণী)
ডাঃ যতীন্দ্রনাথ
(এল. এম. এস.)
২৭। রমেন্দ্রনাথ
(ক্যাপ্টেন, আই. এম. এস,
এল. এম.এস.
প্রদ্যোৎকুমার (এটর্ণী)
২৭। সুধীরকুমার
সুশীলকুমার